সাহিত্য-পরিষৎ
CU6-H04353-6-P36218

বৈজ্ঞানিক

6

সপ্তম ভাগ।

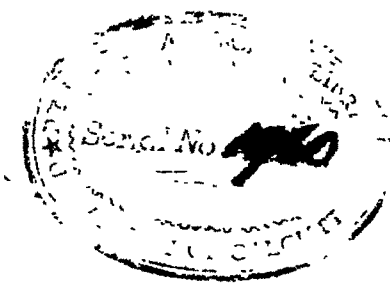

সম্পাদক

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ

৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

কলিকাতা

[illegible] প্রেস হইতে [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩০৫।

P 36,218

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] পরিষৎ-পত্রিকা।

[illegible]

[illegible] সংবাদ [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইতে। [illegible]
প্রাপ্তক্ত ইতিহাস [illegible] [illegible]
[illegible] ৯৪ পৃষ্ঠা [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
সপ্ত শত চৌ[illegible]	[illegible]

ইহা হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
প্রাচীন পুরুষ [illegible]	[illegible]
পুস্তক [illegible]	[illegible]
এই [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible] ১৯, ঠিক।

পরে সম্বৎসরাবধি স্থগিত হইল।
শ্রীউমাশঙ্কর তর্কালঙ্কার মিলিলা।
সবাপি নয়ন দুটি দৈব যোগে অন্ধ।
তথাপি তাঁহার গুণে লোকে লাগে ধন্দ।
ইষ্টনিষ্ঠ বাক্‌নিষ্ঠ কাশীপুরে জন্ম।
পরানিষ্টপরাঙ্মুখ বিজ্ঞ ধর্ম্মী মর্ম্ম।
লোক উপকারে সদা ব্যাকুল অন্তর।
গ্রন্থের সমাপ্তি হেতু গৈলেন তৎপর।
শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার আখ্যান।
তর্কালঙ্কারের পিতা সুধীর বিদ্বান।
তিনে মিলে সাইত করিয়া পণ্ডিত।
এক মাসে বহু গ্রন্থ করি সঙ্কলন।
ষষ্ঠ মাস তিথি বার বর্ষ যাত্রা যত।
পদ্যেতে জানিয়া সংস্কৃত অভিমত।
কালঙ্কারের বন্ধু বিদ্বান নাম।
সিদ্ধান্ত আখ্যান অতি ধীর গুণবান।
পরতি ভাষাতে করিলেন পরিষ্কার।
যার কৃপিলেন বঙ্গ গ্রন্থের প্রচার।

এই বিবরণ হইতে, কবি কোন্ কোন্ পণ্ডিতের সাহায্যে কাশীখণ্ড রচনা করেন, তাহার একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া গেল। অথচও আমরা কবির পরিচয়াদি পাই নাই। উহার পরেই আছে,—

ঘোষাল বংশের রাজা জগন্নারায়ণ।
এই স্থানে সমাপ্ত করিল বিবরণ।
তাঁহার আদেশক্রমে বিরচিল কবি।
রামতনু মুখোপাধ্যায় লইল লিখিয়া।
সেই এই দুই ঘটি নক্ষত্রনিবাসী।
ইন্দুচন্দ্র মুখে পাঁচে লম্বা সিঁথী।

এইটুকুর মধ্যে আমরা কবির নাম ও তাঁহার ঘোষাল বংশে উৎপত্তি এবং তাঁহার রাজোপাধি প্রাপ্তির বিবরণ মাত্র পাইতেছি। তাঁহার বাড়ী কোথায় ছিল, তাঁহার রাজ্য কোথায় ছিল, বা তিনি কে, তাহার কোন বিবরণ বাঙ্গালা সাহিত্য কাশীখণ্ডে পাইলাম কি না, তাহা জানি না। "বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যে" তিনি এসিয়াটিক কাশীখণ্ডের আর কোন কথা উদ্ধৃত করেন নাই বা নিজের ভাষাতেও কোনও কথা বলেন নাই। তবে তিনি কাশীখণ্ড সম্বন্ধে আর যে কয়টি তথ্য কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও এইরূপ উদ্ধৃত হইতেছে,—

"কাশীতে ইহার স্মৃতিস্তম্ভরূপ জগন্নারায়ণ কলেজ এখনও বর্ত্তমান। ১৩০ বৎসরে। আরক হইল, ইনি কাশীবাস কালে কাশীখণ্ডের অনুবাদ করিয়া যান, ইহা মূলের ঠিক অনুযায়ী ও নানা বিচিত্র ছন্দোবন্ধে সুপাঠ্য। এই অনুবাদ সম্পাদন করিতে অনেকগুলি পণ্ডিত খাটিয়া ছিলেন। ইহা এখনকার পণ্ডিতমণ্ডলীর উপেক্ষণীয় না হইতে পারে। কাশীখণ্ডের অনুবাদ ১১৩০ শ্লোকে পূর্ণ। ইহার প্রত্যেক অধ্যায়ে কত শ্লোক আছে, তাহা অধ্যায় শেষে প্রাচীনরীতি অনুসারে একটি শ্লোকে লিখিত আছে। কিন্তু মূলের মূল ভাগ হইতে মুদ্রিত শেষে যে কাশীর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহার মূল্য বেশী। রাজা বাহাদুরের পিতৃকৌশলে তাঁহার সভ্যতাভিজ্ঞতা; তাৎকালিক বাঙ্গালীর যে চিত্র তিনি দিয়াছেন তাহা এক শত বৎসরের বহুনিক, তুলিয়া আবিষ্কার করিবার

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৪র্থ—৫ম সংস্করণ, ৭৮৭ পৃষ্ঠা। দীনেশ বাবু কবির কাশীখণ্ড হইতেও কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাহার উদ্ধৃত অংশের আধিক্য দেখিয়া ঐরূপ মনে হয় না।

এই পুস্তক দুই খানিরও শেষ দুএক পাতা নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস। দুই খানি পুস্তকেই ৩৬৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত আছে। ইহার শেষে—

নরবপু ধরি আমি যত কর্ম্ম করি।
নিজ বংশ হিত জন্য কহিব বিস্তারি॥

এই কবিতাটি পর্য্যন্ত আছে। কবি আত্মপরিচয়ের এই প্রতিশ্রুতি বাক্যের সম্পূরণের জন্য নিশ্চয়ই নিজ কীর্ত্তিমালার বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছিলেন; আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা আর পাওয়া যায় নাই। ৩৬৩ পৃষ্ঠায় কবি যে আত্ম পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি;—

অতঃপর মম জন্ম কুল বিবরণ।
সংক্ষেপে লিখিতে তাহা করিনু মনন॥ ১
পুরাণ ঘটক গ্রন্থ করি অন্বেষণ।
লব্ধ যাহা ক্রমে তাহা করিল গণন॥ ২
ব্রহ্মকুলোদ্ভব বাৎস্য মুনিবরাখ্যান।
ব্রহ্মধ্যাননিষ্ঠ সদা বেদে শুদ্ধ জ্ঞান॥ ৩
তপের প্রভাবে কৃষ্ণভক্তি পরা পান।
গোত্রকারী তেঁহো ভবে দেহ বিদ্যমান॥ ৪
তাঁর পূর্ব্ব বংশাবলী বিশেষ নাটক।
কৃষ্ণভক্ত অগ্রগণ্য এই জানে লোক॥ ৫
এই বংশ পয়োধিতে আছে নানা নিধি।
তার মধ্যে এক প্রিয় হন গুণনিধি॥ ৬
গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ তেঁহো লোকেতে ঘোষয়।
কান্যকুব্জদেশে বাস আছিল নিশ্চয়॥ ৭
বংশোদ্ভব তাঁর অতি শ্রেষ্ঠ সুছান্দড়।
আদিশূর রাজসভে আইলেন রায়॥ ৮
আশু প্রয়োজন জন্য ক্রমে তাঁর সুত।
পর্য্যায়ত গণনীয় বুঝিবে পণ্ডিত॥ ৯
শ্রীধর সুরভি আর সাগর তমোপহ।
বিশ্বামিত্র জিতামিত্র শরণি জানহ॥ ১০
পিঙ্গলাখ্য, সবে শিব বরাল সুস্থিত।
বঙ্গেতে বসতি হেতু গ্রাম নামে খ্যাত॥ ১১
লক্ষ্মণ নামেতে পুত্র ছিল বল্লালের।
সেই সর্ব্বানন্দী মেল দিলেন তাঁহার॥ ১২
ঘোষাল সাহেক উহ কোচ অভিপশ।
উদয় বাণেশ্বর বিশ্বনাথ যশ॥ ১৩
কংসারি ঈশ্বর পদে নড়নাথ নাম।
পাঠক মর্য্যাদায় তাহে বল্লালীয় কাম॥ ১৪
গোপীকান্ত রামকৃষ্ণ বাসেন্দ্র পাঠক।
বাকসাড়া গ্রাম বাসে হইল রক্ষক॥ ১৫
তাঁর দুই সুত বিষ্ণুদেব কৃষ্ণদেব।
কনিষ্ঠের বংশ নাহি দিল দিবদেব॥ ১৬
বিষ্ণুদেব সুতদ্বয় রামদুলাল জ্যেষ্ঠ।
তার পুত্র রামনিধি সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ॥ ১৭
তার পুত্র তাঁর নাম রামলোচন ধীর।
বংশলোপ হইল তাঁর নিয়মে বিধির॥ ১৮
বিষ্ণুর কনীয় সুত কল্পতরু ঘোষাল।
কৈশোরে কিশোরী প্রেমে হইল বসাল॥ ১৯
ঐ হেতু লোলা অতি হইয়া সদয়া।
দেবাধিপ রাজকার্য্যে তারে নিয়োজিয়া॥ ২০
গোবিন্দপুরেতে বাস দিলেন তাঁহার।
গঙ্গা বেহালা খিদিরপুরে নিবসয়॥ ২১
তস্য তিন সুত কৃষ্ণচন্দ্র প্রথম।
গোকুলচন্দ্র রামচন্দ্র অতীব উত্তম॥ ২২
রামচন্দ্র কৈশোরেতে হইল নিধন।
গোকুলচন্দ্র রামগুরুরূপে গণ্য হন॥ ২৩
তাঁর পাঁচ পুত্র নাম ক্রমে বলি শুন।
বৃন্দাবনচন্দ্র পরে রামনারায়ণ॥ ২৪
হরিনারায়ণ তৃতীয় নিবারণ চতুর্থ।
পঞ্চ গঙ্গানারায়ণ হয় যে বর্ণার্থ॥ ২৫
দিন দিন পাঁচ জনের বংশ হৈল হীন।
কৃষ্ণচন্দ্রের এক পুত্র আমি মাত্র দীন॥ ২৬
নর বপু ধরি আমি যত কর্ম্ম করি।
নিজ বংশ হিত জন্য কহিব বিস্তারি॥ ২৭

ইহার পরে আর পাওয়া যায় নাই।

রাজকবি জয়নারায়ণ ;

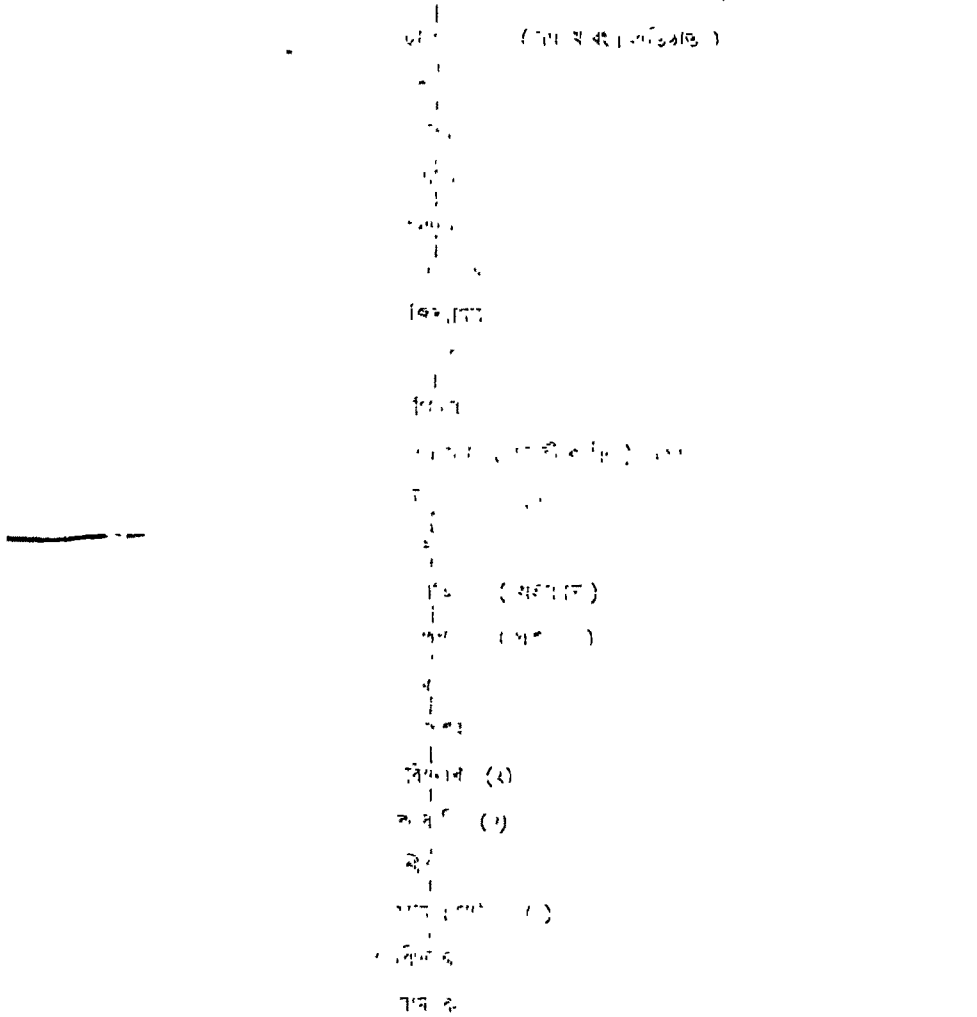

(১) কবি ইহাকেই সর্ব্বানন্দী মেলভুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু মেলবিচার অত্যন্ত অনেক পরে হয়।

(২) কবির 'উদয় বাণেশ্বর বিদ্যারত্ন' এই চরণের "যশ" শব্দটি পূর্ব্ব চরণের "শ" অংশের [illegible] "যশস্বী" আছে [illegible]

(৩) সম্ভবতঃ এই সংখ্যাটি প্রথম কবানন্দী মেল, সেবা গণ্য হয়।

(৪) ইহা কবির আত্মোপলব্ধি ছিল কারণ "ওরালীর কাম" ত্যাগ করিয়া [illegible]

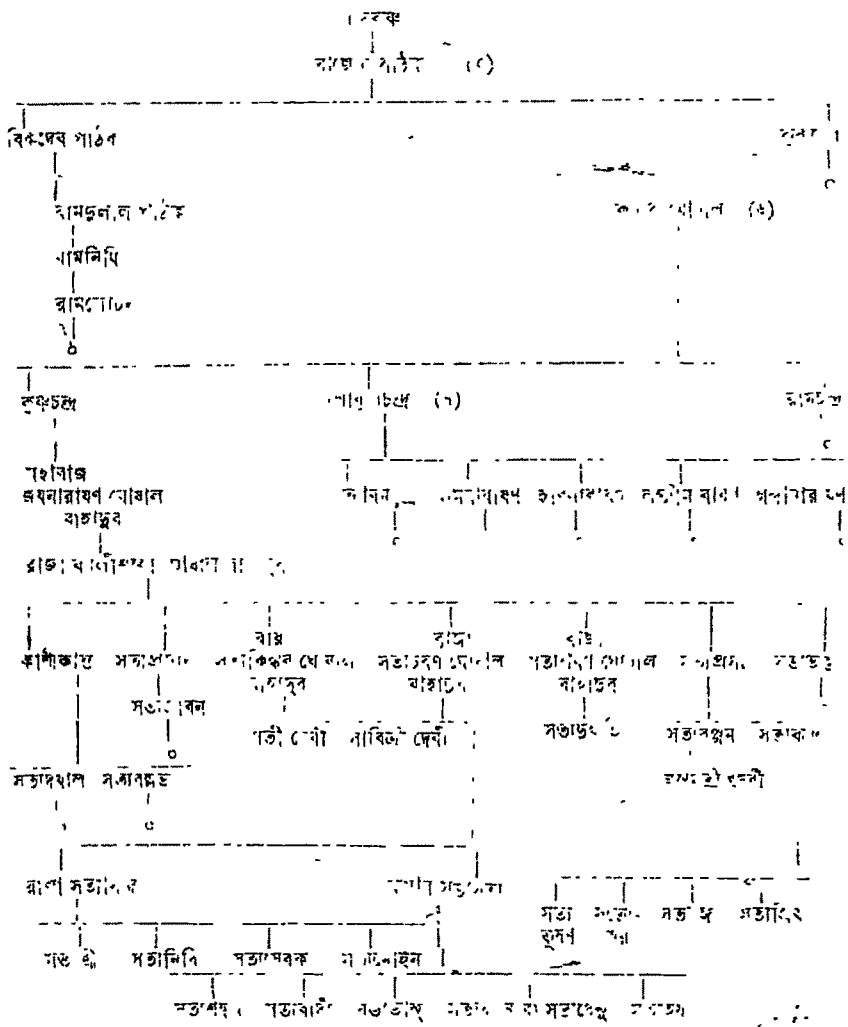

উপরে যে বংশলতা দেওয়া গেল, তাহাতে [illegible] আর অধিকের পাবে না। ইতিপূর্বে কবির রচনা হইতে যতটুকু উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাহার অধিক কোন বিষয় তাঁহার নিজ রচনা হইতে [illegible]

কবির নিজ কথা হইতে আমরা যখন জানিতে পারিলাম যে তিনি বিদিতপুরবাসী গোকুলচন্দ্র ঘোষালের ভ্রাতুষ্পুত্র, তখন তাঁহার জীবনচরিত সংগ্রহ করা বিশেষ কঠিন নহে। জানিয়া আমি ভূকৈলাস রাজবাটী ও গিয়াছিলাম, [illegible] ভ্রাতৃগণের [illegible] বিষয়ে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। কবির পুত্র ৺ রাজা কালীশঙ্কর

(৫) ইনি বাকুড়া গ্রামে বাস করেন। ইহার পূর্বে এই বংশের বাসস্থান কোথা ছিল, জানা যায় না।

(৬) ইনি পরে হইয়া গোবিন্দপুরে বাস করেন এবং পৈতৃক "পাঠক" উপাধি ত্যাগ করেন।

(৭) গবর্ণর বেরেলেষ্ট সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়।

"মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষালের জীবনী।"

যেখানে এখন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ দণ্ডায়মান, পূর্ব্বে সেই স্থানকে গোবিন্দপুর বলিত। সেখানে হিন্দুর বসতি ছিল। সেই গ্রামে কন্দর্প ঘোষাল নামে এক ধনী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। কন্দর্পের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কৃষ্ণচন্দ্র। ১১৫৯ সালের ৩রা আশ্বিন তারিখে (১৭৫২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে) তাঁহার এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। এই পুত্রের নাম জয়নারায়ণ রাখা হয়। কিছুদিন পরে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্ম্মাণের সময় অন্যান্য সকলের ন্যায় কন্দর্পও বাধ্য হইয়া গোবিন্দপুরের বাস পরিত্যাগ করেন। গোবিন্দপুর ছাড়িয়া কন্দর্প প্রথমতঃ কিছুদিন গড়ে বেহালায়[১] বাস করেন। তাহার পরে তিনিই খিদিরপুরে চিরবাস স্থাপন করেন। ১১৬১ সালে কন্দর্প ঘোষাল খিদিরপুরে আবাস বাটী নির্ম্মাণ করান। জয়নারায়ণ ঘোষাল পোনের বৎসর বয়সে বাঙ্গালা সংস্কৃত, ফারসী, হিন্দী এবং ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন এবং বাঙ্গালা, ফারসী, দেবনাগরী ও ইংরাজীতে লিখিতে শিখেন। ১১৭২ সালে জয়নারায়ণ বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার তদানীন্তন নবাব মবাবক উদ্দৌলার অধীনে কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ১১৭৫ সালে তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসেন এবং কিছুদিন পরে তদানীন্তন কলিকাতার পুলিশ সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জন সেক্সপীয়রের সহিত পরিচিত হন। তিনি জয়নারায়ণের বিদ্যাবুদ্ধি ও ক্ষমতা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে নিজকার্য্যের সহকারিরূপে গ্রহণ করেন। তাহার পর যখন সেক্সপীয়র যশোহরের রাজস্ব সংক্রান্ত গোলযোগ মিটাইতে প্রেরিত হন, তখনও তিনি জয়নারায়ণকে সহকারিরূপে লইয়া গিয়াছিলেন। মুরশিদাবাদ, পাটনা, ঢাকা ও বর্দ্ধমানে যখন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা (Provincial Council) স্থাপিত হয়, তখন মিঃ সেক্সপীয়র ঢাকার সভার সভাপতি নিযুক্ত হন। তখনও জয়নারায়ণ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন এবং ১১৮৬ সালের শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত তাঁহাকে সকল কার্য্যে বিধিমত সাহায্য করেন। জয়নারায়ণের কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তিনিও ঢাকার অধিবাসীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদিগের উন্নতিজনক নিয়মাদি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ১১৮৬ সালের শ্রাবণ মাসে তিনি পীড়িত হইয়া বাড়ীতে আসেন। ইংরাজেরা ইঁহার কার্য্যে এত প্রীত হইয়াছিলেন যে তখনকার বাঙ্গালার গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ তদানীন্তন দিল্লীর বাদ্‌শা মহম্মদ জেহান্দার শার নিকট হইতে ইঁহাকে এক সনন্দ আনাইয়া দেন। উহাতে দিল্লীর বাদ্‌শা ইঁহাকে মহারাজ বাহাদুর উপাধি এবং তিনহাজারী মনসবদার পদে নিযুক্ত করেন। খালাসা সীর্জ্জা জওয়ানবখ্‌ত ঐ সনন্দ সহি মোহর করিয়া দেন। উহার তারিখ ১১৯৮ হিজিরী ২৯শে রবিয়লআউল, মনুসী অঙ্ক ২৫ এবং বাঙ্গালা ১১৮৮ সাল। বনবিষ্ণুপুরের রাজা দামোদর সিংহের সহিত জমীদারী বন্দোবস্তের সময়ও ইনি অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। ১১৯৩ সালে ২৪ পরগণার কালেক্টর

[১] কলিকাতার বিলাসের "গড়া বেহালা খিদিরপুরে পরে নিরন্তর" ইত্যাদি হইতে আমরা "গড়ে বেহালা" নাম পাইতেছি।

মিঃ ব্যামাক যখন সমস্ত জেলা জরীপ করাইয়া রাজস্বের আয় বৃদ্ধি করেন, তখনও মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর কালেক্টর সাহেবের সেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহাতে মিঃ ব্যামাক বিশেষ সন্তুষ্ট হন। ১২০৩ সালে মিঃ টমাস প্যাট্‌ল্‌ যখন মুরশিদাবাদের তদানীন্তন নবাব বাবরজঙ্গ বাহাদুরের সহিত বন্দোবস্ত কার্য্যে নিযুক্ত হন, তখনও মহারাজ বাহাদুর মধ্যস্থ হইয়া সুশৃঙ্খলে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে মহারাজ বাহাদুর কোম্পানীর পক্ষে এই সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্য কোনরূপ বেতন বা পুরস্কার গ্রহণ করেন নাই। গবর্মেণ্টের নিকট প্রতিপত্তি ও স্বদেশীয় উপকারার্থ তিনি ইচ্ছা করিয়া নিজ স্বার্থে ঐ সকল কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতেন। ব্যবসা বাণিজ্যে তিনি নিজে যথেষ্ট ধনার্জ্জন করিতেন। সেই আয় হইতে তিনি খিদিরপুরে ও অন্যান্য স্থানে অনেক ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। ব্যবসাবাণিজ্য ও জমীদারীর আয়ে তিনি সুখে স্বাধীন ভাবে থাকিতেন। তাঁহার আয় যথেষ্ট ছিল। তাহা হইতে তিনি অনেক সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। নানা স্থানে নানা দেবতা ও দেবমন্দির স্থাপন করিয়া তাহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ভূসম্পত্তি আদি দান করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে গরীব প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সকল সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল। ১২৮৭ সালে কালীঘাটের কালীদেবীর চারিখানি হাত রৌপ্যে গড়াইয়া দেন। খিদিরপুরের নিকট নিম্নভূমি ভরাট করিয়া এথায় এক বৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। এই স্থানই সাধারণতঃ ভুকৈলাস নামে খ্যাত। উক্ত প্রাসাদের নানা স্থানে কর্ম্মলেশ্বর, কৃত্তিবাসেশ্বর [illegible] নামে তিন শিবলিঙ্গ, পঞ্চানন মহাদেব, গঙ্গা, গণেশ, কার্ত্তিক, দুর্গা, রাধাবল্লভ, হনুমান, যোগ-ভৈরব ও ধাতুনির্ম্মিত পতিতপাবনী নামে সিংহবাহিনী দুর্গা প্রতিষ্ঠিত করেন; এতদ্ভিন্ন ঐ প্রাসাদের মধ্যেই 'শিবগঙ্গা' নামে এক বৃহৎ পুষ্করিণীও প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ১২০০ সালে মহারাজ জয়নারায়ণ কাশীতে "করুণানিধান" নামে শ্রীরাধাকৃষ্ণবিগ্রহ স্থাপন করেন। কাশীতে সাধারণ লোকের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চার বিশেষ অভাব দেখিয়া মহারাজ এক চুনার পাথর দিয়া চারিতল বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ১২২৪ সালে, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এই বাটীতে সকল শ্রেণীর বালকদিগকে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী, ফারসী, ও ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উহাতে খৃষ্টিয়ান এবং দেশীয় শিক্ষক নিযুক্ত করেন এবং ছাত্রসংখ্যা দুই শত হয়। এই দুই শত ছাত্রের ও শিক্ষকগণের থাকিবার আহারাদির ও বেতনের জন্য তিনি চিরদিনের জন্য কিছু মাসিক বৃত্তিও নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। দুর্গাকুণ্ডের নিকট তিনি এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে ধাতুময় গুরুপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এই বাটীর সংলগ্ন গুরুকুণ্ড নামক পুষ্করিণীও তাঁহারই কীর্ত্তি। কাশীবাস কালে তিনি যে ভাবে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলির রচনায় কাল কাটাইতেন, তদুল্লেখ বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন নহে। ১ম শব্দবী-সঙ্গীত (সংস্কৃত শ্লোকে একাম্রকাননবিহারিণী ভগবতীর লীলা বর্ণনা), ২য় ব্রাহ্মণার্চ্চন-

চন্দ্রিকা (বেদ পুরাণ তন্ত্রশাস্ত্রাদি হইতে ব্রাহ্মণ অর্চ্চনার বিধিব্যবস্থা), ৩য় জয়নারায়ণ-কল্পক্রম (সংস্কৃত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণলীলা), ৪র্থ কাশীখণ্ড অনুবাদ (ভাষা বাঙ্গালা পদ্যে ও বৃন্দাবনী ভাষায় স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডের অনুবাদ), ৫ম করুণানিধানবিলাস (বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীকৃষ্ণলীলা)। জয়নারায়ণ কাশীতে বহুকাল বাসের পর, মৃত্যুর সাত দিন পূর্ব্বে কাশীবাসী সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে এক এক পত্র লিখিয়া শেষ বিদায় প্রার্থনা করেন। কাশীর মণিকর্ণিকা তীর্থে ১২২৮ সালের ২৫ কার্ত্তিক পূর্ণিমার দিন দ্বিপ্রহরে ৬৯ বৎসর বয়সে উপস্থিত বন্ধুবর্গের মধ্যে থাকিয়া মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল একমাত্র পুত্র রাখিয়া স্বর্গলাভ করেন। তখন তাঁহার পৌত্র ও প্রপৌত্রও জন্মিয়াছিল। ইঁহাদিগের ভরণপোষণ ও সুখে স্বচ্ছন্দে কালক্ষেপের জন্য মহারাজ যথেষ্ট সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। যদিও সকল ব্যক্তিরই মরণ আছে,—তথাপি যাঁহারা দয়ালু পরদুঃখকাতর তাঁহাদের বিয়োগে বন্ধুবান্ধব কাতর হইয়া পড়ে; যাহারা উপকার পাইত সেই সকল গরীব লোকে তাহাদের অভাবে বিশেষ কাতর হইয়া থাকে। যত দিন তাঁহার কীর্ত্তিমালা স্মরণ করিয়া ভবিষ্যতে লোকে নিঃসহায়কে সাহায্য দান করিবে, ততদিন তাঁহার স্মৃতি জাগরিত থাকিবে এবং সেই জন্যই এই বিবরণ উৎকীর্ণ হইল।"

৺ লোকনাথ ঘোষ প্রণীত—"ভারতীয় রাজা ও মহারাজগণের বিবরণ" নামক ইংরাজী পুস্তক হইতে জানা যায়; কন্দর্প ঘোষালের মধ্যম পুত্র গবর্ণর বেরেলেষ্ট্ সাহেবের দেওয়ান ছিলেন এবং জয়নারায়ণ প্রথমে শনধীপের কানুনগো ছিলেন। কবির পুত্র কালীশঙ্কর ঘোষাল সিন্ধু যুদ্ধের সময় লর্ড এলেনবরার নিকট হইতে "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনিই কাশীতে 'অন্নাবাস' স্থাপন করেন এবং অন্নদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া দেন। ইঁহারই সময়ে ভূকৈলাসে এক মহাপুরুষ আসেন। শিবপুরের চড়ায় জোয়ারের সময়ে এই মহাপুরুষের সমাধিস্থ দেহ ভাসিতে দেখা যাইত, কিন্তু ভাঁটার সময় কোথায় লুকাইয়া যাইত কেহ জানিত না। কিছু দিন পরে এই দেহ ভূকৈলাসে নীত হয়। ইঁহার দর্শনার্থ বহু যাত্রীর সমাগম হইত। উলঙ্গ মহাপুরুষ বহুকাল সমাধিস্থ পড়িয়াছিলেন, তাঁহার পানাহারের প্রয়োজন হইত না। অবশেষে নানা উপায়ে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল; তিনি কেবল রাজবংশীয়গণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। তাঁহার পরিণাম জানা যায় না।

খিদিরপুরে যে স্থানে কন্দর্প ঘোষাল প্রথম বাড়ী করেন, গঙ্গার পুরাতন ডক নির্ম্মাণের সময় তাহার অধিকাংশ তন্মধ্যে পড়ে; সেই বাড়ীতেই দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল বাস করিতেন। পুরাতন ডক নির্ম্মাণের পরও প্রাচীন বাটীর যে সামান্যাংশ বর্ত্তমান ছিল, তাহাও এবারকার নূতন ডক নির্ম্মাণের সময় অন্তর্হিত হইয়াছে। এক সময় একটি রাস্তা নির্ম্মাণের সময় খিদিরপুরের একস্থান খোঁড়া হইতেছিল; ভূগর্ভ হইতে একটি নাতি বৃহৎ শিবমন্দির ও তন্মধ্যে শ্বেত পাথরের শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হয়। এই শিবমন্দিরে একখানি

খোদিত লিপি ছিল, তদ্দৃষ্টে জানা গিয়াছিল, যে সেই শিবমন্দির ও শিবলিঙ্গ দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের স্থাপিত। নূতন ভগ্ন নির্ম্মাণের সময় একস্থানে দুইটি মৃণ্ময় সোনা কলসিত হইয়াছিল। জালা দুটি অভগ্ন এবং কড়ি ভরা, কিন্তু কড়িগুলি জীর্ণ হইয়া প্রায় মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছিল। ইঁহাদিগের জমীদারী পরগণে সলিমাবাদের মধ্যে "গুরুধাম" নামে এক গ্রাম আছে; সেখানেও মহারাজ জয়নারায়ণের স্থাপিত দেবতা আছেন; ওঁকর নামানুসারে এই গ্রামের নামও "গুরুধাম" রাখিয়াছিলেন। কাশীর গুরুধামে গুরুপাদুকা আছে।

ইঁহাদের বংশে নামের পূর্ব্বে সত্যশব্দের সাধারণ ব্যবহার সম্বন্ধে একটি প্রবাদ শুনা যায়;— গোকুলচন্দ্র ঘোষালের মৃত্যুর পর যখন সকলে তাঁহাকে দাহন করিতে যান, তখন জয়নারায়ণ ঘোষাল স্বীয় গুরু গোষ্ঠীর এক ব্যক্তির হস্তে ধনাগারের চাবি দিয়া শ্মশানে গমন করেন। সেই ব্রাহ্মণ ইত্যবসরে ধনাগার হইতে কিছু ধন অপহরণ করেন। গুরুভক্ত জয়নারায়ণ পরে এই প্রবঞ্চনার ব্যাপার শুনিয়া স্বীয় বংশধরদিগকে সর্ব্বদা সত্যস্মরণ করাইবার অভিপ্রায়ে সকলের নামের আদিতে "সত্য" শব্দের ব্যবহার আদেশ করেন।

জয়নারায়ণের প্রাসাদে দশভুজা সিংহবাহিনী পতিতপাবনী দেবীর মূলমন্দির, তাহার দক্ষিণে কালভৈরব বা যোগভৈরবের মন্দির, তদ্দক্ষিণে বাজেশ্বর শিবের মন্দির, তাহার সম্মুখে মুষাঢ়ড় চতুর্হস্ত পঞ্চাননের মন্দির, তৎপার্শ্বে মকরবাহিনী গঙ্গার মন্দির আছে। এই মন্দিরগুলির পরে পতিতপাবনীর সম্মুখে বৃহৎ নাটমন্দির; তৎপরে দুই প্রকাণ্ড মন্দিরে কৃষ্ণচন্দ্রেশ্বর ও জয়নেশ্বর দুই বৃহৎ শিব। দক্ষিণে শিবগঙ্গা পুষ্করিণীর তীরে ষড়ানন-রাধা সীতা, হনুমান, জগন্নাথ ও আর এক দেবতার মূর্ত্তি আছে।

মহারাজ জয়নারায়ণ কবে, কি ভাবে, এই নবাবিষ্কৃত কাব্যখানি রচনা করেন, তাহার বিবরণ তিনি নিজেই এই কাব্য মধ্যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীশ্রীহরি। পীঠবন্দন। মঙ্গলবাগ। তাল দশকুশি।

নানাদেশে বহু শাস্ত্র আছে নিরূপিত।
কেহ কেহ ভিন্ন দেশি বিশেষ বিদিত ॥১
দেশে দেশে লোকাচার ভিন্ন ভিন্ন জাতি।
এখানে যেমন দেখে শুনি নানা ভাঁতি ॥২
ত্রিবিধ প্রকৃতি পুথি স্বদেশি ভাষাতে।
তৈছে পরাক্রম কথা লিখিত তাহাতে ॥৩
এইক্ষণ পূর্ব্বদৃষ্টে ব্যবহার যত।
বিচারিতে সর্ব্ব তন্ত্র দেখে ভিন্ন মত ॥৪
তাহাতে ভাবতখণ্ডে পূর্ণ অবতার।
বিচারিতে শাস্ত্রমধ্যে কৃষ্ণরূপ সার ॥৫
এক মনে দুইরূপ স্থির নাহি হয়।
অতএব এক মূর্ত্তি সাধন নিশ্চয় ॥৬
কাশী মধ্যে সৎসঙ্গ যতেক ঘটিল।
সেবিও যবন চীন বহু জাতি মিল ॥৭
হিন্দু মধ্যে শৈব শাক্ত বৈষ্ণব বহুত।
গণেশের উপাসক মহারাষ্ট্র যত ॥৮
তপনের উপাসক কাশীতে বিস্তর।
অঘোরী নানকপন্থী কবীর-শাসিত ॥৯
হিন্দু জাতি ইচ্ছামত হীন রাজনীতি।
কলিযুগ অল্প ধর্ম্ম জীব পাপান্বিত ॥১০
মুক্তি যুক্তি জ্ঞান ভক্তি এই দুই মার্গ।
সর্ব্বদেশে এই সার স্বর্গ অপবর্গ ॥১১
কর্ত্তার নিশ্চয় বিনা ভক্তি কিবা করে।
কর্ত্তাকে বিশ্বাস বিনা জ্ঞান সদা হরে ॥১২

প্রথম বয়স মম বিষয়েতে গেল।
মধ্যম বয়স শেষ রোগেতে ভোগিল ॥১৩
পঞ্চাশ বিগত পরে জরায় ঘেরিল।
মরণের ভয় আসি অন্তরে পশিল ॥১৪
চিন্তামণি কোথা পাব এই আশা করি।
কাশীমধ্যে দেবালয়ে কিছুকাল ফিরি ॥১৫
কৃষ্ণ রূপ মনে কিছু আবর কবিল।
ইতিমধ্যে কৃষ্ণলীলা সকল দেখিল ॥১৬
অমৃত রায়ের দ্বারা তাহা প্রকাশিল।
অবিরত সেই লীলা নয়নে হেরিল ॥১৭
দেখিতে দেখিতে লীলা হইল উদয়।
সেইমত রচিবারে হইল নিশ্চয় ॥১৮
বাঙ্গালী ভাষাতে লীলা করিতে রচন।
রঘুনাথ ভট্ট আসি মিলিল দুজন ॥১৯
সংস্কৃত পরাকৃত নিজশক্তি মত।
আরম্ভ করিল দোঁহে হবে এক চিত ॥২০
বারশত বিশ সাল মাস অগ্রহায়ণ।
রচিতে কৃষ্ণের লীলা কৈলা আয়োজন ॥২১
স্বপনেতে দেখি যাহা লিখি সেই মত।
সেই ভাষা তরঙ্গমা করেন পণ্ডিত ॥ ২২
ভাব পর নাই আর সে বস্তু কানাই।
নিশ্চয় প্রকাশ ইহা মানিবে সবাই ॥২৩
ভাবের উদয় বস্তু কভু নাহি কবি।
ভুলিয়ে রহিল মন হেরি কৃষ্ণছবি ॥২৪
অতএব গ্রন্থ দোষ করিবে মার্জ্জনা।
ভকতজনায় পায় আমার প্রার্থনা ॥২৫

ইতি পীঠবন্দনা সাঙ্গ ॥

আমাদের এখানকার সাহিত্যে যাহাকে "মুখবন্ধ" "ভূমিকা" ইত্যাদি বলে, তাহাকেই তখন "পীঠবন্দনা" নামে অভিহিত করা হইত। অনেকে "গৌরচন্দ্রিকা" বা "গৌরচন্দ্রী"কেও ঐরূপ ভূমিকা বা মুখবন্ধের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বিশেষ ভুল করিয়া থাকেন। এই আলোচ্য গ্রন্থেও "গৌরচন্দ্রী" আছে। পীঠবন্দনার পূর্ব্বেই তাহা আছে। গৌরচন্দ্রী হইতে এই কাব্যের আরম্ভ। আরম্ভটী এইরূপ ;—

শ্রীহরি।
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

গৌরচন্দ্রী।
রাগ সিন্ধু ; তাল সম।
গৌর করিল উপায়,
জীবের তারণ হেতু ধরি দ্বিজকায় ॥ ধুয়া ॥
নবদ্বীপে নিজ বাস নূতন রটায়।

পরাজাতা
অচিতে চেতন দিতে, জগজন বুঝাইতে,
শ্রীহরি চৈতন্যনাম প্রেমেতে বিলায় ॥
ত্যজিয়া সংসার সুখ, ঘুচাইতে লোকদুঃখ,
উদাসীন হইয়া দীক্ষা গৃহীকে জানায়।
সর্ব্বেশ্বর সেই হরি, আপনি কুকারে হরি,
বল সবে হরি হরি সদা রসনায় ॥
কভু সুখ তাল মানে, উনমত্ত মাস গানে,
কভু প্রেমরসে ডুবি সকলে ডুবায় ॥

এইরূপ গানে গৌরবন্দনার নামই গৌরচন্দ্রী বা গৌরচন্দ্রিকা।

পীঠবন্দনার পর কৃষ্ণরূপ বর্ণনা। তাহার পর গদ্যে একটু বিবরণ আছে,—

"রঘুনাথ-কল্পদ্রুম সংস্কৃত পুস্তকের নাম রঘুনাথ পণ্ডিত রাখিলেন এই বাঙ্গালা ভাষা পুস্তকের নাম শ্রীকৃষ্ণনিধানবিলাস ভক্তজনের আজ্ঞামত হইল কেবল গোকুল বৃন্দাবন লীলা বার বৎসর যেমত শ্রীকৃষ্ণ করিয়াছেন তাহার সংক্ষেপ রচনা কিঞ্চিৎ করিতে উদ্যোগমাত্র কর্ত্তা এক গুরু এক ভক্তজন অনেক কিন্তু ভাব এক।

গদ্যাংশের শেষ বাক্য ও পূর্ব্বোদ্ধৃত পীঠবন্দনা পড়িলে বোধ হয় যে কবি যেন

অনেকটা কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তৎপরে বাগভাষা-হীন কবিতায় কবি গুরুদেবের নিকট প্রার্থনা ও তাঁহার স্তব করিয়াছেন। তৎপরে কবিতায় গুরুস্তুতি করিয়াছেন। এই গুরুস্তব একবারে কর্ত্তাভজার ভাবে ভরা। তার পর গুরুস্তুতির একটি গান। এ পর্য্যন্ত যে যে গান বা কবিতার কথা উল্লেখ করা গেল, তাহাতে কবির নামের ভণিতা নাই, কিন্তু এই গানটিতে আছে;—

গুরুচরণ পরশমণি হৃদয়ে হৃদয়ে।
যতনে সঘন কর দল মলিবে সময়ে। ধুয়া।
ত্রিতাপে দহিতে দেহ মতি নাহি হয় স্নেহ
গুরুপদ অভেদ কি কাজ সংশয়ে।
পরমাত্মা।
সকলের সার গুরু গুরু বাঞ্ছা কল্পতরু
গুরু বিনে নাহি মুক্তি ভবপাশ দায়ে।
পেয়েছ মানব তনু রূপ কর গুরু মনু
দেবের দুর্লভ হবে সংসারে বসিয়ে।
জয় নারায়ণ দীন কি জানে সে গুরুগুণ
দুর্ব্বলের বল গুরু সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।

ইহার পর শ্রীকৃষ্ণলীলার মঙ্গলাচরণ।

পরমকর্ত্তাকে নমস্কার। নম নম পরমকর্ত্তায় পার। গাব যশ দয়া কর দয়াময়।
অভয়চরণ ভাবণ উপায়। নির্ব্বিঘ্নে পূরণ কর বহুনায়ে॥

তৎপরে কবি প্রাপ্তাগত মহাদেব, ব্রহ্মা, ভগবতী, ভানু, ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও জগৎকে বন্দনা করিয়া মঙ্গলাচরণ সমাপ্ত করিয়াছেন। তাহার পর,—

যুগ মন্বন্তরে নানা, যাবতায়।
অসংখ্য প্রভুর লীলা না জানি বিস্তার।
দশম শ্রীভাগবতে কৃষ্ণখণ্ডে।
কহেন মাধুরী লীলা ব্রহ্মাণ্ডে।
অসুর-নিবারি হরি কৈবল্যকারণ।
পৃথিবীতে সেই লীলা করিতে কীর্ত্তন।
প্রাকৃতাদি রচনায় করিয়া রচন।
শুনিবে ভকতজন করিয়া গায়ন।
নয়নে হেরিব রূপ সহ পরিবার।
বালক সাজায়া শোভা দেব নিরন্তর।
তালমানে সুসরাগে গাবে গুণবান।
পণ্ডিতে পড়িবে পুথি মনে করি মান।
ভক্তের ভাগাতে আর বাণী বাজালাতে।
গাইবে সকলে মেলি সুখ হয় যাতে।
সুগতে নাচন কার্য্য করি স্থির মনে।
গুরুপদ চিন্তামণি ভাবহ সঘনে।

"সুগত" শব্দে বৌদ্ধসংঘ বুঝায় কিন্তু এস্থলে সভা বুঝিতে হইবে। ইংরাজীতে meeting বলিলে যাহা বুঝি এই "সুগত" শব্দের সেই অর্থই যেন যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর প্রকৃত বিষয়ের আরম্ভ এইরূপ,—

রাধার অংসানে ধর্ম্ম টলমল। অসুরের-রাজাভুজ প্রজা হত ভিল।
মনুষ্য বিক্রম যার পাপেতে বিকল। সুসঙ্গে পাপের বৃদ্ধি অনেক হইল।

অবলা ধরণী তারে সোপর্দ্দ হইল। দেবরাজ পদে গিয়া প্রণাম করিল॥
তথাচ পাপের ভার নাহিক ঘুচিল। কংস আদি দৈত্য যাথা সব নিবেদিল।
ব্যাকুল হইয়া ধরা যাইয়া চলিল। শুনিয়া অমররাজ ব্রহ্মলোকে গেল॥

এইরূপে ভাগবতানুসারে কবি শ্রীকৃষ্ণাবতারের সূচনা করিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্তানুসারে দেবতাগণ, ধরণী এবং লক্ষ্মী সরস্বতীসমন্বিত বিষ্ণুকে লইয়া গোলোকে রাধাকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। এই স্থলে বৈকুণ্ঠনাথ ও গোলোকনাথের একত্ব কবিকর্ত্তৃক একটি মাত্র ক্রিয়া-পদ ব্যবহারে অতি সুকৌশলে রক্ষিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার সে কৌশল রাখিতে পারেন নাই। জগন্নারায়ণ লিখিয়াছেন,—

শুনিয়া বৈকুণ্ঠনাথ সকল সম্ভবে হাত
রাধি কহে ভয় নাহি আর।
কর্ত্তাকে বিদায় বল গোলোকে সকলে চল
আমি তথা আসিব সত্বর॥

এস্থলে এই "আসিব" ক্রিয়াতে অতি সুন্দর ভাব প্রকাশ হইয়াছে। তাহার পর গোলোকের ষোড়শ দ্বার বর্ণনা, বৈভব বর্ণনা, মহারাসমঞ্চ বর্ণনা ইত্যাদি আছে। তাহার পর দেবকী ও কংসের জন্ম বিবরণ হইতে কথারম্ভ হইয়াছে। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা। তদানুসঙ্গিক গর্ভস্তুতি প্রভৃতিও গানে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর কবি স্বীয় কাব্যকে কেবল শাস্ত্রানুসারী না করিয়া রসাল করিবার জন্য বাঙ্গালীর গৃহোচিত নববধূর প্রথম গর্ভ সংবাদের আনন্দ ছবি বর্ণনা করিয়াছেন। একটা নমুনা দি,—

যার ঘরে যাই শুনিতে পাই করিছে কাণাকাণি। গোকুলেতে রাধা লবে চলিল গোপিনী॥
মথুরাতে গোকুলেতে এই কথা শুনি। বৃদ্ধকালে পুত্র পাবে আজি নন্দরাণী॥
দৈবকীর গর্ভ পূর্ণ অদ্য রাত্রি জানি। খড়ি পাতি জ্যোতিষ বলে অতি শুভবাণী॥
পূর্ণব্রহ্ম পুত্র হবে এই অনুমানি। দুই কুলেতে শুদ্ধ লবে একই নীলমণি॥

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের জন্মগ্রহণ, নন্দালয়ে রক্ষা, কংসপীড়ন ও বসুদেব প্রসাদনের পর কবি লিখিয়াছেন "শ্রীভাগবতের পাঁচ অধ্যায়মতে এই জন্মলীলা সাঙ্গ।" জন্মোৎসবের একটি গীত,—

সকল বাধা দূরে পলাইল। সুখা। বিকসিত হইয়া ভাসিল॥ ১
দুরখের ভঞ্জন হরি জনমে আইল। যশোদার কোলে। শিশুরূপ ছলে।
পদ্মজাতা। হৃদি সরোবরে। ভাস ইন্দীবরে। গোকুলেতে বিলাস করিল॥ ২

ইহার পর নন্দোৎসবের বাধাই গীত। তৎপরে চাড়ির গীত। "চাড়ি" সম্ভবতঃ "চালী" নহে।

আমরা চাড়ি ভরে বাড়ী যশ শুনে গৃহে পশ্যাছি। নব তোর বসন ভূষণ রত্নমালা কাযু পেয়াছি॥ ২
নব স্বর্ণতোড়া তাসের জোড়া আশা করাছি। মোরা গোপালের আলাই বালাই লয়া নরি
যোড়া নব হাতি নব মোরা সব মনে করাছি॥ ১ বিদায় নব নাচি।
চাড়িন্ বলে লাল কোলে সুখী হয়াছি। চাড়ি নাচে চাড়িন নাচে প্রসবের কাচ কাচি॥ ৩

একটি বাধাই গীত—

ওরে আজি আইল আনন্দ বাধাই। দধি ভারে ভারে লৈয়া সঙ্গে করা
চল চল সখি দেখিতে যাই। পরিবার সহ চলে রাই।
ঝিঁঝিট নাগরি বাজে তুরী ভেরী শশি ভানু জিনি রত্ন জ্যোতি তিনি।
কোলাহল শুনিবারে পাই। যুয়া। সখি মিলে দিলেক মাচাই। ২
সখি মতিহার গাঁথিয়াছি ফুলের নন্দসুতে শশি হেরে ভাল শশী
জানমনে দিবসে পরাই। রহে রাধা বামেতে দাড়াই।
অষ্টমী অষ্টমী ব্রহ্ম জানি আমি আনন্দ কৌতুকে ডুবিল লোকে
মোহিনীতে মজাই। ১ হেরি হেরি হৃদয় জুড়াই। ৩

তাহার পর নন্দালয়ে ভাঁড়, হিজড়া, ভাট ইত্যাদি আসিয়া; সকলে মা চল, গাহি —

তাহাতে ভাল নেটো পাখাতে আসারে। পুন নাচাইলে তুমি ধরণী উপরে। ৭
মেণাইচণ্ডি নাচন নাচিবা বারে বারে। ১ যাবাতে বাজায় তাল ঘোল উপচারে।
চৌরাশী লাক বার সোয়াং খানি বারে বারে এ হেন মনের দুঃখ আর কব কারে। ৪
তবু পারিলোম শেষ না হইল তোমারে। ২ এবার পেয়াছি কাবু যশোদার ঘরে।
দশ মাস ঘুচাইলে জননী উদরে। চারি ফল-মিতে ভুবে ভাঁড়ে দধি করে। ৫

তার পর কবি কৃষ্ণের দোলনায় শয়নলীলা, স্তনপানলীলা, ষষ্ঠী পূজা, অষ্ট দিনে আট-কড়িয়া পূজা, ঘুন্ধণলীলা ইত্যাদি লীলা গাহিয়া নবম দিনে পূতনা বধ গাহিয়াছেন।

কবির কর্ত্তাভজার কথা অবশ্য কয়েক স্থলে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন,—

বিষ্ণু অংশে যোগ আনিল নিশ্চয়। দনুজ-নিধন হবে কৃষ্ণ অবতার।
শ্রীকর অষ্টম বংশে হবে অবতার। কর্ত্তাতে ভজিলে জীব পাপ মুক্ত হয়।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইলে সমস্ত জীব কর্ত্তাভজা হইয়া যাইবে কবির এইরূপ মতদাশা দেখিয়া বোধ হয় বৈষ্ণবধর্ম্মমূলক কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতি মহারাজ জয়নারায়ণের নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা ছিল। শ্রীকর অষ্টমবংশ অর্থে শ্রীকর হইতে অধস্তন অষ্টমপুরুষে শ্রীকৃষ্ণ জন্মিয়াছেন; এই শ্রীকর যে কে তাহার পরিচয় কবি কোন পুরাণ হইতে লইয়াছেন, তাহা জানা যায় না; তবে নন্দোৎসবের সময়ে ভাটেরা শ্রীকর বংশের এক পরিচয় গাহিয়াছিল, তাহাতে জানা যায় নন্দঘোষের ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষের নাম শ্রীকর।

কবি জয়নারায়ণ পূতনাবধের পর বকাসুর বধ, গাভীবৎস প্রদর্শন, শকটভঞ্জন, একষ্টিশা পূজা, তৃণাবর্ত্ত বধ, নামকরণ, নৃত্য, ঘুটুনু খেলা প্রভৃতি লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। পাঠকেরা এই ঘুটুনু খেলাটি শিশু কৃষ্ণ কিরূপে খেলিয়াছিলেন, তাহা দেখুন,—

নূপুর বাজে ঝম ঝম ঝন। অতি মনোরম চম চম চম। বদনে বাজায় হর বম বম বম। ২।
ধরণী সকলে, পাতি কর-কমলে, ভরিয়া সুগীত, তড়িত জড়িত,
ঘুটুনু চলত লালা ছম ছম ছম। তরুণ তমাল সম সম সম। ৩।
শোভা পদতলে, অরুণ চলনল,

পুনশ্চ

তত্তা সেই থেই। ঘেরি ঘেরি সারি সারি রহিল দাঁড়াই ॥২
করে করতালি দিয়া নাচত কানাই। নীলকান্ত ছানি ছটা ঘেরিল ব্রহ্মাণ্ড কটা *
গোকুল নয়ন-লোভী সুধাকর মুখ হেরি নীলকান্ত হই রহে গগনেতে ছাই।

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের সাতাইশ দিন বয়স হইলে সাতাশ নক্ষত্র পূজা, গোপীগণের গর্ভাগীত (নক্ষত্রপূজা উপলক্ষে ভগবতী স্তুতি), শ্রীধর ব্রাহ্মণ দমন (কংস প্রেরিত দুষ্ট ব্রাহ্মণের নিগ্রহ), অন্নপ্রাশন, ব্রহ্মবেধ (গোলোকনাথের বিরহে), চন্দ্রদর্শন এবং মহাদেবাগমন লীলা বর্ণিত হইয়াছে। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের বয়স প্রায় দুই বৎসর পূর্ণ হয়। এই কাব্যে এই সময়ে চন্দ্র দর্শন উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণজীবনে প্রধান ব্যাপার বাধাদর্শন ঘটান হইয়াছে। কবি যে কৌশলে সেটি ঘটাইয়াছেন, তাহা দেখাইতেছি ;—

দ্বিতীয় বৎসর কৃষ্ণ জগমনহারী। যশোদা ভুলায় যত কিছু না মানিল ॥
যশোদা লইয়া কোলে করে পাইচারি। থালে জল রাখি রাণী চাঁদ দেখাইল।
সন্ধ্যাগতে গগনেতে পূর্ণচন্দ্র শোভা। থালের তলায় ধরি উলটি ফেলিল ॥
করপদ নখে রাণী দেখে সেই আভা। আপনি ধরিতে যায় কর পসারিয়া।
ধরিয়া চরণখানি কুক্ষেরে দেখায়। যশোদা রাখিতে নারে কোলেতে ধরিয়া ॥
তব নখে চাঁদ আসি হইল উদয়। আনিল দর্পণ গোল দুদিকে সমান।
পুনর্ব্বার দেখাইল বরনখবর। চাঁদ নও বলি রাণী কৃষ্ণ করে মেন।
বহুচন্দ্র দীপ্তি করে বিবিধ প্রকার। কিয়ার ঘুরায় কৃষ্ণ দেখে চাঁদনয়।
মায়ে ভুলাইতে কৃষ্ণ বহু করে ছল। শিশু বলি মোরে মাতা এমতে ভুলায়।
চাঁদ ধরিবারে হরি হইল চঞ্চল। পুন করে আবদার কিছু নাহি মানে।
যে চাঁদ খাইব বলি কান্দিতে লাগিল। ভূমিতলে গড়াগড়ি চাঁদের কারণে ॥

এইরূপ-মহা-বিভ্রাটের মধ্যে পড়িয়া যশোদা যখন তাঁহার গোপালকে লইয়া বিব্রান্ত হইয়া পড়িতেছিলেন, তখন যোগিবেশে মহাদেব বাল-গোপাল দর্শনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিবের মুখই লুকাইয়াছিল ; লুকায় নাই কেবল কপালের অর্দ্ধচন্দ্র। অর্দ্ধচন্দ্র দেখিয়া রাণী কতকটা নিশ্বাস ফেলিবার উপায় পাইলেন। তখন তিনি—

অর্দ্ধচন্দ্র ভালে দেখি দেখায় কুক্ষেরে :
যাও বাছা এই চাঁদ ধরি দুই করে ॥

কিন্তু আদরের নন্দলাল সে ছেলেই নহেন, তিনি ঠিক বলিয়া বসিলেন ;

ভাঙ্গা চাঁদ নিব না মা গোটা চাঁদ দে। যোগীর সঙ্গেতে দেখি এক রাক্ষসমুখা।
যোগী দেখে ভয় পাই মোরে ছেড়ে দে। ভয় লাগে হৃদে ওরে দূর করে দেখা ॥

নন্দরাণীর পালনের গুণে আমরা দেখিতেছি নন্দদুলাল কেবল জুজু ও বুড়ো ভীত বাঙ্গালী খোকামণি হইয়াছেন। শিবের জটাজাল ও ব্রহ্মার রক্তবদন খোকা কৃষ্ণকে যে ভয় পাওয়াইয়াছে, তাহা আমরা বোধ হয় এখন উপলব্ধি করিতে পারি। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ কিছুতেই থামিলেন না দেখিয়া,

* ব্রহ্মাণ্ডকটা=ব্রহ্মাণ্ড কটাহ।

এক সখী যুক্তি করি আসিয়া তখনে। কোটী চন্দ্র প্রকাশিত শ্রীমুখ উপরে।
অকলঙ্ক চাঁদ আমি দিব এইক্ষণে। মুখচন্দ্র দেখি কৃষ্ণ উঠিল তখন।
কৃষ্ণে অভিমান শান্ত করিবার তরে। রাধিকার গলা ধরি লটকে মোহন।
মোহিনী রূপিণী রূপ বৃষভানুঘরে। মুখচন্দ্রে চুম্ব দিয়া সুধারস খায়।
সখী মিলি রাধিকারে আনিল সত্বরে। দেখিয়া রাধার মন আনন্দিত হয়।

বাণীর যাহাই হউক শ্রীকৃষ্ণ তখন গলিয়া গিয়াছেন; তিনি বলিয়া বসিলেন,—

আর পাইলেহি হাতে ছাড়া দিব না। এ চাঁদে সুধার রাশি চাহিয়া দেখ না।

এই স্থলে রাধাকৃষ্ণের মিলনসূচক একটী গীত উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারা যাইতেছে না;—

কালাচাঁদ গগনচাঁদে ধরিবারে চায়। মোর কালাচাঁদে দেখি আভা না নিচায়।
চাঁদের আকুট রাধা চাঁদেতে মিটায়। রাধামুখ স্বর্ণ চাঁদ অকলঙ্ক হারায়।
কাল পল গীত শশী দেখি শশোদায়। দুই চাঁদ কোলে করি অশোদা দাঁড়ায়।
উত্তম বিচার করি বুঝিল তাহায়। দেখ চাঁদের হাটে রাধাকৃষ্ণ গায়।
যেত চাঁদ কলঙ্কেতে হয় নিতি ক্ষয়। [illegible] কলঙ্কের চাঁদ বেড়া তায়।

ইহার পর কবি ঋষিগণের শ্রীকৃষ্ণদর্শন, কণ্বমুনি আগমন, মৃত্তিকাভক্ষণ, কর্ণবেধ, দ্বিতীয় বৎসরের জন্মতিথিপূজা (বরষগাঁঠ পূজা), [illegible] কাহিনী বলিয়া নিদ্রা আনয়ন ও নিদ্রাঘোরে সীতাবিবহ, শালগ্রাম গ্রাস, স্নান, ভোজন, গোয়াল সঙ্গে আখমুদলি খেলা বর্ণনা করিয়াছেন। এই খেলাটী কিরূপ তাহার বিবরণ উদ্ধৃত হইল,—

[illegible] খেলে মিলি ব্রজবালে। খেলায় জিতিলে হরি, হারে যারে সে করি,
রেং রেং বরেং বলে হেম বাহুমূলে। সখীভাব দেখাইল ভুবনমণ্ডলে।

তাহার পর গোদ খেলা—

নতুটে খেলায় গোঁদ খেলে গোঁদ মাদে। বানর করিয়া তারে নাচায় সত্বরে।
রামকৃষ্ণ খেলে ভাল বালক ভিতরে। হুপ হুপ বলি সবে ক্ষেপায় তাহারে।
যার গোঁদ ভূমে পড়ে সেই জন হারে। জীবে কি বুঝিবে লীলা না জানে অমরে।

এই গোঁদ খেলা ও আখমুদলি যথাক্রমে আজকালকার গেণ্ডুয়া খেলা বা ভাঁটাখেলা ও চোক ফুটাফুটি খেলার অনেকটা নিকটবর্ত্তী। তার পর হাউলীলা—

বৃন্দাবনে খেলে কৃষ্ণ সমোবয়া লৈয়া। ইহারে বধিলে বাছা বাঁচিবারে পারি।
ভবেতে যশোদা তথা গেল অতি ধায়া। মায়েরে কাতর দেখি আসি কহে হরি।
হাউভূত দেখাইয়া চাহে আনিবারে। শ্রীদাম হইল হাউ দেখাইতে ভয়।
এক শিশু বনে আসি হাউরূপ ধরে। তব নাই চল মাতা লই মোরে ঘর।
যশোদা পসার দেখি বিশাল আকার। সন্ধ্যার আরতি করি শিশুরে খাওয়ায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে নেত্রে ঝরে বারি। জগৎ জনক হৈয়া পুজেন মাতায়।

কবির নিজস্ব কবিত্ব দেখাইবার মত এইবার একটি বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিব। ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার, শ্রীমদ্ভাগবতকার, হরিবংশকার প্রভৃতি পুরাণকারগণ কৃষ্ণলীলার অসংখ্য উপাখ্যান

রচনা করিয়া গিয়াছেন। কবি জয়নারায়ণ আবার তাহার উপরেও কতকগুলি লীলা যোগ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ফলহারী লীলা একটি :—

দুখিনী কুজুড়া এক ছিল বৃন্দাবনে।
হীন জাতি কিন্তু প্রেম সাধুসঙ্গ গুণে॥
ফল মূল তরকারি ভক্তের সদনে।
কৃষ্ণের বালক লীলা শুনিয়া শ্রবণে॥
সুপক্ক সুন্দর ফল লইয়া যতনে।
গোকুল নগরে আসি নন্দের ভবনে।
ফল লে ফল লে বলি ফুকারে সঘনে॥
মনমধ্যে বহু বাঞ্ছা কৃষ্ণ দরশনে।
অন্তর্য্যামী নন্দসুত হেরিয়া লোচনে॥
আয় আয় ফলহারী আমার এখানে।
কিনিব সকল ফল সমূল্য প্রদানে॥
পীযূষ মিলিত বাণী পশিল শ্রবণে।
ধায়া ধায়া দাঁড়াইল শিশু বিদ্যমানে।
সমবয়ো পরিধান সকলে সমানে।
কেবা রাম কেবা শ্যাম বিভিন্ন না চিনে॥
কৃষ্ণ কহে ফলহারী বৈস এই খানে।
দেখাহ সকল ফল আমা সব স্থানে॥
কমল বাতাবি মিঠা নারাঙ্গী কলালে।
নানাজাতি ফলাফল দিলেক মোহনে॥
খাইল সকল ফল শিশু সর্ব্বজনে।
দুখিনী অবাক্ হৈল শিশু আচরণে॥
ফল বেচি চারি পল লব ছিল মনে।
গোপালে খাইল ফল মোর কৃষ্ণ বিনে॥
তরাইতে জন্ম যার দীন হীন ক্ষীণে।
সে যদি এ দীনে দেখি লুকায় কেমনে॥
কৌছড় পুরিয়া যান গোলা কাটা আনে।
কুজুড়ানি দাম লও ফলের কারণে॥
আঁচল পাতিয়া লয় যাদব সম্মানে।
আঁচলে পড়িতে সোণা হব তত্ক্ষণে॥

কাজেই ফলওয়ালী বুঝিল এ গোয়াল সেই গোপালই বটে; তখন বিমুগ্ধ হইয়া গাহিল,—

যবন রমণী আমি তারে স্পর্শ কৈলে তুমি
এত দয়া কৈলে নিজগুণে।

শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে এক দরিদ্রা যবনীর ফলবিক্রয়ার্থ উপস্থিত হওয়া ইতিহাসের দৃষ্টিতে যতই অসঙ্গত হউক, ভক্তের চক্ষে ইহার মূল্য স্বতন্ত্র। তিনি হরিভক্তি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই হয়ত কবি এই যবনানীর কল্পনা করিয়াছেন। এরূপ নব সৃষ্টি কবির আরও আছে, যথাস্থানে উল্লেখ করা যাইবে। মতিক্রয় লীলা বর্ণনায় কবি কৃষ্ণকে যে সকল বেপারীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, দ্বাপর যুগে তাহাদের সংজ্ঞা কি ছিল কে জানে?

বিদেশী বঞ্জারা বলদ ভরিয়া।
আনিল উজ্জ্বল মোতি নাহিক তুলিয়া॥
কংসধামে বেচিবে মনে করিয়া।
উত্তরিল সন্ধ্যাকালেতে আসিয়া॥
অলক্ষ্যে সুন্দর বাজার দেখিয়া।
নন্দপুরে রহিল বলদ লইয়া॥
পেসার বিশ্বাসে দ্বারে দাঁড়াইয়া।
ভঙ্গিতে মোতি ভরা আনিয়া কানাইয়া॥
নিকটে গেল শিশু কিনিব বলিয়া।
শিশুরে বঞ্জারা দিল খেদাইয়া॥
রাগেতে কহেন কৃষ্ণ শুনরে ভাষ্যা।
কাড়ি ছিঁড়ি লও তারা ঝোলা ভরিয়া॥
শিশুজাল মিলি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া।
ভাত যেন কাক লইল লুটিয়া॥
মারিতে বালকে উদ্যত হইয়া।
বঞ্জারার গুলি করকা জিনিয়া॥
নন্দসুত বালজাল বঞ্জারা দেখিয়া।
বন্দুকে রঞ্জক দিল দারুতে ভরিয়া॥

এই বণ্ডারা বণিক দল এখনও দক্ষিণাপথে যথেষ্ট। ইংরাজ ইতিহাসে ইহারা বুঞ্জী নামে খ্যাত। ইহারা ভ্রমণকারী বণিকসম্প্রদায়। বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া স্ত্রীপুত্রাদি সহিত ইহারা দলে দলে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। যেখানে যখন তাম্বু ফেলে, সেই খানেই তখন বাস। ইহাদের সঙ্গে কতকগুলি ব্যাঘ্রবিক্রম কুকুর থাকে, তাহারা রাত্রিতে বাণিজ্য দ্রব্য ও স্ত্রীপিওর বস্ত্রাবাসে চৌকী দেয়। ইংরাজী পশুতত্ত্বে এই সকল কুকুর 'বঞ্জারা কুকুর' নামে স্বতন্ত্র আখ্যা পাইয়া থাকে। কৃষ্ণের সময় না হউক, কবির সময়ে অর্থাৎ এক শত বৎসর পূর্ব্বে যে বঞ্জারাগণ বলদ লইয়া নানা স্থানে সমুদ্রোত্থিত মুক্তার ব্যবসায় করিয়া বেড়াইত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কৃষ্ণের সময়ে বন্দুকের ব্যবহার পরিতে বেশ হাসি পায়।

তাহার পর নানা লীলায় কৃষ্ণের পঞ্চম বৎসর কাটিয়া গেল। নন্দরায় গণ্ডার ভালুকের ভয়ে গোকুল নগর ছাড়িয়া বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিলেন। এই পর্য্যন্ত লিখিতে কবির এক মাস সময় লাগিয়াছিল। কবি বলিতেছেন,—

প্রথমে গোধন পার হইল সকল। একচল্লিশ লীলায় নীত নব গান।
শকট সম্ভার শেষে পারে উত্তরিল। এক মাসে পূর্ণ কৈল কবগানিধান।
* * * স্বপনে পাইয়া আজ্ঞা জয়নারায়ণ।
বাড়ি মাস কৃষ্ণলীলা গোকুলে প্রচার। সহায় মঙ্গলদাস বৈষ্ণব সুজন।
তিথি পুরাণে লেখা সূত্রমাত্র তার। সংস্কৃত তাল সুরে মাধব পণ্ডিত।
এক মাস সেই লীলা বস্তু ভাগবতে। ব্রজের ভাষায় ভট্ট গাইল বিহিত।
এ সকল হয় গোপি বৃন্দাবনে। বাঙ্গালী ভাষায় গায় ভুবনমোহন।
কৃষ্ণ যাবা হৈয়া গোপী কৃষ্ণলীলা করি। বুদ্ধিহীন বাণীহীন জয়নারায়ণ।
বাঁচিয়া রহিল তাবা লীলা হেরি হেরি। শুনিতে তোমার গুণ শ্রবণ কপীন হয়
সেই সূত্র মনে করি জুড়াইতে প্রাণ। নিদারুণ রসনায় হরি হরি বলিবার বিধে।
নব বৃন্দাবনে লীলা পুরাণ প্রমাণ। কি কব কুসঙ্গ রঙ্গ ভব খানে দিল ভঙ্গ
যথা শক্তি করি যুক্তি লৈবা ভক্তগণ। বিহীন সুজন সঙ্গ যাতনায় গীতা যেন পিশে।
মদনবিলাস লীলা অমিয়া সমান।

এই পুঁথিমতে গোকুললীলা একমাস পঞ্চদশ দিবসে সাঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণের বয়স তখন পঞ্চম বৎসর চলিতেছে। একদিন,—

বালক বালিকা সব করে এই মনে। খেলাতে বিবাহ দিব কেহ না জানিব।
কৃষ্ণের বিবাহ দিব এই রাই সনে। এই খেলা নন্দঘরে নিশিতে খেলিব।

এই পরামর্শ হইয়া থাকিল। তাহার পর রাত্রিতে অগ্রণী হইয়া,

কহেন বলাই বুঝিলরে ভাই বসন ভূষণে অনঙ্গে হারাই
মাধারে আনিয়া বসাও কানাই। চুলায় সুবেশ দিবে সাজাই।

তাহার পর নানা বস্ত্র ভূষণে চুলালের বরবেশ সম্পাদিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে যশোদাকেও ডাকা হইল,—

কামেরে চান্দেরে ছানিয়া আনিয়া হরিদ্রা সুতাব দূরবা বান্ধিয়া
ব্রজবালা রসে ; যতন করিয়া। কুঞ্চকরে দিল সপ্তফেরি দিয়া।
ভূষণ বসন দিল পরাইয়া সোণামোড়া জাঁতি বন্ধরে কানাঞা
যশোদা মোহিত নিছানি লইয়া। বিবাহ সাজন দেখহ চাহিয়া।

তাহার পর বাখালের দল বাধাব ঘবে গিয়া পড়িল ,—

দুবল বলযে এসে কন্যা সাজাইব। যাহা চাই তাহা যেও তোমরা আনিয়া।
ললিতা বলিল মোরা সাজাইয়া দিব। বিয়লে বনাব বেশ তুলারে জিনিয়া।

অতঃপব, হীরামণিতে, পুষ্পভাবে, নানা বস্ত্রে, কাঁচলিতে তুলীন সজ্জা সমাপ্ত হইল. তারপর বালকেব দল "বরাত" সজ্জা করিল। বালকেবাই বাদ্যকব, নিশানধাবী, অশ্ব, উষ্ট্র, হাতী, ইত্যাদি সাজিয়া ফেলিল। যশোদাব ঘর বরগৃহ ও বোহিণীব গৃহ বস্ত্রাগৃহ হইল। যশোদা রোহিণীও খেলায় যোগ দিলেন। শেষে বর আসিলে হুলাহুলি শঙ্খধ্বনি হইল। অবশেষে,—

সুবর্ণ পীঠেতে কৃষ্ণ বসিলেন সুখে। বস্ত্রাদান সম্পাদন করিল রোহিণী।
সম্মুখে বসিল রাই পরম কৌতুকে। ব্রজগোপী সখী মেঁহে মঙ্গ পড়াইল।

তাহার পর বাসর, শয়ন, সম্ভোগ ইত্যাদি আছে। এই গ্রন্থে আয়ান ঘোষের অস্তিত্ব নাই। কৃষ্ণকালীর কথা আছে ; কিন্তু তাহা আয়ান ঘোষেব তরে নহে ; তাহার কারণ এইরূপ—

পরম রূপসী-তরে কেবা সে তুলনা করে অতএব নিবেদন সবা বিদ্যমানে।
বঙ্গদীতে ছন্দ দিবা চন্দ্রাবিত হোয়েছে। * * * *
কুৎসিতা যে ছিল সখী তাবে কর ঠারি আঁখি হ.তে মোতে ধরা যদি উপযুক্ত হয়।
তোমারে এখানে দেখি সরমেতে মরিছে। চলহ আমার সঙ্গে বিলম্ব না সয়।
শুনিয়া কুৎসিতা সখী মুদিয়া যুগল আঁখি প্রধান প্রধান গোপ করে ডাকা লাঠি।
কৃষ্ণ মোরে দিতে ফাঁকি করিলে চাতুরী হে। চলিল অসুর ভাল ক্রোধে কাঁপে মাটি।
নগরে করিয়া খেলা মজাব গোপের বালা * * * *
দেখিব কেমন লীলা যাই ত্বরা করি হে। মনোরাজ মন বুঝি জানিলেন মনে।
কুৎসিতা নগরে গিয়া শীঘ্র উপনীত। তুষিব গোপের মন নূতন রচনে।
কৃষ্ণলীলা কথা সব কহিল বিহিত। মহাকালী ইষ্টদেবী গোপকুলে জানি।
প্রধান গোপের কাছে করিল প্রচার। শ্রীকৃষ্ণ হইল কালী গোপিনী যোগিনী।
কুলশীল ধর্ম্ম আদি হইল সংহার। * * * *
সকল যুবতী কন্যা একত্র করিয়া। শ্রীরাধিকা চন্দ্রাবলী ছিল দুই নারী।
বন মধ্যে দুই কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ লইয়া। শ্রীদামা বিজয়া এবে দুই সহচরী।
অদ্য আমি দেখিলাম আপন নয়নে।

কবি আয়ানের অস্তিত্ব উড়াইয়া দিয়াছেন, সুতরাং জটিলা কুটিলাও গিয়াছে। এই ব্যাপার শ্রীকৃষ্ণের নবম বর্ষে ঘটে। সপ্তম বর্ষে ঘুড়ি উড়ান লীলা একটা নূতন আছে। অষ্টম বর্ষে একদিন গ্রীষ্মের সময় প্রাতে এক প্রহর হইতে ক্রমান্বয়ে খস খস কুঞ্জে, তুলসী

কুঞ্জে, আমলকী কুঞ্জে, দূর্ব্বাদল কুঞ্জে, কেতকী কুঞ্জে, অরগজা বস্ত্রের কুঞ্জে, কর্পূরকুঞ্জে, অগুরু, চন্দন, কুমুদ, নৌকা, সর্ব্বতরু, শেষে প্রভাতে রাধার গৃহে লীলা বর্ণিত হইয়াছে। তার পর মহারাসের পূর্ব্বে একপক্ষ ব্যাপিয়া সাঁজিলীলা অর্থাৎ প্রতিপদাদি হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণলীলাদি রচনা করিয়া পুষ্পার্চ্চনাদি দ্বারা কৃষ্ণপ্রীতিবর্দ্ধন লীলা বর্ণিত আছে। সম্প্রতিও এই সাঁজির ব্যাপার এখনও বৃন্দাবনে ব্রজবাসীরা করিয়া থাকেন। প্রথম সাঁজির বিবরণ দিতেছি,—

সাঁজি লীলা আরম্ভ।

শুভ কৃষ্ণ প্রতিপদ আইল সখী আহ্লাদ
এই সে কুমার মাস সাঁজির সনর্ব।
সনে মিলা কর কেলি
চল যাই ফুল তুলি
মচির শ্রীবৃন্দাবন লাগি বহুদূর।
পাশে পীঠ সাঁজি মাঝে
চরণ যাহাতে রাজে
অষ্টাদশ চিত্র সারাও তাহার।
নাম ফুলে, তাহু দূতা
রাম ঘাটে বিশোলিতা
বলাই মন্দির তটে রাচিব এই ঘর।
[illegible] সাজি
বজতে বহুত ঘাট
অনুবেস ঘাট সাজি যাতে শোভা পাব।
লতাওল তরুবর
আছে যত দুইধার
সাবধানে রাখ কৃষ্ণ কুঞ্জ নাহি যায়।
দক্ষিণ বাকে মথুরা

কুতেবর জটাধর।
শেষশায়ী জাতায়নী রচ রচনা।
ভড়াগ বাউলি আদি
চিত্র কর নিরবধি
কমঠ মকর মীন লেখ যমুনার।
ফুলের সাঁজি বসাইবা
পূজে বাই কৃষ্ণ ধ্যায়া
হেনকালে কৃষ্ণ আসি ছলেতে দাঁড়ায়।
চিনিবা কৃষ্ণের ছল
প্রেমে রাধা চলমল
সলাসলি করি রাই সাঁজিকে দেখায়।
প্রথম সাঁজির দিন
ভুলাইল কৃষ্ণ মন
প্রত্যহ আসিব আমি কহে বহুরায়।
বৈকালে তুলিব ফুল
ভরিবা যমুনা কূল
সাঁজি মধ্যে ব্রজলীলা সকলে চাহায়।

P 3218

তার পর প্রতিদিন কৃষ্ণলীলা রচনায় ও কৃষ্ণসম্ভোগে পোনের দিনে রাধার সাঁজিলীলা সমাপ্ত হয়।

তার পর কবি বার মাসে তের পার্ব্বণের লীলা লিখিয়াছেন। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া লীলায় ফাঁক যায় নাই। অবশ্য এ লীলায় রাধিকাই কৃষ্ণকে ভাইফোঁটা দিতেছেন, এমন বর্ণনা করিতে কবির সাহসে কুলায় নাই; কিন্তু মথুরা হইতে সুভদ্রাকে ব্রজে টানিয়া আনিয়াছেন।

যদ্যপি সম্বন্ধ নহে ব্রজেতে যাইতে। তথাপি আইল ভদ্রা ভাইকে তুষিতে॥

ব্রজে প্রেমের বাজার দেখিয়া ভদ্রা নাকে হাত দিল। কৃষ্ণ তখন একটু লীলাছলে সঙ্কুচিত করিলেন। ভদ্রা মোহিত হইয়া কৃষ্ণবলরাম সহ রাধালবালক সকলকেই ফোঁটা দিল এবং যাইবার সময় রাধিকার হস্তেই কৃষ্ণকে সমর্পণ করিয়া গেল,—

গোপীসহ রাধিকার সুভদ্রা তুষিল। সহজ ভাবেতে সদা পাসিবে সুন্দরী।
এই দুই ভাই মোর ব্রজেতে রহিল। ইহা বলি চলে ভদ্রা উচ্চারি শ্রীহরি।

তাহার পর রাধাকৃষ্ণ সখীসহাগণ লইয়া দশ অবতার, কোজাগরী লীলা, মনসা পূজা, গণেশ পূজা, দুর্গোৎসব কালী পূজা রাসলীলা কার্ত্তিকপূজা চড়কপূজা ইত্যাদি করেন। এই সকল পূজায় রাধাকৃষ্ণকেই উক্ত দেবদেবী সাজাইয়া লীলা বর্ণনা করা হইয়াছে। বাসন্তী পূজায় কিছু ধুমধাম হইয়াছিল। রাধা ভগবতী হইয়া মৃগাক্ষী নাম্নী সখীকে সিংহ করিয়া চিত্রাকে মহিষাসুর করিয়া বাসন্তী সাজিয়া বসিয়াছেন। এই পূজা উপলক্ষে তিন রাত্রি কুঞ্জে কবি গাওনা হইল। দুই দলের বাগ্‌যুদ্ধ। এক দলের নেত্রী চন্দ্রাবলী। অপর দলে কামকলা প্রধানা। রীতিমত শুকদেব সাজিয়া ব্যাসদেব সাজিয়া বিরহ, টপ্পা, সখীসংবাদ, খেউড় গাহিয়া কবির গানের লীলা বর্ণনা করা হইয়াছে। চড়কের লীলার সময় সখীরা ভবজা গাহিয়াছিল।

এইরূপে নানালীলা বর্ণনার পর কৃষ্ণমুখে কবি ভবিষ্যৎ আজ্ঞা প্রচার করিয়া গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বৃন্দাবন লীলাবর্ণনার উপসংহার করিয়াছেন। চড়কের বৈশাখ মাসের লীলা শেষ হইলে,

জ্যৈষ্ঠেতে ঘোষণা শুনি ব্রজাঙ্গনা অক্রুর আসিবে কৃষ্ণ লৈয়া যাবে
কাতর হইল প্রাণ মনে। কংস বিদ্যমানে।

গোপীরা শুনিয়া গোপীনাথকেই জানাইল,—'তবে গোপী বাঁচিবে কেমনে'। গোপীনাথ উত্তর দিলেন,—

দ্বিতীয় রূপেতে আমি যাব রথে এবে অন্তর্ধান লীলার বিরাম
এরূপে যাব বৃন্দাবনে। হইবে সঙ্গতি।
এই নিত্যধাম আমার বিশ্রাম আসে যুগ কলি ফুটে ভক্তি-কলি
বিচ্ছেদ না হব কোন দিনে। করি শুদ্ধমতি।
* * * * সবে মোর নাম হবে মহাকাম
বিলাপ করিও না ধনি আসি হে তোমার। ধুয়া। পাবে ভক্তি রতি।
বুঝিয়াছি তব মন বাকি নাহি আর। চিতান। আসি বহু নর হইবে উদ্ধার
নবধা ভক্তির পথে কিনিয়াছ প্রাণধনে ব্রজে করি স্থিতি।
তবে কেন ভাবহ অসার। শুন যুগ কথা যাতে যাবে ব্যথা
না হবে বিরহ জ্বালা শুন সব ব্রজবালা কুকে হবে রতি।
এই সার প্রতিজ্ঞা আমার। তিন যুগ অবশেষে কলির পতন।
নিকুঞ্জ আষাঢ়ে বসিয়া নিগূঢ়ে এই যুগে হবে সার আমার কীর্ত্তন।
পরাণের গতি। একাচার এক নাম হইবে যখন।
লীলা বৃন্দাবন হইল পূরণ প্রকাশ হইব আমি আসিয়া তখন।
শুনহ সুমতি। * * * *
যশোদার কৃপা করিল উদ্ধার সুখানন্দ নিরানন্দ চিন্তাকৃপ জয়।
ব্রজের বসতি। এ সকল দেহ মধ্যে রহিবেক ভয়।

ইহার স্বভাব এই কহিতে হইবে।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
দক্ষিণে বিলাত আখা [illegible]
দক্ষিণেও এরমিকা সকলে জানিবে।
পূর্ব্বদিকে হিন্দুস্থান এসিয়া বলিবে।
পৃষ্ঠদেশে ইয়োরিকা যে খোলাকার।
আকাশে ঘুরিবে সদা ভানু সহভার।
মধ্যাহ্নে থাকিবে ভানু চান বেড়া ভাম।
এমত ক্রমে উত্তর গণে দিবানিশি কল।
ওই মত দিবানিশি এই ছোট দিন।
বাড়িবে ক্রমেক ক্রমে ছয়মাস দিন।

* * *

এমত করিয়া ধরা জন্ম লবে যত।
পৃথক্ পৃথক মত বলাবে সতত।

করিতে ধরার ভাগ কিছুকাল পরে।
সত্যনাম অবনীতে পাঠিবে নরেশ।
চাম্পিয়েনে সত্যনাম হইবে প্রকাশ।
কাটিবেক দুইজনে নাম চারিবেদ।
উত্তরেতে লামা ভক্ত নানক গণিবে।
রামশরণ নামে এক হবে পূর্ব্বদেশে।
পুত্ররূপী অবতার হইবে পশ্চিমে।
ইসু ক্রাইষ্ট নাম তার ক্রশিফেক্স কয়।
তিন বেলী তিন পন্থ করিয়া মিলন।
ইহুকে সকলে তারা গণিবে প্রধান।
এইকালে মম নাম হইবে ঘোষণা।
ইসু বিনা গতি নাই হইবে ভাষণ।

* * *

নিত্যরূপে সর্ব্বরূপী রবি নিত্য সতে।
অন্তর্ধান ব্রজলীলা আনন্দে রহিবে।

এই ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু বৃন্দাবন লীলা গান।

এই উদ্ধৃতাংশের ভবিষ্যৎ কথাগুলি মূল্য যত অধিক হউক বা না হউক, কবির যে অন্তর্দৃষ্টি ছিল তাহা নহে। কৃষ্ণকে আধুনিক ভূগোল ইতিহাস শিখাইবা কবি একটু উপহাস করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ ধর্ম্মপ্রচারক দিগের মধ্যে কৃষ্ণ নানক, যীশু, মামা (বুদ্ধ) এমন। বর্ত্তমান রামশরণ পালের নামও করিয়াছেন, কিন্তু সত্যধর্ম্ম প্রচারক চতুষ্টয়ের মধ্যে কাহারা তাহা জানি না। রামশরণ পালকে সত্যধর্ম্মপ্রচারক অবতার বলিয়া কবি এখানে যেমন দৃষ্টি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা তাঁহাকে বর্ত্তমান মতাবলম্বী বলিয়া প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইলেও বিশ্বাস করিতে সঙ্কোচ করি না। বৃন্দাবন-লীলা সাঙ্গের পর কবি কয়েকটি ভজন গাহিয়া এইরূপে বাল্যলীলার অবতারণা করিয়াছেন,—

কংসের হইল ঘোরতর অরিষ্ট আইল।
কৃষ্ণ বলদেবে যাই মথুরা চলিল।
গোপিনী বিরহ আদি যত লীলা যত।
[illegible]
[illegible]
প্রভুর প্রকাশ হইল [illegible]

* * *

বাল্যলীলা এইরূপে ভুষ্ট করিলেন।
উদ্ধব চলিল তথা করি আজ্ঞা শিরে।
গোপিনীর প্রেম বারি উদ্ধব পরিয়া।
ভক্তির পাইল বীজ জগৎ তারিয়া।

* * *

হস্তিনাপুরেতে অক্রুর করিল গমন।
পূর্ব্বার্দ্ধ শ্রীকৃষ্ণ কথা হইল সমাপন।

* * *

দ্বিজ কুমারের কথা হইল বিখ্যাত।
দ্বারকা বিহার সার হইল সমাপ্ত।
শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণগুণ গান।
দ্বিতীয়রূপের কথা এ রস আখ্যান।

এই পর্য্যন্ত বাহ্যলীলার কথাও শেষ হইল। তাহার পর কবি গ্রন্থরচনার ইতিহাস দিতেছেন,—

নরনারায়ণ দাস করে নিবেদন। বৃন্দাবন ছাড়ি মন না যায় কখন॥

কবি এ গ্রন্থে বৃন্দাবনলীলা বা আন্তরলীলা যেমন বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, বাহ্যলীলা তাহার লক্ষাংশের একাংশও নহে। আন্তরলীলা বর্ণনা করিতে ১ হইতে ৩৫২ পৃষ্ঠা লাগিয়াছে; আর বাহ্যলীলার আরম্ভ ৩৫২ পৃষ্ঠার প্রথমে ও শেষ ৩৫৩ পৃষ্ঠার মধ্যস্থলে, কেবল ৪৩টি মাত্র কবিতায়। তিনি যে দ্বারকালীলা বাহুল্যরূপে বর্ণনা করিবেন না, তাহা তাঁহার পূর্ব্বোদ্ধৃত "বৃন্দাবন ছাড়ি মন না যায় কখন" এই বাক্য হইতেই বুঝা যায়। তাহার পর,—

নবতি অধ্যায়ে সাঙ্গ গ্রন্থের রচন। কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের লেহিল চরণ॥
মন বুদ্ধি হীন বড় করিতে বর্ণন। ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধ করি গান।
ইতি বাহ্য লীলা সাঙ্গ। ব্রজের ভাষাতে তাহা করিল রচন।
দশমস্কন্ধ মধ্যে কৃষ্ণের চরিত্র। শ্রীমদ্ভাগবত ভাষা কাশীরামে কৈল।
এই কথা ত্রিভুবন করিবে পবিত্র। পঞ্চম বৎসরে তাহা পূরণ করিল॥
ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলাবিলাস গান। সন্তুষ্ট তাহাতে আমি নিযুক্ত রহিল।
বারশত একুইশ সালে হইল পূরণ। বাঙ্গালাতে কাশীবাসী-সংক্ষেপে কহিল॥
এক শত চৌবাল্লিস মাসে শ্রীকৃষ্ণ লীলা। স্বর্গ আরোহণ পর্ব্ব বর্ণের শাসন।
নিজ বৃন্দাবনে হরি অনেক করিলা। শুনি শুদ্ধ মনে তুষ্ট নরনারায়ণ।
তার মধ্যে স্থূল লীলা দ্বিশত ত্রেত্রিশ। শ্রীউদিতনারায়ণ বারাণসী পতি।
যথাশক্তি লিখিলাম শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশ। ব্রজের ভাষাতে সাঙ্গ করিলেন পুথি॥
লিপির অনেক দোষ করিতে শোধন। এই স্থল ত্রিভুবনে হউক মঙ্গল।
আশ্রয় কেবলমাত্র ভক্তের চরণ। রাজার মঙ্গল মাগি সদাই কুশল॥
প্রতিদিনে নবলীলা করিতে রচন। সব বংশে কৃষ্ণভক্ত হও সেই জন॥
অসম্ভব আশা ছিল না হৈল পূরণ। সাযুর্য্য হৃদয় লীলা করিবে বর্ণন॥
তিনশত পঞ্চষট্টি একই বৎসরে। এই পুথি মধ্যে যত পাবে চুক ভুল।
বার শুণে তেত্রিশ শত আর্দ্ধ পুরে। করিবে ইহার শুদ্ধ হয়া অনুকূল॥
ব্রজাস্থিত এই লীলা রচ কবীশ্বরে। ইতঃপর নিজকর্ম্ম জন্ম আদি যত।
সূত্রমাত্র স্থূল লীলা পৃথিবী ভিতরে। ভাষাতে আসিয়া আমি করিল সতত॥
পাঁচ ভাব ছয় রস নব ভক্তি সার। বিশেষিয়া সব কথা লিখিব সকল।
অন্তর্গত বহু লীলা নাহি পারাবার। যাহাতে শ্রীলের কর্ম্ম জানিয়া কৌশল॥
কিছুকাল মৃত্যাপুরে করিয়া যাপন।

পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যাইতেছে, কাশীরাজ উদিতনারায়ণের মহাভারতানুবাদ শেষ হইলে, হরি কথার আলোচনা বন্ধ হইল ভাবিয়া কবি-মহারাজ জগন্নারায়ণ অসুখী হন। সেই অসুখ দূর করিবার জন্যই কাশীতে মঙ্গলদাস বাবাজীর সঙ্গে নব বৃন্দাবনের অনুষ্ঠান করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন। মৃত্যাপুরের কৃষ্ণদাস বাবাজীও এ বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশ হইতে আরও জানা গেল,—১২২১ সালে কবি এই "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বিলাস" সমাপ্ত করেন। দ্বিতীয় কবিতা হইতে জানা যাইতেছে, তিনি ইহাতে ২৩২৫ পদাবলী বর্ণনা করিয়াছেন। পঞ্চম কবিতায় যে হেঁয়ালী লিখিয়া গিয়াছেন, চতুর্থ ও ষষ্ঠ কবিতা হইতে আমি তাহার অর্থ এইরূপ বুঝিয়াছি :—এক বৎসরে ৩৬৫ দিন হয়, তাহাকে বার গুণ করিলে ৪৩৮০ হয়; প্রতিদিন একটি করিয়া "নবলীলা" লিখিতে কবির বাসনা ছিল, ঘটে নাই; অর্থাৎ এই কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বৃন্দাবনবাস বর্ণনা সমস্ত দিনের লীলা লিখিবার জন্য কবির ইচ্ছা ছিল, তাহা ঘটে নাই; ২৩৩৫ গান লেখা হইয়াছে। কাব্যারম্ভ কত দিনে হয়, তাহার কোন সঙ্কেত পাওয়া গেল না। ১২২১ সালে সমাপ্ত হইয়া থাকিলে, এত বড় কাব্যরচনায় সম্ভবতঃ দুই এক বৎসর বিলম্ব বোধ হয় ঘটিয়াছে এমন বোধ হয় না; কারণ একস্থলে কবি "রোগীর স্তুতি" ও "আরোগ্য স্তুতি" লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, উহা তাঁহারই কোন কঠিন রোগের সময়েই লিখিত হইয়া থাকিবে। ঐ স্থলে "সত্যস্তুতি" "সত্য আচরণ স্তুতি" ইত্যাদি আছে, তাহাতেও কর্ত্তাভজা মতের কথা পাওয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে কাশীরাজের মহাভারতের অনুবাদ হইয়াছিল।

তাহার পর কবি কতকগুলি নীতিধর্ম্মসংক্রান্ত পদ গাহিয়া, উপদেশ দিয়া এবং সে সকল কথার প্রমাণস্বরূপ ব্রহ্মসংহিতা, শ্রীমদ্ভাগবত, নানা পুরাণ, নানা তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থের বচনাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন। পরে পঞ্চাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ স্তব করিয়াছেন। তাহার পর নিজের পরিচয় লিখিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন, উহা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে।

এই কাব্যে অনেকগুলি পারিভাষিক শব্দ আছে। পতঙ্গলীলা, শতরঞ্জ ক্রীড়ালীলা, কুস্তিলীলা প্রভৃতি বর্ণনায় তাহার আধিক্য দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন ভোজনলীলা, বেশভূষা লীলা প্রভৃতির বর্ণনায় অনেকানেক খাদ্যের ও বসনভূষণের নূতন নাম পাওয়া যায়। এ সকল শব্দের সংখ্যা বড় বেশী। উদাহরণস্বরূপ দুচারিটী উদ্ধৃত করিলে তৃপ্তি হয় না বলিয়া ক্ষান্ত রহিলাম।

অক্ষরাদি দেখিয়া অনুমান হয়, এই কাব্য ১৮১৫ হইতে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

বিদ্যাপতি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত।

সুপরিচিত বিদ্যাপতি প্রসিদ্ধ মিথিলা প্রদেশে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। মিথিলার ব্রাহ্মণের ভিতর শ্রোত্রিয় ও মৈথিল বলিয়া দুই শ্রেণী আছে; তাহার মধ্যে মৈথিলদের অনেক গাঞি আছে; যাঁহারা শ্রোত্রিয় তাঁহাদের আর পৃথক্ গাঞি নাই। মৈথিল কবি বিদ্যাপতির

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে এই প্রবন্ধ পঠিত হয়।

গাঞি বিষরিবার বিস্কী। তাঁহার বংশের আদি পুরুষ বিষ্ণুঠাকুর বিষরিবার বিস্কী নামক গ্রামে আসিয়া বাস করেন; তদবধি ইঁহারা বিষরিবার বিস্কী বলিয়া পরিচিত। বিষরিবার বিস্কী বিদ্যাপতি ঠাকুর মহারাজ শিবসিংহের সন্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। এই শিবসিংহ রাজা দেবসিংহের পুত্র ও ভবসিংহের পৌত্র এবং কামেশ্বরের প্রপৌত্র। ইঁহারাও ব্রাহ্মণ। ইঁহাদের বংশের আদিপুরুষ জগৎপুর নামক স্থানে বাস করিতেন। তাঁহার পর এই বংশেরই একজন ওএনী নামক গ্রামে আসেন; তিনি নাকি কোন রাজার নিকট ওএনী গ্রামটী শাসনরূপে পাইয়াছিলেন; তাঁহার অন্য নাম প্রকাশ নাই; তিনি ওএন ঠাকুর বলিয়াই প্রসিদ্ধ। ইনি কামেশ্বর হইতে ঊর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ। কামেশ্বর একজন প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ নিরীহ মহাত্মা ছিলেন; সামান্য কুটীরে আপন ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া দিনাতিপাত করিতেন ও বিষয়স্পৃহা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। যখন কামেশ্বর তাঁহার পূর্ব্বপুরুষোপার্জ্জিত ওএনী গ্রামে থাকিয়া মিথিলা প্রদেশকে অলঙ্কৃত করিতেন, তখন হরিসিংহদেব মিথিলার অধিপতি। হরিসিংহদেব নান্যদেবের বংশধর। নান্যদেবকে ১০১১ শকাব্দে দেখিতে পাওয়া যায়। সিমরৌনগড় নামক স্থানে একখানি কীর্ত্তিশিলা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এই শ্লোকটী খোদিত আছে :—

৯ ১ ০ ১

নন্দেন্দু-বিন্দু-বিধু-সম্মিতশাকবর্ষে
তচ্ছ্রাবণে সিতদলে মুনিসিদ্ধতিথ্যাং।
স্বাতীশনৈশ্চরযুতে করিবৈরিলগ্নে
তন্নান্যদেবনৃপতির্বিদধীত বাস্তুং॥

অর্থাৎ মহারাজ নান্যদেব ১০১৯ শকাব্দে শ্রাবণ মাসে শুক্লপক্ষে সপ্তমী তিথিতে স্বাতী নক্ষত্রে শনিবারে সিংহলগ্নে এই বাস্তুটী নির্ম্মাণ করিলেন। যিনি ১০১৯ শকে নৃপতি বলিয়া পরিচিত হইয়া মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিলেন তিনি অবশ্য তাহা হইতে কিছু পূর্ব্বে রাজা হইয়াছেন। যাহাই হউক ধরিয়া লইলাম তিনি দশম শাক শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজা হন। নান্যদের কর্ণাটী, তিনি কর্ণাট দেশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। বিদ্যাপতি পুরুষপরীক্ষা নামক গ্রন্থে যুদ্ধবীর কথা প্রস্তাবে নান্যদেবের এক পুত্রের এই বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন যে "আসীৎ মিথিলায়াং কর্ণাটকুলসম্ভবস্য নান্যদেবনাম্নো রাজ্ঞঃ পুত্রো মল্লদেবনামধেয়ঃ কুমারঃ"। তবেই নান্যদেব কর্ণাটী হইলেন। নান্যদেব কোন অপরিজ্ঞেয় কারণে দশম শতাব্দীতে মিথিলায় আসিয়া মিথিলার অধিপতি হইয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার বংশীয়েরা রাজা হইতে থাকিলেন। নান্যদেবের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ হরিসিংহদেব যখন মিথিলা শাসন করেন, তখন ধর্ম্মশাস্ত্রে সাত খানি রত্নাকর কর্ত্তা প্রসিদ্ধ চণ্ডেশ্বর তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। এই চণ্ডেশ্বর বিদ্যাপতি ঠাকুরের খুল্লপিতামহ। ইঁহার উপাধি ছিল মহামহত্তক সান্ধিবিগ্রহিক। তাঁহার

পিতা বীরেশ্বর, তিনিও সুপণ্ডিত ছিলেন ; বীরেশ্বরপদ্ধতি বলিয়া তিনি এক পদ্ধতি করিয়া গিয়াছেন ; মিথিলার ব্রাহ্মণেরা সাদ্যিও বীরেশ্বরপদ্ধতি অনুসারেই তাঁহাদের দশকর্ম্ম করিয়া থাকেন। তিনিও হরিসিংহের ও তাঁহার পিতা শক্রসিংহের মন্ত্রিত্ব করিতেন। চণ্ডেশ্বরের পিতামহ দেবাদিত্য ; তিনিও সান্ধিবিগ্রহিক মন্ত্রিবর বিদ্যাত। দেবাদিত্যের পিতা কর্ম্মাদিত্য মন্ত্রীর কার্য্য করিতেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে বিদ্যাপতির পূর্ব্ব পুরুষেরা সকলেই রাজকুলসেবী ছিলেন। চণ্ডেশ্বরের উর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ বিষ্ণুঠাকুরই প্রথমে মিথিলায় বিসফীতে বাস করেন ; বিষ্ণুঠাকুর পৌত্র কর্ম্মাদিত্য হইতে সকলেরই নাম পাওয়া যাইতেছে। আর ওদিকে হরিসিংহদেবের উর্দ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষ নান্যদেবকেই প্রথমে মিথিলার রাজপদে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং চণ্ডেশ্বরের উর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ বিষ্ণুঠাকুর আর হরিসিংহদেবের উর্দ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষ নান্যদেব এক সময়ের লোক। নান্যদেব হইতে তদ্বংশীয়েরা রাজা হইতে থাকিলেন, আর ইঁহারাও তাঁহাদেরই মন্ত্রী হইতে থাকিলেন।

মহামহত্তক সান্ধিবিগ্রহিক চণ্ডেশ্বর যখন মিথিলাপতি হরিসিংহদেবের মন্ত্রী, তখন হরিসিংহের প্রদত্তক্রমে কামেশ্বর ওএনী গ্রাম অলঙ্কৃত করিতেছেন। তাঁহার উর্দ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষ ওএন ঠাকুরই ওএনী গ্রামটী দান স্বরূপ পাইয়াছিলেন। কোন্ রাজার নিকট তিনি যে গ্রাম পাইয়াছিলেন তাহার কোন নিদর্শন না থাকিলেও তিনি যে নান্যদেবের কাছে অথবা তাঁহারই সময়ে আর কাহারও কাছে পাইয়াছিলেন তাহা এক প্রকার স্থির ; কেন না কামেশ্বরের উর্দ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষ ওয়েন ঠাকুর যে হরিসিংহদেবের উর্দ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষ নান্যদেবের সমসাময়িক লোক, সে বিষয়ে সন্দেহ কি ? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে চণ্ডেশ্বর কামেশ্বর ও হরিসিংহদেবের উল্লিখিত পূর্ব্বপুরুষেরা সকলেই সমসাময়িক ও দশম শাক শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক।

হরিসিংহদেব যেমন পরাক্রান্ত তেমনই আবার প্রজারঞ্জক ছিলেন। মিথিলার তৎকালিক প্রজারা তাঁহাকে পিতা বলিয়া জানিতেন। হরিসিংহদেব বল্লালসেনের দৃষ্টান্তে স্বীয় সাম্রাজ্য মিথিলায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের এক পঞ্জী প্রণয়ন করান। সেই হইতেই মিথিলার ব্রাহ্মণের ভিতর দুই শ্রেণী হইল ; এক মৈথিল আর এক শ্রোত্রিয় ; ইহার ভিতর আবার গাঞি পর্য্যন্ত হইয়া গেল। আজিও মৈথিলে শ্রোত্রিয়ে আদান প্রদান ও আহারাদি পর্য্যন্ত নাই। দুই শ্রেণীর মধ্যে শ্রোত্রিয়ই সম্মানী, তিনিই কুলীন। মহারাজ হরিসিংহদেব যাহা করিলেন, তাহা সকলেই অবনত মস্তকে স্বীকার করিল।

হরিসিংহ পরাক্রমী ছিলেন, প্রজারঞ্জক ছিলেন, অশেষগুণে গুণবান্ ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার কপালে অধিক দিন রাজভোগ ছিল না। তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ; তাঁহার মত অধিক মিথিলায় তখন আরও অনেক ছিল ; তিনি সব করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু জাতি বশ করিতে পারেন নাই, তাহাতেই তাঁহার সর্ব্বস্ব গেল। কিংবদন্তী হরিসিংহ সেব এক [illegible]

অনুষ্ঠান করেন ; সমস্ত প্রস্তুত ; যজ্ঞ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে ; যিনি রাজা তাঁহাকে অভিষিক্ত হইতে হইবে। হরিসিংহ রাজা ; তিনি নান্যদেবের বংশধর ; তিনিই অভিষিক্ত হইবেন। জ্ঞাতি ক্ষত্রিয়েরা বাঁকিল, তাহা হইবে না, হরিসিংহকে অভিষিক্ত হইতে দিব না। ক্রমে যজ্ঞ নষ্ট হইল। হরিসিংহ ভাগ্যবিপর্য্যয়ে সহায়হীন ; শেষে সমস্ত ছাড়িয়া ফকির হইয়া চলিয়া গেলেন। নান্যদেবের বংশ এইখানেই পর্য্যবসিত হইল। হিন্দুস্থানে তখন মুসলমান রাজা। এ বার্ত্তা ক্রমে তাৎকালিক মুসলমান সম্রাটের কর্ণে উঠিল ; তিনি বিনা আয়াসেই রাজ্য দখল করিলেন। কিংবদন্তী এই সময়ে মুসলমান সম্রাটের সহিত কামেশ্বরের কি রকমে দেখা হয় ; কামেশ্বরের নিরীহতা ও কতিপয় সিদ্ধপুরুষোচিত অদ্ভুতগুণে নাকি সম্রাট বড়ই সন্তুষ্ট হন ; তাই তিনি কামেশ্বরকে মিথিলার রাজা হইতে বলেন। কামেশ্বর নাকি কিছুতেই উহা গ্রহণ করিতে চাহেন না। শেষে সম্রাটের আগ্রহাতিশয়ে স্বীকার করিলেন। মিথিলায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ কামেশ্বর রাজা হইলেন। সম্রাট তাঁহাকে সনন্দ দিলেন। দুর্দ্দান্ত ক্ষত্রিয়েরা, যাহারা রাজপুত্র হরিসিংহকে সন্ন্যাসী করিয়াছে, তাহারা মুসলমান সম্রাটের ভয়ে আর মাথা তুলিতে পারিল না। মিথিলা মুসলমানের করদ রাজ্য হইল ; ব্রাহ্মণ রাজা হইলেন।

কামেশ্বরের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভোগীশ্বর, মধ্যম কুসুমেশ্বর, কনিষ্ঠ ভবসিংহ। কামেশ্বরের পর ভোগীশ্বর রাজা হইলেন। ভোগীশ্বরের পুত্র গণেশ্বর যখন রাজা, তখন আবার চণ্ডেশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্র গণপতি ঠাকুরকে রাজবাড়ীতে দেখিতে পাওয়া যায়। গণপতি ঠাকুর রাজা গণেশ্বরের পরম মিত্র ছিলেন। কবি বিদ্যাপতি এই গণপতি ঠাকুরেরই পুত্র। প্রবাদ গণপতি কপিলেশ্বর নামক মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া পুত্ররত্ন বিদ্যাপতিকে পাইয়াছিলেন। আজিও মিথিলায় কপিলেশ্বর মহাদেব বর্ত্তমান। বিদ্যাপতি বাল্যকাল হইতেই পিতার সহিত রাজবাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। বিদ্যাপতি প্রসিদ্ধ পক্ষধর মিশ্রের সহাধ্যায়ী ; ইঁহারা উভয়েই হরি মিশ্রের নিকট অধ্যয়ন করেন। হরি মিশ্র পক্ষধর মিশ্রের পিতৃব্য। পক্ষধর ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় হইয়াছিলেন ; ইঁহারই নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিয়া নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি ইঁহাকেই বিচারে পরাস্ত করিয়া যান এবং গুরুর আলোককে নির্ব্বাপিত করিয়া আপনার দীধিতিতে জগৎ উদ্ভাসিত করেন। বিদ্যাপতি মধুময় কবিত্ব লইয়া পাঠশালা হইতে বাহির হইলেন। রাজবাড়ীতে তখন বড় গোলযোগ উপস্থিত ; মহারাজ গণেশ্বর জ্ঞাতিবর্গের চক্রান্তে অকালে ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। বিদ্যাপতির পিতা গণপতি সুহৃদ্দেব শোকে অধীর। গণপতি পণ্ডিত ছিলেন, ধার্ম্মিক ছিলেন ; এ সব দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার রাজসংসার আর ভাল লাগিল না। তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন ; তাহার পর হইতে তিনি নাকি ধর্ম্মকার্য্যে শেষজীবন অতিবাহিত করেন। ইত্যবসরেই তিনি গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ও গ্রন্থের ফল মৃত সুহৃদ্দেব পারত্রিক মঙ্গলের জন্য অর্পণ করেন।

গণেশ্বরের দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ কীর্ত্তিসিংহ, কনিষ্ঠ বীরসিংহ। কীর্ত্তিসিংহ দেখিলেন, ব... বিপদ। কনিষ্ঠ পিতামহ ভবসিংহ তাঁহাকে পৈতৃক রাজ্যের অর্দ্ধেক দিতে চাহেন। কীর্ত্তি সিংহ ভাবিলেন সে আবার কি? আমার পৈতৃক রাজ্য আমি ভিক্ষা লইতে যাইব কেন? গোলযোগ না করিয়া চুপি চুপি একেবারে দিল্লীশ্বরের কাছে হাজির। দিল্লীশ্বর সমস্ত শুনিয়া কতকগুলি সৈন্য সহিত কীর্ত্তিসিংহকে আপন রাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন। এই ব্যাপারে গোলযোগ দেখিয়া বলিয়া বসিল, আমি নির্দ্দোষী, রাজা কীর্ত্তিসিংহের, সে এসে... ইহাতে এত গোলযোগ যে কে করিল তাহা আমি জানি না; গণেশ্বরের আকস্মিক মৃত্যু সম্বন্ধেও আমি নির্দ্দোষ। যাহা হউক আর কোন গোলযোগ হইল না; কীর্ত্তিসিংহ রাজা হইলেন। কীর্ত্তিসিংহ যখন রাজা, তখন আমাদের বিদ্যাপতি তাঁহার সভাপণ্ডিত। তিনি কীর্ত্তিসিংহের দিল্লী গমন হইতে পুনর্ব্বার রাজ্যপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া কীর্ত্তিলতা বলিয়া একখানি পুস্তকরচনা করেন। গ্রন্থখানি আজও আমরা কোথাও দেখি নাই; কেবল নেপাল মহারাজের সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকালয়েই তাহা দেখিতে পাইয়াছি। তাহার পর কীর্ত্তিসিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা বীরসিংহ উভয়েই নিঃসন্তান হইয়া মরিলেন। ভবসিংহের পুত্র দেবসিংহ রাজা হইলেন। দেবসিংহ যখন রাজত্ব পান, তখন তাহার পুত্র শিবসিংহ পরিণতবয়স্ক। যুবরাজ শিবসিংহ বুদ্ধিমান, পরাক্রমী ও সাহসী ছিলেন, তিনি অশ্বারোহণে অসাধারণ দক্ষ ছিলেন। বিদ্যাপতি অতি শৈশবে তাঁহার পরিচিত। সুবুদ্ধি সুরসিক শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে অমূল্য রত্ন বলিয়া গ্রহণ করিলেন; বিদ্যাপতি দেখিলেন এইবার মিলিয়াছে, যাহা খুঁজিতেছি তাহা পাইয়াছি। এই সময়েই বিদ্যাপতি যে কিল্লোলপ্রিয় পঞ্চমস্বরের সৃষ্টি করেন; এই সময় হইতেই জগৎ যাহা কখন শুনে নাই তাহা শুনিয়াছিল; আজও যাহার স্বর্গলহরী স্মৃতিজগতে সজীব হইয়া রহিয়াছে। হৃদয়বান্ হইলে যাহা হয়, প্রেমিক হইলে যাহা হয়, শিবসিংহ তাহাই হইয়াছিলেন। শিবসিংহ এতদূর সাহসী হইয়াছিলেন যে তিনি আপনাকে মুসলমানের অধীন বলিয়া মনে করিতেন না। ক্রমে ক্রমে দিল্লীতে কর পাঠান বন্ধ করিলেন। দেবসিংহ উপযুক্ত পুত্রের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিতেন না। কাজেই কর পাঠাইতে পারিতেন না, কিন্তু আতঙ্কে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া যাইত। ক্রমে আতঙ্ক সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। দিল্লীশ্বরের সৈন্যগণ মিথিলা প্রবেশ করিল। দেবসিংহ পলায়ন করিলেন। কিন্তু শিবসিংহের অসীম সাহস, তিনি একাকী শত্রুসেনায় প্রবেশ করিলেন। তাহার পর শিবসিংহ ধৃত হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হইলেন, সেখানে কারাগারে তাঁহার স্থান হইল। দেবসিংহ রাজত্ব করিলেন, তাঁহার রাজ্য বজায় রহিল। কিন্তু সে রাজ্যে তাঁহার সুখ কি? তাঁহার প্রিয়তম পুত্র কারাগারে। বিদ্যাপতি ভাবিলেন শিবসিংহ নাই, রাজসংসারে আর কি করিতে থাকিব? আমি কোথা হইতে আর পঞ্চমস্বরে ডাকিব? আমার সে বসন্তপঞ্চম কোথায়? বিদ্যাপতি একেবারে দিল্লীতে গিয়া উপস্থিত। অনেক করিয়া দিল্লীশ্বরের কৃপা

পাইলেন; একেবারে পঞ্চমে সুর বাঁধিলেন। মুসলমান মোহিত হইয়া গেল। বিদ্যাপতি শিবসিংহের মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। শিবসিংহ মুক্ত হইলেন। কবিবর বিদ্যাপতি শিবসিংহকে লইয়া মিথিলায় আসিলেন; দেবসিংহের আনন্দের আর সীমা রহিল না। বিদ্যাপতির যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কবিত্বে বিদ্যাপতি মুসলমান সম্রাটকে জয় করিলেন।

তখন হইতেই বিদ্যাপতির আওয়াজ খুলিল। মিথিলার একপ্রান্তে বসিয়া বিদ্যাপতি যে সুর ধরিয়া গিয়াছিলেন তাহাই প্রবাহরূপে বাঙ্গালায় বহিয়াছিল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সেই প্রবাহে আপনাকে ভাসাইয়া বাঙ্গালার পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে দক্ষিণাপথে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একেবারে ডুবাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

স্বাধীনচেতা শিবসিংহের অন্তঃকরণে বিদ্যাপতির উদার মধুর ভাব গাঁথিয়া গেল। বিদ্যাপতি সুর, শিবসিংহ তন্ত্রী; বিদ্যাপতি না হইলে শিবসিংহ অচেতন, শিবসিংহ না হইলে বিদ্যাপতি অস্তিত্বহীন।

প্রকৃত কবি হইলে যাহা হয় বিদ্যাপতি তাহাই হইলেন। বিদ্যাপতি ভক্ত হইলেন, বিদ্যাপতি প্রেমিক হইলেন। স্বাধীনচেতা শিবসিংহ আরও বিশালমনা হইলেন, তিনি মুসলমানের অধীন হইতে চাহিলেন না। বৃদ্ধ পিতা অনেক বারণ করিলেন, তথাপি শিবসিংহ আবার দিল্লীতে কর প্রেরণ বন্ধ করিলেন। সম্রাট এবার স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে গৌড়েশ্বরকে আসিয়া সমবেত হইতে বলিলেন।

এসব ব্যাপার শিবসিংহের অবিদিত রহিল না। শিবসিংহের পিতা দেবসিংহ এমন সময়ে পীড়িত হইলেন। ক্রমে পীড়া বর্দ্ধিত হইল; বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেবসিংহ গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এদিকে মুসলমানও আসিয়া পড়িল, এদিকে দেবসিংহও গঙ্গাতীরে প্রাণত্যাগ করিলেন। শিবসিংহ পিতার সৎকার করিয়াই রণস্থলে পতিত হইলেন; মুসলমান সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল; শিবসিংহের জয় হইল। মুসলমান বিজয়ী শিবসিংহ মিথিলার শূন্য সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। দেশে আর আনন্দের সীমা রহিল না। বিদ্যাপতি নগরে নগরে গাহিয়া বেড়াইলেন, তোমরা সকলে শুন তোমাদের রাজা শিবসিংহ কি করিয়াছেন। তোমাদের রাজা

অনলবজ্র কর লক্খণ গরবই সক্ক সমুদ্দ কর আগিনি সসী।
চৈতকারি ছঠি জেঠা মিলিআ বার-বেহগ্গই জাউলুসী॥
দেবসিংহ জং পুহবী ছড্ডই অদ্ধাসন সুররাঅ সক্ক।
তুহু সুরতান নিদৈ অব সোঅউ তপ্পসহীন জগ্গ ভক্ক॥
দেখহুঁও পৃথিমীকে রাজা পৌরুস মাঁঝ পুণ্ণ বলিও।
সত্তবলৈ গঙ্গা মিলিতকলেবর দেবসিংহ সুরপুর চলিও॥

একদিস যবন সকল দল চাপিও একদিস সৌ জয়রাঅ চরু।
দুহুএ দলটি মনোরথ পুরও গরুএ দাপ সিবসিংহ করু।
সুরতরুকুসুম ঘালি দিন পুরেও দুন্দুহি সুন্দর সাদ ধরু।
বীরছত্র দেখনকো কারণ সুরগণ সোভৈঁ গগন ভরু॥
আরম্ভীঅ থম্ভেট্ট মহামখ রাজসুঅ অশ্বমেধ জহাঁ।
পণ্ডিত বর আচার বখানিঅ যাচককেঁ। ঘরদান কহাঁ॥
বিজ্জাবই কইবর এহু গাবএ মানত মন আনন্দ ভও।
সিংহাসন সিবসিংহু বইঠৌ উছবৈঁ বিসরি গও॥

হে নগরবাসিগণ! তোমাদের পূর্ব্ব রাজা দেবসিংহ এই ২৯৩ লাক্ষ্মণাব্দে চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে স্বর্গে দেবরাজের সিংহাসনার্দ্ধভাগী হইয়াছেন। রাজা নিঃপুত্র হন নাই; তাঁহার পুত্র শিবসিংহ রাজা হইয়াছেন; শিবসিংহ বাহুবলে বলীয়ান্। তিনি সম্মুখাগত যবনদিগকে তৃণের মত তুচ্ছ ভাবিয়া জননী জাহ্নবীর অমৃতস্থান জন্য পিতার দেহ ভস্মীভূত করিয়া চটাকমাত্রে যমরাজ সৈন্যগণকে পরাভূত করিয়াছেন। তাহার পর যবনরাজ, তাঁহার সঙ্গে অগণিত সৈন্য; তোমাদের নূতন রাজা অকুতোভয়; ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তোমরা অনুপস্থিত ছিলে; দেখ নাই; আকাশে সারি গাঁথিয়া দেবগণ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে যবনরাজ পলায়ন করিল। স্বর্গে তেই না দুন্দুভি বাজিল। শিবসিংহের মাথার উপর কতই না সুরতরু কুসুম পড়িতে লাগিল। সেই শিবসিংহ এখন তোমাদের রাজা হইয়াছেন; তোমরা নির্ভয়ে বাস কর।

বিদ্যাপতি এইরূপে শিবসিংহের কীর্ত্তি গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শিবসিংহ রাজা হইলেন। দান যে কতই হইল তাহার আর ইয়ত্তা নাই। যে অব্দে শিবসিংহ রাজা হইয়াছিলেন সেই অব্দেই বিদ্যাপতিকে তিনি তাঁহার স্বগ্রাম বিষয়িবার বিষ্ফী গ্রামটী শাসনরূপে দান করিয়াছিলেন। তিনি একখানি তাম্রময় শাসনপত্রে লিখিয়া দিলেন:—

স্বস্তি গজরথেত্যাদিসমস্তপ্রক্রিয়াবিরাজমানশ্রীমদ্রামেশ্বরীবরলব্ধপ্রসাদ-ভবানীভবভক্তিভাবনপরায়ণ-রূপনারায়ণ-মহারাজাধিরাজ-শ্রীমৎ-শিবসিংহ-দেবপাদাঃ সমরবিজয়িনঃ। জয়ইল তপ্পায়াং বিসপীগ্রামবাস্তব্যসমস্ত-লোকান্ ভূকর্ষকাংশ্চ সমাদিশন্তি মতমস্তু। ভবতাং গ্রামোঽয়মস্মাভিঃ সপ্রক্রিয়াভিনবজয়দেবমহারাজপণ্ডিতঠক্কুরশ্রীবিদ্যাপতিভ্যঃ শাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽতো বয়মেতেষাং বচনকরীভূয় কর্ষণাদিকং কর্ম্ম করিষ্যেতি লসৎ ২৯৩ শ্রাবণ শুদি সপ্তম্যাং গুরৌ। শ্লোকাশ্চ।

অব্দে লক্ষ্মণসেনভূপতিমতে বহ্নিগ্রহদ্ব্যঙ্কিতে
মাসি শ্রাবণসংজ্ঞকে মুনিতিথৌ পক্ষেঽবলক্ষে গুরৌ।
বাগ্‌বত্যাঃ সরিতস্তটে গজরথেত্যাখ্যা প্রসিদ্ধে পুরে
দিৎসোৎসাহবিবৃদ্ধবাহুপুলকঃ সভ্যায় মধ্যেসভং ॥

ইত্যাদি আরও ৭টী শ্লোক আছে। তাম্রশাসনে আমরা দেখিতে পাইলাম মহারাজ শিবসিংহের রাজধানীর নাম গজরথপুর; উহা বাগ্‌বতী নদীর তীরবর্ত্তী। এখনও গজরথপুর বলিয়া একটী গ্রাম দ্বারভাঙ্গার নিকটবর্ত্তী স্থানে আছে; উহাও বাগ্‌মতী নদীর তীরে; উহাই যে সেই গজরথপুর তাহা মিথিলা প্রদেশে সকলেই বলেন।

মহারাজ শিবসিংহ যখন রাজ্যাভিষিক্ত হন তখন তিনি প্রৌঢ়; কিন্তু তখনও তাঁহার সন্তান হয় নাই এবং পরেও তাঁহার সন্তান হয় নাই। শিবসিংহ রূপনারায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রবাদ রূপনারায়ণ শিবসিংহ রাজ্যাভিষেকের পর তিন বৎসর রাজত্ব করিলে আবার মুসলমান সম্রাট বিপুল আয়োজনে মিথিলা আক্রমণ করেন। শিবসিংহ বুঝিলেন এবার আর নিস্তার নাই। রাজাবনৌলিগ্রাম নেপাল পাহাড়ের পাদদেশে। তথায় তখন দ্রোণবংশীয় রাজারা রাজত্ব করিতেন। শিবসিংহের সহিত তাঁহাদের বন্ধুত্ব ছিল। বিদ্যাপতি এ বিপদের সময় মানসম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য রাণী লখিমাকে লইয়া তথায় চলিয়া গেলেন। শিবসিংহ একাই রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। যেদিকে সম্রাট সেইদিকে বায়ুবেগে অশ্ব ছুটাইলেন। শিবসিংহ তরবারির অগ্রভাগ দিয়া সম্রাটের শিরস্ত্রাণ উড়াইয়া দিয়া সৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়া চলিয়া গেলেন। পশ্চাতে বিপক্ষ সেনা ছুটিতেছিল; মুসলমান সম্রাট বলিলেন শিবসিংহকে ধরিয়া কাজ নাই; শিবসিংহ যে মুহূর্ত্তে আমার শিরস্ত্রাণ উড়াইয়াছেন সেই মুহূর্ত্তেই আমাকে হত্যা করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। তিনি বীরের মত আমাকে দেখাইয়া আপন স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া স্বাধীন ভাবে বিহার করিতে চলিয়া যাইবেন। আর উহাকে ধরিয়া কাজ নাই। আর যুদ্ধেও কাজ নাই; বুঝিয়াছি শিবসিংহ আর ফিরিবেন না; অনুসন্ধান কর শিবসিংহের আর আছে কে; তাহাকেই এ রাজ্য দিয়া চল আমরা স্বদেশে ফিরিয়া যাই। তাহাই হইল। শিবসিংহের থাকিবার মধ্যে পত্নী লখিমা, তিনিও তখন রাজা বনৌলি গ্রামে। সম্রাট তাঁহাকে রাজত্ব দিয়া চলিয়া গেলেন। লখিমা রাণী হইলেন। বিদ্যাপতি যেমন ছিলেন তেমনই রহিলেন। শিবসিংহের অভাব তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না; তিনি সর্ব্বদাই শিবসিংহকে দেখিতে পাইতে লাগিলেন; তাঁহার কবিত্ব তখন আরও সজীব হইয়া উঠিল কিন্তু পতিপ্রাণা লখিমা বেশী দিন বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিলেন না, অল্প দিনের মধ্যেই সংসার জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। তাহার পর শিবসিংহের ভ্রাতা পদ্মসিংহ রাজা হইলেন; তাঁহার পর তাঁহার পত্নী বিলাসদেবীকে মিথিলার রাণীপদে

দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি তখনও আছেন। বিশ্বাস দেবীর সময়ে তিনি গঙ্গা বাক্যাবলী প্রভৃতি কতিপয় ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহার পর দেবসিংহের রাজত্ব আরম্ভ হইল। তাহার পর দেবসিংহের ভ্রাতা হরসিংহের পৌত্র ধীরসিংহ রাজা হইলেন, ইনি হরনারায়ণ বলিয়াও পরিচিত ছিলেন। হরনারায়ণ ধীরসিংহ কোন্ সময়ে রাজা হন তাহার কোন প্রমাণ নাই, তবে তিনি যে ৩২১ লক্ষ্মণাব্দে মিথিলার রাজা ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। দ্বারভাঙ্গা মহারাজের লাইব্রেরীতে হস্তলিখিত সংস্কৃত পুস্তকাবলী দেখিতে দেখিতে সেতুদর্পণী নামে একখানি পুরাতন তালপত্রের পুঁথি পাই। ইহা মহাকবি কালিদাস প্রণীত সেতুবন্ধ নামক প্রাকৃত কাব্যের টীকা, উহার শেষভাগে শ্রীলিপিকাল দেওয়া আছে; যথা—

পরমভট্টারকেত্যাদিমহারাজাধিরাজশ্রীশ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবীয়ৈকবিংশত্যধিক-শতত্রয়তমাব্দে ফাল্গুনমাসবস্যাবাং শনৌ সমস্তপ্রক্রিয়াবিরাজমানশ্রিপুরাক্ষ-কৃৎসনারায়ণশিবভক্তিপরায়ণ-মহারাজাধিরাজ-শ্রীশ্রীমদ্ধীরসিংহসভূজ্যমানা বা ভীরভুক্তৌ * * শ্রীরত্নেন চরেণ * * লিখিতমদঃ পুস্তকমিতি।

তাহা হইলে ৩২১ লক্ষ্মণাব্দে ধীরসিংহ মিথিলার রাজা ছিলেন। তাহার ভ্রাতা ভৈরবসিংহ। তিনি যখন মিথিলার রাজা, তখনও আমরা বিদ্যাপতিকে দেখিতে পাই। বিদ্যাপতি মহারাজ ভৈরবসিংহের সময়ে দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণীর সমাপ্তি বাক্যের অগ্রে এই শ্লোকটী দেখিতে পাওয়া যায়—

ভূপঃ শ্রীভবসিংহবংশতিলকঃ শ্রীদর্পনারায়ণঃ
স্বাপাসীন্দননন্দনক্ষিতিপতিঃ শ্রীধীরসিংহঃ কৃতী।
শক্রশ্রীঃ সহভূরুপেন্দ্রমা তশ্রীভৈরবক্ষ্মাভুজো
দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী কৃতিরিয়ং তস্যাস্ত সৎপ্রীতয়ে॥

ভৈরবসিংহের পর রামভদ্র রাজা হন। বিদ্যাপতি এই রামভদ্রের সময়েই লোকান্তর গমন করেন।

বিদ্যাপতি যখন জন্ম গ্রহণ করেন, তখন ভোগীশ্বরের পুত্র গণেশ্বর মিথিলার অধীশ্বর। তাহার পর মিথিলায় কত জন রাজা হইলেন; কামেশ্বরের বংশও প্রায় শেষ হইয়া আসিল; বিদ্যাপতি তখনও জীবিত। কামেশ্বরের বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মীনাথ। তাঁহার পর আর এই বংশের কাহাকেও দেখা যায় না। বিদ্যাপতি দীর্ঘজীবী ছিলেন। শিবসিংহের পরবর্ত্তী রাজারাও অল্প অল্প দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি পক্ষধর মিশ্রের পুত্র হরিমিশ্রের নিকট অধ্যয়ন করিতেন; পাঠ সমাপ্ত হইলে তিনি কীর্ত্তিসিংহের সভাপণ্ডিত হইলেন; কীর্ত্তিসিংহের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি প্রথমেই কীর্ত্তিলতা নামিকা

* ৩২ পৃষ্ঠার শেষ পংক্তিতে বিশ্বাস দেবী পরে ভ্রমক্রমে বিলাস দেবী মুদ্রিত হইয়াছে।

গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; ইহা সংস্কৃতে রচিত। তাঁহার কবিত্বকুসুমের এই প্রথম বিকাশ। শিবসিংহ রাজা হইলে সেই বৃন্তচ্যুত কুসুমের অস্ফুট গন্ধ তাঁহার মনোহরণ করিল; তিনি তাহাকে সাদরে মাথায় তুলিলেন; বিদ্যাপতি এত দিনের পর প্রকৃত স্থান পাইলেন। এইবার তাঁহার পূর্ণ বিকাশ। শিবসিংহের আশ্রয়ে থাকিয়াই তিনি তাঁহার নিরুপম পদাবলীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি কবিত্বের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির যাথার্থ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন—ক্রমে তিনি এক জন ভক্ত সাধক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। শিবসিংহকেও তাহাই করিয়া তুলিয়াছিলেন। ভক্ত শিবসিংহ সংসার ছাড়িয়া চলিয়া গেলেও বিদ্যাপতি অটল ভাবে সংসারের দুঃসহ বেগ সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি রাজসংসারে থাকিতেন বটে; কিন্তু তিনি নিঃসঙ্গ ছিলেন। শিবসিংহ সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার পর তিনি আর গান গাহেন নাই; তাহার পর তাঁহার গঙ্গাবাক্যাবলী প্রভৃতি ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থই দেখিতে পাওয়া যায়।

বিদ্যাপতির স্বগ্রাম বিস্ফী দেখিতে গিয়াছিলাম। এখন আর তথায় তাঁহার বংশীয়েরা কেহই নাই;—আজ চারি পুরুষ হইল, তাঁহার বংশধরেরা সে গ্রাম ছাড়িয়া সৌরাট নামক গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছেন। বিস্ফীতে এখন আর কিছুই নাই। আছে কেবল তাঁহার বাস্তুভিটার ভগ্নাবশেষ; ভগ্নাবশেষই বা কেন, কেবল স্মৃতি চিহ্ন। খানিকটা খুব উচ্চ ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে বলে উহাতেই তাঁহার বাটী ছিল; বাটী বোধ হয় মেটেই ছিল। তাহার পর দেখিতে পাওয়া যায় একটী সুড়ঙ্গ—এখন অনেক বুজিয়া আসিয়াছে। জঙ্গলও হইয়াছে। প্রবাদ এই অন্ধকার স্থানে বসিয়াই নাকি তিনি চরমের আলোকের অনুসন্ধান করিতেন। আর আছেন এক লিঙ্গমূর্ত্তি মহাদেব। বিদ্যাপতি স্বয়ং ইঁহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আগে ইঁহার পাকা মন্দির ছিল; এখন আর সে মন্দিরের কিছুই নাই; চারিদিকে মাটীর দেওয়াল আর উপরে চাল। লিঙ্গটী যেখানে আছেন, তাহা একটী অন্ধকারময় কূপ, সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না;—সিঁড়ি আছে, নামিয়া আলো জ্বালিয়া দেখিতে হয়। এখনও তাঁহার নিত্য পূজা হয়। বিদ্যাপতির ভিটার ধারে কমলানদী প্রবাহিতা; এখন নদীরও বেগ মন্দ হইয়া গিয়াছে। বিদ্যাপতি আপন জীবনের শেষ বুঝিতে পারিয়া স্বগ্রাম হইতে গঙ্গাতীরে আসিতেছিলেন। প্রায় ক্রোশ দুই বাকি আছে, আর যাইতে পারেন নাই;—সাহিট বাজিতপুর পর্য্যন্ত আসিয়া চলৎশক্তি হীন হইয়াছিলেন। সেখানে আসিয়া তিনি নাকি কাতরকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, আমি এতদূর মার জন্য আসিলাম, মা কি আমাকে লইতে এতটুকু আসিতে পারিবেন না। প্রবাদ সেই রাত্রির মধ্যেই গঙ্গা তথায় আসিয়াছিলেন; সেইখানেই তিনি আনন্দভরে পার্থিব দেহ ত্যাগ করেন। এখন বাজিতপুরে গঙ্গার একটী সূক্ষ্ম প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবদিগের ইহা একটী মহাতীর্থ। এইরূপে বিদ্যাপতি মনুষ্যসমাজকে মোহিত করিয়া স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীবিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ।

সকল উকিল তবে করিলা নমস্কার।
পাৎসার হুকুম হৈছে হুজুর জাইবার।
হুকুম মানিআ হুজুর চলিলা সনাতন।
পাৎসার হুজুর গিআ দিলা দরশন॥
হুজুরা করিআ দাড়াইলা সনাতন।
পাৎসা পুছেন বাহিরে রহ কি কারণ॥
এ কথা সুনিআ সনাতন তবে হাসে।
কুন বেটা এমত কথা কহে তুমার পাশে॥
সে জন আমার বৈরী মিথ্যা কথা কহে।
মুকাবিলা হৈলে জানি কেমন মহাশয়ে॥
ঈষৎ হাসিআ পাৎসা কহিলা বচন।
মিথ্যা না কহিয়-কিছু অহে সনাতন॥
তুমার ভাই শ্রীরূপ আছিল প্রিয়পাত্র।
হাগেসা বৈঠক ছিল শয়ন একত্র॥
হেন প্রাণের রূপ প্রিয় গেল জেই দেশে।
হেন বুজি জাইবা তুমি তাহার উদ্দেশে॥
পড়ার মুধা সেক হেবু বাড়ি ফতেপুর।
হাগেসা থাকয়ে সেই পাৎসার হুজুর॥
তাকে বোলাইআ পাৎসা কহে বারবারে।
সনাতন হাহল আজি করিল তুমারে॥
সোণার পাখে ঢাকিআ রাখ পুতা ঘরে।
সাবধানে রাখ জেন জাইতে না পারে॥
এই মত পাৎসার হুকুম হইল তারে।
সনাতন রাখে নিআ বন্দী [কারাগারে]।
পাশে পাশে প্রহরী থাকয়ে অবিরত॥
সপ্ত বৎসর পর্য্যন্ত আছেন এই মত॥
সেক হেবুকে ডাকিআ বলেন সনাতন।
আমাকে [লইয়া] তুমার কুন প্রয়োজন॥
সেক হেবু কহে সাহেব কি বল আমারে।
পাৎসার হুকুম বিনে কে করিতে পারে॥

আমা হৈতে কুন কার্য্য [কর] উপদেশ।
তুমার দুঃখ দেখি মোর তনু হৈল শেষ॥
এ কথা সুনি হাতে ধরি বলে সনাতন।
বন্দি হৈতে তুমি মোরে করহ মোচন॥
পায়ে ধরি সেক হেবু কবে নিবেদন।
কিরূপে করিব আমি বন্দিতে মোচন॥
এ কথার যুক্তি আমি লৈমু কার পাশ।
তুমাকে ছাড়িআ দিলে আমার সর্ব্বনাশ॥
তবে সনাতন বলে ভয় নাহি তব।
ইহার উপদেশ আমি কহি শুন তব॥
এক লক্ষ মুদ্রা আছে দিব আমি তরে।
যদি পাৎসা তলপ করে রাজার দিঅ তারে॥
এই হুকুম বাদিয়া ধন তারে দিআ।
বহু ধন পাইলে পাৎসা দিবেন ছাড়িআ॥
জে আজ্ঞা মাগিআ হেবুক পড়িল পায়ে।
জে হৌক সে হৌক প্রভু আমার উপায়ে॥
ইহা সুনি লক্ষ মুদ্রা দিলা তার হাতে।
ছুড়া হৈয়া সনাতন জায়ে রাজপথে॥
জয় জয় গৌরাঙ্গ বোলি সিংহগতি ধায়।
ব্যাঘ্র ভল্লুক দেখি দূরেতে পালায়॥
দুই প্রহর রাত্রি শেষে গেলা নদীতীরে।
গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ বলি ডাকে উচ্চস্বরে॥
সমুদ্র তরঙ্গ দেখি কান্দে উচ্চরায়ে।
কেমতে হইব পার না দেখি উপায়॥
এই দুঃখ মনে ভাবি রহে কতক্ষণ।
হেন কালে কুম্ভীররাজ দিল দরশন॥
কুম্ভীর দেখিআ তবে আনন্দিত মন।
ঊর্দ্ধবাহু করিআ ডাকেন সনাতন॥
আমারে কর তুমি এই নদী পার।
তুমারে করিব স্মরণ জিব যত কাল॥

সনাতন হুঙ্কার কুম্ভীর মহাবীর।
কূলে আসি উঠি করে সপ্ত প্রদক্ষিণ ॥
সনাতন বলে হরির নাম দিব তরে।
আমার সেবক করি ঘুষিব সংসারে ॥
হরির নাম মহামন্ত্র কর্ণে দিল তার।
তাহার কাছেতে চড়ি নদী হৈলা পার ॥
তিন তিন দিনের পথ জায় এক দিনে।
উন্মত্ত হইআ ধায়ে বাহ্য নাহি মনে ॥
পবনের গতি হৈআ চলে নরেশ্বর।
শুনিলেন গৌরাঙ্গ চান্দ আছে কাশীপুর ॥
নিকটে জাইতে অঙ্গ কাপে থরথর।
দারিদ্রে পাইল জেন পরশ পাথর ॥
দাড়াইঞা অন্তঃপুরে ভাবে মনে মনে।
কিরূপে জাইব আমি প্রভু দরশনে ॥
ফকির ফকির বলি ডাকে সর্ব্বজন।
মহাপ্রভু জানিলা আশিলা সনাতন ॥
অন্তরে উল্লাস বড় পুলক শরীর।
অনেই ডাকিঞা দেখি কেমত ফকির ॥
ফকির ফকির বুলি ডাকে এক জনে।
আহ আহ প্রভু দেখা কর এইক্ষণে ॥
এ কথা শুনিআ তবে হইলা কাতর।
দশনে ধরিআ তৃণ চলিলা গোচর ॥
মহাপ্রভু দেখিআ উঠিলা সেই ক্ষণ।
দণ্ডবত হইআ পড়িলা সনাতন ॥
উঠ উঠ বলিআ করিলা আলিঙ্গন।
চিরদিনে পাইলাম তুমার দরশন ॥
অস্পর্শ পামর মুই অতি বড় হীন।
আমাকে স্পর্শিতে প্রভু নাহি কুন দিন ॥
তবে জে করুণা কর আপনার গুণে।
দেখিলে নিন্দিব সব পাষণ্ডির গণে ॥

এ বুল শুনিতে অশ্রু নয়ান যুগলে।
মুহেন পামর পাপী নাই ক্ষিতিতলে ॥
তুমার চরণে এই করু নিবেদন।
বৃন্দাবনে রূপ সঙ্গে হউক মিলন ॥
প্রভু বলে এ * * লভিব তুমার।
দুই ভাই বৃন্দাবনে করহ বিহার ॥
চান্দমুখে বলে গোরা চল শীঘ্রগতি।
অবিলম্বে পাইবা তুমি সেই নরপতি ॥
আজ্ঞা বলবান করি করিলা গমন।
কালিন্দী যমুনা বলি করিলা স্মরণ ॥
এথা হইতে সনাতন গেলা বৃন্দাবনে।
রূপ সঙ্গে দেখা হৈল ভাণ্ডীর মহাবনে ॥
দেখিঞা শ্রীরূপ গোসাঞি আনন্দিত মন।
দারিদ্রে পাইল জেন পুতাবান্ধা ধন ॥
রূপে কান্দে সনাতনের ধরিঞা চরণ।
এতকাল পরে মোর করিলা স্মরণ ॥
শুনি কোলেত করিলা সনাতন।
না কান্দ না কান্দ ভাই স্থির কর মন ॥
রূপে বলে তুমা সঙ্গ পাইল চিরদিনে।
মহাপ্রভুর বার্ত্তা কহ সনিরে শ্রবণে ॥
তবে সোনাতনে বলে প্রভু কাশীপুরে।
তুমা প্রতি যত কৃপা কত কহিব তারে ॥
সনাতন সঙ্গে রূপ বসি একাসনে।
রাত্রি দিনে কৃষ্ণ কথা আর নাহি মনে ॥
বৃন্দাবনে পরিক্রমা করে দুইজন।
হা হা নিত্য নিত্য বলি করয়ে রোদন ॥
* * * বলি ভূমিতে লুটায়।
অমৃতমঞ্জরী জেন পাষাণে মিলায় ॥
কান্দিতে কান্দিতে দুহে হৈলা অচেতন।
তাহার কান্দনে কান্দে * * * ॥

নানা জাতি পক্ষী কান্দে হেরিঞা বয়ান।
কমল মুদিত হয়ে দেখিআ নয়ান॥
হাহাকার হইল সকল বৃন্দাবন।
পাষাণ ৩. ৪ কান্দে কি কারণ॥
কে জানি কান্দিআ ফিরে যমুনার তীরে।
কেহত ইহার ভাব বুঝিতে না পারে॥

* * * * *

যে দিন যেখানে জায়ে সেইখানে রহে॥
এইমত পরিক্রমা করে দুই জনে।
কথ ক্ষণ পরে আইলা গিরি গোবর্দ্ধনে॥
গোবর্দ্ধন বন্দিআ বসিলা দুই ভাই।
সেই স্থানে জিজ্ঞাসিলা শ্রীরূপ গোসাঞি॥
সুন সুন মহাপ্রভু করি নিবেদন।
কহ দেখি নিত্য কথা করিয়ে শ্রবণ॥
কেমতে বা নিত্য রহে কাহার উপরে।
কাহা হৈতে উদ্ভব হৈল কহত আমারে॥
কুন বর্ণ হয়ে সেই কিসের গঠন।
চন্দ্র সুর্য্যের গতি নাই কিসের কারণ॥
পবনের গতি নাই মনের অগোচর।
কুন গতি পায়ে সেই কহ নরেশ্বর॥
আর এক নিবেদন সুনহ বচন।
স্বাধীন বিজয়ে হয়ে কিসের পতন॥
শ্রীমন্দির কিসে হইতে হইল নির্ম্মাণ।
সুনিবারে চাহি কিছু ইহার বিধান॥
কাহা হৈতে উদ্ভব হইল সেই স্থান।
কথ খানি দীর্ঘ হয়ে প্রস্থ প্রমাণ॥
কোথা হতে জীব সব করে গতাগতি।
সে জন বা হয়ে কোথা তার যেই স্থিতি॥
কিশোরকিশোরী আদি অষ্ট সপ্তগণ।
কাহা হৈতে উদ্ভব হয়ে কহত কারণ॥

এই সকল উক্ত জ হা হৈতে হয়ে।
নাম বর্ণ ভেদ করি কহ মহাশয় ॥
কুন মূর্ত্তি ধরি যেঁ রহে কুন স্থানে।
কৃপা করি কহ মরে শুনিএ শ্রবণে ॥
শুনিআ এ সব কথা গোসাঞি সনাতন।
দুই ভাই গলাগলি করয়ে রোদন ॥
ভাবেত কম্পিত তনু টলমল করে।
সর্ব্বতের জল জেন ভুগে আশি পড়ে ॥
থরথরি করি কাঁপে সর্ব্ব কলেবর।
অচেতন হইআ পড়েন নরেশ্বর ॥
দুই প্রহর অবধি দুহার নাহিক চেতন।
চৈতন্য করিতে জেন নাহি কুন জন ॥
হেন কালে মহাপ্রভু নিজ মূর্ত্তি ধরি।
রূপ সনাতন বলি ডাকযে কুকারি ॥
মধুলোভে অলি রহে পদ্মের ভিতরে।
দুই ভাই রহিলা ডুবি প্রেমের সাগরে ॥
অঙ্গে হস্ত দিআ প্রভু কহে নিত্যকথা।
নিত্যশক্তি তুমার হইব বিজ্ঞ সর্ব্বথা ॥
উঠ রূপ সনাতন উঠহ ত্বরিতে।
নিত্যনির্ণয় কথা কহিব বিদিতে ॥
তুমা হৈতে জীব সব পাইব পরিত্রাণ।
তুমি বিনে কে জানিবে ইহার সন্ধান ॥
এইমত স্বপ্ন দেখি উঠিলা দুই ভাই।
চক্ষু মেলি দেখিলা সেখানে কেয় নাই ॥
হাহাকার করিয়া কান্দেন দুই ভাই।
প্রবোধ দিআ মহাপ্রভু গেলা কুন ঠাই ॥
এইমত বিলাপ করিআ কথো ক্ষণ।
তারপরে নিত্যকথা পড়িল স্মরণ ॥
মহাপ্রভুর আজ্ঞামত অর্থ [illegible]
নিত্যনিরূপণ কথা কহে [illegible] ॥

অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের পরে জেই স্থান।
তাহার অবধি সুন হৈঞা সাবধান ॥
যখনে আছিল সব ঘোর অন্ধকার।
তদবধি নাহি ছিল দিবার প্রচার ॥
চম্পক-কলিকা নাম সুর্য্যের আকার।
সরণি টীকাতে কহে ইসব বিচার ॥
নপুংসক শরীর আপনি একেশ্বর।
কোশ বীজমূর্ত্তি অঙ্গ নবীন সুন্দর ॥
বৈকুণ্ঠের পরাৎপর জেই স্থান হয়।
অখণ্ড মণ্ডল সেই টল নাহি হয়ে ॥
তাহার উপরে আছে গুপ্ত চন্দ্র গ্রাম।
সেই স্থানে আছে এক চম্পককলিকা নাম ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত উষ্ণ এক নাহি হয়ে।
জন্ম জরা মৃত্যু ব্যাধি নাহিক সংশয় ॥
পরম পুরুষ সেই নাহি তার পর।
আদি অন্ত কহিতে না পারে মহেশ্বর ॥
চারি বেদে যার গুণ গণিতে না পায়।
হাহাকার করি ব্রহ্মা কান্দিয়া বেড়ায় ॥
চম্পক-কলিকা নাম চারি বেদের পর।
জে শরীর হৈতে হৈল যুগল কিশোর ॥
সুনিঞা এ সব কথা সনাতনমুখে।
শ্রীরূপে পুছেন তত্ত্ব পরম কৌতুকে ॥
এমত অপুর্ব্ব কথা না সুনিছি আর।
রজনী লভিলা জন্ম কেমত প্রকার ॥
কর্ণে সুনিলে হয়ে হৃদয়ে প্রবোধ।
তিনে এক হৈলে বুঝে মনুষ্য মুগধ ॥
বিনে গর্ভবাসে জন্ম নাহি কুন লোকে।
অযোনিসম্ভবা জন্ম হয়ে কুন রূপে ॥
নাহি সুনি এ সব কথা কুন যুগপুরাণে।
বহুভাগ্যে এ সব কথা সুনিল শ্রবণে ॥

জন্মজন্মান্তরের পাপ জেই জেই লিখন।
খণ্ডিল সকল পাপ তুমার কারণ ॥
ইহা বলি অশ্রু বহে নয়ান যুগলে।
পড়িলা কাতর হৈঞা সনাতনের কোলে ॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে সুয়াস্থ্য না পায়।
ধরি সনাতন পদে ধরণী লুটায় ॥
রূপকে ধরিঞা উঠাইলা সনাতন।
সনাতনে বোলে রূপ স্থির কর মন ॥
সে কথা কহিয়ে সুন অবধান করি।
জেরূপে উদ্ভব হৈলা কিশোরাকিশোরী ॥
এ কথা সুনিআ রূপ যুড় করি হাত।
আজ্ঞা কর কর্ণে সুনি দুঃখ যাউক পাত ॥
যুগলকিশোর পদ করি আরাধন।
উদ্ভবনির্ণয় শ্লোক পঢ়ে সনাতন ॥
চম্পক-কলিকাতত্ত্ব সুন এক মনে।
জেরূপে আছয়ে সেই অখণ্ড ভুবনে ॥
অচেতন যোগনিদ্রা চিরকাল ধরি।
অষ্টবীজে মঞ্জরী অষ্ট সতত বিহারী ॥
ক্লীং শ্রীং দুই বীজ ধরে বাহুমূলে।
চক্ষু মধ্যে জ্যোতি জেন আছএ বিরলে ॥
এক অভিগত সেই কিশোরাকিশোরী।
রূপে রসে ডগমগি আনন্দবিহারী ॥
রূপের ছটা রসে লাগে রসের ছটা রূপে।
দিবস রজনী ভেদ এই অনুরূপে ॥
সনাতন মুখে সুনি এসব বিচার।
ভাবিয়া চিন্তিয়া রূপ পুছে পুনর্ব্বার ॥
কিরূপে রাত্রি হয়ে দিবা কুনরূপে।
কৃপা করি কহ সুনি এসব কৌতুকে ॥
বেদ বিনে শূন্য কথা নাহি জ্ঞানলোকে।
অপূর্ব্ব অমৃত কথা তুমি কহ মুখে ॥

মুখের লাবণ্য দেখি হাসে সনাতন।
এতেক সন্ধান নাহি জানে কুন জন॥
রাত্রি বল দিবা বল সবে দুইজন।
দিবারাত্রির কথা সুন হৈআ একমন॥
পুর্ব্বে জে কহিআছি ঘোর অন্ধকার।
তদবধি নাহি ছিল দিবার প্রচার॥
চম্পক-কলিকানাম আদি তত্ত্ব সাব।
সরণি টীকায় কহে এ সব বিচার॥
বাম ভুজ পানে হয়ে দিবার প্রচার।
দক্ষিণ ভুজ পানে হয়ে ঘোর অন্ধকার।
চতুষ্প্রহর দিবা হয় রাত্রি চাইর প্রহর।
অঙ্গের বরণে হয়ে এই দিবাকর॥
উত্তরের পরিবর্ত্ত দিলা সনাতন।
পুনর্ব্বার রূপে কিছু করে নিবেদন॥
যোগনিদ্রা কারে বলি কেমত প্রকার।
কিরূপে চৈতন্য তবে হইল তাহার॥
এ কথা সুনিতে বাঞ্ছা অতি বড় মনে।
নির্ণয় করিয়া তত্ত্ব কহত আপনে॥
তুমার মুখের জেই সেই তত্ত্ব সার।
তাহার উপরে নাই করিতে বিচার॥
তবে সনাতনে বলে রুহিয়ে তুমারে।
চৈতন্য পাইলা জেই জেই অনুসারে॥
পঞ্চ আত্মা পঞ্চ স্থানে আছে নিয়োজিত।
কার সঙ্গে করে দেখা হয়ে সমুচিত॥
প্রাণের সহিতে প্রাণের না হৈল মিলন।
তদবধি অবধি আছিল অচৈতন্য॥
উদান অপান সমান তিন জন।
এই তিন প্রাণের সনে করায়ে মিলন॥
প্রাণে বলে সুনহ তুমুরা তিনজন।
ধ্যান অচেতন নিদ্রা জায়ে কি কারণ॥

যুড় হস্ত করি তবে কহে তিন জন।
অঙ্গ সঙ্গ করি ধ্যান হয়ে অচেতন ॥
প্রাণনাথ মনে তবে এতেক বিচার।
এমত পাপিষ্ঠ জন আছে কেবা আর ॥
এই মতে আর্ত্তনাদ করি কথক্ষণ।
উদানে ডাকিআ করে আত্ম নিবেদন ॥
মনকে জানায় গিআ এই সমাচার।
আমা হৈতে না হৈল উহার প্রতিকার ॥
উদানে কহিল গিয়া মনের গোচর।
ধ্যান অচেতন দেখি প্রাণ কাতর ॥
ই কথা সুনিলা যদি উদানের মুখে।
করিলা চৈতন্য মনে পরম কৌতুকে ॥
উঠ উঠ ধ্যান তুমি কেবল বর্ব্বর।
তুমার অচেতনে প্রাণ আছেন কাতর ॥
এ বুল সুনিঞা তবে উঠে কাল দিআ।
যোগনিদ্রা হৈল ভঙ্গ চমকিত হৈআ ॥
প্রাণের সহিত হৈল পঞ্চ সহোদর।
রূপে রসে করে নিত্য বাহুর উপর ॥
সুনিয়া এ সব কথা আনন্দ অন্তরে।
কহিবারে চাহে রূপ বচন না সরে ॥
মহাভাবের বরণ সকল কলেবর।
ডুবু ডুবু করে আখি প্রেমের সাগর ॥
বুক বহিয়া ধারা বহে ওষ্ঠ থর থর।
কহিতে না পারে প্রেমে বিভুল অন্তর ॥
দেখিআ এসব রীত গোসাঞি সনাতন।
আপনা পাসর কেনে হৈঞা অচেতন ॥
সুনিআ এসব কথা হেট কৈলা মনে।
পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলা সনাতন স্থানে ॥
কিশোর কিশোরী হয়ে কিশের গঠন।
কুন বর্ণ হয়ে সেই কিশের বসন ॥

কেমত বয়েস তাহান হয়ে কত দিন।
জিজ্ঞাসিতে নহে মর মুই মতি হীন॥
সুনিআ এসব কথা গোসাঞি সনাতন।
ঈষৎ হাসিআ কহে মধুর বচন॥
যদি জিজ্ঞাসিলা মরে কহিয়ে তুমারে।
আপন ভজন কথা না সুনাব আরে॥
তবে কে কহিযে আমি তুমার কারণ।
নিরূপণ তত্ত্ব কথা সুন দিআ মন॥
চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ বয়েস নিয়ম।
ইহার অধিক নাহি কহিলাম মরম॥
রূপে রসে অঙ্গ কান্তি মনুষ্য আকার।
মনুষ্য স্বরূপে করে কৌতুক বিহার॥
নীল পীত বাস দুহে সর্ব্বক্ষণ পৈরে।
মেঘের সহিত যেন বিদ্যুত সঞ্চারে।
এই ত্রিভুবনের মন করয়ে হরণ।
নয়ান ইঙ্গিতে যদি দেখে কুন জন॥
এমত বিনোদ রূপে করে রসের গঠন।
অধর আখি কর পদর কিরণ॥
চূড়ায়ে গালতীর মালা গুঞ্জরে টালনি।
চাচর চিকুর কেশ চূড়ার বলনি॥
পূর্ণৈশ্বর্য্য ধর নয়ানের ছান্দে।
কিশোর তিলক ভালে মধ্যে পূর্ণ চান্দে॥
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে অতি মনোহর।
নাসিকায়ে গজমুক্তা রতন পাথর॥
চরণে নূপুর শুভে গলে বনমালা।
আজানুলম্বিত ভুজ শুভে তাড় বালা॥
পীত বস্ত্রে শ্যাম তনু অতি শোভা করে।
বস্ত্র ছেদি অঙ্গ কান্তি প্রকাশ উপরে॥
ক্ষণে ক্ষণে পীত বস্ত্র উড়ে মন্দ বায়ে।
নব জলধর অঙ্গে লহরী খেলায়॥

এই বর্ণ বস্ত্র বয় কহিল তুমাকে।
ললিত ত্রিভঙ্গ শ্যাম মুরলী অধরে ॥
বীজকে বলিয়ে রস রসের মুর্ত্তি অঙ্গ।
রূপে রসে ডগমগি আনন্দ তরঙ্গ ॥
মূল হৈতে বস হয়ে রসের কলিকা।
রসাবেশে হৈল নাম শ্রীরসকলিকা।
কিশোরী নাম ধরে বয়েস অনুসারে।
ত্রৈলোক্যমোহন হরি তার মন হরে ॥
এমন বরণ অঙ্গ রূপের গঠন।
যদি দেখে ইঙ্গিতে না জিয়ে সেই জন ॥
শত কোটি সূর্য্যের তেজ অঙ্গের বরণ।
ডুবু ডুবু করে রাঙ্গা দুখানি চরণ ॥
নীলপট্ট পরিধান রতন কাচুলি।
পৃষ্ঠেত বিচিত্র বেণী অধর বান্ধুলি ॥
রতন নূপুর পায়ে কেয়ুর ভুজমূলে।
কর্ণে শুভে কর্ণফুল রত্নহার গলে ॥
নাসায়ে বেশর শুভে অধরের কাল।
নয়ানে কাজল শুভে সিন্দুর কপাল ॥
চম্পককলিকা আগে মেলে বাম আখি।
আখির উপরে রূপ কোটি সূর্য্য দেখি ॥
সেইরূপের গঠা হয়ে কিশোরী সুন্দরী।
মন্দ-মন্দ মুখে হাস্য অশেষ মাধুরী ॥
রূপের তুলনা দিতে নাহি কুন খানে।
শত কোটি অংশ কলা পায়ে কুন জনে।
রসের পরাণ রূপ রসের কলিকা।
রসাবেশে হৈল নাম প্রেমচণ্ডিকা ॥
এই ত যুগল রূপ জার চিত্তে থাকে।
জার চিত্ত এক থাকে সেই রূপ দেখে ॥
আপনার সিদ্ধি নাম গুরু বর্গে আর।
বর্ণ বস্ত্র বয়েস জানিয় জার জার ॥

নিত্যের স্বভাব রতি বসাইলা গুরু তারে।
গুরু গৌরব প্রতি সেই ভাব রাখিব অন্তরে॥
আপনে প্রকৃতি হৈআ হইব তার বশ।
মাগিআ লইব তবে তাহার পরশ॥
পরশ রতন হার থাকে জার বুকে।
আনন্দ থাকিব গিআ সেই নিত্য লোকে॥
সনাতনমুখে রূপ সব ভেদ পাইলা।
পুনরপি আর কিছু পুছিতে লাগিলা॥
আজ্ঞা কর সুনি চান্দমুখের মধুরী।
কিরূপে উদ্ভব হৈল অষ্ট মঞ্জরী॥
তাহার অবধি করি কহ সুনি কানে।
অন্ধলেরে চক্ষুদান দেয়ত আপনে॥
সুনিআ এসব কথা গোসাই সনাতন।
কিশোরী কিশোর স্মরি পঠয়ে বচন॥
জে জেখানে হৈতে হৈলা জার উপনীত।
তাহার অবধি কহি সুন দিআ চিত॥
চম্পক-কলিকা হাসি নিরক্ষে কলেবর।
ফুল ফুল ধরিআছে বৃক্ষের উপর॥
চক্ষেতে শ্রীরূপমঞ্জরী অতি গুণবান।
কর্ণেতে শ্রীরতিমঞ্জরী হৈলা উপাদান॥
মুখেতে শ্রীরসমঞ্জরী প্রেমের সন্ধান।
বাহুতে লবঙ্গমঞ্জরী সকল প্রধান॥
কুচেতে শ্রীমঞ্জুলালি মাধুর্য্য বিলাস।
রসস্থানে শ্রীমঙ্গলমঞ্জরী হইলা প্রকাশ॥
নাভিতে স্বরূপমঞ্জরী বৈষ্ণব সেই হয়ে।
শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী গুরু জানিয় নিশ্চয়ে॥
মঞ্জরী উদ্ভব কথা সুনিআ নির্ণয়।
চরণে ধরিআ রূপ করেন বিনয়॥
এমত অপূর্ব্ব কথা নাহি সুনি আর।
মর ভাগ্যে তুয়ার মুখে সুনিল বিচার॥

লবঙ্গমঞ্জরী গুরু কহিলা আপনে।
মনুষ্য শরীরে তানে পাইব কেমনে॥
সনাতনে বলে আমি কহিনে তুমারে।
এক গুরু পরে আর নাহিক সংসারে॥
তবে জে মনুষ্যাকার দীক্ষা উপদেশ।
লবঙ্গস্বরূপ রূপ জানিয় বিশেষ॥
গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি না করিহ নরে।
লবঙ্গ স্বরূপে রূপ নিত্য সেবা করে॥
নিত্যের স্বভাব জে রাখয়ে গুরুতরে।
দেহের পতন হৈলে পায় গিআ তারে॥
লবঙ্গস্বরূপে রূপ কৃপাদাতা হয়ে।
ভারাবতারণে সেই গুরু মহাশয়॥
গুরু গোসাঞি কৃপা করি বীজ আরোপিলা।
বীজের মূর্ত্তি রাধাকৃষ্ণ তারে দেখাইলা॥
অতএব বর্ণবয়েস রাখিআ হৃদমাঝে।
স্বভাব স্বরূপে তারা রাধাকৃষ্ণ ভজে॥
দেহের স্বভাব তেজি করাইলা উপদেশ।
প্রকৃতি গোপীর ভাব বসাইলা বিশেষ॥
সেই ভাব মনে করি রহে সর্ব্বক্ষণ।
গুরু গোসাঞি আজ্ঞা সদা করয়ে পালন॥
গুরু শিষ্য দুই দেহ এক কলেবর।
গুরু আজ্ঞা শিষ্য হয় নহে ভিন্ন পর॥
সুনিআ এসব কথা সনাতন মুখে।
পুনরপি আর কিছু পুছিলা শ্রীরূপে॥
স্বরূপমঞ্জরী বৈষ্ণব বলিলা আপনে।
মনুষ্য শরীরে তানে পাইব কেমনে॥
তবে কহে সনাতনে সুন দিআ মন।
যে ভাবে পায়েন জীব বৈষ্ণব সেবন॥
স্বরূপ রূপ সেই পরম ইষ্ট হয়ে।
পরাপর পরম বৈষ্ণব সে হয়ে॥

সেই ভাব অনুসারে বন্দী ভক্তগণ।
ভক্তগণ পদধূলি মস্তকে ভূষণ॥
নিত্যগুরু পরিচয়ে জাহা হৈতে হয়ে।
চক্ষুদান তাহা হৈতে শিক্ষাগুরু কয়ে।
দীক্ষাগুরু হৈতে জানে সেবার বিধান।
প্রকৃতি স্বভাব হৈয়া দেয়ে চক্ষুদান॥
দীক্ষা শিক্ষা নিত্য গুরু বৈষ্ণব পরিচয়।
বস্তু এক মূর্ত্তি তিন রাখিয় হৃদয়॥
এই কথা শুনিআ রূপ দণ্ডবত করে।
মঞ্জরীর বর্ণ বস্ত্র পুছে তার পরে॥
তবে সনাতনে বলে জে পুছিলা মরে।
তাহার নির্ণয় আমি কহিয়ে তুমারে॥
সমান বয়েস সভার একই স্ব স্ব বরণ।
এক দিনে উদ্ভব হইল এ সকল॥
বর্ণ বস্ত্র বয়েস জাহার জেই হয়ে।
তাহার অবধি কহি শুন মহাশয়ে॥
শ্রীরূপমঞ্জরীর বয়েস তের হয়ে।
সোণার বরণ অঙ্গ জানিয় নিশ্চয়॥
পারিজাত পুষ্পের বরণ বস্ত্র পেন্ধে।
নিরন্তর দুহার চরণ সেবা করে॥
শ্রীরসমঞ্জরীর বয়েস তের হয়ে।
কুঙ্কুম অঙ্গের বর্ণ জানিয় নিশ্চয়ে॥
রক্ত রেখা শ্রীগঙ্গাজল ক্ষীরদ সাড়ি পেরে।
সুবর্ণ ঝারিতে দুহার জল সেবা করে॥
শ্রীলবঙ্গমঞ্জরীর বয়েস তের হয়ে।
সিন্দুর বরণ অঙ্গ জানিয় নিশ্চয়॥
রক্ত রেখা পট্টবাস গঙ্গাজল সাড়ি পেবে।
নিরন্তর দুহার কর্পূর সেবা করে॥
শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর বয়েস তের হয়ে।
গৌরবর্ণ অঙ্গ তার এইত নির্ণয়ে॥

জবা পুষ্প তুল বস্ত্র সর্ব্বক্ষণ পৈরে ।
নিরন্তর দুহার ব্যজন সেবা করে ॥
শ্রীমঞ্জুলালির বয়েস তের হয়ে ।
হরিতাল অঙ্গের বর্ণ এইত নির্ণয়ে ॥
হিঙ্গুল বরণ বস্ত্র সর্ব্বক্ষণ পৈরে ।
ঘৃত আদি শর্করা ভক্ষণ সেবা করে ॥
শ্রীমঙ্গলমঞ্জরীর বয়েস তের হয়ে ।
রবির কিরণ অঙ্গ এইত নির্ণয়ে ॥
কুঞ্জকেলি পুষ্পের বরণ বস্ত্র পৈরে ।
নিরন্তর দুহার চামর সেবা করে ॥
এই জে কহিয়ে তুমা না করিঅ আন ।
এই সপ্ত মঞ্জরী শ্রীরাধিকার প্রাণ ॥
শ্রীরূপে পুছেন পুন সর্ব্বস্ব সংগ্রামে ।
সাধ্য বস্তু সাধন এই জানিব মরমে ॥
সমুদ্র মথনে জেন উপজিল চন্দ্র ।
[illegible] আদি করি সভার আনন্দ ॥
অন্ধকার দূরে গেল হইল দীপ্তিমান ।
ধরণী শীতল হইল স্বর্গে হৈল স্থান ॥
তথা কান্তি এথা দীপ্তি হইল উদয়ে ।
এমত একান্ত ভাব রূপের হৃদয়ে ॥
সকল গোচর আছে নিজ মানের কুনে ।
সাধ্য সাধন এই জানিয় আপনে ॥
নিত্য স্বভাব ভাব দেখি সনাতন ।
রূপকে ধরিআ পুন কৈলা আলিঙ্গন ॥
তুমার অভিপ্রায়ে লভিল সেই জন ।
এই সে কারণে তোমার এথা আগমন ॥
যোগশাস্ত্র বিচারিআ না পায়ে কখন ।
একবারে পাইলা তুমি পরম নিধন ॥
তবে রূপে বলে হৈল আমার উপায় ।
পাইলাম পরম তত্ত্ব তুমার কৃপায় ॥

পূর্ব্বে যে কহিআ আছি স্থান নিরূপণ।
তদবধি সুনিতে আছয়ে মর মন ॥
সেই কথা স্মৃতি করি কহে সনাতন।
যেমতে করিলা সেই স্থানের গঠন।
জিহ্বারসে জন্মিলা শ্রীমধুকর্ণিকা।
ষড় ভুজ হইলা সুবর্ণ কলিকা ॥
চম্পককলিকা কহে চাইআ তার পানে।
দ্বার মন্দির ঘর করিলা আপনে ॥
সুনিআ এসব কথা হরষিত মনে।
আমা হেন ভাগ্যবান নাহি কুন খানে ॥
এই অঙ্গীকার যদি হয়ে তুমার মনে।
আমাকে ইহার বর্ণ জানায় আপনে ॥
যে তুমি করিয় স্মরণ আপনার গুণে।
সিদ্ধি কল্পতরু নাম ধরহ আপনে ॥
জতেক কহিলা প্রভু আপনার গুণে।
কহিবা সকল কথা সুনিয়ে শ্রবণে ॥
কেবল করুণাসিন্ধু তুমি দয়া নিয়ে।
জখনে জে উদ্ধারিলা তাহা যেন হয়ে ॥
এই মতে নিবেদন করি বারে বার।
সিদ্ধিকল্পতরু তুমি মহিমা অপার ॥
অশেষ ভকতি করি করিলা নমস্কার।
শ্রীমধুকর্ণিকা হৈলা বল মা আকার ॥
ভাগ্য করি মানিলা হরষিত মনে।
বক্ষস্থলে সে নিত্য স্থান করিলা আপনে ॥
ষড় ভুজ ষটের আপনে হৈলা নীর।
অঙ্গের বরণ করিলা শ্রীমন্দির।
প্রহর পঞ্চাশ কোটি দীর্ঘ পরিসর ॥
স্থানের প্রমাণ এই নাহি জানে পর ॥
এক প্রহরর পথ প্রমাণ মন্দির।
চতুর্দ্দিকে শুভা করে কনক প্রাচীর ॥

কল্পতরু চারি ধারে পুষ্প ধরে থরে।
বট্টকর মধ্যে সপ্তদল মন্দির ভিতরে॥
মণ্ডলের মধ্যেতে রতন সিংহাসন।
সপ্তদল মধ্যে নিজা করিলা স্থাপন॥
নানা জাতি পুষ্প দিয়া রচিত উপরে।
সৌরভে মুহিত সব মন্দির ভিতরে॥
তাহাতে বিরাজ করে কিশোরা কিশোরী।
সপ্ত দলে সপ্ত সেবা সপ্ত মঞ্জরী॥
কতেক কহিব তার অশেষ চাতুরী।
নানা রঙ্গ বিলাস ভুঞ্জে কতেক মাধুরী॥
ঐশান্ত দলে স্থিতি শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী।
সভায়ে করেন গান অতি গুণধারী॥
পূর্ব্বদলে করে স্থিতি শ্রীরূপমঞ্জরী।
তপ্ত বাদ্যে করে গান অতি মনুহারি॥
অগ্নিদলে করে স্থিতি শ্রীরসমঞ্জরী।
মন্দিরা লৈয়া করে গান অশেষ মাধুরী॥
দক্ষিণের দলে স্থিতি করে অনঙ্গমঞ্জরী।
রসমণ্ডলে গান করেন নৃত্য করি॥
পশ্চিমের দলে স্থিতি শ্রীরসমঞ্জরী।
দুহু মুখ হেরি গান পিনাকবস্ত্রধারি॥
নৈঋত দলে স্থিতি শ্রীস্বরূপমঞ্জরী।
বীণাযন্ত্রে করে গান হয়ে শুক শারী॥
শ্রীমঞ্জুআলি করে স্থিতি উত্তরের দলে।
কপিলা সে গান করে অতি কৌতুহলে॥
সপ্তস্বরে করে গান সপ্ত মঞ্জরী।
শুনিয়া আনন্দ বড় কিশোরা কিশোরী॥
এইরূপে রসে গান করে নিরন্তর।
সভার অগোচরে স্থান নাহি তার পর।
এই মত প্রাণ গোলোক নিত্য স্থান।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব না পায় ইহার সন্ধান॥

গুহ্যের অধিক গুহ্য এই স্থান হয়ে।
অপ্রকাশ্য মহানিধি প্রকাশ্য জে নয়ে॥
আনন্দ হইঞা বলে শ্রীরূপ গোসাঞি।
আমা হেন ভাগ্যবান আর কেয় নাই॥
আজি হেতে হৈল মর সাফল্য জীবন।
নিত্য বিলাস কথা সুনিয়া মরম॥
আর এক কথা মোর পড়িআছে মনে।
কৃপা করি কহ মরে সুনিয়ে শ্রবণে॥
কিশের উপরে হয়ে এই বৃন্দাবন।
তাহার অবধি করি কহত আপন॥
তবে সনাতনে বুলে কহিয়ে তুমারে।
না কহিয় কার ঠাই রাখিঞ অন্তরে॥
পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চারি কায়ে।
দিক মধ্যে বৃন্দাবন কবু নাহি হয়ে॥
দিক মধ্যে দিক নয় ঐশান্য কুন।
সেই কুন মধ্যে তবে হয়ে বৃন্দাবন॥
সূর্য্যের কুমারী হয়ে কালী বিম্ব (১) নাম।
কুঞ্জসুখবিলাসিনী (২) অতি গুণধাম॥
লক্ষ বৎসর তবে করিয়া কামনা।
কৃষ্ণ সঙ্গ পাইআ নাম হৈল যমুনা॥
ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন যমুনা নাভিস্থলে।
অষ্ট ক্রোশ হয়ে তার বাহু অন্তরে॥
ষোল ক্রোশ মধ্যে হয়ে পদ্ম ষষ্টদল।
তাহার বাহু অষ্ট ক্রোশ মোক্ষফল॥
অষ্ট ক্রোশ মধ্যে হয়ে নিভৃত বৃন্দারন।
তাহে অষ্টকুঞ্জ করে নিত্য সখীগণ॥
তাহার মধ্যে চারি ক্রোশ নিকুঞ্জ মন্দির।
মলয়া পবন তাহে বহে ধীর ধীর॥

---

(১) কালিন্দীশ্বরী নাম। (২) কৃষ্ণসুখবিলাসিনী।
জেসোর পুঁথি মতে পাঠ; শেষ প্রবন্ধ দেখ।

চৌআরি রচন হয়ে নিকুঞ্জ বলি তারে
চারি কল্পতরু তার হয়ে চারি দ্বারে ॥
নিকুঞ্জ ভিতরে হয়ে পদ্ম অষ্টদল।
রতন সিংহাসন শুভে তাহার উপর।
কুসুমে রচিত শয্যা তাহার ভিতর।
তাহাতে বিরাজ করে কিশোরী কিশোর ॥
নিত্য শক্তি সেই দলে সপ্তমঞ্জরী।
নিত্য আনন্দময়ে হয়ে শুক শারী ॥
সনাতন মুখে শুনি এতেক বিচার।
আনন্দে করেন নৃত্য হরিষ অন্তর ॥
হরি হরি শব্দ করি গগন পরশে।
ধরণি লুটায়ে কেনে ভাবের আবেশে ॥
ক্ষণে সনাতন পদধূলি লয়ে বুকে।
পদধূলি লইআ মাখে চান্দমুখে ॥
এমত উন্মাদ দেখিআ সনাতন।
রূপকে ধরিআ করে পুন আলিঙ্গন ॥
[illegible] কহে কানে কানে।
[illegible] ব্যক্ত করে কানে।
তবে [illegible] মনে করি সার।
কুঞ্জের বর্ণ ভেদ পুছেন পুনর্ব্বার ॥
কুন কুঞ্জ কুন দিগে কুন বর্ণ তার।
কৃপা করি কহ শুনি এসব বিচার ॥
কুন সখী কুন কুঞ্জে সদা বাস করে।
কুন বর্ণ কুন বয়েস কুন বস্ত্র পরে ॥
এতেক শুনিআ তবে রূপের বচন।
কুঞ্জের বর্ণ ভেদ শ্লোক পড়ে সনাতন ॥
ঐশান্তি কুনেতে হয় মেঘের বরণ।
নানা জাতি পুষ্প তাহে করয়ে শোভন ॥
মদন সকতা নামে কারুণ্য কল ধরে।
বিশাখা ঠাকুরাণী তাহে বাস করে ॥

চৌদ্দ বৎসর অষ্ট মাস তাহার বয়েস।
শিখিপুচ্ছ বসন মোটন বান্ধা কেশ॥
বিদ্যুতের বর্ণ অঙ্গ ঝলমল করে।
নিরক্ষিতে নারে কেহ রূপে আখি ভরে॥
মেঘের সহিতে জেন বিদ্যুত সঞ্চারে।
বস্ত্র অলঙ্কার আদি এই সেবা করে॥
বিশাখা স্বরূপে হয়ে লবঙ্গমঞ্জরী।
একরূপ একমুখ লখিতে না পারি॥
দুহার মিলন সুখে এক কুঞ্জে বাস।
নানান কৌতুকে করে হাস্য পরিহাস॥
পূর্ব্বদিকে নন্দাখ্যা কুঞ্জ অতি সুভা করে।
কত কালা কত ধলা কুঞ্জের ভিতরে॥
নানাবর্ণে চিত্র যেন করে চিত্রকারে।
কুঞ্জের মাধুরী দেখি নয়ান না ফিরে॥
চিত্রদেবী করে বাস তাহার ভিতরে।
সুখের অবধি নাহি আনন্দ অন্তরে॥
তাহান বয়েস এহি নিয়সে কুঁ[illegible]
চতুর্দ্দশ সপ্ত মাস আর [illegible]
কিশোরে লবঙ্গমালা [illegible]
অন্তরে আনন্দ হৈআ এই সেবা করে॥
শ্রীরূপমঞ্জরী করে সেই কুঞ্জে বাস।
নানা রঙ্গকৌতুকে হাস্য পরিহাস॥
পূর্ণ ইন্দু কুঞ্জের নাম অগ্নি কুনে ধরে।
পূর্ণিমার চন্দ্র জেন অন্ধকার হরে॥
চাহিতে শীতল করে তাপ জায় দূরে।
চম্পকলতা ঠাকুরাণী তাহে বাস করে॥
চতুর্দ্দশ সপ্ত মাস বিংশতি দিবস।
তাহার নিয়ম এই কহিল বয়েস॥
চম্পক পুষ্পের বর্ণ সেই কলেবর।
চাম্পা পুষ্পের বর্ণ বস্ত্র পৈরে নিরন্তর॥

বর্ণ বস্ত্র বেষস সে জে প্রেমরসভরে।
আনন্দ উল্লাসে চন্দন সেবা করে ॥
চম্পক লতার প্রাণ শ্রীরতিমঞ্জরী।
এক কুঞ্জে করে বাস অশেষ চাতুরী ॥
দক্ষিণে চম্পকবৃক্ষ অতি শোভা করে।
কুঞ্জের মাধুরী দেখি নয়ান না ফিরে ॥
শারী শুকে করে গান কুঞ্জের আশ পাশ।
রঙ্গদেবী হরষিতে সেই কুঞ্জে বাস ॥
চতুর্দ্দশ সপ্ত মাস আর তিন দিন।
পদ্মকিঞ্জল্ক বর্ণ এই তার চিহ্ন ॥
রঙ্গণ পুষ্পের বরণ বস্ত্র পৈরে নিরন্তরে।
হেরিআ দুহার মুখ চামর সেবা করে ॥
রঙ্গদেবীর প্রাণ সখি স্বরূপমঞ্জরী ॥
এক কুঞ্জে করে বাস আনন্দবিহারী।
নৈঋত কুনে শ্যাম কুঞ্জ শ্যাম বর্ণ ধরে।
সুদেবী ঠাকুরাণী তাহে বাস করে ॥
চতুর্দ্দশ সপ্ত মাস চৌদ্দদিন আর।
বয়েস নির্ণয় এহি কহিল তাহার ॥
চন্দ্রের বরণ অঙ্গ জানিহ উহার।
অরুণ বসন পৈরে কটির সাঝার ॥
জল সেবা করে সেই ঝারি লৈয়া হাতে।
দুহার মুখ হেরি সদা আনন্দ অন্তরে ॥
কস্তুরীমঞ্জরী করে সেই কুঞ্জে বাস।
হাস্যরসে আনন্দিত পরম উল্লাস ॥
পশ্চিমেত কুঞ্জ এক অনুবর্ণ ধরে।
ললিতা ঠাকুরাণী তাহাতে বাস করে ॥
চতুর্দ্দশ অষ্টমাস সাত দিন আর।
বয়েস নির্ণয় এহি কহিল তাহার ॥
কুঙ্কুম অঙ্গের বর্ণ শুক্লবস্ত্র পৈরে।
মনের আনন্দে সেই পুষ্প সেবা করে ॥

সেই কুঞ্জে করে বাস অনঙ্গমঞ্জরী।
কত বা কহিব তার রূপের মাধুরী॥
উত্তরে অনঙ্গকুঞ্জ অম্বুজ বর্ণ ধরে।
ইন্দুরেখা ঠাকুরাণী তাহে বাস করে॥
চতুর্দ্দশ সপ্ত মাস সাত দিন আর।
বয়েস নির্ণয় এহি কহিল তাহার॥
হরিতাল অঙ্গের বর্ণ তাহে শুভা করে।
দাড়িম্ব পুষ্পের বর্ণ বস্ত্র সদা পরে॥
শ্রীমঞ্জুলালি করে বাস তাহার ভিতরে।
দুই জন এক প্রাণ ভিন্ন দেহ ধরে॥
বর্ণভেদ কুঞ্জনির্ণয় কহিল তুমারে।
এই সব কুঞ্জের নির্ণয় রাখিব অন্তরে॥
অষ্ট সখী অষ্ট বর্ণ অষ্ট সেবা করে
অষ্ট বর্ণ অষ্ট বস্ত্র অষ্ট সখী পরে॥
অষ্ট বয়েস অষ্ট সখী যার যত দিন।
বর্ণভেদ রাখিয় মনে জার যত দিন॥
সখী প্রাণ মঞ্জরী অষ্ট কহিল তুমারে।
এতেক সুনিআ রাখ হৃদয় মাঝারে॥
নিত্য স্থানে মঞ্জরী স্থিত সখী বৃন্দাবন।
মূর্ত্তি অথবা রস করে আস্বাদন॥
সাধকে সুনিয়া কানে রাখিব নয়ানে।
বিনে গুরু উপদেশে না জানে কুন জনে॥
সাধ্য বস্তু সাধন বিনা আর নাহি হয়ে।
সাধ্য সাধন যত এইত নিশ্চয়॥
সাধ্য বস্তু সাধন এই কহিল তুমারে।
ইহার অধিক নাহি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে॥

সমাপ্ত।

চম্পক-কলিকা পুস্তিকা বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সংগৃহীত হস্তলিখিত পুঁথি অবলম্বনে প্রকাশিত হইল। হস্তলিখিত পুঁথির আট খানি পাতা। প্রথম ও অষ্টম পত্রের কেবল এক পিঠে লেখা। প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের কোণে দুই জায়গায় পুঁথি ছিন্ন। অক্ষর মোটের উপর স্পষ্ট; দুই এক স্থানে কালী উঠিয়া গিয়া অস্পষ্ট ও অপাঠ্য হইয়াছে মাত্র।

পুস্তকের শেষে ভিন্ন হস্তাক্ষরে ভিন্ন কালীতে লিখিত আছে "সাকিম্ মালিক শ্রীকিশর দাস সাকিন ডৌআদিগ মৌজে লুহারপাড়া ইতি সন ১২৫২ বাং।" পুঁথির কাগজের অবস্থা দেখিয়া পুঁথির বয়স তদপেক্ষা প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়।

গ্রন্থের নাম, গ্রন্থ রচয়িতার নাম ও রচনাকালের নাম গ্রন্থ মধ্যে কোথাও নাই। প্রত্যেক পাতার উপরের বাম কোণে গ্রন্থের নাম চম্পক-কলিকা লিখিত আছে। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় দেখিয়া ইহাকে কোন বিশেষ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বলিয়া বোধ হয়। কোন্ সম্প্রদায়ের গ্রন্থ পণ্ডিতেরা বিচার করিবেন। গ্রন্থের ভাবার্থ সাধারণের পক্ষে সহজে অধিগম্য নহে। সহজিয়া প্রভৃতি তান্ত্রিক বৈষ্ণব মতের একটু আভাস পাওয়া যায়। যাহাই হউক এই শ্রেণীর গ্রন্থের প্রচার বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাস সঙ্কলনে সাহায্য করিবে।

বাঙ্গালার হস্তলিখিত পুঁথির সাধারণ নিয়মানুসারে এই পুঁথিতেও বর্ণশুদ্ধির অভাব। কোন্ কোন্ স্থলে বর্ণাশুদ্ধি লিপিকারের বা গ্রন্থকারের অনভিজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন, তাহার নির্ণয় দুরূহ। মোটের উপর ক্রিয়াপদ ও সর্ব্বনাম পদগুলির বানান পুঁথির মধ্যে যথাদৃষ্ট তথা মুদ্রিত হইল। অন্যান্য স্থানে বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত বর্ণবিন্যাস পদ্ধতি অনুসারে সংশোধন করা গেল। দুই একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক।

সনাতন পুঁথির মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্র সোনাতন, কুত্রাপি বা সুনাতন হইয়াছেন। আমরা সনাতনত্ব বজায় রাখিলাম।

দেবী, মঞ্জরী, মালতী, সখী, ঠাকুরাণী, মাধুরী প্রভৃতি ঈকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ প্রায় সর্ব্বত্রই ইকারান্ত লিখিত আছে; এখানেও সংশোধন করা গেল।

ওকার বহুস্থলে উকারে পরিণত হইয়াছে। যথা শোভা=সুভা, মোহন=মুহন, সোহন=মুহন, লোক=লুক, কোল=কুল, সোণা=সুনা, কোণ=কুন, মনোহর=মনুহর। ওকারের এই পরিণাম বৈয়াকরণগণের চিন্তার বিষয়। সর্ব্বত্র সংশোধন করি নাই।

বয়েস, নয়ান, দারিদ্র, মলয়া পবন প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ সংশোধন না করিয়া মুদ্রিত করা গিয়াছে।

গ্রন্থ মধ্যে কয়েক স্থলে তথাহি পূর্ব্বক সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিবার চেষ্টা আছে। উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকগুলি লিখিতে লিপিকারের সাহসে কুলায় নাই। তিনি সেই সেই স্থলে তথাহির পর ফাঁক দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। একস্থলে [illegible]

পূর্ব্বক একটি সংস্কৃত শ্লোক লিখিত হইয়াছে; কিন্তু বর্ণবিন্যাসগুণে তাহার অর্থগ্রহ ও পাঠোদ্ধার অসাধ্য। পত্রিকা-সম্পাদক।

বাঙ্গলা শব্দদ্বৈত।

ব্রুগ্‌মান্ তাঁহার ইণ্ডো-জর্ম্মাণীয় ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণে লিখিতেছেন একই শব্দকে দুই বা ততোধিকবার বহুলীকরণ দ্বারা পুনর্বৃত্তি (repetition), দীর্ঘকাল-বর্ত্তিতা, ব্যাপকতা অথবা প্রগাঢ়তা ব্যক্ত করা হইয়া থাকে। ইণ্ডো-জর্ম্মাণীয় ভাষার অভিব্যক্তি দশায় পদে পদে এইরূপ শব্দদ্বৈতের প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইণ্ডোজর্ম্মাণ ভাষায় অনেক দ্বিগুণিত শব্দ কালক্রমে সংযুক্ত হইয়া এক হইয়া গেছে; সংস্কৃত ভাষায় তাহার দৃষ্টান্ত, মর্ম্মর, ঘর্ঘর (ঘড়া, জল শব্দের অনুকরণে), গদ্‌গদ, বর্ব্বর (অস্পষ্টভাষী), কঙ্কণ। দ্বিগুণিত শব্দের এক অংশ ক্রমে বিকৃত হইয়াছে এমন দৃষ্টান্তও অনেক আছে; যথা কর্কশ, কঙ্কর, ঝঞ্ঝা, বন্ধুর (ভ্রমর), চঞ্চল।

অসংযুক্ত ভাবে দ্বিগুণীকরণের দৃষ্টান্ত সংস্কৃতে যথেষ্ট আছে, যথা, কালে কালে, জন্মী-জন্মনি, নব নব, উত্তরোত্তর, পুনঃ পুনঃ, "পীত্বা-পীত্বা," যথা যথা, যদ্‌যৎ, অতঃঅতঃ, প্রিয়ঃ-প্রিয়, সুখ-সুখেন, পুঞ্জপুঞ্জেন।

এই দৃষ্টান্তগুলিতে হয় পুনরাবৃত্তি, নয় প্রগাঢ়তার ভাব ব্যক্ত হইতেছে।

যত দূর দেখিয়াছি তাহাতে বাঙ্গালায় শব্দদ্বৈতের প্রাদুর্ভাব যত বেশি, অন্য আর্য্য ভাষায় তত নহে। বাঙ্গলা শব্দদ্বৈতের বিধিও বিচিত্র; অধিকাংশ স্থলেই সংস্কৃত ভাষায় তাহার তুলনা পাওয়া যায় না।

দৃষ্টান্তগুলি একত্র করা যাক্। মধ্যে মধ্যে, বারে বারে, পরে পরে, পায় পায়, পথে পথে, ঘরে ঘরে, হাড়ে হাড়ে, কথায় কথায়, ঘণ্টায় ঘণ্টায়—এগুলি পুনরাবৃত্তিবাচক।

বুকে বুকে, মুখে মুখে, চোখে চোখে, কাঠে কাঠে, পাথরে পাথরে, মানুষে মানুষে—এগুলি পরস্পর সংযোগবাচক।

সঙ্গে সঙ্গে, আগে আগে, পাশে পাশে, পিছনে পিছনে, মনে মনে, তলে তলে, পেটে পেটে, ভিতরে ভিতরে, বাইরে বাইরে, উপরে উপরে—এগুলি নিয়তবর্ত্তিতারাচক। অর্থাৎ এগুলিতে, সর্ব্বদা লাগিয়া থাকার ভাব ব্যক্ত করে।

চলিতে চলিতে, হাসিতে-হাসিতে, চলিয়া চলিয়া, হাসিয়া হাসিয়া—এগুলি দীর্ঘকালী-নতাবাচক।

অল্প অল্প, অনেক অনেক, নূতন নূতন, ঘন ঘন, টুক্‌রা টুক্‌রা—এগুলি বিভক্ত বহুলতা-বাচক। "নূতন নূতন কাপড়" বলিলে প্রত্যেক নূতন কাপড়কে পৃথক করিয়া দেখা হয়। "অনেক অনেক লোক" বলিলে লোকগুলিকে অংশে অংশে ভাগ করা হয়, কিন্তু শুদ্ধ "অনেক লোক" বলিলে নিরবচ্ছিন্ন বহু লোক বোঝায়।

লাল লাল, কালো কালো, লম্বা লম্বা, মোটা মোটা, রকম রকম—এগুলিও পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর। লাল লাল ফুল বলিলে ভিন্ন ভিন্ন অনেকগুলি লাল ফুল বুঝায়।

যাকে যাকে, যেমন যেমন, যেখানে যেখানে, যখন যখন, যত যত, যে যে, যারা যারা —এগুলিও পূর্ব্বোক্তরূপ।

আশায় আশায়, ভয়ে ভয়ে—এ দুইটিও ঐ প্রকার। আশায় আশায় অর্থ প্রত্যহ এই আশা হইতেছে; ভয়ে ভয়ে আছি অর্থাৎ বারংবার ভয় হইতেছে। অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে পৃথক্ পৃথক্ ক্ষণে আশা বা ভয় উদ্রেক করিতেছে।

মুঠো মুঠো, কুড়ি কুড়ি, বস্তা বস্তা—এগুলিও পূর্ব্বানুরূপ।

টাট্‌কা-টাট্‌কা, গরম-গরম, ঠিক-ঠিক—এগুলি প্রকর্ষবাচক।

টাটকা-টাট্‌কা বলিলে টাট্‌কা শব্দকে বিশেষ করিয়া নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

চার-চার, তিন-তিন এগুলিও পূর্ব্ববৎ। চার চার পেয়াদা আসিয়া হাজির, অর্থ নিতান্তই চারটে পেয়াদা বটে।

গলায় গলায় (আহার), কানে কানে (কথা)—ইহাও পূর্ব্ব শ্রেণীর; অর্থ গলা পর্য্যন্ত পূর্ণ; কানাকানি নিকটে গিয়া কথা। "হাতে হাতে" (ফল, প্রাপ্তি) বোধ করি স্বতন্ত্রপ্রকার। বোধ করি তাহার অর্থ এই, যে, যেমনি হাত দিয়া কাজ করা, অমনি সেই হাতেই ফলপ্রাপ্ত হওয়া, যে হাতে চুরি করা সেই হাতেই ধৃত হওয়া।

নিজে নিজে, আপনি-আপনি, তখনি তখনি—পূর্ব্বানুরূপ। অর্থাৎ বিশেষরূপে নিজে, আপনিই—অন্য কেহই নহে, বিলম্বমাত্র না করিয়া তৎক্ষণাৎ। "সকাল-সকাল" শব্দও বোধ করি এই জাতীয়, অর্থাৎ নিশ্চয়রূপে দ্রুতক্ষণে সকাল।

জ্বল্ জ্বল্, চুব্ চুব্, ঘুম্-ঘুম্, টল্ টল্, নড়্-নড়্ এগুলি জ্বলন, চূর্ণন, ঘূর্ণন, টলন, নর্ত্তন শব্দজাত; এগুলিতেও প্রকর্ষভাব ব্যক্ত হইতেছে।

বাঙ্গলা অনেকগুলি শব্দদ্বৈতে দ্বিধা, ঈষদূনতা, মৃদুতা, অসম্পূর্ণতার ভাব আছে, যথা:—

ঝাপ্‌সা, উঠি উঠি।

মেঘ-মেঘ, রাঙ্গা-রাঙ্গা, শীত-শীত, রাগ-রাগ, সব্-সব্, পড়-পড়, ভরা-ভরা, গোঁজা-গোঁজা, ভিজে ভিজে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা, কাঁদ-কাঁদ, হাসি-হাসি।

মানে-মানে ভাগো-ভাগো শব্দের মধ্যেও এই ঈষদূনতার ভাব আছে। মানে মানে পলায়ন অর্থে, মান প্রাণ রক্ষা করিয়া পলায়ন। ভাগ্যে ভাগ্যে রক্ষা পাওয়া অর্থ যেটুকু ভাগ সূত্রে রক্ষা পাওয়া গেছে তাহা অতি ক্ষীণ।

খেড়্-খেড়্ (খেলা), চোর-চোর (খেলা), এই জাতীয়। অর্থাৎ সত্যকার চোর নহে, তাহারি নকল করিয়া খেলা।

এইরূপ ঈষদূনত্বসূচক অসম্পূর্ণভাবসূচক শব্দদ্বৈত বোধ করি অন্য আরো ভাষাতেও

যায় না। ফরাসী ভাষায় এক প্রকার শব্দ ব্যবহার আছে, যাহার সহিত ইহার কথঞ্চিৎ তুলনা হইতে পারে।

ফরাসী চলিত ভাষায় কোন জিনিষকে আদরের ভাবে বা কাহাকেও খর্ব্ব করিয়া লইতে হইলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে শব্দদ্বৈত ঘটিয়া থাকে। যথা me-mere, মে-মেয়ার্, অর্থাৎ ক্ষুদ্র মাতা; মেয়ার্ অর্থে মা, মে-মেয়ার অর্থে ছোট্ট মা, আদরের মা, যেন অসম্পূর্ণ মা। Bete বেট্ শব্দের অর্থ কিন্তু, be-bete বে-বেট্ শব্দের অর্থ ছোট্ট কিন্তু, আদরের কিন্তুটি। অর্থাৎ দেখা যাইতেছে এই দ্বিগুণীকরণে প্রকর্ষ না বুঝাইয়া খর্ব্বতা বুঝাইতেছে।

আর এক প্রকার বিকৃত শব্দদ্বৈত বাঙ্গলায় এবং বোধ করি ভারতীয় অন্য অনেক আর্য্য ভাষায় চলিত আছে, তাহা অনির্দ্দিষ্ট-প্রভৃতি-বাচক। যেমন, জল-টল, পয়সা-টয়সা। জল-টল বলিলে জলের সঙ্গে সঙ্গে আরও যে কটা আনুষঙ্গিক জিনিষ শ্রোতার মনে উদয় হইতে পারে ... সংক্ষেপে সারিয়া লওয়া যায়।

বোঁচ্‌কা-বুঁচকি, দড়া দড়ি, গোলা-গুলি, কাটি-কুটি, গুঁড়া-গাঁড়া, কাগড-চোপড় এগুলিও প্রভৃতি-বাচক বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর অপেক্ষা নির্দ্দিষ্টতর। বোঁচ্‌কা-বুঁচকি বলিলে ছোট বড় মাঝারি এক জাতীয় নানা প্রকার বোঁচ্‌কা বোঝায়, কিন্তু অন্য জাতীয় কিছু বোঝায় না।

মহারাষ্ট্রী হিন্দি প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় অন্যান্য আর্য্যভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ [illegible] ভিন্ন সহিত তত্তৎ ভাষার শব্দদ্বৈত বিধির তুলনা করিলে একান্ত বাধিত হইব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—o—

চম্পক-কলিকা সম্বন্ধে মন্তব্য।

পরিষৎ-পত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত চম্পক-কলিকা পুস্তিকা ছাপান শেষ হইলে উহার আর একখানি হস্তলিপির সন্ধান পাই। জেমো (মুর্শিদাবাদ জেলা কান্দি সবডিবিসন) বিশ্বাসপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর ঘোষ মহাশয়ের নিকট এই দ্বিতীয় পুঁথিখানি পাইয়া বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ের পুঁথির সহিত মিলাইয়া দেখিলাম, উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পাঠভেদ রহিয়াছে। জেমোর পুঁথির আটখানি পাতা, প্রথম পত্রের এক পিঠে, অন্য পত্রের দুই পিঠে লেখা। প্রথম পাঁচ পাতার হস্তাক্ষরের সহিত শেষ তিন পাতার হস্তাক্ষরের মিল নাই। পুঁথির শেষে লেখকের নাম "দিনহিন শ্রীবসময় দাস" লিখিত আছে; নিবাস বা তারিখ কিছুই নাই। মোটের উপর জেমোর পুঁথি আকারে বিশ্বকোষের পুঁথির অপেক্ষা অনেক ছোট; বিশ্বকোষের পুঁথিতে প্রায় সাড়ে সাত শত চরণ পয়ার আছে, জেমোর পুঁথির চরণ সংখ্যা আন্দাজ চারি শত। গ্রন্থারম্ভে সনাতনের কারামোচন ঘটিত উপাখ্যানটা ইহাতে একবারেই নাই; তার পরে স্থানে স্থানে দু ছত্র দশ ছত্রের একবারে

প্রভাব। এইরূপ অনেক ঠেকে বাদ দেওয়ায় জেমোর পুঁথি নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও স্থানে স্থানে খাপছাড়া হইয়াছে। উভয় পুঁথির মধ্যে যে অংশ সাধারণ, তাহা নিকাশিয়া দেখিলাম, পৃষ্ঠা প্রত্যেক ছত্রেই কিছু না কিছু পাঠভেদ রহিয়াছে। মোটের উপর বিবেচনায় কালাচাঁদের পুঁথিই অধিকতর প্রামাণ্য। দুই এক জায়গা হইতে জেমোর পুঁথি হইতে উদ্ধৃত করিয়া উভয়ের প্রভেদ কতকটা বুঝা যাইবে।

(১)

অষ্ট বৎসর আগে রূপ গেলা বৃন্দাবনে।
এথা গোরাস্থি গদাজলের নাহি বাজি দিনে॥
সঘনে লাগিএ নদা স্থির নহে মন।
শ্রীগৌরাঙ্গচরণ সদা করে আরাধন॥
বিরহ বাড়ন মোর করাও মোচন।
তোমা বিনে জানকর্ত্তা নাহি অন্যজন॥
বিষয় বিষের জ্বালা সহনে না যায়।
হৃদয়ে পোড়এ মন কি করি উপায়॥
এই ভাবি রাত্রি দিন সনাতন মনাতন।
অশ্রুধারে নয়ানে বহে বিরস বদন॥
পত্রের স্থানে হৈতে পত্রাইয়া গেলা।
রাধাকৃষ্ণ-অষ্টকালি ভাবে গৌরাঙ্গ ভেটিলা॥
অন্য দেহ গৌরাঙ্গেরলি ধরে সনাতন।
সঙ্গে [illegible] করে রোদন॥
[illegible] ভাইলা ভোলাই॥
সনাতন ভাবে [illegible] তাহাই॥
হরি [illegible] দিল তার।
কৃষ্ণদাস পূর্ণ হৈল নদী হৈল পার॥
দিন দিন উপাসী চন্দ্র একেশ্বর।
ত্রিনিশা গৌরাঙ্গ চন্দ্র আছে কাশীপুর॥

(২)

ওন ওন মহাশয় এই নিবেদন।
[illegible] নির্ণয় যেমন॥
কোন বর্ণ হয় সেই কিসের গঠন।
চন্দ্র সূর্য্য গতাগতি নহে কি কারণ॥
[illegible] হইল নির্ম্মাণ।
[illegible] সেই স্থান॥
[illegible] আদি বস্ত্র পরিধান।
[illegible] যা গমন॥

এ সকল উত্তর তাহা হৈতে হয়।
কোন নাম ধরে সেই গোপ মহাশয়॥

(৩)

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড উপরে যেই ধাম।
তাহার নির্ণয় শুন হঞা সাবধান॥
ধন জীব অন্ন বৃষ্টি সাধনা সম্পদ।
বৈকুণ্ঠে পরাৎপর আদ্যও বিশেষ॥
সবলের উর্দ্ধ আছে নাহি তার সীমা।
অন্ত অন্ত স্থানেতে আছেন হএ গণ্য॥
তার পরে আছে গুপ্ত ত্রিলোকা নামে গ্রাম।
সেইখানে আছেন চম্পককলি নাম॥
চম্পককলিকা নাম ধরি যেহেতু কারণ।
যে শরীর হয় তুলসি নিশির সমতায়॥
রূপে বলে ভগমগি কিশোর কিশোরী।
দুই সখী অষ্ট বর্ষেতে বিহরি॥
চম্পককলিকা নাম ধরি তাহার।
নব পূর্ণ জিনি হয় বর্ণ তাহার॥
বামভাগে পার্শ্বে হয় দিবস নিশি।
দক্ষিণভাগে পার্শ্বে সব অন্ধকার॥
রূপ কহে শুন ভাই আমার বচন।
কিসের উপরে হয় সেই বৃন্দাবন॥
সনাতন বোঝে তুমি চাহ বিচারিতে।
দিব্য নবো বৃন্দাবন কেন দিব্য নয়॥
দিব্য নবো দিব্য নয় ঐশ্বর্য্য তাহে নাই।
সেই কোণ মূল হয় ত্রিলোক [illegible]
সর্ব্বোপরি কুমারী [illegible]
[illegible] বিলাসিনী [illegible]
লক্ষ যোজন বসন [illegible]
কৃষ্ণ সঙ্গ গঙ্গা [illegible] নাম হইল [illegible]

ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন যমুনা নাভিস্থলে।
তার মধ্যে অষ্ট ক্রোশ পদ্মে অষ্টদলে।
অষ্ট ক্রোশ মধ্যে হয় নিভৃত বৃন্দাবন।
তাহে অষ্ট কুঞ্জ করে নিত্য সখীগণ।
তার মধ্যে চারি দিকে নিকুঞ্জ মন্দির।
মলয়া পবন তাহে বহেন সুসির।
তাহাতে বিরাজ করে কিশোরা কিশোরী।
রত্নবেদি শোভা করে অতি মনোহারী।
ঐশান কোণেতে কুঞ্জ মেঘের বরণ।
মদন কুঞ্জ নাম তার পরম মোহন।
নানারাতি ফুল ফল সেই কুঞ্জে ধরে।
বিশাখা সুন্দরী তাহে সদা বাস করে।
শিখিপুচ্ছ বর্ণ বস্ত্র লোটন বান্ধা কেশ।
রূপে গুণে ডগমগি আনন্দ বিশেষ।

(৪)

গ্রন্থ শেষে।

এহি সব সখী যাবে মোহাকার সঙ্গে।
নিরন্তর পরিচর্য্যা করে মোরা রঙ্গে।
কুঞ্জের মাঝারে শয্যা করে মহারঙ্গে।
কুঞ্জের মাঝারে শয্যা বৃন্দায় রচিত।
সভে আসি সেইখানে হব উপনীত।
মদন আসিলে শুতি রহে দুই জন।
নানা বাদ্য নানা গীত গায় সখীগণ।
নানা দ্রব্য ভোজন করায় সখীগণে।
তার শেষ ভোজন করয়ে সখীগণে।
এহি মতে সখীগণ নিত্য সেবা করে।
সখীপ্রাণ মঞ্জরী কহিলাও তোমারে।
নিত্য স্থানে মঞ্জরী স্থিতি সখী বৃন্দাবনে।
সাধকে শুনিবা করে চর্ব্বিত চর্ব্বণ।
উপদেশ গুরু বিনে না জানে অন্য জন।
সাধ্য বস্তু সাধন বিনে সিদ্ধি কিছু নয়।
কৃপা করি কহ যদি সাধু মহাশয়।
সাধ্য বস্তু তত্ত্ব ইহা কহিনু তোমারে।
ইহা ভিন্ন নাহি আর ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।
তদভাবকের মঞ্জরী পরিচয়।
উপাসনা সিদ্ধ এহি কহিনু তোমায়।
মনাগুরুর মুখে রূপ এতেক শুনিয়া।
অষ্টাঙ্গ প্রণাম করে ভূমিতে পড়িঞা।
যোগ পাশে যে বিচারিতে না পারে এগন।
তোমার প্রসাদে আমি পাইলাও নিত্য ধন।
[illegible]
শ্রীরূপ তুলিঞা কৈলা দৃঢ় আলিঙ্গন।

ইতি সনাতন গোসাঞি বিরচিত চম্পকলিকা সমাপ্ত।

এতদ্ভিন্ন জেমোর পুঁথির মাঝামাঝি রূপসনাতনের মধ্যে প্রশ্নোত্তর ছলে নিম্নোদ্ধৃত গদ্যাংশ আছে।

অথ জিজ্ঞাসা। কৃষ্ণলীলা কয় মত: দুই মত: প্রকট. আর অপ্রকট একটি লীলাতে: মথুরাদি গমন: অপ্রকটে বৃন্দাবনে স্থিতি। অবতারী কে; নন্দনন্দন; অবতারী বসুদেব নন্দন। কয় কৃষ্ণ: তিন কৃষ্ণ। কয় রাধা: তিন রাধা। তিন কৃষ্ণ কে কে: বসুদেব নন্দন: নন্দনন্দন: ব্রজেন্দ্রনন্দন। তিন রাধা কে কে: কাম রাধা: প্রেম রাধা: ভাব রাধা। কাম রাধা চন্দ্রাবলী: প্রেম রাধা বৃষভানু নন্দিনী: ভাব রাধা পৌর্ণমাসী। কয় রতি: তিন রতি: সাধারণী. সমঞ্জসা: সমর্থা। অনুগত কয়টি: তিনটি: রাগানুগা: প্রেমানুগা. কামানুগা। কৃষ্ণের কয় শক্তি: তিন শক্তি. অন্তরঙ্গা: বহিরঙ্গা: তটস্থা। ভজনের অধিকারী কয়টি: তিনটি: সাধক সিদ্ধ: প্রবর্ত্তক। আশ্রয় কি: গুরু পাদপদ্ম। অবলম্বন কি: বৈষ্ণব গোসাঞি। উদ্দীপন কি: কৃষ্ণ কথা। দেশ কোথা: বৃন্দাবন নবদ্বীপ। কাল কি: অক্রুর: অথবা কলিকাল। পাত্র কে: শ্রীকৃষ্ণটী অথবা মহাপ্রভু। তিন বাঞ্ছা কি কি ভক্ত ভাব: ভক্ত সঙ্গ: প্রেম আস্বাদন। প্রেমের স্বভাব কি: বাউল। সিদ্ধের উপাসনা কি: কামগায়ত্রী। কামবীজ সাধকের: যুগল মন্ত্র প্রবর্ত্তকের। হরিনামের ধাম কোথা: শ্রীবৃন্দাবন। প্রমাণ কি: বেল ক্রোশ সমাপর্য্য (?) অষ্ট ক্রোশ। কোন মন্ত্রে উপাসনা: যুগল মন্ত্রে। কোন যুগল: রাধাকৃষ্ণ। কৃষ্ণ মন্ত্র কয় অক্ষর: আঠার অক্ষর। মতির রীত অক্ষর। কামগায়ত্রী সাড়ে পঁচিশ অক্ষর। কাম বীজ সাড়ে চব্বিশ অক্ষর। কৃষ্ণের গুণ কি: পঞ্চ গুণ। কি কি. রূপ গুণ: রস গুণ: পরশ গুণ: শব্দ গুণ: গন্ধ গুণ। কয় ভাব: পঞ্চ ভাব: দাস্য ভাব: বাৎসল্য ভাব: সখ্য ভাব: মধুর ভাব। কৃষ্ণের বাণ কয়টি: পঞ্চ বাণ: আকর্ষণ: স্তম্ভন: জৃম্ভন: শোষণ: মোহন. ইতি জিজ্ঞাসা সমাপ্ত।

পত্রিকা-সম্পাদক।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

বৌদ্ধ-দর্শন

ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদ।

(সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত)

শাক্যমুনির প্রচারিত দার্শনিক মত কালক্রমে বহুভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে বৈভাষিক ও যোগাচারই সর্ব্বাধিক প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধদর্শনোক্ত স্বাবতীয় মতেরই পরিণাম [illegible] হইতে ইহাঁদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ই বিভিন্ন পথ নির্দ্দেশ করিয়া একমাত্র শূন্যতায়ের [illegible] অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত না বলিয়া একমাত্র যোগাচার [illegible] হেয় [illegible]

যোগাচার দার্শনিকগণ চীন ও জাপান প্রদেশে "বিজ্ঞানমাত্র সম্প্রদায়" বা "লঙ্কাবতার সম্প্রদায়" নামে প্রসিদ্ধ। কত কাল হইতে যোগাচার দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। সংস্কৃত ও চীন গ্রন্থের আলোচনা দ্বারা অবগত হওয়া যায়, দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে কুমারলব্ধ নামক দার্শনিক গান্ধার প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া এই মতের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করিয়াছিলেন। তদনন্তর উক্ত দর্শনের মত মধ্যে আর্য্য সুমতিকীর্ত্তি নামক পণ্ডিত কর্ত্তৃক চীন ও জাপান প্রদেশে নীত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নয় শত বৎসর কাল চীনদেশে যোগাচার মত বহুল প্রচার লাভ করে। ক্রমে চীনবাসিগণ মাধ্যমিক দর্শনের মত পরিত্যাগ করিয়া যোগাচার মত অবলম্বন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে যখন চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ ভারত ভ্রমণ করিতে আগমন করেন, তখন ভারতবর্ষে যোগাচার মতেরই সমধিক প্রচার বর্ত্তমান ছিল। হুয়েন্ সাঙ স্বয়ং কুমারলব্ধ পুরুষ ভদ্রাবধের দর্শন করিয়াছিলেন। আর্য্য অসঙ্গ নামক বোধিসত্ত্ব যোগাচার দর্শনসংক্রান্ত বহু গ্রন্থ লিখিয়া উক্ত দর্শনের বহুল প্রচার করেন। অসঙ্গের [illegible]

নন্দ, উত্তরসেন, সম্যক্‌সত্য প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ যোগাচার দর্শনের আলোচনা ও প্রচার করিয়াছিলেন। হুয়েনসাঙ অতীব ভক্তিসহকারে উল্লিখিত দার্শনিকবর্গের গৃহের নষ্ট অবশেষাদি দৃষ্টিগোচর করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ বোধ করেন। তিনি স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যোগাচার সম্প্রদায়ের যে সকল পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন তাঁহাদের সহিত আলাপ ও কথোপকথনের বিষয় বিবৃত করিয়া গিয়াছেন।

সন্ধিনির্ম্মোচন সূত্র, লঙ্কাবতার সূত্র ও গণ্ডব্যূহ সূত্র এই তিনখানি অতিপ্রাচীন যোগাচারসংক্রান্ত গ্রন্থ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। উহা ব্যতীত যোগাচার্য্য ভূমিশাস্ত্র, মহাযানালঙ্কারশাস্ত্র, মহাযানসম্পরিগ্রহসূত্র, দশভূমীশ্বর শাস্ত্র, বিভাগযোগশাস্ত্র, বিজ্ঞানমাত্র দ্বাদশ শাস্ত্র, বিজ্ঞানমাত্র ত্রিদশ শাস্ত্র, মধ্যান্তবিভাগশাস্ত্র, বিজ্ঞানমাত্রসিদ্ধিশাস্ত্র, মহাযানঅভিধর্ম্মসংগীতিশাস্ত্র প্রভৃতি যোগাচার গ্রন্থসমূহ এক সময়ে ভারতবর্ষে বিরচিত হইলেও এখন এদেশে উহার একরূপ বিরল প্রচার বা অপ্রচার; কিন্তু চীন জাপান প্রভৃতি দেশে এখনও ঐ সকল গ্রন্থের অনেক অনুবাদ বর্ত্তমান।

নালন্দ নামক প্রসিদ্ধ বিহারের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মযাজক শীলভদ্রের নিকট হুয়েনসাঙ ৬০২—৬৬৫ খৃঃ পর্য্যন্ত যোগাচার মত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি চীন প্রদেশে গমন করিয়া বহু শিষ্যকে ঐ মত শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান শিষ্য কুয়েইচি ৬৩২ খৃঃ—৬৮৩ খৃঃ পর্য্যন্ত যোগাচার দর্শন সমস্ত চীন প্রদেশে প্রচারিত করেন।

হুয়েনসাঙের পূর্ব্বেও পরমার্থ, বোধিরুচি ও গুণমতি ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে গমন করিয়া যোগাচার দর্শনের মত প্রচারিত করিয়াছিলেন। যোগাচার দর্শনের মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া মধ্য ভারতবর্ষের অচিন্ত্য বিহারে (Ajanta cave) এই মতের আলোচনা করিতেন।

যোগাচার দর্শনের মতে বিজ্ঞান দুই প্রকার; প্রবৃত্তিবিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞান। ক্ষণিক জ্ঞানসমূহের প্রত্যেকের নাম প্রবৃত্তিবিজ্ঞান। ঐ জ্ঞানধারা বা জ্ঞানসমষ্টির নাম আলয়বিজ্ঞান। যেমন অসংখ্য জলকণার সমবায়ে নদীর উৎপত্তি হয়, ঐ জলকণাসমূহ ব্যতীত নদী নামক কোন পদার্থ নাই, সেইরূপ ক্ষণিক জ্ঞানসমূহের সমষ্টিতেই অহং (আত্মা) এর উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই জ্ঞানসমূহ ব্যতীত অহং পদবাচ্য কোন পদার্থ নাই। জ্ঞানসমূহ নানা প্রকার। কালিক জ্ঞান, দৈশিক জ্ঞান, বস্তু-প্রতিবিকল্পজ্ঞান প্রভৃতি নানাপ্রকার জ্ঞান, বিদ্যমান আছে। এই সকল জ্ঞানের নানাপ্রকার সমবায়ে জগতের নিখিল পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞান পর পর জ্ঞানে সংক্রান্ত হইয়া স্মরণাদি জন্মাইয়া থাকে।

মাধ্যমিকবৃত্তির সংস্কৃতপরীক্ষা নামক অষ্টম প্রকরণে বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রাচীন মতসমূহ উদ্ধৃত করিয়া চন্দ্রকীর্ত্তি লিখিয়াছেন—বুদ্ধিবোধ্য পদার্থমাত্রই ক্ষণিক। যোগাচার

বিশেষ। ঘট পট ইত্যাদি সমুদয়ই জ্ঞানের বৈচিত্র্য মাত্র। যাঁহারা জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থ স্বীকার করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। জ্ঞানের আশ্রয় ব্যতীত কেহই বাহ্য পদার্থের উপলব্ধি করিতে পারেন না। যদি বাহ্য পদার্থ জ্ঞানের আশ্রয় ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারিত, তাহা হইলে উহাকে যথার্থ পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতাম, কিন্তু বাহ্য পদার্থ জ্ঞানের অতীত হইতে পারেনা, বাহ্য পদার্থ তদ্বিষয়ক জ্ঞানের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল না, কারণ তদ্বিষয়ক জ্ঞানের আশ্রয় ব্যতীত তুমি কিরূপে প্রমাণ করিবে যে বাহ্য পদার্থ ছিল।

জ্ঞানের পরেও বাহ্য পদার্থের উৎপত্তি হয় নাই, কারণ বাহ্য পদার্থের সহিত সংশ্রব ব্যতীত তদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য পদার্থের সম্বন্ধই জ্ঞানের উৎপাদক। অতএব বাহ্য পদার্থ জ্ঞানের পরে উৎপন্ন হয় নাই। জ্ঞানের পূর্ব্বেও যে উহা বিদ্যমান ছিল না ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং বাহ্য পদার্থ ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান যুগপৎ বা সমকালে উৎপন্ন হইতেছে। বাহ্য পদার্থ ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান এতদুভয়ের কেহই অপরকে উৎপাদন করিতেছে না অর্থাৎ উভয় পদার্থ এক; সুতরাং জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থ নাই।

স্বপ্নাবস্থায় যেমন নানা বাহ্য পদার্থ অনুভূত হয়, অথচ উহার কোনটিই সত্য নহে, সেইরূপ এই সংসারে আমরা জ্ঞানের বৈচিত্র্য-হেতু বিবিধ বাহ্য পদার্থের সৃষ্টি করিতেছি।

আনন্দগিরি ২।২।২০ বেদান্তসূত্র ভাষ্যে বৌদ্ধমত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, পদার্থমাত্রই ক্ষণিক। সকল পদার্থই যে ক্ষণিক উহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বীজের ধ্বংস হইলে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়। যদি বীজ ও অঙ্কুর উভয়ই সমকালে বিদ্যমান থাকিত তাহা হইলে কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি স্বীকার করিতে পারা যাইত; কিন্তু বীজ ও অঙ্কুর সমকালে বিদ্যমান থাকে না, বীজের ধ্বংস না হইলে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না। অতএব পূর্ব্বক্ষণস্থায়ী কারণ হইতে পরক্ষণস্থায়ী কার্য্যের উৎপত্তি হয় এই মত অগ্রাহ্য অর্থাৎ ভাব পদার্থ হইতে ভাব পদার্থের উৎপত্তি হয় না, অভাব পদার্থ হইতেই ভাব পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে; সুতরাং প্রত্যেক পদার্থই ক্ষণিক।

বাৎস্যায়ন ৩।২।১১ ন্যায়সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—ক্ষণ শব্দের অর্থ অতি অল্প-কাল। জগতের প্রত্যেক পদার্থই ক্ষণস্থায়ী, জীবদেহও ক্ষণিক। প্রতি মুহূর্ত্তেই জীবদেহের পরমাণু-সমূহ রূপান্তরিত হইয়া নবীকৃত হইতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তেই পূর্ব্ব দেহের নাশ ও নূতন দেহের উৎপত্তি হইতেছে। উদ্যোতকরাচার্য্য ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্য টীকায় ৪।২।৩১ ও ৪।২।৩৫ সূত্রের ব্যাখ্যা স্থলে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমত উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন;—জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থ নাই, আমাদের অনাদি বাসনাই জ্ঞান-বৈচিত্র্যের কারণ।

উদয়নাচার্য্য আত্মতত্ত্ববিবেক গ্রন্থের প্রথমেই ক্ষণভঙ্গবাদের (ক্ষণিক বিজ্ঞান বাদের) বিচার করিয়াছেন। তিনি বলেন;—বৌদ্ধগণ প্রত্যেক পদার্থই ক্ষণিক বলিয়া স্বীকার করিতেন, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে আমরা যে বীজ অবলোকন করিতেছি, উহা পর মুহূর্ত্তে অঙ্কুররূপে পরিণত হইবে। যদি অঙ্কুর উৎপন্ন হইবার পরও বীজ বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে আমরা

বীজকে দ্বিক্ষণস্থায়ী বলিতে পারিতাম, কিন্তু অঙ্কুরের উৎপত্তি হইতে না হইতেই বীজের ধ্বংস হইয়া থাকে; সুতরাং বীজ একক্ষণস্থায়ী বা ক্ষণিক।

জয়ন্ত স্বামী ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থের ১২শ আহ্নিকে যোগাচার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মত উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—একমাত্র জ্ঞানই সত্য, জ্ঞানের আকার আছে, ঘট পট ইত্যাদি জ্ঞানের আকার মাত্র।

শবরস্বামী মীমাংসা দর্শনের ১।১।৫ সূত্রের ভাষ্যে প্রতিপক্ষগণের (বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের) মত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—জ্ঞানাতিরিক্ত পদার্থ নাই, জ্ঞান সকল ক্ষণিক। নিত্য জ্ঞাতা (আত্মা) নাই। যাঁহারা বলেন নিত্য আত্মা স্বীকার না করিলে স্মরণাদির অনুপপত্তি হয়, তাঁহারা ভ্রান্ত। আমি পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যাহা দর্শন করিয়াছিলাম, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে তাহা স্মরণ করিতেছি; অতএব পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের দ্রষ্টা ও বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের স্মর্ত্তা একই পদার্থ (নিত্য আত্মা)। এই মত যুক্তি সঙ্গত নহে। দর্শন ও স্মরণ উভয়ই জ্ঞান এবং উহারা উভয়ই এক সন্ততিস্থ অর্থাৎ উভয়ই এক জ্ঞানধারার অন্তর্ভূত। পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যাহা বীজ ছিল তাহাই যেমন বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে অঙ্কুররূপে পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যাহা দর্শন জ্ঞান ছিল তাহাই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে স্মরণজ্ঞানরূপে পরিণত হইয়াছে।

মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের বৌদ্ধদর্শনপ্রস্তাবে লিখিয়াছেন;—বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন;—

১ম। জগতের প্রত্যেক পদার্থই ক্ষণিক।

২য়। সকলই দুঃখময়।

৩য়। সমুদয়ই স্বলক্ষণ অর্থাৎ স্বসদৃশ।

৪র্থ। সবস্তুই শূন্য।

সাংখ্য সূত্রের প্রথম অধ্যায়ে ক্ষণিকবাদ নিরাকৃত হইয়াছে। কপিল অনুগণের (অর্থাৎ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের) মত উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে তাঁহারা স্থির আত্মা স্বীকার করেন না এবং কেবলই জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। বিজ্ঞান ভিক্ষু সাংখ্যসূত্রের উক্ত সূত্রের বিবাদ বিবৃতি করিয়াছেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস।

জৈন পুরা-কাহিনী।

আজ কয়েক বর্ষ হইতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজে জৈন-ধর্ম্ম ও জৈন-গ্রন্থ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা চলিয়াছে। এই আলোচনার ফলে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে বাদ বিসংবাদ ও পরস্পর মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ-অধ্যাপক বেবার (Weber) ও ফরাসী-পণ্ডিত বার্থ (Barth) উভয়ে ঘোষণা করিতেছেন, জৈনশাস্ত্রসমূহ নিতান্ত আধুনিক, উহাদের প্রাচীনতায় বিশ্বাস করিবার পক্ষে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। অধ্যাপক বেবার মনে করেন, বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতেই জৈন ধর্ম্মের উৎপত্তি। প্রথমে জৈন ও বৌদ্ধগণ এক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, পরে যখন জৈনেরা বৌদ্ধ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহারা ইচ্ছাক্রমে তাঁহাদের ধর্ম্মশিক্ষাগুরু শাক্যমুনিকে অস্বীকার করিলেন, এমন কি তাঁহারা মিথ্যাগল্প রচনা করিয়া আপনাদিগকে শাক্যবুদ্ধের শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীর শিষ্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এইরূপে তাঁহারা বুদ্ধ ও বৌদ্ধ আচার্য্যগণের আদর্শে স্ব স্ব গুরুগণের চরিতাখ্যান কীর্ত্তন করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। বেবার সাহেব বলিতেছেন, সেইজন্যই আমরা জৈনশাস্ত্রে বৌদ্ধগ্রন্থের অনেক প্রতিচ্ছবি দর্শন করিতেছি। অধ্যাপক বার্থ বলিতেছেন, যখন খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে জৈনশাস্ত্রসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তখন অতিপ্রাচীন জৈনপ্রবাদসমূহ কিরূপে প্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস করা যায়? কারণ ঐ সময়ের পূর্ব্বতনকালে রচিত কোন জৈনশাস্ত্র বা জৈনগ্রন্থ লিপিবদ্ধ ছিলনা, তাহা জৈনেরা নিজেই স্বীকার করিয়া আসিতেছে। তিনি মনে করেন, জৈনগণ বহুকাল ধরিয়া কোনও বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায় মধ্যে গণ্য ছিল না, পরে তাহারা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আদর্শে অভিনব ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছে।

বেবার ও বার্থ সাহেব যে মত প্রচার করিয়াছেন, প্রত্নতত্ত্ববিৎ লাসেন তাহার পথপ্রদর্শক। লাসেনের মতে জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কারণ জিন ও অর্হৎ শব্দদ্বারা বুদ্ধকেই বুঝায়। জৈনদের যেমন চব্বিশজন তীর্থঙ্কর আছেন, বৌদ্ধ গ্রন্থেও সেইরূপ চব্বিশজন বুদ্ধের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। যদিও ঐ চব্বিশজনের মধ্যে পরস্পর নামের পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। জিনের অপর নাম সুগত ও সর্ব্বজ্ঞ, বুদ্ধদেবেরও তাহাই নামান্তর। বৌদ্ধগণ বিরুদ্ধবাদীকে 'তীর্থের' বা 'তীর্থিক' নামে উল্লেখ করেন, কিন্তু জৈনগণ, আপনাদিগের প্রধান আরাধ্য দেবাধিদেবকে 'তীর্থঙ্কর' নামে উল্লেখ করিয়াছেন; এ পক্ষে প্রায় ব্রাহ্মণদিগেরই অনুকরণ লক্ষিত হয়। বৌদ্ধেরা যেমন তাঁহাদের আচার্য্য প্রভৃতিকে ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, জৈনদের মধ্যেও সেইরূপ প্রচলিত আছে। অহিংসা-ধর্ম্মপালন সম্বন্ধে জৈনেরা বৌদ্ধ অপেক্ষা বরং কঠিন নিয়ম পালন করিয়া থাকে। বৌদ্ধেরা যেমন অসংখ্য যুগপর্য্যায়ের অবতারণা করিয়াছেন, সেইরূপ জৈনেরাও বৌদ্ধগণকে অতিক্রম করিয়া উৎসর্পিণী ও

অবসর্পিণীর কল্পনা করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা যেমন প্রাচীন সূর্য্যবংশের ইতিহাস আপনাদের ইচ্ছানুসারে সংশোধন করিয়া লইয়াছেন অর্থাৎ তাঁহারা যেমন রাজা মহাসম্মতকে সূর্য্য-আদিরাজ ও মহাসম্মত হইতে ইক্ষ্বাকু পর্য্যন্ত পুরুষ গণনা করিয়া থাকেন, জৈনদিগের মধ্যেও উক্ত সকল বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, বৌদ্ধদিগের হইতেই জৈনধর্ম্মের সৃষ্টি। এইরূপে লাসেন প্রকাশ করিয়াছেন, যে খৃষ্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দীতে জৈনধর্ম্মের বিকাশ হইয়াছে। অধ্যাপক বুহলার, জ্যাকবি, ওলডেনবর্গ, হর্ণলি, পিটার্সন্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ উক্ত মতের সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে বৌদ্ধ ও জৈন দুইটী স্বতন্ত্র মত; বৌদ্ধ হইতে জৈন ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় নাই। (আমরাও বিশ্বকোষে প্রমাণ করিয়াছি, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের কোন কোন বিষয়ে পরস্পর সৌসাদৃশ্য থাকিলেও জৈনধর্ম্মকে বৌদ্ধধর্ম্মের পরবর্ত্তী বলা যুক্তিসঙ্গত নয়।)

লাসেনপ্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে যে প্রমাণ দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে জৈনধর্ম্মের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন, সেই সেই প্রমাণদ্বারাই জৈনধর্ম্ম হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি প্রতিপাদন করা যাইতে পারে। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকগণ সকলেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে লালিত পালিত হইয়াছেন, এরূপ স্থলে সরল ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মকেই জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের জনক বলা যুক্তিসঙ্গত।

আমাদের বিবেচনায় যখন শাক্যবুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাহারও বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই জৈনধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে। প্রাচীনতম জৈন অঙ্গে স্পষ্টতঃ বৌদ্ধ বা বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গ নাই। কিন্তু ললিতবিস্তরাদি প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থে 'নির্গ্রন্থ' নামে জৈনদের উল্লেখ আছে। কটক জেলার উদয়গিরি হইতে খারবেলের লিপি ও জুনাগড়ের উপরকোট হইতে রুদ্রদামার পূর্ব্ববর্ত্তী যে প্রাচীন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎপাঠে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, জৈন-সম্প্রদায় বহু প্রাচীন।

মহাবগ্গ, সুমঙ্গলবিলাসিনী, সদ্ধর্ম্মালঙ্কার প্রভৃতি পালি বৌদ্ধ গ্রন্থে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছয়জন তীর্থিকের উল্লেখ আছে, এই ছয়জনের নাম পূরণকাশ্যপ, মক্খলিপুত্ত গোসাল, নিগণ্ঠনাথপুত্ত, অজিতকেশকম্বল, সঞ্জয়পুত্তবিরতি ও ককুদকাত্যায়ন। উহাদের মধ্যে নিগণ্ঠনাথপুত্ত (নির্গ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র) এক ধর্ম্মমতপ্রবর্ত্তক বলিয়া খ্যাতি ছিল। বৌদ্ধগ্রন্থ-মতে, 'সংসারগ্রন্থি ছেদন' করিয়াছেন এইরূপ ভাণ করায় ইনি নিগ্রন্থ (নির্গ্রন্থ), এমন কি অর্হিত (অর্হৎ) নামেও পরিচিত হন। তাঁহার মত বহুসংখ্যক লোকে গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার মতে শীতল জলপান নিষেধ, কারণ তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক জীব থাকে। তিনি আরও বলেন, কায়, মন, ও বাক্ এই তিন দণ্ড অর্থাৎ তিনের সহচর, প্রত্যেকটী স্বাধীনভাবে কার্য্য করে। পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ অদৃষ্টের অধীন।

মহাবগ্গে নির্গ্রন্থ পালিগ্রন্থমতে জ্ঞাতিপুত্র (জ্ঞাতিপুত্র) ক্রিয়াকলাপ করিয়াছিলেন।

উপরে বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে যে মত উদ্ধৃত হইল, আমরা জৈনদিগের ঠানং (স্থানাঙ্গ) সূত্রের ১ম ও ৩য় উদ্দেশকে ঐরূপ মত দেখিতে পাই। যথা ৩য় উদ্দেশকে—

"তত্থদণ্ডাপন্নত্ত তং যথা মনোদণ্ডে বচদণ্ডে কায়দণ্ডে।"

প্রসিদ্ধ জৈন আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন—তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী স্থানাঙ্গ-বর্ণিত উক্ত মত প্রচার করিয়াছিলেন। জৈন সাধুগণ নির্গ্রন্থনামে খ্যাত, জ্ঞাতিপুত্র শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীরই নামান্তর। জৈনদিগের ভগবতীসূত্রে (৪৫ শতকে) মঙ্খলিপুত্র গোশাল মহাবীরকে 'নাযপুত্ত'(জ্ঞাতপুত্র) বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

চীন, ভোট, নেপাল, সিংহল, প্রভৃতি জনপদের প্রাচীনতম বৌদ্ধশাস্ত্রে ঐ ছয় জন তীর্থিকই বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; ঐ ছয় জনের মতই জৈনধর্ম্মমূলক। বৌদ্ধশাস্ত্রবর্ণিত দ্বিতীয় তীর্থিক মঙ্খলিপুত্র গোশালের বিবরণও ভগবতীসূত্রে বর্ণিত আছে। শেষোক্ত জৈনগ্রন্থ-মতে, গোশাল মহাবীরেরই একজন শিষ্য ছিলেন, কিন্তু মহাবীরের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটায় তিনি আপনাকে 'জিন' বলিয়া পরিচিত করেন এবং অতীর্থ মত প্রচার করেন।

সিংহলের সামঞ্ঞফলসুত্ত নামক পালিগ্রন্থে নির্গ্রন্থগণ চাতুর্যাম-ধর্ম্ম-সম্বৃত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। জৈনদিগের ভগবতীসূত্রে পার্শ্বনাথের-কালাস-বেসিয়-পুত্তের সহিত মহাবীরের ধর্ম্ম প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

"তজ্জন্নং অহিএ চাতুজ্জামাতো ধম্মতো পঞ্চ মহব্বইযং সপডিক্কমণং ধম্মং উপসম্পজ্জিত্তাণং বিহরিত্তএ"

অর্থাৎ আপনার নিকট থাকিয়া চাতুর্যামরূপ ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তে পঞ্চযাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম।

আচারাঙ্গের প্রসিদ্ধ টীকাকার শিলাঙ্ক লিখিয়াছেন, ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ যে ধর্ম্মমত প্রচার করেন, তাহাই চাতুর্যামধর্ম্ম এবং মহাবীর স্বামী যে ধর্ম্ম মত প্রবর্ত্তন করেন, তাহাই পঞ্চযাম বা পঞ্চমহাব্রতপালনরূপ ধর্ম্ম। যখন মহাবীর স্বামী পার্শ্বমতাবলম্বীর নিকট পার্শ্বমত শুনিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, জৈন এবং বৌদ্ধদিগের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে যখন চাতুর্যাম ধর্ম্মের উল্লেখ আছে, তখন স্বীকার করিতে হইবে, চাতুর্যাম ধর্ম্মমত বহুপ্রাচীন, মহাবীর স্বামী বা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী শাক্যবুদ্ধেরও বহুপূর্ব্ববর্ত্তী।

জৈনদিগের কল্পসূত্রে লিখিত আছে, মহাবীরের ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে পার্শ্বনাথ স্বামী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। খৃষ্টজন্মের ৫২৭ বর্ষ পূর্ব্বে মহাবীরের নির্ব্বাণ হয়। এরূপ অবস্থায় খৃষ্ট জন্মের প্রায় ৮০০ বর্ষ পূর্ব্বে পার্শ্বনাথ কর্ত্তৃক চাতুর্যাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। জৈনাচার্য্যগণ নন্দিসূত্রের প্রমাণ দিয়া বলিয়া থাকেন, পার্শ্বনাথ স্বামীর বহুপূর্ব্বে আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেব হইতেই জৈনমত সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। জৈনদিগের অধিকাংশ অঙ্গে লিখিত আছে যে, বর্দ্ধমান বা মহাবীর ৮৪০০০০০ প্রশ্নবিশিষ্ট দ্বাদশ অঙ্গ প্রচার করেন, কিন্তু তাহার টীকাকারগণ বর্দ্ধমানস্থানে ঋষভদেবের নাম বসাইয়া লইয়াছেন। প্রসিদ্ধ দিগম্বরাচার্য্য জিনসেন হরিবংশপুরাণে লিখিয়াছেন, মহাবীর স্বামী একাদশাঙ্গ প্রচার

করেন; দ্বাদশাঙ্গ ও উপাঙ্গগুলি তাঁহার শিষ্য গৌতম কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। যদিও মহাবীর স্বামীর পূর্ব্বে জৈন ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু দুই একখানি ভিন্ন অধিকাংশ জৈন গ্রন্থ মতে শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর হইতেই প্রাচীনতম জৈন অঙ্গসমূহ প্রবর্ত্তিত হয়।

ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি, কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত কল্পসূত্রের দোহাই দিয়া লিখিয়া থাকেন, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে জৈন-শাস্ত্রসমূহ প্রথম লিপিবদ্ধ হয়; এ সম্বন্ধে তাঁহারা লিখিয়া থাকেন যে ৯৯০ বীর সম্বতাব্দে অর্থাৎ ৪৬৬ খৃষ্টাব্দে স্কন্দিলাচার্য্যের অধিনায়কতায় মথুরায় জৈন-সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু কল্পসূত্রে লিখিত আছে, ৯৮০ বীর সম্বতাব্দে (৪১৩ খৃষ্টাব্দে) দেবর্দ্ধিগণি ক্ষমাশ্রমণ আদেশ করিয়াছিলেন যে, সাধারণে প্রচারের জন্য ঐ সমস্ত পাঠ করিবেন। এস্থলে তাহার বহু পূর্ব্বে জৈন অঙ্গসমূহ পুস্তকাকারে পরিণত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। দিগম্বর জৈনদিগের মতে বীর-নির্ব্বাণের পর ৬৩৩ বৎসর (১০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৭ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে পুষ্পদন্ত নামে এক জন আচার্য্য সমস্ত অঙ্গ সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন। এ দিকে সমবায় অঙ্গ, প্রজ্ঞাপনা উপাঙ্গ ও অনুযোগদ্বার সূত্রে স্পষ্ট লিপি-পদ্ধতির উল্লেখ থাকায় স্বীকার করিতে হইবে যে ঐ সময়ের পূর্ব্ব হইতেই জৈন-শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিবার উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। বাস্তবিক মহাবীর স্বামী যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, প্রথমে সে সমস্ত তাহার শিষ্যপরম্পরায় মুখে মুখেই চলিয়া আসিত জৈন-কিন্তু বহুকাল মুখে মুখে থাকায় অনেক গ্রন্থ নষ্ট বা বিকৃত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। হেমাচার্য্যের স্থবিরাবলিচরিত পাঠে জানা যায়, বীর-নির্ব্বাণের ১৭০ বর্ষে (অর্থাৎ ৩৫৭ খৃঃ পূঃ অব্দের) কিছু পূর্ব্বে পাটলিপুত্রনগরে শ্রীসঙ্ঘ হয়; সে সময়ে জৈন শাস্ত্র বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। শ্রীসঙ্ঘে পাঁচ শত ভিক্ষু মিলিয়া জৈন শাস্ত্রসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

উপরে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হইল, তদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, জৈন শাস্ত্রগুলিকে অনেকে যেরূপ আধুনিক মনে করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে উহারা সে রূপ আধুনিক নহে। তবে লিখিত গুলি পরবর্ত্তী কালে লিপিবদ্ধ হইলেও মূল অঙ্গগুলি যে বহু প্রাচীন তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। পাশ্চাত্য পুরাবিদ্‌গণ বলিতে চাহেন যে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যে গ্রীক দিগের ফলিত ও গণিত জ্যোতিষ ভারতে প্রচারিত হয়, কিন্তু জৈনদিগের মূল অঙ্গে গ্রীক জ্যোতিষের কিছুমাত্র আভাস নাই, তাহা জর্ম্মাণ-পণ্ডিত যে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। আমাদিগের বেদসংহিতায় যেরূপ পঞ্চবর্ষাত্মক যুগ হইতে নক্ষত্রের গণনা দৃষ্ট হয়, জৈনদিগের প্রাচীন অঙ্গে সেইরূপ কাল নির্ণীত হইয়াছে, এবং সঙ্গে ঐ সকল অঙ্গ যে বহু প্রাচীন, এমন কি বৌদ্ধদিগের প্রাচীনতম গ্রন্থেরও পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এখন দেখা যাউক জৈনদিগের পুরা কাহিনী-সমূহ কত দূর প্রামাণিক। ডাক্তার হেরমান যেকোবি প্রমুখ জর্ম্মাণ পণ্ডিতগণ জৈনদিগের স্থবিরাবলি গণ ও শাখাসমূহ অপাণিনি ও

কাল্পনিক বলিয়া মনে করেন; এই জন্যই জৈন গ্রন্থাদিতে যে সমস্ত ঐতিহাসিক কথা বিবৃত হইয়াছে, তাহার উপর তাঁহারা তত আস্থাবান্ নহেন; কিন্তু আমরা বহুতর সাময়িক প্রমাণ পাইয়াছি, যদ্দ্বারা আমরা প্রমাণ করিব, উক্ত পুরাবিদ্‌গণ যাহা কাল্পনিক বলিয়া মনে করেন, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে কাল্পনিক নহে, তাহা ঐতিহাসিক। মথুরা, বরাবর, ও কটক জেলাস্থ খণ্ডগিরি হইতে যে সকল জৈন শিলালিপি বাহির হইয়াছে, সেই সকল সাময়িক লিপি আমাদের কথার পোষকতা করিতেছে।

মথুরা হইতে যে সমস্ত প্রাচীন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ কনিষ্ক, বাসুদেব প্রভৃতি শকরাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ। ইহার অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিৎ কনিংহাম্ ও অবশেষে ডাক্তার ফুহরার আবিষ্কার করিয়াছেন। কনিংহাম্ সাহেব বহুকাল হইল, ঐ সকল শিলালিপির ছবি প্রকাশ করিলেও তিনি ঐ সকল লিপি জৈন বলিয়া মনে করেন নাই। ডাক্তার বুহলর সাহেবই ঐ বিষয়ের পথপ্রদর্শক। উক্ত মহাত্মাদিগের সঙ্কলিত লিপিসমূহের সাহায্যে আমরা প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা করিব।

১। বর্দ্ধমান প্রতিমার উৎকীর্ণ লিপি।

কনিংহাম্ সাহেব মথুরার কঙ্কালি-তিলা নামক স্তূপ মধ্য হইতে একটী জৈন দেবমূর্ত্তিতে এই কয় ছত্র পাইয়াছিলেন। ডাক্তার বুহলর ইহার বিশুদ্ধ পাঠ প্রকাশ করেন:—

সিদ্ধং সং ২০ গ্রমা ১ দি ১৫ কোটিয়তো গণতো বাণিয়তো কুলতো বৈরিতো শাখাতো শিরিকাতো ভত্তিতো বাচকস্য আর্য্য-সঙ্ঘসিংহস্য নির্বর্ত্তনং দত্তিলস্য·· বিলস্য কোঠুবিকিয় জয়বালস্য দেবদাসস্য নাগদিনস্য চ নাগদিনায়ে চ মাতু শ্রাবিকায়ে দিনায়ে দানং···ই বর্দ্ধমানপ্রতিমা *

অনুবাদ—'সিদ্ধ হউক! সংবৎ ২০, গ্রীষ্মমাস ১, তারিখ ১৫, শিরিকাভাগে, বৈরি-শাখার বাণিয় কুলে ও কোটিয় গণে উৎপন্ন বাচক (১) আর্য্যসঙ্ঘসিংহের নির্বর্ত্তন। দত্তিলের (কন্যা), বিলের কুটুম্বী, জয়পাল, দেবদাস ও নাগদিনের মাতা শ্রাবিকা দিনার (২) দান—এই বর্দ্ধমান-প্রতিমা।'

২। জৈন পীঠের উপর উৎকীর্ণ লিপি।

সিদ্ধং মহারাজস্য কনিষ্কস্য রাজ্যে সংবৎসরে নবম্যে···মাসে প্রথ ১ দিবসে অস্যাং পূর্ব্বায়ে কোটিয়তো গণতো বাণিয়তো কুলতো বৈরিতো শাখাতো বাচকস্য নাগনংদিস নির্বর্ত্তনং ব্রহ্ম···ধূতয়ে ভট্টিমিতস

* Gunningham's Arch. Sur. Reports. Vol. III. plate XIII, No 6.

(১) বাচক—ধর্ম্মশাস্ত্রবক্তা। (২) দিনা—সংস্কৃত রূপ 'দিন্না' বা 'দত্তা'।

কটুম্বিনিয়ে বিকটায়ে শ্রীবর্দ্ধমানস্য প্রতিমা কারিতা সর্ব্বসত্ত্বানাং হিত সুখায়ে *

"সিদ্ধ হউক। মহারাজ কনিষ্কের রাজ্যকালে নবম সংবৎসরে প্রথম মাসে ৫ম দিনে—এই পূর্ব্বোক্ত তারিখে কোটিয়গণে বাণিয কুলে বৈরিশাখায় উৎপন্ন বাচক নাগনন্দির নির্দ্দেশে ভট্টিমিত্রের কুটুম্বী (১) ও ব্রহ্মের কন্যা বিকটা কর্ত্তৃক সর্ব্ব মনুষ্যের মঙ্গল ও সুখের জন্য শ্রীবর্দ্ধমানপ্রতিমা প্রতিষ্ঠাপিত।"

৩। কঙ্কালি-টিলা হইতে প্রাপ্ত খণ্ডিত লিপি।

সংবৎসরে ৯০ ব·····স্য কুটুবনি···বদানস্য বধূয় কোটিয়তো গণতো (প্রশ্ন-) বাহনকতো কুলতো মঝমাতো শাখাতো·····ন নিকা: ভতি গালা এ খবানি··· †

নিতান্ত অস্ফুট বলিয়া অনুবাদ করা হইল না। ইহাতে কোটিয়গণ প্রশ্নবাহনকুল মধ্যমা শাখার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে।

৪। কঙ্কালি-টিলার একটী উলদ মূর্ত্তিতে উৎকীর্ণ।

সিদ্ধং নমো অরহতো মহাবীরস্য দেবনাশস্য। রাজ্ঞ বাসুদেবস্য সংবৎসরে ৯৮ বর্ষ মাসে ৪ দিবসে ১১ এতস্যা পূর্ব্বায়ে অর্য্যরোহনিয়তে গণতো পরিহাসককুলতো পোনপত্রিকাতো শাখাতো গণিস্য অর্য্যদেবদত্তস্য ন ‡

অনুবাদ।—"সিদ্ধ হউক! অর্হৎ মহাবীর দেবনাশকে নমস্কার। রাজা বাসুদেবের সংবৎসরে, ৯৮ বর্ষে ৪ মাসে ১১ দিবসে—উক্ত তারিখে আর্য্য-রোহণের গণে, পরিহাসক কুলে (ও) পোনপত্রিকা (পৌর্ণপত্রিকা) শাখার উৎপন্ন গণি আর্য্য দেবদত্তের।"

৫। উক্ত স্থান হইতে আবিষ্কৃত আর একখানি লিপি।

স ৪৭ গ্রী ২ দি ২০ এতস্যা পূর্ব্বায়ে বারণে গণে পেতিধর্ম্মিককুলে বাচকস্য রোহনদিস্য শিসস্য সেনস্য নিবর্ত্তনং শ্রাবক দ। §

"সংবৎ ৪৭, গ্রীষ্ম ২য় মাসে, ২০শ দিনে উক্ত তারিখে বারণগণে ও পেতিধর্ম্মিক (পৈতৃধর্ম্মিক) কুলে বাচক রোহনন্দির শিষ্য সেনের নির্ব্বর্ত্তন।"

---

* Cunningham's Arch. Sur. Reports, vol. III, plate XIII, No 4

† Do Do „ plate XV. No 19

‡ Do Do Do plate XV. no 20

§ ডাক্তার বুহ্‌লর 'চারণ' গণ পাঠ করিতে বলেন। কিন্তু মূলে স্পষ্ট 'বারণ' আছে।

(১) কুটুম্বী=গৃহপত্নী।

৬। কঙ্কালি তিলা হইতে নবাবিষ্কৃত অপর শিলালিপি। *

সিদ্ধম্ ॥ মহারাজস্য রাজাতিরাস্য দেবপুত্রস্য যাহি কনিষ্কস্য সং ৭ হে ১ দি ১৫ এতস্যাং পূর্ব্বায়াং অর্য্যোদেহিকিয়াতো গণাতো অর্য্যনাগ-ভূতিকিয়াতো কুলাতো গণিস্য অর্য্যবুদ্ধপিরিস্য শিষ্যো বাচকো অর্য্য··· নিকস্য ভগিনি অর্য্য জয় অর্য্য গোঠ··· †

'সিদ্ধ হউক। মহারাজ রাজাতিরাজ দেবপুত্র সাহী কনিষ্কের ৭-সংবতে হেমন্তের ১ম মাসে ১৫ শ দিনে উপরোক্ত (দিনে) আর্য্য উদ্দেহিকীয়গণে আর্য্যনাগভূতিকীয় কুলে উৎপন্ন গণি আর্য্যবুদ্ধশ্রীর শিষ্য বাচক আর্য্য ··নিক, তাহার ভগিনী আর্য্য জয়া ও আর্য্য গোষ্ঠ।'

৭। ঐ স্থান হইতে নবাবিষ্কৃত অপর শিলালিপি। *

সিদ্ধম্ সব ৮৪ (?) হেমন্তমাসে চতুর্থে ৪ দিবসে ১০ অস্যাং পূর্ব্বায়াং কোট্টিয়াতো গণাতো স্থানিয়াতো কুলাতো বৈরাতো শাখাতো শ্রীগুহাতো সম্ভোগাতো বাচকস্যার্য্যহস্তহস্তিস্য শিষ্যো গণিস্য অর্য্যমাঘহস্তিস্য শ্রদ্ধচরিবাচকস্য অর্য্যদেবস্য নির্ব্বর্ত্তনে গোবস্য সীহপুত্রস্য লোহিককারুকস্য দানং সর্ব্বসত্বানাং হিতসুখা এক সরস্বতী প্রতিষ্ঠাপিতা অবতলে রঙ্গানর্ত্তনো মে।

'সিদ্ধ হউক! সংবৎ ৮৪ হেমন্ত কালে চতুর্থে ১০ ম দিবসে, (শুক্ল পক্ষে) কোট্টিয় গণে স্থানীয় কুলে বৈরশাখায় ও শ্রীগুহ সম্ভোগে উৎপন্ন বাচক আর্য্যহস্তহস্তীর শিষ্য গণি আর্য্য-মাঘহস্তীর শ্রদ্ধচারী আর্য্যদেবের নির্ব্বর্ত্তনে সর্ব্ব মনুষ্যের মঙ্গল ও সুখের জন্য এক সরস্বতী প্রতিষ্ঠাপিত সিংহপুত্র গোপ লোহিক কারুকের দান।'

পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিতেছেন, উপরোক্ত শিলালিপি-গুলি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর কোন সময়ে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এখন দেখা যাউক, উক্ত লিপিসমূহে যে সকল গণ, কুল ও শাখার উল্লেখ আছে, জৈনশাস্ত্রে ঐ সকল গণ ও শাখাদির উল্লেখ আছে কিনা? আমরা জৈনদিগের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে বাস্তবিক ঐ সকল গণও শাখার উল্লেখ পাইয়াছি।

---

* প্রায় পাঁচ বর্ষ হইল, ডাক্তার বুহলার কঙ্কালি-তিলার নানা স্থান খনন করাইয়া যে সকল শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন, এ সমস্তই নবাবিষ্কৃত বলিয়া উল্লেখ করা হইল। সুপণ্ডিত ডাক্তার বুহলর এ সকলেরও পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। [Epigraphia Indica, vol II. দ্রষ্টব্য।]

† ইহার মূল লিপির ফটোলিথো Weiner zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes, Vol. II, p. 145, P. pt. প্রকাশিত হইয়াছে।

আর্য্যরোহণগণ বিহাসকুল—পোষপত্তিকা শাখা।

কল্পসূত্রে লিখিত আছে, অশোকের পৌত্র সংপ্রতিরাজের দীক্ষাগুরু আর্য্য সুহস্তী বার জন শিষ্য; তন্মধ্যে কাশ্যপ গোত্রজ আর্য্যরোহণ একজন; ইনি উদ্দেহগণের প্রবর্ত্তক। ঐ সকল গণ আবার চারিটী শাখায় এবং ছয়টী কুলে বিভক্ত, তন্মধ্যে পূর্ণপত্রিকা [illegible] বিহাসককুল একটী।

উদ্দেহিকাগণ—আর্য্যনাগভূতিকীয় কুল।

উপরোক্ত আর্য্যরোহণগণই উদ্দেহগণ বলিয়া কল্পসূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। [illegible] ভূতিকুল এই গণেরই অন্তর্গত, তাহা কল্পসূত্রেই পাওয়া গিয়াছে। বেতাম্বর জৈনদিগের পট্টাবলীমতে বীরাব্দ ২৬৫ বর্ষে (অর্থাৎ ২৬২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে) আর্য্য সুহস্তী [illegible] করেন। এরূপ স্থলে ঐ সময়ে বা তাঁহার অনেক কাল পরে তাঁহার প্রধান শিষ্য আর্য্যরোহণ কর্ত্তৃক উদ্দেহগণ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে।

বারণগণ—পেডিধর্ম্মিক কুল।

কল্পসূত্রের মতে—(পূর্ব্বোক্ত) আর্য্যসুহস্তীর অপর শিষ্য কামর্দ্ধি [illegible] গণ প্রবর্ত্তন করেন। এই চারণগণ চারিটী শাখা ও সাতটী কুলে বিভক্ত, এই সকল কুলের মধ্যে [illegible] একটী। লিপিলিপির বাহুল্য লিপিকর প্রমাদে কল্পসূত্রে চারণগণের বিকৃত হইয়াছে। পুরাতন লিপিতে 'ব' ও 'চ' প্রায় একরূপ লিখিত। এরূপ স্থলে 'বারণ' 'চারণ' হইলে, তাহাতে আর বাধা কি? সময়সুন্দর কল্পসূত্রকল্পদ্রুমকলিকায় লিখিয়াছেন যে লিপিপ্রমাদেও অনেক গণাদি বিলুপ্ত হওয়ায় প্রাচীন কল্পসূত্রের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এরূপ স্থলে অধিক সম্ভব কল্পসূত্রের রচনাকালে (খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে) বারণগণ বিলুপ্ত হইয়াছিল। বিলুপ্ত না হইলে এরূপ লিপিকর প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না।

কোটীয়গণ বাণিজকুল—ইন্দ্রিশাখা। কোটীয়গণ প্রশ্নবাহনকুল মধ্যমাশাখা। কোটীয়গণ খাসীয়কুল বহ্নিলিখা।

কল্পসূত্রে লিখিত আছে, আর্য্যসুহস্তীর অন্যতম শিষ্য ব্যাঘ্রাপত্যগোত্র সুস্থিত সুপ্রতিবুদ্ধ অপর নাম কৌটিক ও কাকন্দক হইতে কৌটিকগণ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই গণে চারিটী শাখা ও চারিটী কুল, তন্মধ্যে বইরি বা বজ্রী শাখা এবং বাণিজ কুলের উল্লেখ আছে, কিন্তু অন্যান্য কুলের উল্লেখ নাই। কল্পসূত্রের মতে, উক্ত স্থবিরদ্বয়ের অন্যতম [illegible] প্রবগহ্ন মধ্যমা শাখা স্থাপন করেন। জৈন পট্টাবলীমতে, বীরাব্দে ৩১৩ বর্ষে (২১৪ পূর্ব্বাব্দে) সুপ্রতিবুদ্ধের গুরু ব্রাতা সুস্থিত মোক্ষলাভ করেন।

যাহা হউক কল্পসূত্র ও জৈনগ্রন্থ হইতে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, যে [illegible] দুই শতবর্ষের পূর্ব্বে জৈনসম্প্রদায় মধ্যে নানা শাখার ও শ্রেণীর বিভাগ ঘটিয়াছিল। [illegible] সুপ্রাচীন শিলালিপিসমূহ তাহারই সমর্থন করিতেছে।

এইবার আমরা কয়েকটী নানাসাময়িক প্রমাণ দ্বারা দেখাইতেছি যে জৈন ধর্ম্ম [illegible] এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত খৃষ্ট জন্মের দুই তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে প্রচারিত ছিল।

মথুরার কঙ্কালি-টিলা হইতে আবিষ্কৃত আর একখানি পূর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতর শিলা-লিপিতে লিখিত আছে—

নমো অরহংতানং নমো সিদ্ধান সং ৬২
গ্র ৩ দি ৫ এতায়ে পুর্বায়ে বারকস্য অর্যককসঘস্তস্য
শিষ্যা আতপিকোগহবর্যস্য নির্বর্ত্তন চতুর্বর্ণস্য সংঘস্য
যা দিন্না পটিভাগ ১। বৈহিকায়ে দত্তি।

'অর্হৎগণকে নমস্কার, সিদ্ধগণকে নমস্কার। সংবৎ ৬২ [১], গ্রীষ্ম ৩, দিন ৫। এই দিনে বাচ্-বাসী আর্য্য বকর্কশঘর্ষিতের শিষ্য আতপিকগ্রহবর্য্যের নির্বর্ত্তন। বহিকার দান।'

এতদ্ভিন্ন জুনাগড়ের উপরকোটের প্রাচীনতম লিপিতে 'কেবলীজ্ঞান সংপ্রাপ্তানাং' খণ্ডগিরিস্থ হাতিগুম্ফার প্রসিদ্ধ শিলালিপিতে অর্হৎ প্রভাব, এবং বরাবর শৈলের অশোক-লিপি ও নাগার্জ্জুনী শৈলের অশোক পৌত্র দশরথের শিলালিপিতে জৈন সন্ন্যাসী আজীবক-গণের প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইতেছে সম্রাট অশোকের সময়ে ও কিছু পরে জৈনগণ আমাদের বাঢ় দেশ হইতে গুজরাত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

বুদ্ধ দেবের জীবন-চরিত।

(সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত)

হিন্দু শাস্ত্রে ভগবানের প্রধানতঃ দশ অবতার স্বীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে বুদ্ধদেব নবম অবতার। দশ অবতারের নাম নিম্নে লিখিত হইল।

মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী চ তে দশ॥

প্রথমতঃ মৎস্য অবতার। দ্বিতীয়তঃ কূর্ম্ম। বরাহ তৃতীয় অবতার। চতুর্থ অবতারের নাম নৃসিংহ। বামন পঞ্চম অবতার। পরশুরাম ষষ্ঠ অবতার। রামচন্দ্র সপ্তম অবতার। বলরাম অষ্টম অবতার। নবম অবতার বুদ্ধ। কল্কী দশম অবতার।

সাহিত্যদর্পণকার এই দশ অবতার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

বস্ত্রাদীকৃত শফসীন্নি মলধিঃ পৃষ্ঠে জগন্মণ্ডলং
দংষ্ট্রায়াং ধরণী নখে দিতিসুতাধীশঃ পদে রোদসী।

---

[১] ডাক্তার বুহলার (Buhler) সাহেবের মতে, এই সংবৎ শকদিগের সংবৎজ্ঞাপক নহে। এই অক্ষরের আকার দেখিয়ে তাহারও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়।

ক্রোধে ক্ষত্রগণঃ পরে দশমুখঃ পাপৌ প্রলম্বাসুরো
ধ্যানে বিশ্বসমাবহার্মিককুলং কল্কিচিরস্মৈ নমঃ।

মৎস্য অবতারে যাঁহার শঙ্খাবৃত দেহে মহাসমুদ্র বিলীন হইয়াছিল, কূর্ম অবতারে যিনি জগন্মণ্ডল পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন, বরাহ অবতারে যিনি দন্তাগ্রভাগ দ্বারা ধরণীকে উত্তোলন করিয়াছিলেন, নৃসিংহ অবতারে যিনি নখ দ্বারা হিরণ্যকশিপুকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, বামন অবতারে যিনি পদ দ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন, পরশুরাম অবতারে যিনি ক্রোধের বশে ক্ষত্রিয়গণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, বলরাম অবতারে যিনি হস্তদ্বারা প্রলম্বাসুরকে নিপাতিত করিয়াছিলেন, বুদ্ধ অবতারে যিনি ধ্যানের প্রভাবে সমগ্র বিশ্ব অধিকার করিয়াছিলেন, কল্কী অবতারে যিনি অধার্ম্মিক লোকসমূহকে খড়্গ দ্বারা নিহত করিবেন, তিনি যিনিই হউন, তাঁহাকে আমরা নমস্কার করি।

জয়দেব দশাবতারস্তোত্রে বুদ্ধাবতার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে।

হে কেশব, তুমি বুদ্ধশরীর ধারণ পূর্ব্বক দয়ার্দ্রচিত্তে পশুহিংসায় অপকারিতা প্রদর্শন করিয়া যজ্ঞবিধায়ক মন্ত্রসমূহের নিন্দা করিয়াছ। হে জগদীশ হরি, তোমার জয় হউক।

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে, ভগবানের অবতারের সংখ্যা একবিংশতি। নারায়ণ প্রথমতঃ ব্রাহ্মণরূপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন। দ্বিতীয় বারে বরাহরূপে অবতীর্ণ হন। তৃতীয় বারে নারদরূপ ধারণ করেন। চতুর্থ বারে নারায়ণরূপে অবতীর্ণ হন. কপিল পঞ্চম অবতার। ষষ্ঠ অবতার দত্তাত্রেয়। সপ্তম বারে আকূতির গর্ভে যজ্ঞ নামে অবতীর্ণ হন। অষ্টম অবতার ঋষভ। নবম অবতার পৃথু। দশম অবতারে মৎস্যরূপ ধারণ করেন। কূর্ম একাদশ অবতার। দ্বাদশ অবতারে ধন্বন্তরি। ত্রয়োদশ বারে মোহিনী রূপ ধারণ করেন। নৃসিংহ চতুর্দ্দশ অবতার। বামন পঞ্চদশ অবতার। পরশুরাম ষোড়শ অবতার। ব্যাস সপ্তদশ অবতার। রামচন্দ্র অষ্টাদশ অবতার। একোনবিংশ বারে নারায়ণ বাসুদেবরূপ গ্রহণ করেন। বিংশে কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে; ভগবান্ এই যুগে গয়া প্রদেশে অঞ্জনের পুত্র বুদ্ধ নামে অবতীর্ণ হইবেন। কলিযুগের শেষ কালে নারায়ণ বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে কল্কিরূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন।

বিষ্ণু পুরাণের তৃতীয় অংশের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে বুদ্ধ মায়ামোহ নামে অভিহিত হইয়াছেন। বিষ্ণু পুরাণে বর্ণিত আছে যে ভগবান্ স্বীয় শরীর হইতে মায়ামোহ উৎপাদন করিয়া দেবগণকে কহিলেন :—এই মায়ামোহ সমুদায় দৈত্যগণকে মোহিত করিবে, দৈত্যগণ বেদমার্গবিহীন হইলে তোমরা অনায়াসে উহাদিগকে বধ করিতে পারিবে।

অনন্তর মায়া-মোহ নর্ম্মদা নদীতীরে গমন করিয়া দেখিলেন, সেখানে অসুরগণ তপস্যা করিতেছে। অসুরদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন হে দৈত্য-পতি-গণ, তোমরা কেন তপস্যা করিতেছ? যদি তোমরা ঐহিক বা পারত্রিক ফল ইচ্ছা কর, তাহাহইলে আমার বাক্যানুসারে কর্ম্ম কর। আমি যে ধর্ম্মের উপদেশ করিব, উহাই মুক্তির উপযোগী। উহ হইতে শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম আর নাই। এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে স্বর্গ বা মুক্তি যাহ অভিলাষ কর তাহাই পাইবে। মায়া-মোহের প্ররোচনায় দৈত্যগণ বেদমার্গ হইতে বহিষ্কৃত হইল। এটি ধর্ম্ম এটি অধর্ম্ম, এইটি সৎ এটাট অসৎ, ইহাতে মুক্তি হয় উহাতে মুক্তি হয় না, এইটি পথমার্গ ওটি অপথ, ইহা দিগম্বরদিগের ধর্ম্ম উহা বস্ত্রবস্ত্র মনুষ্যের ধর্ম্ম, এইরূপ নানা সন্দেহজনক বাক্য বলিয়া মায়া-মোহ দৈত্যগণকে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করাইল। মায়া-মোহ বলিয়াছিল "হে দৈত্য-গণ, তোমরা মদুক্ত ধর্ম্ম অর্হত অর্থাৎ মান্য কর"। এই জন্য যাহারা মায়ামোহ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহারা আর্হত নামে খ্যাত হয়। মায়ামোহের ধর্ম্ম ক্রমে বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িল। অনন্তর মায়ামোহ অসুরগণকে বলিল, যদি নির্ব্বাণ লাভ করা তোমাদিগের বাঞ্ছনীয় হয়, অথবা যদি তোমরা স্বর্গ কামনা কর, তাহা হইলে পশুহিংসা প্রভৃতি দুষ্ট ধর্ম্ম ত্যাগ কর এই জগৎপ্রবাহ বিজ্ঞানময় বলিয়া অবগত হও। এই জগতের কোন আধার নাই, ইহা নিশ্চিত জানিও। ইত্যাদি।

এইরূপে অগ্নিপুরাণ বায়ুপুরাণ প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থসমূহে বুদ্ধাবতার সম্বন্ধে নানা বৃত্তান্ত উল্লিখিত হইয়াছে।

বল্লভাচার্য্য বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ষড়্‌বিংশ সূত্রের ব্যাখ্যায় নিম্নলিখিত আখ্যায়িকা উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

অভাবপদার্থ হইতে ভাবপদার্থের উৎপত্তি হয় এই মত খণ্ডন করিয়া ভগবান্ ব্যাস বেদসমূহের প্রামাণ্য সংস্থাপন করেন। তদনন্তর ভগবান্ বুদ্ধ দৈত্যগণকে বিমূঢ় করিবার জন্য প্রবৃত্ত হন। বুদ্ধ দেব রুদ্ররূপী মহাদেবকে সম্বোধন করিয়া বলেন :—

ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়।
অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ।
প্রাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।

হে মহাবাহো রুদ্র, আপনি মোহশাস্ত্র সমূহ বিরচন করুন। হে মহাভুজ, আপনি অতথ্য ও বিতথ্য ব্যাপার সমূহ প্রদর্শন করুন। আপনি কতকগুলি কল্পিত শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়া যাহাতে লোক সকল আমার প্রতি বিমুখ হয় তাহা করুন। বুদ্ধদেবের আদেশ অনুসারে মহাদেব প্রভৃতিও স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হইয়া বৈদিকধর্ম্মে প্রবেশ পূর্ব্বক লোকের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত বেদসমূহের যথার্থ ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর তাঁহারা অস্তি ও নাস্তির অতীত অবিদ্যা নামক পদার্থকে জগৎপ্রবাহের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এবং সেই অবিদ্যার নিবৃত্তিতেই নির্ব্বাণ লাভ হয়, এই কথা বলিয়া কতকগুলি জাতিভ্রষ্ট সন্ন্যাসী ও পাষণ্ডের সৃষ্টি

করেন। এই সকল দেখিয়া ব্যাস তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। ব্যাস শঙ্করের তাহা সহ্য করিয়া উহাঁকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন ও তদনন্তর মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলেন। মহাদেব এইরূপে জগৎকে বিমুগ্ধ করিলেন ও ব্যাস তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন দেখিয়া আমি—অগ্নিদেব—এখানে উপস্থিত হইয়াছি। বৈদিকমার্গের সমুদ্ধারের অভিপ্রায়ে আমি বেদের সূত্রসমূহ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি। বেদসমূহের উদ্ধার করিয়া আমি সমস্ত মোহ নিবারণ করিয়াছি।

পক্ষান্তরে বৌদ্ধগ্রন্থকারগণ বুদ্ধদেবের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

অমরসিংহ স্বীয় অমরকোষের প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের নামের পূর্ব্বেই বুদ্ধের নাম কীর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছেন :—

সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ।
সমন্তভদ্রো ভগবান্ মারজিৎ লোকজিৎ জিনঃ।
ষড়ভিজ্ঞো দশবলোঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ।
মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্তা মুনিঃ শাক্যমুনিশ্চ যঃ।
স শাক্যসিংহঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ শৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ।
গৌতমশ্চার্কবন্ধুশ্চ মায়াদেবীসুতশ্চ সঃ।

বঙ্গদেশীয় প্রাচীন বৌদ্ধকবি রামচন্দ্র কবিভারতী ভক্তিশতক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

ব্রহ্মাঽবিদ্যাভিভূতো মুরবিগমমহামায়য়ালিলিতোঽসৌ
বিষ্ণুর্মায়াভিরেকাৎ নিজবপুষি যঃ পার্ব্বতী শঙ্করেণ।
যীতাবিদ্যো বিমায়ো জগতি স ভগবান্ বীতরাগো মুনীন্দ্রঃ
কঃ সেব্যো বুদ্ধিমদ্ভির্বদত মে ভ্রাতরস্তেষু মুক্ত্যৈ।

ব্রহ্মা অবিদ্যা দ্বারা অভিভূত; বিষ্ণু মহামায়ার আলিঙ্গনে বিমুগ্ধ; শঙ্কর আসক্তিবশতঃ পার্ব্বতীকে নিজদেহে ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুনিপুঙ্গব বুদ্ধ অবিদ্যা, মায়া ও আসক্তি এই সমস্ত হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত।

বিদেহনামক কবি সমন্তকূটবর্ণনা নামক পালিগ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

সততবিততকিত্তিং ধ্বস্তকন্দর্পদর্পং
হিতবহিতবিধানং সব্বলোকেককেতুং।
অমিতমতিমনঞ্জং সন্তিদং সেকসারং
সুগতমহমুদারং রূপসারং নমামি।

যাঁহার কীর্ত্তি সর্ব্বতোবিস্তৃত, যিনি কন্দর্পের দর্প ধ্বংস করিয়াছেন, যিনি হিতসাধনে হিতসাধন করিয়াছেন, যাঁহার হৃদয় মেরুর ন্যায় সারবিশিষ্ট, এবং যিনি লোকসমাজের কেতুস্বরূপ, সেই অমিতবুদ্ধিশালী, মনোহর, শান্তিদাতা, রূপবান্ ও উদার সুগতকে নমস্কার করি।

কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধকবি ক্ষেমেন্দ্র অবদানকল্পলতায় বুদ্ধজন্ম নামক পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন :—

হসতি সকললোকালোকসর্গায় ভানুঃ
পরমমমৃতবৃষ্ট্যৈ পূর্ণতামেতি চন্দ্রঃ।
ইয়তি জগতি পূজ্যং জন্ম গৃহ্লাতি কশ্চিৎ
বিপুলকুশলসেতুঃ সত্ত্বসন্তারণায়।

সমগ্র জগতে আলোক প্রদানের নিমিত্ত সূর্য্য উদিত হন ; পরম অমৃত বর্ষণ করিবার জন্য চন্দ্র পূর্ণতা লাভ করেন ; এই জগতে জীবগণের উদ্ধারসাধনের অভিপ্রায়ে পুণ্যসেতু নির্ম্মাণ করিবার জন্য পূজনীয় মহাজন জন্মগ্রহণ করেন।

অবদানকল্পলতার মহাকাশ্যপাবদান নামক ত্রিষষ্টিসংখ্যক পল্লবের প্রারম্ভে ক্ষেমেন্দ্র লিখিয়াছেন :—

শক্রযমবরুণাদয়ঃ সুরাঃ
বিক্রিয়াং মুনিবরাশ্চ যৎকৃতে।
যাতি তৎ সুরসুখং তৃণায়তে
যস্য কস্য ন স বিস্ময়াস্পদম্।

ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ ও প্রধান প্রধান মুনিগণ যে কামসুখের নিমিত্ত বিকৃত-চিত্ত হইয়া পড়েন, সেই কামসুখকে যিনি তৃণের ন্যায় তুচ্ছ করিতে পারেন, তিনি কাহার বিস্ময়ের পাত্র নহেন।

বুদ্ধচরিত কাব্যের প্রারম্ভে অশ্বঘোষ বুদ্ধকে নমস্কার করিয়া লিখিয়াছেন :—

শ্রিয়ং পরার্ঘ্যাং বিদধদ্ বিধাতৃজিৎ
তমো নিরস্যন্নভিভূতভানুভৃৎ।
সুদগ্নিদাঘং জিতচারুচন্দ্রমাঃ
স বন্দ্যতেঽর্হন্ ইহ যস্য নোপমা।

যিনি পরম সম্পদ লাভ করিয়া বিধাতাকে জয় করিয়াছেন, সংসারের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করিয়া যিনি সহস্ররশ্মিকে পরাভূত করিয়াছেন, লোকের শোকসন্তাপ নিবারণ করিয়া যিনি মনোহর চন্দ্রমাকে অতিক্রম করিয়াছেন, বস্তুতঃ জগতে যাঁহার উপমা নাই, সেই বুদ্ধকে বন্দনা করি।

এসিয়া মহাদেশের প্রায় সর্ব্বপ্রদেশে ও সর্ব্বভাষায় বুদ্ধদেবের জীবনচরিত লিপিবদ্ধ আছে। ললিতবিস্তর সূত্র, বুদ্ধচরিত কাব্য, লঙ্কাবতার সূত্র, অবদানকল্পলতা প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ ; মহাবংস, মহাপরিনিব্বান সুত্ত, মহাবগ্গ, জাতক ইত্যাদি পালিগ্রন্থ ; Fo-pan-hhing-tsi-cin প্রভৃতি চীন গ্রন্থ ; Shaka-jitsu-roku প্রভৃতি জাপানী গ্রন্থ ; মললংগর বত্থু প্রভৃতি ব্রহ্মদেশীয় গ্রন্থ ; গ-ঢের-রোল-প (ক্যাঙ্‌গ্যুরের সূত্র

পিটকের খ অধ্যায়) নামক তিব্বতীয় গ্রন্থ; ইত্যাদি গ্রন্থের মত অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে।

পরলোকগত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ললিতবিস্তর গ্রন্থ এসিয়াটিক সোসাইটীর দ্বারা মুদ্রিত করেন। রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি. আই, ই, ও পণ্ডিত হরিমোহন বিদ্যাভূষণ নির্বাণকল্পলতার তিব্বতীয় বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত করেন। ভদ্রাবতারসূত্র আমি ও রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর কলিকাতা বুদ্ধিষ্ট টেক্‌সট সোসাইটীর গ্রন্থাবলী মধ্যে প্রকাশিত করিতেছি। কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ই, বি, কাউএল্ ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বুদ্ধচরিত কাব্যের এক উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। ফরাসীদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক সেনার্ট সুবিপুল মহাবংশ গ্রন্থের শেষ খণ্ড সংপ্রতি সমাপ্ত করিয়াছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিত জর্জ টার্নার মহাবংশ নামক পালি গ্রন্থের প্রথম সপ্তত্রিংশৎ অধ্যায় মুদ্রিত করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন; অনন্তর সিংহলদেশীয় পণ্ডিত সুমঙ্গল মহাথেরো ঐ গ্রন্থের অবশিষ্ট ত্রিষষ্টিসংখ্যক অধ্যায়ের মুদ্রণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। অধ্যাপক চাইল্ডার্স মহাপরিনিব্বানসুত্ত নামক প্রাচীন পালি গ্রন্থের সংস্করণ কার্য্য রোমান্ অক্ষরে সম্পাদন করেন, এবং ঐ গ্রন্থ লণ্ডন রয়াল এসিয়াটিক্ সোসাইটীর ব্যয়ে মুদ্রিত হয়। যাঁহার সুগভীর প্রাচ্য ভাষাভিজ্ঞতায় সমগ্র ইউরোপ গৌরবান্বিত, ডেন্‌মার্ক দেশীয় সেই জগদ্বিখ্যাত পালিপণ্ডিত ডাক্তার ফৌসবোল্ জাতক নামক পালিগ্রন্থ রোমান্ অক্ষরে মুদ্রিত করিয়াছেন।

Fo-pen-hhing-tsi-cin নামক চীন গ্রন্থ, Shaka-jitsu-roku নামক জাপানী গ্রন্থ, ও সদ্ধর্মলঙ্কারবস্তু নামক ব্রহ্মদেশীয় গ্রন্থ, বহুবার চীন, জাপান ও ব্রহ্মদেশে মুদ্রিত হইয়াছে। ক্যাঙ্গুর নামক সুপ্রসিদ্ধ তিব্বতীয় ধর্ম্মগ্রন্থনিচয়ের সূত্রপিটকের খ অধ্যায়ে গ-ছের্-রোল্-প নামে যে গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, উহা অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই।

বুদ্ধের জীবনচরিত সম্বন্ধে উপরে যে কয়েক খানি গ্রন্থের নাম লিখিত হইয়াছে, উহাদের প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে উহাদের মধ্যে কতকগুলি গ্রন্থ দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন গ্রন্থসমূহের সময়াবধারণ নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ। গ্রীস, সিংহল, চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশীয় প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থের লিখিত বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতীয় কবি ও দার্শনিকগণের আবির্ভাবকাল কিয়ৎ পরিমাণে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

দুই সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম চীনদেশে প্রচারিত হয় এবং ঐ সময় হইতে ভারতবর্ষের সহিত চীনদেশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটে। ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ চীন দেশে গমন করিয়া যে সকল ধর্ম্ম গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদিত করিতেন এবং চীন অক্ষরে যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া দিতেন, অথবা চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণ ভারতবর্ষে আগমন করিয়া যে সকল সংস্কৃতগ্রন্থ লইয়া যাইতেন, ঐ সকল গ্রন্থ চীন সম্রাট্‌গণ আজ পর্য্যন্ত রক্ষিত করিয়া

করিতেন; এবং ঐ গ্রন্থসমূহের সংগ্রহকর্ত্তা ও অনুবাদকর্ত্তার নাম ধাম ও সময় রাজকীয় পুস্তকের তালিকায় লিখিয়া রাখিতেন। এইরূপে খৃষ্টের প্রথম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত দ্বাদশ শতবর্ষ মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে বহুসংখ্যক প্রয়োজনীয় সংস্কৃত গ্রন্থ চীন দেশে গীত হয়। সংপ্রতি ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারির আদেশে অধ্যাপক মোক্ষমূলরের তত্ত্বাবধানে জাপানদেশীয় Hongwanzi বিহারের ধর্ম্মাধ্যক্ষ Bunyin Nanjio ঐ সকল গ্রন্থের চীনদেশে আনয়নকাল, উহাদের অনুবাদকাল, সংগ্রাহক ও অনুবাদকের নাম ধাম ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া এক সুবৃহৎ Catalogue প্রস্তুত করিয়াছেন। Bunyin Nanjio র উক্ত Catalogue এ ১৬৬২ খানি অতি প্রয়োজনীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই Catalogue এ লিখিত আছে, ললিতবিস্তর গ্রন্থ চারিবার চীনভাষায় অনুবাদিত হয়। শেষ হান্ বংশের রাজত্বকালে ২২১—২৬৩ খৃঃ অব্দ মধ্যে উহা একবার চীন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। Kai-yuen-shi-kian-mu-lu নামক চীন গ্রন্থের মতে প্রথম হান্ বংশীয় Wing-hing নামক রাজার রাজত্বকালে ৬৯ খৃঃ অব্দে ললিতবিস্তরের চীন-ভাষায় প্রথম অনুবাদ হয়। মূল সংস্কৃত ললিতবিস্তর অবশ্য ভারতে তাহার পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান ছিল।

বুদ্ধচরিত কাব্য উদীচ্য Liang বংশের রাজত্বকালে ৪১৪ খ্রীঃ অব্দ হইতে ৪২১ অব্দ মধ্যে ধর্ম্মরক্ষ নামক পণ্ডিতকর্ত্তৃক চীনভাষায় অনুবাদিত হয়। চীন পরিব্রাজক হুয়েন্ সাঙ্ নিজের ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন, যে চারিটী সূর্য্যের উদয়ে সমস্ত জগৎ আলোকিত হইয়াছে, বুদ্ধচরিত কাব্যপ্রণেতা অশ্বঘোষ উহাদের অন্যতম। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে বুদ্ধচরিতপ্রণেতা অশ্বঘোষ রাজা কনিষ্কের ধর্ম্মোপদেষ্টা ও তিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

পূর্ব্ব সুঙ্ বংশের রাজত্বকালে ৪৪৩ খৃঃ অব্দে গুণভদ্র নামক পণ্ডিত লঙ্কাবতারসূত্র চীন ভাষায় অনুবাদিত করেন। চীন পরিব্রাজক হুয়েন্ সাঙ্ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে তীর্থপর্য্যটনকালে লঙ্কাদ্বীপে গমন করেন। তিনি স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে অতি প্রাচীন কালে লঙ্কামলয়শিখরে আসীন হইয়া ভগবান্ বুদ্ধ লঙ্কাবতারসূত্রের উপদেশ করেন।

প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান্ পূর্ব্ব Tsing বংশের রাজত্বকালে ৩৯৭ হইতে ৪২০ খ্রীঃ অব্দ মধ্যে মহাপরিনির্ব্বান সূত্র একবার চীন ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন।

জাতক-নিদান নামক গ্রন্থ পশ্চিম Tsing বংশের রাজত্বকালে ২১৫ খৃঃ অব্দে চীন ভাষায় অনুবাদিত হয়।

৪১০-৪৩১ খৃঃ অব্দ মধ্যে মহানাম নামক পণ্ডিত পালি মহাবংসের পূর্ব্ব খণ্ড বিরচন করেন।

অভিনিষ্ক্রমণ সূত্র ৫৮৭ খ্রীঃ অব্দে Sui বংশের রাজত্বকালে ফানতওগুরুকর্তৃক চীনভাষায় অনুবাদিত হয়।

ক্ষেমেন্দ্রের অবদানকল্পলতা ১২০২ খ্রীঃ অব্দে তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়।

বুদ্ধের জীবনচরিত সম্বন্ধে অপর যে কয়েক খানি গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের রচনা ও যথাসম্ভব অনুবাদকাল ঐরূপে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে।

উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হয় যে বুদ্ধচরিতসম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থ দুই সহস্র বা দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে দেশান্তরিত ও ভাষান্তরিত হইয়াছিল। ভাষান্তরিত হইবার পূর্ব্বে ঐ সকল গ্রন্থ এদেশে বিদ্যমান ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতএব এক্ষণে বুদ্ধের যে জীবনবৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে, উহা অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণ যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

মহাবস্তু গ্রন্থে কোলিয় রাজবংশের উৎপত্তিবর্ণন অধ্যায়ে বুদ্ধদেবের জন্মসম্বন্ধে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে :—

সমন্ত নামধেয় কোন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। রাজা সমন্তের পুত্র কল্যাণ, তাহার পুত্র বর, বরের পুত্র উপোষধ, উপোষধের পুত্র মান্ধাতা। রাজা মান্ধাতার বংশ পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে বহুসহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

পশ্চিম পাকেত মহানগরে সুজাত নামক ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা রাজত্ব করিতেন। সুজাতের ওপুর, নিপুর, করকণ্ডক, উল্কামুখ ও হস্তিকর্ণীর্ষ নামক পাঁচ পুত্র এবং গুপ্তা, বিমলা, বিজিতা, ভদ্রা ও জয়ন্তী নামে পাঁচ কন্যা জন্মে।

রাজা সুজাত শ্রেষ্ঠী নামধেয় কোন বিলাসিনীর প্রতি আসক্ত হন। শ্রেষ্ঠীর গর্ভে জেন্ত নামক এক পুত্র জন্মে। একদা রাজা প্রীত হইয়া জেন্তীকে বলেন, আমি তোমাকে কোন বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি, তুমি যে বর প্রার্থনা করিবে, আমি উহাই প্রদান করিব। জেন্তী বলিল, মহারাজ, অগ্রে আমার পিতামাতাকে জিজ্ঞাসা করিব, তাঁহারা যে বর লইতে বলেন তাহাই প্রার্থনা করিব। তদনন্তর জেন্তী তাহার পিতামাতা ও ভ্রাতৃস্বজনগণের নিকট যাইয়া বলিল, রাজা আমাকে কোন বর প্রদান করিতে চাহিয়াছেন, আপনারা যে বর প্রার্থনা করিতে বলিবেন, রাজার নিকট আমি তাহাই যাচ্ঞা করিব। তখন যাহার যাহা অভিমত হইল সে তাহাই বলিল। কেহ বলিল, শ্রেষ্ঠি তুমি একটি উৎকৃষ্ট গ্রামের আধিপত্য প্রার্থনা কর, ইত্যাদি। অনন্তর পণ্ডিতা নিপুণা ও মেধাবিনী কোন বয়স্যা বলিলেন, জেন্তি, তুমি রাজার বিলাসিনী স্ত্রী; রাজার বাহু নাই যাহা দ্বারা তোমার পুত্রের কোনই প্রভুত্ব নাই; রাজা তোমাকে বর দিতে চাহিয়াছেন, ইহা তোমার সৌভাগ্যের বিষয়; তিনি অতিশয় সত্যবাদী, তাঁহার প্রতিজ্ঞা কখনই অন্যথা হয় না; তুমি তাঁহার নিকট বল, মহারাজ আপনার ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভসম্ভূত পাঁচটি কুমারকে রাজ্য হইতে বিপ্রোবিত করিয়া আমার গর্ভসম্ভূত জেন্ত নামক পুত্রকে যৌবরাজ্যে

অভিষিক্ত করুন; আপনার মৃত্যুর পর যাহাতে আমার পুত্র শাকেত মহানগরের রাজা হইতে পারে তাহার বিধান করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা। জেন্তী তাহাই করিল রাজা সুজাত জেন্তীর এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুর্শ্চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। তিনি তাঁহার পাঁচটী পুত্রকে অতিশয় ভাল বাসিতেন; উহাদিগকে কিরূপে রাজ্য হইতে বিদূরিত করিবেন স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অথচ জেন্তীর প্রার্থিত বর প্রদান না করিলে তাঁহার প্রতিশ্রুতিভঙ্গ হয়। তখন রাজা জেন্তীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:— তোমাকে প্রতিশ্রুত বর প্রদান করিতেছি; নগর ও জনপদের প্রজাপুঞ্জ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছে যে আমি আমার পঞ্চ পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিয়া তোমার পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। নগর ও জনপদের লোকসকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছে তাহারা আমার পঞ্চ পুত্রের সহ বনে গমন করিবে। রাজা প্রজাগণের অভিপ্রায় পূর্ণ করিলেন। প্রজা-গণ বলবাহনসমন্বিত হইয়া যথার্থই উক্ত পঞ্চকুমারের সহ গমন করিল। তাহারা শাকেত নগর হইতে নির্গত হইয়া উত্তরাভিমুখে ধাবমান হইল। কতিপয় দিবসের পর কাশিকোশলের রাজা উহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া স্বীয় রাজ্যে লইয়া গেলেন। উহারা কিয়ৎকাল কাশিকোশল রাজ্যে অবস্থিতি করিল। অনন্তর কাশিকোশলের রাজা ভাবিতে লাগিলেন, এই মহাজনকায় এই পঞ্চকুমারের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত, ইহারা যদি দীর্ঘ-কাল এই স্থানে বাস করে, তাহা হইলে হয়ত আমার প্রাণ সংহার করিয়া পঞ্চকুমারকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবে। এইরূপে ঈর্ষ্যার বশবর্ত্তী হইয়া রাজা ঐ মহাজনকায় ও পঞ্চকুমারকে কাশিকোশল রাজ্য হইতে বিপ্রোষিত করিলেন।

অনন্তর উহারা হিমালয় পর্ব্বতের প্রত্যন্তপ্রদেশে শাকোটবনখণ্ডস্থিত ঋষি কপিলের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ঐ স্থানে বাস করিতে লাগিল। সেখানে উহারা পরস্পরের ভগিনী, ভাগিনেয়ী ইত্যাদির সহ পরস্পরের পরিণয় কার্য্য সম্পাদিত করিল। রাজা সুজাত বণিকদিগের মুখে শুনিতে পাইলেন, তাঁহার পুত্রগণ অনুহিমবৎ প্রদেশে শাকোট বনখণ্ডে ঋষি কপিলের আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছে, এবং উহারা ঐ স্থানে পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে. তখন রাজা স্বীয় পুরোহিত ও অমাত্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমারগণ যেরূপ প্রণালীতে বিবাহ করিয়াছে, উহা শক্য অর্থাৎ ধর্ম্মসঙ্গত কি না? পুরোহিতপ্রমুখ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ বলিলেন, কুমারেরা এক্ষণে যেরূপ অবস্থায় অবস্থিত, তাহাতে ঐরূপ বিবাহাদি শক্য অর্থাৎ ধর্ম্মসঙ্গত। ব্রাহ্মণগণ ঐরূপ কার্য্য শক্য মনে করিয়াছিলেন বলিয়া কুমারগণের নাম শাক্য হইল। তদবধি কুমারগণ শাক্য নামে পরিচিত হইলেন। তদনন্তর ঐ শাক্যকুমারগণ ঋষি কপিলের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক এক মহানগর নির্ম্মাণ করিলেন। কপিল ঋষি উহাদিগকে বাসস্থান প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ নগর কপিলবাস্তু নামে প্রসিদ্ধ হইল। উক্ত পঞ্চকুমারের মধ্যে ওপুর জ্যেষ্ঠ। তিনি কপিলবাস্তু নগরের রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন; রাজা ওপুরের পুত্র নিপুর,

শাক্যকন্যাকে আহ্বান করিয়া আশ্রমপদে লইয়া গেলেন। উক্ত কোল ঋষির ঔরসে ও শাক্যকন্যা অমিতার গর্ভে দ্বাত্রিংশৎ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। উহাদের আকৃতি অতি মনোরম এবং উহারা সকলেই অজিন জটা ধারণ করিয়াছিল। অনন্তর অমিতা তাঁহার পুত্রগণকে বলিলেন, তোমাদের মাতামহ কপিলবাস্তুনগরের রাজা, অতএব তোমরা সেই স্থানে গমন কর। পিতামাতার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক কুমারগণ কপিলবাস্তু নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। কপিলবাস্তু নগরের শাক্যগণ ঋষিকুমারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে? কোথা হইতে এখানে আগত হইয়াছে? তাহারা বলিল, অনুহিমবৎ প্রদেশে কোল নামে যে রাজর্ষি বাস করেন আমরা তাঁহার পুত্র ও শাক্যরাজ সিংহহনুর দৌহিত্র। মামাদের মাতা সিংহহনুর দুহিতা। শাক্যগণ এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে যে কুষ্ঠরোগগ্রস্তা অমিতাকে নির্ব্বাসন করিয়াছিলেন, তিনি রোগ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার গর্ভে ঋষিকুমারগণের উৎপত্তি হইয়াছে জানিয়া তাঁহাদের আহ্লাদের সীমা থাকিল না। তাঁহারা ঐ কুমারগণকে প্রভূত দান করিলেন ও শাক্যকন্যা-গণের সহ উহাদের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল। কোল নামক ঋষির ঔরসে কুমারগণের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া উহাদের বংশ কোলির বংশ নামে খ্যাতিলাভ করিল।

শাক্যগণের দেবদহ নামে একটী জনপদ ছিল। সেখানে সুভূতি নামে এক সমৃদ্ধিশালী শাক্যরাজ বাস করিতেন। পূর্ব্বোক্ত কোলিয়বংশীয় কোন কন্যার সহিত সুভূতির বিবাহ হয়। সুভূতির মায়া, মহামায়া, অতিমায়া, অনন্তমায়া, চূলীমা, কোলীসোবা ও মহা-প্রজাবতী নামে সাতটী কন্যা জন্মে। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে সিংহহনু কপিলবাস্তুর সিংহা-সনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সিংহহনুর শুদ্ধোদন, শুক্লোদন, ধৌতোদন ও অমৃতোদন নামক চারি পুত্র ও অমিতানাম্নী কন্যা জন্মিয়াছিল। সিংহহনুর পরলোকপ্রাপ্তির পর শুদ্ধোদন কপিলবাস্তুর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। পূর্ব্বোক্ত দেবদহের রাজা সুভূতির যে পাঁচটী কন্যা জন্মিয়াছিল, শুদ্ধোদন উহাদের মধ্যে দুইটীকে বিবাহ করেন। এই দুই কন্যার নাম মায়া ও মহাপ্রজাবতী। শুদ্ধোদনের ঔরসে ও মায়ার গর্ভে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়।

কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধকবি ক্ষেমেন্দ্র অবদানকল্পলতা নামক গ্রন্থে শাক্যোৎপত্তি ও বুদ্ধজন্ম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত করিয়াছেন :—

পূর্ব্বে বসুন্ধরা ঘোরতমসাবৃত ও জলমগ্ন ছিল। ক্রমে জলভাগ ঘনীভূত হইতে লাগিল ও স্থলভাগের উৎপত্তি হইল। অন্ধকার বিলুপ্ত হইলে পৃথিবী প্রাণিগণের আবাসযোগ্য হইল। ক্ষত্রিয়বংশে মহাসম্মত নামে রাজা জন্মগ্রহণ করিলেন। মহাসম্মতের উপোষধ নামে পুত্র জন্মে। উপোষধের পুত্র রাজা মান্ধাতা। মান্ধাতার বংশ বহুসহস্র বৎসর রাজত্ব করেন। ঐ বংশে কুকি নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করেন। কুকির বংশে কাশ্যপ ও কাশ্যপের বংশে ইক্ষ্বাকু জন্মগ্রহণ করেন। ইক্ষ্বাকুর বংশে বিরূঢ়কের জন্ম হয়। বিরূঢ়ক কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতি প্রীতিবশতঃ অপর পুত্রগণকে নির্ব্বাসিত করেন। তখন তাহারা

স্বদেশের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া ঋষি কপিলের আশ্রমে গমন করেন। ঋষি ঐ কুমারগণের আবাসের নিমিত্ত কপিলবাস্তু নামে এক নগর নির্ম্মাণ করেন। কিছুকাল গত হইলে রাজা বিকটক অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি কুমারদিগকে প্রত্যানয়ন করিবার জন্য অমাত্যগণকে আদেশ করিলেন। তখন মন্ত্রিগণ নিবেদন করিলেন মহারাজ কুমারগণ উৎকৃষ্ট নগরের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে উহাদের প্রত্যানয়ন করা অশক্য। রাজা বিকটক চিন্তা করিতে লাগিলেন, কুমারগণের প্রত্যানয়ন সহজ, কি অশক্য। তিনি এইরূপে শক্যাশক্য নিচিন্তন করিয়াছিলেন বলিয়া কুমারগণ শাক্য নামে পরিচিত হইলেন। তাঁহাদের বংশ শাক্যনামে খ্যাত হয়। এই বংশে ক্রমে পঞ্চবিংশতি সহস্র নৃপতি জন্মগ্রহণ করেন। পরিশেষে ঐ বংশে রাজা দশরথের জন্ম হয়। দশরথের বংশে সিংহহনু জন্মগ্রহণ করেন। সিংহহনুর শুদ্ধোদন, শুক্লোদন, দ্রোণোদন ও অমৃতোদন নামে চারিপুত্র ও শুদ্ধা, শুক্লা, দ্রোণী ও অমৃতা নামে চারি কন্যা জন্মে; শুদ্ধোদনের ঔরসে ও মহামায়ার গর্ভে ভগবান্ বুদ্ধের জন্ম হয়।

অবদানকল্পলতায় বুদ্ধদেবের জীবনচরিত সম্বন্ধে অপর যে সকল বৃত্তান্ত লিখিত আছে, উহার সহিত ললিতবিস্তর গ্রন্থে বর্ণিত বৃত্তান্তের কোন বিশেষ পার্থক্য নাই। দুই একটী স্থলে সামান্য কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। অবদানকল্পলতার মতে বুদ্ধের পত্নীর নাম যশোধরা, কিন্তু ললিতবিস্তরের মতে উহাঁর নাম গোপা।

সিংহলের ইতিহাস মহাবংস নামক পালি গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বুদ্ধজন্ম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়:—

কল্পের প্রারম্ভে মহাসম্মত নামে এক রাজা বিদ্যমান ছিলেন; তাঁহার বংশে রোজ, বরোজ, কল্যাণ, বরকল্যাণ, উপোষধ, মান্ধাতা, বরমান্ধাতা, চরক, উপচরক, চৈল, মুচল, মহামুচল, মুচলিন্দ, সগর, সাগরদেব, ভরত, ভাগীরথ, রুচি, সুরুচি, প্রতাপ, মহাপ্রতাপ, প্রণাদ, মহাপ্রণাদ, সুদর্শন, মহাসুদর্শন, নেরু এবং মহানেরু নামে রাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর তদ্বংশীয় ১০০, ৫৬, ৬০, ৮৪০০০, এবং ৩৬ জন রাজা বিভিন্ন প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তদনন্তর ৩২,২৮,২২, ১৮, ১৭, ১৫, ১৪, ৯, ৭, ১২, ২৫,১২, ১১ এবং ৯ জন রাজা বিভিন্ন রাজধানীতে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইহাদের শেষ রাজার নাম ওক্কাহ (উল্কাহ)। ওক্কাহের পুত্র ওক্কামুখ (উল্কামুখ)। উল্কামুখের বংশে নিপুত্র, ছন্দোযান, ছন্দোমুখ, শ্রীসঞ্জয়, বেশ্মান্তর, চামি, সিংহবাহন ও সিংহহনু নামে রাজা প্রাদুর্ভূত হন। সিংহহনুর বংশে ৮২০০০ রাজা যথাক্রমে জন্মগ্রহণ করেন। শেষ রাজার নাম জয়সেন। শাক্যরাজ জয়সেন কপিলবাস্তু নগরে রাজত্ব করিতেন। জয়সেনের পুত্রের নাম সিংহহনু ও কন্যার নাম যশোধরা।

দেবদহ নগরে দেবদহ নামে এক শাক্যরাজ বাস করিতেন। দেবদহের অঞ্জন নামে এক পুত্র ও কাঞ্চনা নামে এক কন্যা জন্মে। পূর্ব্বোক্ত সিংহহনুর সহ কাঞ্চনার বিবাহ

হয় এবং অঞ্জন পূর্ব্বোক্ত যশোধরার পাণিগ্রহণ করেন। অঞ্জনের মায়া ও মহাপ্রজাবতী নামে দুই কন্যা এবং দণ্ডপাণি ও সুপ্রবুদ্ধ নামে দুই পুত্র জন্মে।

সিংহহনুর শুদ্ধোদন, ধৌতোদন, শুক্লোদন ও অমৃতোদন নামক চারিপুত্র এবং অমিতা ও প্রমিতা নামে দুই কন্যা জন্মে।

সুপ্রবুদ্ধ অমিতার পাণিগ্রহণ করেন এবং তাঁহার সুভদ্রকাঞ্চনানাম্নী কন্যা ও দেবদত্ত নামক পুত্র জন্মে।

শুদ্ধোদনের সহ মায়া ও মহাপ্রজাবতী উভয়েরই বিবাহ হয়। শুদ্ধোদনের ঔরসে ও মায়ার গর্ভে সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। সিদ্ধার্থই পরিশেষে বুদ্ধ এই নামে পরিচিত হন।

খৃঃ পূঃ ৬২৩ অব্দে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়।

সিদ্ধার্থের সহ পূর্ব্বোক্ত সুভদ্রকাঞ্চনার বিবাহ হয়। তাঁহাদের রাহুল নামে এক পুত্র জন্মে।

মগধ-রাজ বিম্বিসারের সহ সিদ্ধার্থের অকপট বন্ধুত্ব উৎপন্ন হয়। বিম্বিসার অপেক্ষা সিদ্ধার্থ পাঁচ বৎসর বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। ঊনত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির আশয়ে গৃহ হইতে অভিনিষ্ক্রমণ করেন। ছয় বৎসর কাল অবিশ্রান্তভাবে জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তদনন্তর বুদ্ধ বিম্বিসারের নিকট গমন করেন। পোনের বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিম্বিসার মগধের সম্রাট্ হন। ষোল বৎসর রাজত্ব করিবার পর অর্থাৎ একত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি বুদ্ধের ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সাতষট্টি বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিম্বিসার স্বীয় পুত্র অজাতশত্রু কর্ত্তৃক নিহত হন। অজাতশত্রুর রাজ্যগ্রহণের আট বৎসর পরে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণলাভ করেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সিদ্ধার্থ ঊনত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে গৃহত্যাগ করিয়া ছয় বৎসর-কাল ধ্যান, সমাধি ইত্যাদিতে নিমগ্ন থাকেন। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে মগধরাজ্যে উরুবেল নামক স্থানে বোধিক্রমমূলে বৈশাখমাসের পূর্ণিমা তিথিতে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তদনন্তর সপ্তাহ ঐ স্থানে অবস্থিতি করিয়া বারাণসী নগরীতে গমন করেন। সেখানে সাতি জন লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। কিয়ৎকাল পরে ত্রিশ জন রাজা তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তদনন্তর মহাকাশ্যপ নামক সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ দার্শনিককে দীক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি মগধরাজ্যে পুনরাগমন করেন। সেখান হইতে তিনি লঙ্কাদ্বীপে গমন করেন এবং ঐ দ্বীপের অসংখ্য লোক তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করে। ৪।৫ বৎসর পরে তিনি নাগদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পর ৪৫ বৎসর কাল তিনি এইরূপে বিভিন্ন প্রদেশে বিচরণ করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম প্রচারিত করেন। অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে খৃঃ পূঃ ৫৮৩ অব্দে বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে কুশীনগরের কোন শালবৃক্ষমূলে জগতের এই উজ্জ্বলতম জ্যোতিঃ নির্ব্বাণ লাভ করেন।

জাতক নামক সুপ্রসিদ্ধ পালিগ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে সিদ্ধার্থ কপিলবাস্তু নগরে

শুদ্ধোদনের ঔরসে মহামায়ার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। সিদ্ধার্থ যে লুম্বিনীবনমধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন, উহা কপিলবাস্তু ও দেবদহ এই দুই নগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ললিত প্রভৃতি বর্ণিত অন্যান্য বৃত্তান্তের সহ ললিতবিস্তরে বর্ণিত বৃত্তান্তসমূহের কোনই প্রভেদ নাই। জাতকে লিখিত আছে, সিদ্ধার্থ আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে অভিনিষ্ক্রমণ করেন। তিনি এক রাত্রিতে তিন রাজ্য অতিক্রম করেন এবং প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ অতিক্রম করিয়া অনোমা নদীতীরে উপস্থিত হন। সেখানে আম্রবনমধ্যে এক সপ্তাহ বাস করেন। তথায় প্রায় পঞ্চাশৎ ক্রোশ পদ-ব্রজে গমন করিয়া রাজগৃহ নগরে উপনীত হন। তিনি রাজা বিম্বসারের নিকট কিয়ৎকাল কিছু শিক্ষা করিয়া নৈরঞ্জনা নদীতীরে গমন করেন। তিনি নৈরঞ্জনা নদীর যে স্থানে স্নান করিয়াছিলেন, উহা পরিশেষে বুদ্ধগয়া নামক প্রধান তীর্থে পরিণত হয়। নৈরঞ্জনা নদীতীরে বোধিদ্রুমমূলে তিনি ছয় বৎসর কাল তপস্যা করেন। ছয় বৎসরের পর সূর্য্য অস্তগত হইবার পূর্ব্বে তিনি মারসৈন্যকে পরাজিত করেন। তদনন্তর রাত্রির প্রথম যামে পূর্ব্ব জন্মসমূহ তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হয়। রাত্রির মধ্যম যামে তাঁহার দিব্য চক্ষু উৎপন্ন হয়। রাত্রির শেষ যামে তিনি জগতের কার্য্যকারণ ভাব মনোমধ্যে চিন্তা করেন। এই সময়ে তিনি বৌদ্ধদর্শনের প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।

মহাবগ্গ নামক পালিগ্রন্থে বুদ্ধের জীবনচরিত সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, উহার সহ ললিত বিস্তরে বর্ণিত বৃত্তান্তের কোন বিশেষ পার্থক্য নাই। মহাবগ্গে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পরও সাত দিবস নৈরঞ্জনা নদীতীরে বোধিদ্রুমমূলে অবস্থান করেন। তিনি ঐ রাত্রি বুদ্ধত্বলাভ করেন, ঐ রাত্রির প্রথম মধ্যম ও শেষ যামে প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্বের আবিষ্কার করেন। জগতে কিরূপে দুঃখের উৎপত্তি ও ধ্বংস হয়, তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব ঐ সময়ে তিনি মনোমধ্যে আলোচনা করেন।

অশ্বঘোষ স্বীয় বুদ্ধচরিত কাব্যে বুদ্ধদেবের আদ্যোপান্ত জীবনচরিত বর্ণনা করিয়াছেন। ললিতবিস্তর গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনার সহ বুদ্ধচরিত কাব্যে বর্ণিত ঘটনার বিশেষ পার্থক্য নাই। বুদ্ধচরিত কাব্যের দ্বাদশ সর্গের নাম অরাড়দর্শন। রাজগৃহ নগরে অরাড় নামক ঋষির সহ সিদ্ধার্থের যে সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছিল, এই সর্গে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। সিদ্ধার্থ অরাড়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক রাজগৃহ নগরে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করেন। তিনি অরাড়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, লোক সকল কি উপায়ে জরামরণ, দুঃখ ইত্যাদি হইতে মুক্ত হইতে পারে? অরাড় স্বীয় শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বর্ণন পূর্ব্বক বলিলেন, প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইএর প্রভেদ অবগত হওয়া উচিত। বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চভূত, বিষয়, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি প্রকৃতির বিকার মাত্র। এই প্রকৃতিকে যিনি জানেন, তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বা আত্মা বলে। অজ্ঞান, কর্ম্ম ও তৃষ্ণা এই তিন দ্বারা লোকসকল সংসারে বদ্ধ হয়। যিনি প্রকৃতি হইতে বিভক্ত, অহঙ্কারশূন্য, নির্গুণ আত্মাকে উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি

জরামরণাদি হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এইরূপে অরাড় স্বীয় মতের বিবরণ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সিদ্ধার্থ ঐ রাজগৃহ নগরে রুদ্রক নামক ব্রাহ্মণ দার্শনিকের আশ্রমে গমন করেন। রুদ্রক স্বীয় দার্শনিক মতের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলেন সংজ্ঞা ও অসংজ্ঞা এতদুভয়ের অতিক্রম দ্বারা মুক্তি লাভ হয়।

বুদ্ধচরিত কাব্যের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, সিদ্ধার্থ যে দিন বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন, সেই দিন তিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য্য ইত্যাদি মারসৈন্যকে পরাভূত করিয়া পরম নিবৃত্তি লাভ করেন। তদনন্তর তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়া বুঝিতে পারিলেন, সংসার কদলীগর্ভের ন্যায় নিঃসার। রাত্রির দ্বিতীয় যামে তাঁহার দিব্য চক্ষু উৎপন্ন হয়। যেমন নির্ম্মল আদর্শে বস্তুসকল সম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়, সেইরূপে তিনি দিব্য চক্ষুর সাহায্যে নিখিল বিশ্বের গূঢ় রহস্য স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। প্রাণিগণ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ঊর্দ্ধগতি এবং অসৎ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মের ফল বিচিত্র। জীব সকল অহরহঃ জন্ম, জরা মরণ দুঃখ ইত্যাদি ভোগ করিতেছে। তখন তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, জরা মরণের কারণ জন্ম। জন্ম না হইলে জরা মরণ হয় না। ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল ভোগের নিমিত্ত লোকের জন্ম হয়। সংসারে উপাদান বা আসক্তি না জন্মিলে ভবের উৎপত্তি হয় না। কোন পদার্থের প্রতি তৃষ্ণা না জন্মিলে উপাদান অর্থাৎ আসক্তি প্রাদুর্ভূত হয় না। সুখ দুঃখ ও অদুঃখা-সুখ এই ত্রিবিধ বেদনাই তৃষ্ণার কারণ। ইন্দ্রিয়ের সহ বিষয়ের সম্বন্ধই বেদনার হেতু। চক্ষুঃ কর্ণ ইত্যাদি ষড়ায়তন ও রূপরস ইত্যাদি বিষয়ই উক্ত সম্বন্ধের হেতু। দর্শন শ্রবণাদি বিজ্ঞানসমূহ ঐ ষড়ায়তন ইত্যাদির ব্যঞ্জক। পূর্ব্ব সংস্কারসমূহ এই ষড়্‌বিধ বিজ্ঞানের হেতু। অবিদ্যা হইতে সংস্কার সমূহের উৎপত্তি হয়। এইরূপে তিনি দেখিলেন, অবিদ্যা বা অজ্ঞানই আমাদের সর্ব্ব দুঃখের কারণ ও সংসার বিষবৃক্ষের মূল। দুঃখের কিরূপে উৎপত্তি ও নিরোধ হয়, এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া তিনি বুদ্ধ বা জ্ঞানী নাম লাভ করেন। ঐ দুঃখতত্ত্বের নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ। এই দুঃখতত্ত্ব বা প্রতীত্যসমুৎপাদের বিস্তৃত বৃত্তান্ত বৌদ্ধদর্শনের ইতিহাস নামক প্রস্তাবে বর্ণিত হইবে। বুদ্ধ যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, বুদ্ধচরিত কাব্যের মতে ঐ ধর্ম্মের নাম মহাযান। নির্ব্বাণ লাভের উহাই উৎকৃষ্ট উপায়। নির্ব্বাণ শিখরে উপনীত হইবার সোপান স্বরূপে তিনি চতুরার্য্য সত্যের ও আর্য্যাষ্টাঙ্গিক মার্গের উপদেশ করেন। দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের ধ্বংস ও দুঃখ ধ্বংসের উপায় এই চারি প্রকার সত্যকে চতুরার্য্য সত্য বলে। জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ ইত্যাদি সমস্তই দুঃখশব্দবাচ্য। তৃষ্ণাই দুঃখোৎপত্তির কারণ। তৃষ্ণার নিবৃত্তিতেই দুঃখের নিবৃত্তি হয়। সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যগ্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি এই আটটীকে আর্য্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ বলে। ইহাদের অবলম্বনে দুঃখনিরোধের উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বোধিসত্ত্ব গৃহ ত্যাগ করিবার পর যে সকল কু-প্রলোভনে

পড়িয়াছিলেন, তাহা তিনি সিংহের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক অতিক্রম করেন। এখন সর্গে বর্ণিত আছে, যখন তিনি রাজগৃহ নগরে ভিক্ষা দ্বারা আহার সংগ্রহ করিতেছিলেন, তখন রাজগৃহের রাজা বিম্বিসার বহুলোক সমভিব্যাহারে বোধিসত্ত্বের নিকটে আগমন করিয়া তাঁহাকে বলেন :—

আখ্যাতপূর্ব্বঃ বিপুলং তুঙ্গং তে নবং বয়ো দীপ্তমিদং বপুশ্চ।
কন্দর্পাদিং তে মভিরক্ষণেন ভৈক্ষাক এবাভিরতা ন বাহ্যে।
গাত্রং হি তে লোহিতচন্দনার্হং কাষায় সংস্পর্শনমর্হসেতৎ।
হস্তঃ প্রজাপালনযোগ্য এষ ভোক্তুং ন চার্হঃ পরদত্তমন্নম্।

হে বোধিসত্ত্ব আপনি সূর্য্যবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আপনার এক্ষণে যৌবনকাল উপস্থিত এবং আপনার দেহ দীপ্তিশালী। আপনার এক্ষণে বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটিল কেন? আপনি ভিক্ষায় অভিরত আছেন, কিন্তু রাজ্যে আপনার অভিলাষ নাই, ইহার কারণ কি? আপনার সুকোমল দেহ লোহিত চন্দন দ্বারা চর্চ্চিত হইবার যোগ্য, কাষায় বস্ত্র পরিধান করা আপনার সম্পূর্ণ অযোগ্য। আপনার হস্ত শাসনদণ্ড পরিচালনা করিবার যোগ্য, কিন্তু পরদত্ত অন্ন গ্রহণ করিবার যোগ্য নহে।

রাজা বিম্বিসারের কথায় বোধিসত্ত্বের হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও বিষয়-বাসনা উৎপন্ন হয় নাই।

বুদ্ধচরিত কাব্যের ত্রয়োদশ সর্গে মারবিজয় বর্ণিত হইয়াছে :—

তস্মিংশ্চ বোধায় কৃতপ্রতিজ্ঞে রাত্রির্বিশেষপ্রভবে মহর্ষৌ।
ত্রিলোকবিত্তে প্রজহর্ষ লোকস্তত্রাস সদ্যশ্চলিতেব ধাত্রী।
ন মন্দরেবং প্রবয়ংতি লোকে চিত্রাসুধং পুষ্পশরং তথৈব।
ক্ষয়ং তথাবিধমিতি ত্রিলোক্যে মোক্ষক্ষিতং মারমুপাবরুহ্য।
তস্যাস্ত্রয়ো বিক্রমহর্ষদর্পমিশ্রা রতিপ্রীতিতৃষশ্চ কন্যাঃ।
প্রচক্রুরেনং মদনং বিকায়ং ভাংস্তে ভাস্তেন বচো বভাষে।
অসৌ মুনিস্তে চরণৈর্বিভেত্তা বুধ্বং বুদ্ধিশরং বিকৃষ্য।
ত্রৈলোক্যজেতা বিষয়ান্ মহীয়ান্ শ্রাবয় মে মনসো বিষাদং।
ত্রিলোকনাথাভিভূতং যাতি লোকাব চাথাত্যপবর্গমার্গং।
ত্বদুদ্ভবোহয়ং বিষয়ো মনস্বী বৃত্রাচ্ছ্রুতস্যেব বিদেহদর্পঃ।
তব প্রসাদেন ন লঙ্ঘচক্রমশ্লোকয়ে কিঞ্চিতি বাসবেব।
যাস্যন্তি তাস্ত্বদ্ভয়তস্ত ভেত্তুং সেতুং নদীবেগ ইবাচিরেণ।
তয়েত্যুদীর্ণে পুনরেব তস্মিন্ মারপ্রধানা মোহকলাংশ্চ পঞ্চ।
সোঽথ ধ্রুবং সম্বুতোঽস্ত্যগচ্ছদ্ বাহ্যাকাশী মনসঃ প্রসাদান্।
স প্রাপ্তবান্ মুনিসিংহনখুং পাবং ভিত্তীর্থং ভবসাগরস্য।
বিদ্ধ্যে নবাং ফলমাধুধাংশ্চ ক্রীড়ন্ সবেগোদমুবাচ বারঃ।

বাসর্ষিবংশপ্রভূত মহর্ষি বোধিসত্ত্ব পরমজ্ঞান লাভ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বোধিদ্রুমমূলে আসীন হইলে সংসারের সকল লোকেই হর্ষ প্রকাশ করিল, কিন্তু [illegible]

শত্রু মার ভীত হইল। লোকে যাহাকে কামদেব, চিত্রায়ুধ এবং পুষ্পশর নামে অভিহিত করে, পণ্ডিতগণ তাহাকেই কামরাজ্যের অধিপতি, মুক্তির বিদ্বেষী মার নামে অভিহিত করেন। বিলাস, হর্ষ ও দর্প নামক তিন পুত্র এবং রতি, প্রীতি ও তৃষ্ণা নাম্নী তিন কন্যা মারের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে পিতঃ আপনি উদ্বিগ্ন হইয়াছেন কেন? তখন মার উক্ত পুত্র ও কন্যাদিগকে বলিল:—শাক্যমুনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞারূপ বর্ম্ম, সত্ত্বরূপ আয়ুধ এবং বুদ্ধিরূপ বাণ ধারণ পূর্ব্বক আমার সমগ্র রাজ্য বিজয় করিবেন বলিয়া বোধি-দ্রুমমূলে আসীন আছেন; সেই হেতু আমার মন অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়াছে। যদি উনি আমাকে পরাজিত করিয়া সংসারে মোক্ষ ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহা হইলে আজ আমি সমগ্র রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইলাম এবং আজ হইতে কন্দর্পের বৃত্তি লোপ পাইল। অত-এব যে কাল পর্য্যন্ত শাক্য মুনি দিব্যচক্ষুঃ লাভ না করেন এবং যে কাল পর্য্যন্ত তিনি আমার রাজ্যে অবস্থান করেন, সেই সময়ের মধ্যে আমি তাঁহাকে উচ্ছিন্ন করিব। যেমন নদীর বেগ বর্দ্ধিত হইয়া সেতু ভেদ করে, আমিও সেইরূপে উহাঁকে ভেদ করিব। তদনন্তর লোকহৃদয়ের অস্বাস্থ্যকারী মার পুষ্পময় ধনুঃ ও মোহোৎপাদক পঞ্চবাণ গ্রহণ করিয়া নিজ পুত্রকন্যাসমভিব্যাহারে বোধিদ্রুমমূলে উপস্থিত হইল। অনন্তর মার বন্ধুর অগ্রভাগে বাম হস্ত সংস্থাপন করিয়া প্রশান্তচিত্তে, যোগাসনে আসীন এবং ভবসাগরের পারগমনেচ্ছু বোধিসত্ত্বকে অনেক কথা বলিল। বোধিসত্ত্বের সহ মারের প্রথমে বাগ্‌যুদ্ধ হইল। অনন্তর মার ও তাহার পুত্র, কন্যা এবং অসংখ্য সৈন্য একত্র সমবেত হইয়া বিবিধ উপায়ে বোধিসত্ত্বকে আক্রমণ করিল। মারসেনার সহ বোধিসত্ত্বের যে তুমুল সংগ্রাম ঘটিয়াছিল তাহার বিস্তৃত বৃত্তান্ত বুদ্ধচরিত কাব্যের ত্রয়োদশ সর্গে বর্ণিত হইয়াছে।

বুদ্ধচরিত কাব্যের পঞ্চদশ সর্গে বর্ণিত আছে যে মার সম্মুখ-যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অতি বিষণ্ণ অন্তঃকরণে স্বগৃহে প্রতিগমন করিয়াছিল। তদনন্তর রতি, তৃষ্ণা ও অরতি নামধেয়া তিন কন্যা মারকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল, হে পিতঃ, আপনি চিন্তিত হইবেন না; আমরা কৌশলপূর্ব্বক বোধিসত্ত্বকে আপনার অধীন করিয়া দিতেছি। অনন্তর উহারা যুবতীর রূপ ধারণপূর্ব্বক বোধিসত্ত্বের নিকট গমন করিল।

রতিস্তত্রেন্দুবদনা মোহবিদ্যাবলংকৃতা।
মোহয়ামাস ভৈক্ষেন্তং গার্হস্থ্যসুখসংসনৈঃ॥
চক্রবর্ত্তিসুখং ত্যক্ত্বা কিং দীনং সুখমাশ্রয়ে।
ত্যক্ত্বা সংপৎ কথং মোক্ষ ইত্যস্মান্ সমুপাশ্রয়॥
নোচেৎ ত্বং বিপ্রতিসারী দ্রষ্টা মম স্মরিষ্যসি।
মিত্রানুরিব তথাক্যং নাশৃণ্বং ধ্যানশীলিতঃ॥

ইন্দুবদনা ও মোহরূপ অলঙ্কারে বিভূষিতা রতি সংসারের নানা প্রকার সুখের কথা বলিয়া বোধিসত্ত্বকে বিমোহিত করিতে লাগিল। সে বলিল হে বোধিসত্ত্ব, তুমি সাম্রাজ্য

সুখ ত্যাগ করিয়া কেন দীনভাবে কালযাপন করিতেছ? সম্পৎসমূহ ত্যাগ করিলে মুক্তিলাভ হয়, ইহা কাহার নিকট শুনিয়াছ? তুমি আমাদিগের আশ্রয়ে আগমন কর; যদি তুমি বিপথগামী না হইয়া থাক, তাহা হইলে আমাদের নিকটে আইস। নিদ্রাগত লোক যেমন কাহারও কথা শুনিতে পায় না। ধ্যানমগ্ন বোধিসত্ত্ব সেইরূপ বলিলে বলিয়া শুনিতে পাইলেন না।

রতির বাক্য শেষ হইতে না হইতেই তৃষ্ণা ও আরতি আসিয়া বোধিসত্ত্বকে নানা প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। অনন্তর উহারা বৃদ্ধার রূপ ধারণপূর্ব্বক বোধিসত্ত্বের নিকট আসিল এবং নানা উপদেশ বাক্য বলিতে লাগিল।

এক সময়ে রতি, তৃষ্ণা ও আরতি বোধিসত্ত্বের সমীপে গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিয়াছিল:—

প্রব্রজ্যাং দেহি ভগবন ভবচ্ছরণমাগতাঃ।
বার্ত্তামাকর্ণ্য ভবতাং আখাতাঃ কাঞ্চনাৎ পুরাৎ।
গার্হস্থ্যং ধর্ম্মমুৎসৃজ্য নমুচেরাত্মজা বয়ং।
পঞ্চশতানাং ভ্রাতৃণাং শিবসংরণোৎসুকাঃ;
যথা ত্বমসি বৈরাগ্যো যথং চ ভর্ত্তৃবর্জ্জিতাঃ॥

হে ভগবন্, আমরা আপনার আশ্রয়ে আগমন করিয়াছি। আপনি আমাদিগকে প্রব্রজ্যা ধর্ম্ম প্রদান করুন; আপনার কথা শুনিয়া আমরা গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সুবর্ণপুর হইতে এই স্থানে আগমন করিয়াছি। আমরা কন্দর্পের দুহিতা। আমাদের পাঁচ শত ভ্রাতা। তাহারাও সদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উৎসুক হইয়াছে আপনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন; অতএব আমি ও আমার ভগিনীগণ, আমরা সকলেই আজ বিধবা হইলাম।

নির্লজ্জ মারও যথাসাধ্য সর্ব্বশেষ চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। বোধিসত্ত্ব কন্দর্পের বিজয় সাধন করিয়া মহাপ্রীত্যাহাবব্যূহ নামক সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন।

রাক্ষসপতি রাবণের প্রার্থনা অনুসারে বুদ্ধদেব লঙ্কাদ্বীপে গমন করিয়া রাক্ষসদিগকে কিরূপে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, লঙ্কাবতারসূত্রে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। অভিনিষ্ক্রমণসূত্রে বোধিসত্ত্বের প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণের বিষয় বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

Fo-pan-shin-tsi-cin নামক চীন গ্রন্থে যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে, উহার সহ বুদ্ধচরিত কালের ঘটনার কোন বিশেষ পার্থক্য নাই। মললংগববস্তু নামক ব্রহ্মদেশীয় গ্রন্থের বর্ণিত বৃত্তান্ত ও ললিতবিস্তরের বৃত্তান্ত প্রায় একরূপ।

হুয়েন্‌সাঙ্ ও তাঁহার সমসাময়িক চীন গ্রন্থকারগণের মতে বুদ্ধদেব খৃঃ পূঃ ৯৫৩ অব্দে প্রাদুর্ভূত হন

শক-জিছু-রোকু নামক জাপানী গ্রন্থে বুদ্ধের জীবনচরিত সম্বন্ধে অনেক আলোচনা

ঘটনা বিবৃত আছে। উহার কতক অংশ সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে বলিয়া এস্থলে উল্লিখিত হইল না। অন্যান্য অংশ ললিতবিস্তরের অনুরূপ। শক-জিছু-রোকু গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়াছেন, বুদ্ধদেব গৌতম গোত্রে, ইক্ষ্বাকুকুলে ও শাক্য বংশে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া যথাক্রমে গৌতম, ইক্ষ্বাকু ও শাক্য নামে প্রসিদ্ধ হন। শাক্যরাজ শুদ্ধোদন বুদ্ধের গৌতমী ও মায়া নামে দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। মায়াদেবীর গর্ভের সঞ্চার হইলে গৌতমী ঈর্ষ্যার বশে তাঁহার নানা প্রকার অপকার করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয় ও তিনি অনুতপ্ত হইয়া মায়াদেবীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। মায়াদেবী লুম্বিনীবনমধ্যে সিদ্ধার্থ নামে একটী পুত্র প্রসব করিয়া সাত দিন পরে পরলোক গত হন। [খৃঃ পূঃ ১০২৭ অব্দে ঐ পুত্রের জন্ম হয়।] অনন্তর উক্ত শিশুর প্রতিপালনের ভার গৌতমীর হস্তে অর্পিত হয়। যখন সিদ্ধার্থের বয়স্ আট বৎসর, তখন তিনি বিশ্বামিত্র নামক কোন উপাধ্যায়ের নিকট বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত প্রেরিত হন। উদয়ী নামক কোন বালক সিদ্ধার্থের সহচর নিযুক্ত হয়। সিদ্ধার্থ বাল্যকালেই পশুহিংসা প্রভৃতি কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার দেবদত্তপ্রভৃতি সহচরগণ মৃগয়ার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। সিদ্ধার্থ তাহাদিগকে বলিতেন:—পশুপক্ষিপ্রভৃতি প্রাণীর বধ করা অত্যন্ত নৃশংসের কার্য্য। যশোধরা নাম্নী শাক্যকন্যার সহ সিদ্ধার্থের বিবাহ হয়। তাঁহাদের রাহুল নামে এক পুত্র জন্মে। জাপানী গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, যে যদি সিদ্ধার্থ বিবাহ না করিতেন ও তাঁহার পুত্র না জন্মিত, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিতেন না যে সংসার দুঃখবহুল। কোটি কোটি মানবকে বিবাহের দুঃখবাহুল্য বুঝাইবার জন্য সিদ্ধার্থ স্বয়ং পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন। বুদ্ধ আদেশ করিয়াছিলেন যে যাঁহারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে বিবাহ নিষিদ্ধ। সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া বারাণসীতে গমন করেন। তদনন্তর তাঁহার দশজন প্রধান শিষ্য ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন। সেই দশজন শিষ্যের নাম কাশ্যপ, আনন্দ, সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন, অনিরুদ্ধ, সুভূতি, পূর্ণ, কাত্যায়ন, উপালি এবং রাহুল। শ্রাবস্তীর সুদত্ত নামক কোন শ্রেষ্ঠী বুদ্ধকে জেতবন বিহার প্রদান করিয়াছিলেন। বুদ্ধ ঐ স্থানে স্বীয় ধর্ম্মের প্রচার করেন।

গ-ছেব-রোল-প ইত্যাদি তিব্বতীয় গ্রন্থে বর্ণিত আছে, মারক বিজয় করিয়া সিদ্ধার্থ অর্হন্ এই নাম লাভ করেন। অর্হন্ শব্দ অবিহন্ শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অবিহন্ শব্দের অর্থ শত্রুবিজয়ী। জীবের মহাশত্রু মার বা কন্দর্পকে জয় করিয়া সিদ্ধার্থ অর্হন্ নামে প্রসিদ্ধ হন। তিব্বতীয় ভাষায় অর্হন্‌কে ড-চোম্-প বলে। ড শব্দের অর্থ শত্রু এবং চোম্-প শব্দের অর্থ বিজেতা। অনেক তিব্বতীয় গ্রন্থের মতে বুদ্ধদেব খৃঃ পূঃ ৫১৪ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।

ললিতবিস্তর গ্রন্থ হইতে বুদ্ধের জীবনচরিত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়:—

কপিলবাস্তু মহানগরে শুদ্ধোদন নামে এক সুপ্রসিদ্ধ শাক্যরাজ বাস করিতেন। তিনি শাক্যাধিপতি সুপ্রবুদ্ধের কন্যা মায়াদেবীকে বিবাহ করেন। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে মায়াদেবীর গর্ভসঞ্চার হয়। তদনন্তর দশমাস অতীত হইলে মায়াদেবী কপিলবাস্তু নগরের সান্নিধ্যে লুম্বিনীনামক পরম রমণীয় উদ্যানমধ্যে একটী পুত্র প্রসব করেন। পুত্র ভূমিষ্ঠমাত্রই শুদ্ধোদনের সর্ব্বার্থ সংসিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া তিনি পুত্রের সর্ব্বার্থসিদ্ধ বা সিদ্ধার্থ এই নাম রাখিলেন। সিদ্ধার্থের জন্মগ্রহণের সাত দিন পরে মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। এই সময়ে সিদ্ধার্থ কপিলবাস্তু রাজধানীতে আনীত হন। কুমারের প্রতিপালনের ভার উহার মাতৃষসা মহাপ্রজাবতী গৌতমীর হস্তে অর্পিত হয়।

হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বে অসিত নামে এক মহর্ষি বাস করিতেন। এই সময়ে তিনি স্বীয় ভাগিনেয় নরদত্তের সহিত কপিলবাস্তু নগরে আগমন করেন। সিদ্ধার্থের দ্বাত্রিংশৎ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ ও অশীতি প্রকার অনুব্যঞ্জন দেখিয়া তিনি শুদ্ধোদনের নিকট নিবেদন করেন, যে যদি ঐ বালক সংসারাশ্রমে অবস্থান করে, তাহাহইলে রাজচক্রবর্ত্তী হইবে, আর যদি গৃহ ত্যাগী হয়, তাহাহইলে সম্যক্ সম্বুদ্ধি লাভ করিবে। অনন্তর অসিত স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে সিদ্ধার্থ গুরুগৃহে প্রেরিত হইলেন। সেখানে তিনি বিশ্বামিত্র নামক উপাধ্যায়ের নিকট নানাদেশীয় লিপি শিক্ষা করেন। গুরুগৃহে গমনের পূর্ব্বেই তিনি

---

* দ্বাত্রিংশৎ প্রকার মহাপুরুষলক্ষণ যথা :—

সিদ্ধার্থের মস্তকে উষ্ণীষের চিহ্ন; তাঁহার কেশসমূহ কৃষ্ণবর্ণ ও দক্ষিণদিকে আকুঞ্চিত; ললাট সমতল ও বিপুল; ভ্রূযুগের মধ্যভাগ ঊর্ণালক্ষিত; তাঁহার নেত্র নীলবর্ণ এবং গোপ্পক্ষ্মযুক্ত; দন্তসমূহ ঘনসন্নিবিষ্ট ও শুক্লবর্ণ; তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি মধুর; রসনার অগ্রভাগ রসাভিজ্ঞ; [illegible] বৃহৎ ও কৃশ; তাঁহার উরু সিংহের উরুর ন্যায়; তাঁহার স্কন্ধদেশ বর্ত্তুলাকৃতি ও উন্নত; তাঁহার কান্তি সুবর্ণের ন্যায়, তিনি স্থির; তাঁহার ভুজদ্বয় অবনত ও প্রলম্বিত; শরীরের পূর্ব্বভাগ সিংহের ন্যায়; কটিদেশ [illegible] ন্যায় পরিমণ্ডল; শরীরের ঘন রোমরাজি পরস্পর বিভিন্ন; উরুদেশ সুগোল; জঙ্ঘাদেশ এন মৃগের ন্যায়; তাঁহার অঙ্গুলি সমূহ দীর্ঘ; তাঁহার পাণি ও পাদ আরক্ত ও কোমল; হস্ত ও পদতল রেখাজালসমন্বিত; পাদদ্বয়ের গুল্ফদেশ চক্রাঙ্কিত, বিচিত্র ও শুভ্র; পাদদ্বয় সুপ্রতিষ্ঠিত ও সমান।

অশীতি অনুব্যঞ্জন যথা:—

সিদ্ধার্থের নখসকল উন্নত, তাম্রবর্ণ ও স্নিগ্ধ; তাঁহার অঙ্গুলি সকল বর্ত্তুলাকৃতি ও ক্রমনিম্ন; গুল্ফ ও শিরা সকল অগুপ্ত; দেহের সন্ধি সকল দৃঢ়; পাদদ্বয় অবিষম, পার্ষ্ণিদ্বয়ের পার্শ্বদেশ আরক্ত, হস্তের রেখা সকল স্নিগ্ধ, তুলাকৃতি, গভীর, অরক্ত ও ক্রমনিম্ন; ওষ্ঠদ্বয় বিম্বফলের ন্যায় আরক্ত, তাঁহার শব্দ অনুচ্চ; জিহ্বা কোমল ও রক্তবর্ণ; তাঁহার কণ্ঠস্বর মধুর, গম্ভীর ও সুস্পষ্ট; নাসাদ্বয় প্রলম্বিত; চক্ষু পবিত্র, মৃদু, বিশাল, অধীন, অপূর্ব্ব, সুসমাহিত ও কুবিভক্ত। বাহুমণ্ডল বিপুল ও সুপরিপূর্ণ, গাত্র বৃত্তাকৃতি, সুমার্জ্জিত, অস্নিগ্ধ ও অপুপূর্ণ; নাভি গম্ভীর, অস্নিগ্ধ ও অপুপূর্ণ; তাঁহার আচার পবিত্র, দেহ প্রসন্ন; দেহপ্রভা সুবিস্তৃত, তিনি গর্ব্বের ন্যায় [illegible] তাঁহার প্রণিধিপরায়ণতা; তাঁহার কুক্ষি বৃত্তাকৃতি ও অস্নিগ্ধ; উদর ধনুর ন্যায়; নাভি সুগুপ্ত, বস্তি বৃত্তাকৃতি, তীক্ষ্ণ ও অপুপূর্ণ; নাসিকা তুঙ্গ, নয়ন পবিত্র সুবিমল, প্রহসিত, আবর্ত্ত, বিশদ ও নীল রুবরায়তনের সদৃশ; ভ্রূদ্বয় সংযুক্ত, বিচিত্র, সংগত, অপূর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ; গণ্ডদেশ পীন, অবিষম, গণ্ডদেশশূন্য কুক্ষি অপুপহত; ইন্দ্রিয় সকল তীক্ষ্ণ ও সুপরিপূর্ণ; মুখ ও [illegible] পরস্পর সংগত; চক্ষু পরিপূর্ণ; কেশ কৃষ্ণ, ঘন, পরস্পর সুসংগত, সুরভি, অপরুষ, অনাকুল, অকুপূর্ব্ব, সঞ্চুচিত ও সুসংস্থিত,

ব্রাহ্মী, খরোষ্ট্রী, পুষ্করসারী, অঙ্গ লিপি, বঙ্গ লিপি, মগধ লিপি, মাঙ্গল্য লিপি, মনুষ্য লিপি, অঙ্গুলীয় লিপি, শকারি লিপি, ব্রহ্মবল্লী লিপি, দ্রাবিড় লিপি, কিনারী লিপি, দক্ষিণ লিপি, উগ্র লিপি, সংখ্যা লিপি, অনুলোম লিপি, অর্দ্ধধনুর্লিপি, দরদ লিপি, খাস্ত লিপি, চীন লিপি, হূন লিপি, মধ্যাক্ষরবিস্তর লিপি, পুষ্প লিপি, দেব লিপি, নাগ লিপি, যক্ষ লিপি, গন্ধর্ব্ব লিপি, কিন্নর লিপি, মহোরগ লিপি, অসুর লিপি, গরুড় লিপি, মৃগচক্র লিপি, চক্র লিপি, বায়ুমরুলিপি, ভৌমদেব লিপি, অন্তরীক্ষ দেব লিপি, উত্তরকুরুদ্বীপ লিপি, অপর গৌড়ানি লিপি, পূর্ব্ব বিদেহ লিপি, উৎক্ষেপ লিপি, নিক্ষেপ লিপি, বিক্ষেপ লিপি, প্রক্ষেপ লিপি, সাগর লিপি, বজ্র লিপি, লেখপ্রতিলেখ লিপি, অনুদ্রুত লিপি, শাস্ত্রাবর্ত্ত লিপি, গণনাবর্ত্তলিপি, উৎক্ষেপাবর্ত্তলিপি, অধ্যাহারিণী লিপি, সর্ব্বরুতসংগ্রহণী লিপি, বিদ্যানুলোমা লিপি, বিমিশ্রিত লিপি, ঋষিতপস্তপ্তা, রোচমানা, ধরণীপ্রেক্ষণ লিপি, সর্ব্বৌষধিনিষ্যন্দা, সর্ব্বসারসংগ্রহণী, ও সর্ব্বভূতরুদ্রগ্রহণী, এই চতুঃষষ্টি প্রকার লিপি অবগত ছিলেন।

ক্রমে তিনি নানা বিদ্যা শিক্ষা করেন। বেদ ও উপনিষদ্ বিদ্যায় তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য জন্মিয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে সিদ্ধার্থের পাঠ সমাপন হইলে তিনি কপিলবাস্তু রাজধানীতে প্রত্যানীত হইলেন। শুদ্ধোদন মহাপ্রাজ শাক্যের কন্যা গোপার সহিত তাঁহার পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করেন। সিদ্ধার্থ বিবাহের সময়ে বেদ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, শিক্ষা, গণিত, সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক ইত্যাদি শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতে সিদ্ধার্থের সংসারে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। যখন তিনি বর্ণমালা শিক্ষা করেন, তখনই অকার উচ্চারিত হইবামাত্র "অনিত্যাঃ সর্ব্বসংস্কারাঃ" এই বাক্য তাঁহার কর্ণমধ্যে প্রবেশ করে। এক দিন তিনি কৃষিগ্রাম দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে একটী বৃক্ষ দেখিয়া উহার মূলে নির্জ্জনে বসিয়া ধ্যানমগ্ন থাকেন।

অনন্তর এক দিন তিনি স্বীয় সারথিকে বলিলেন, সারথে, রথযোজনা কর, আমি উদ্যান ভূমি দর্শন করিব। সারথি রথ যোজনা করিলেন। সেখানে একটী জরাজীর্ণ বৃদ্ধলোককে দেখিয়া সিদ্ধার্থ সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

কিং সারথে পুরুষ দুর্ব্বল অল্পধাম
উচ্ছূন মাংস রুধিরশ্চ স্নায়ু নদ্ধঃ।
শ্বেতশিরো বিরলদন্ত কৃশাঙ্গযষ্টি
আলম্ব্য দণ্ড ব্রজতেঽধ্বং খলন্ত।

হে সারথে, এই লোকটী দণ্ডধারণ পূর্ব্বক অতি কষ্টে স্খলিত গতিতে গমন করিতেছে কেন? ইহার শরীর দুর্ব্বল ও স্থৈর্য্যবিহীন, এবং মাংস, রুধির, ত্বক্ সকল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। দেহের স্নায়ু সকল প্রকাশমান হইয়াছে। ইহার মস্তক শ্বেতবর্ণ, দন্ত বিরল, ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতি কৃশ, ইহার কারণ কি?

সারথি উত্তর করিল,—

এসো হি দেব পুরিসো জরায়াভিভূতো
খীণেন্দ্রিয়ো দুক্খিতো বলবীরিয়হীনো।
বন্ধুজনেন পরিভূত অনাথভূতো
কার্য্যাসমর্থ অপবিদ্ধ বনের যথা।

হে দেব এই ব্যক্তি জরা দ্বারা অভিভূত, দুঃখিত ও বলবীর্য্যবিহীন। ইহার ইন্দ্রিয় সকল ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এ ব্যক্তি এখন নিঃসহায় হইয়া পড়িয়াছে। বনমধ্যে জীর্ণকাষ্ঠ যেমন পড়িয়া থাকে, এই ব্যক্তিও সেইরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া কালযাপন করিতেছে।

সিদ্ধার্থ সারথিকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন :—

কুলধর্ম্ম এষ অরমস্ত হি ত্বং ভণাহি
অথবাপি সর্ব্বজগতোহস্ত ইদং অবস্থা।
শীঘ্রং ভণাহি বচনং যথভূতমেতং
শ্রুত্বা তথার্থমিহ যোনি সক্কিস্সমিস্সে।

এইব্যক্তির জরাগ্রস্ত হওয়া কি এইব্যক্তির কুলধর্ম্ম অথবা সংসারের সকল লোকেরই এইরূপ অবস্থা? তুমি শীঘ্র যথার্থ উত্তর প্রদান কর। তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি ইহার যথাভূত কারণ চিন্তা করিব।

তখন সারথি বলিল :—

নৈতস্সেব কুলধর্ম্ম ন রাষ্ট্রধর্ম্মঃ
সর্ব্বে জগস্স জরযৌবন ধর্ষয়াতি।
তুয়াং পি মাতৃ পিতৃ বান্ধব জাতিসংঘো
জরযা অমুক্তং নহি অন্তগতির্জনস্স।

হে দেব, ইহা এ ব্যক্তির কুলধর্ম্ম বা রাষ্ট্র ধর্ম্ম নহে। সংসারের সকল লোকেরই যৌবন জরা কর্ত্তৃক অভিভূত হয়। আপনিও আপনার পিতা, মাতা, বান্ধব, ও জ্ঞাতি প্রভৃতি সকলেই জরার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবেন না। লোকের অন্য গতি নাই।

তখন সিদ্ধার্থ বলিলেন :—

ধিক্ সারথে অবুধবালজনস্স বুদ্ধি—
যদ্ যৌবনেন মদমত্ত জরাং ন পস্সো।
আবর্ত্তযাহি রথং পুনরহং প্রবেক্ষ্যে
যত্রং মহা ক্রীড়বতিভির্বরযোষিতস্স।

হে সারথে, লোক সকল নির্ব্বোধ। তাহাদের বুদ্ধিকে ধিক্ যে তাহারা যৌবনমদে মত্ত হইয়া বার্দ্ধক্য দেখিতে পায় না। তুমি রথ প্রত্যাবর্ত্তন কর, আমি এই প্রকারে [illegible]

পুনরায় অবলোকন করিব। জরা আমাকে আক্রমণ করিবে, অতএব আমার ক্রীড়াসুখে প্রয়োজন কি ?

অপর একদিন সিদ্ধার্থ নগরের দক্ষিণ দ্বার দ্বারা উদ্যানভূমি প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে একটী ব্যাধিগ্রস্ত লোককে দেখিতে পাইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

কিং সারথে পুরুষ রূপবিবর্ণগাত্রঃ
সর্ব্বেন্দ্রিয়েভি বিকলো গুরু প্রশ্বসন্তঃ।
সর্ব্বাঙ্গ শুষ্ক উদরাকুল প্রাপ্তকৃচ্ছ্রে।
মূত্রে পুরীষ ঋকি তিষ্ঠতি কুৎসনীয়ে।

হে সারথে, এই লোকটী স্বকীয় কুৎসিত মূত্র ও পুরীষ মধ্যে অবস্থান করিতেছে কেন ? ইহার গাত্র বিবর্ণ, ইন্দ্রিয়সকল বিকল ও সর্ব্বাঙ্গ শুষ্ক। এব্যক্তি ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে ও অতিকষ্টে কালযাপন করিতেছে, ইহার কারণ কি ?

সারথি উত্তর করিল :—

এষো হি দেব পুরুষঃ পরমং গিলানো
ব্যাধীভয়ং উপগতো মরণান্ত প্রাপ্তঃ।
আরোগ্য তেজ রহিতো বলবিপ্রহীনো
অত্রাণবী প্রপরণো হুপরাবণশ্চ।

হে দেব, এই ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত গ্লানি অনুভব করিতেছে। ইহার মৃত্যু আসন্ন ও আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা নাই। ইহার বল হীন হইয়াছে। রক্ষা পাইবার কোন আশা নাই দেখিয়া এ ব্যক্তি অশরণ হইয়া পড়িয়াছে।

তখন সিদ্ধার্থ বলিলেন :—

আমোদয়ন্তা চ ভবন্তে যথ বল্গ ক্রীড়া
ব্যাধির্ভয়ঞ্চ ইম ঈদৃশ ঘোররূপম্।
কো নাম বিজ্ঞ পুরুষো ইম দৃষ্ট্বা বহ্বাং
ক্রীড়ারতিঞ্চ জনয়েৎ শুভসংজ্ঞিতাং বৈ।

আরোগ্য স্বপ্ন ক্রীড়ার ন্যায় অলীক; ব্যাধি সমূহ অতি ভয়ঙ্কর। কোন্ বিজ্ঞ পুরুষ এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকিতে পারেন, অথবা জগতে সুখ আছে — বলিয়া ভাবিতে পারেন ?

অন্য সময়ে যখন সিদ্ধার্থ নগরের পশ্চিম দ্বার দ্বারা উদ্যান ভূমিতে গমন করিতেছিলেন, তখন একটী মৃত লোককে দেখিতে পাইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

কিং সারথে পুরুষ মঞ্চোপরি গৃহীতো
উদ্ধৃত কেশ নখ পাংশু শিরে ক্ষিপন্তি।
পরিচারয়িত্ব বিহরন্তরন্তাড়য়ন্তো
নানাবিলাপবচনানি উদীরয়ন্তঃ।

হে সারথে, এই লোকটী মস্তকের উপর গৃহীত হইতেছে কেন? ইহার চতুর্দ্দিকের লোক সকল কেশ ও নখ কর্ত্তন করিতেছে ও মস্তকে ধূলি প্রক্ষেপ করিতেছে। ঐ সকল লোক ইহাকে বেষ্টিত করিয়া বক্ষঃস্থল তাড়িত করিতেছে ও নানা বিলাপবাক্য উচ্চারণ করিতেছে, ইহার কারণ কি?

সারথি বলিল :—

এষো হি দেব পুরুষো মৃতো জম্বুদ্বীপে
ন হি ভূয় মাতৃ পিতৃ দ্রক্ষ্যতি পুত্র দারম্।
অপহায় ভোগ গৃহমাতৃপিতৃমিত্রজ্ঞাতিসংঘং
পরলোক প্রাপ্তো ন হি দ্রক্ষ্যতি ভূয় জ্ঞাতিম্।

হে দেব জম্বুদ্বীপে এই লোকটীর মৃত্যু হইয়াছে। এ ব্যক্তি পুনর্বার পিতা, মাতা, পুত্র ও পত্নী প্রভৃতিকে দেখিতে পাইবে না। গৃহ, পিতা, মাতা, মিত্র, জ্ঞাতি প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া এ ব্যক্তি পরলোক গমন করিতেছে; জ্ঞাতিপ্রভৃতি আর এ ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হইবে না।

তখন সিদ্ধার্থ বলিলেন :—

ধিগ্ যৌবনেন জরয়া সমতিক্রমেন
আরোগ্য ধিগ্ বিবিধব্যাধিপরাহতেন।
ধিগ্ জীবিতেন পুরুষো ন চিরস্থিতেন
ধিক্ পণ্ডিতস্য পুরুষস্য রতি প্রসংগৈঃ।
যদি জরা ন ভবেন্না নৈব ব্যাধির্ন মৃত্যু
তথাপি চ মহদ্দুঃখং পঞ্চস্কন্ধং বহন্তো।
কিং পুন যত্র ব্যাধি মৃত্যু নিত্যানুবদ্ধাঃ
সাধু প্রতি নিবর্ত্তা চিত্তমিদং প্রমোচম্।

যৌবনে ধিক্, কারণ জরা ইহার পশ্চাতে ধাবমান। আরোগ্যে ধিক্, যেহেতু বিবিধ ব্যাধি অবশ্যম্ভাবী। জীবনে ধিক্, কারণ লোক চিরস্থায়ী নহে। বিজ্ঞ পুরুষকে ধিক্, যে তিনি অলীক আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকেন।

যদি জরা ব্যাধি ও মৃত্যু না থাকিত, তাহা হইলেও লোকের পঞ্চ স্কন্ধ ধারণ করিয়া মহা দুঃখ ভোগ করিতে হইত। জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর নিত্য সহচর হইয়া আমাদের যে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি? অতএব আমি গৃহে প্রতিগমন করিয়া দুঃখমোচনের উপায় চিন্তা করিব।

অল্প সময়ে যখন সিদ্ধার্থ নগরের উত্তর দ্বার দ্বারা উদ্যানভূমিতে প্রবেশ করিতেছিলেন তখন একটী শান্ত, দান্ত, সংযত ও ব্রহ্মচারী ভিক্ষুক দর্শন করিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

কিং সারথে পুরুষ শান্তপ্রশান্তচিত্তো
নোৎক্ষিপ্তচক্ষু ব্রজতে যুগমাত্রদর্শী।
কাষায়বস্ত্রবসনো সুপ্রশান্তচারী
পাত্রং গৃহীত্বা ন চ উন্নত উন্নতো বা।

হে সারথে, এই লোকটী কে? এ ব্যক্তি শান্তশীল ও প্রশান্তচিত্ত, ইহাঁর চক্ষুর্দ্বয় স্থির ও কাষায় বস্ত্র পরিধানীয়। ইনি উদ্ধতও নহেন, অবনতও নহেন। ইনি ভিক্ষাপাত্র ধারণ করিয়া শান্তভাবে বিচরণ করিতেছেন ও অন্তকাল প্রতীক্ষা করিতেছেন। ইনি কে?

সারথি বলিল :—

এষো হি দেব পুরুষ ইতি ভিক্ষু নামা
অপহায় কামরতয়ঃ সুবিনীতচারী।
প্রব্রজ্য প্রাপ্তঃ সমমাত্মন এষমার্গো
সংরাগদ্বেষবিগতো ভিক্ষতি পিণ্ডচর্য্যা।

হে দেব, এই ব্যক্তির নাম ভিক্ষু। ইনি কামসুখ ত্যাগ করিয়া বিনীত আচার অবলম্বন করিয়াছেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক ইনি আত্মার শান্তি অন্বেষণ করিতেছেন এবং আসক্তি-হীন ও বিদ্বেষবিহীন হইয়া সামান্য আহার সংগ্রহ করিতেছেন।

তখন বোধিসত্ত্ব বলিলেন :—

সাধু সুভাষিত মিদং মম রোচতে চ
প্রব্রজ্য নাম বিদুষিঃ সততং প্রশস্তা।
হিতমাত্মনশ্চ পরসত্ত্বহিতঞ্চ যত্র
সুখজীবিতং সুমধুরং মৃতং ফলঞ্চ।

তুমি যে বিষয়ের কথা বলিলে, উহা অতি সুন্দর ও সৎ। উহাতে আমার রুচি জন্মিতেছে। জ্ঞানিগণ সর্ব্বদাই প্রব্রজ্যাশ্রমের প্রশংসা করিয়াছেন। ঐ আশ্রমে অবস্থান করিয়া নিজের হিত ও অন্য জীবের হিত সাধন করিতে পারা যায় এবং জীবন সুখে যাপন করিতে পারা যায়। সুমধুর অমৃত অর্থাৎ মুক্তিই ঐ আশ্রমের ফল।

শুদ্ধোদন স্বীয় পুত্রের এইরূপ বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া নানাবিধ উপায়ে উহাঁকে গৃহস্থাশ্রমে রাখিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। সিদ্ধার্থ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি নিশীথ সময়ে শুদ্ধোদনের শয়নাগারে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, পিতঃ, অদ্য আমি গৃহ হইতে অভিনিষ্ক্রমণ করিব।

সিদ্ধার্থের চিত্ত তখন চারি প্রকার প্রণিধানে নিমগ্ন হইয়াছিল। সংসারমহাচারক বন্ধনপ্রক্ষিপ্ত লোকসমূহের বন্ধনমোচনের নিমিত্ত তাঁহার প্রথম প্রণিধান জন্মিল। সংসার মহাবিদ্যান্ধকারগহনপ্রক্ষিপ্ত লোকসমূহের প্রজ্ঞালোক উৎপাদন করিবার জন্য তাঁহার দ্বিতীয় প্রণিধান জন্মিল। তিনি তৃতীয় প্রণিধানে অহংকারমমকারাভিনিবিষ্ট

লোকসমূহকে আর্য্যমার্গোপদেশ প্রদান করিবার উপায় চিন্তা করিলেন। চতুর্থ প্রণিধানে তাঁহার মনে উদিত হইল, যে জীব সবল ধর্ম্মাধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া ইহলোক হইতে পর লোকে ধাবমান হয় এবং পুনরায় পরলোক হইতে ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই অনাতচক্রসমাকুল সংসারী লোক সমূহের পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন ক্লেশ নিবারণ করিবার জন্য তিনি প্রজ্ঞাতৃপ্তিকর ধর্ম্ম প্রকাশিত করিবার মানস করিলেন।

নগর হইতে নির্গত হইবার জন্য তিনি ছন্দক নামক স্বীয় সারথিকে রথ সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন। ছন্দক সিদ্ধার্থকে বলিল দেব, আপনার সংপ্রতি একটী পুণ্যবান পুত্র জন্মিয়াছে। সে চতুর্দ্বীপের অধিপতি হইবে। আপনি বিপুল সম্পদের অধিকারী। কপিলবাস্তু রাজ্য সুসমৃদ্ধ ও রমণীয়। হে দেব, পুণ্যবানগণ জন্মান্তরে ঈদৃশ সম্পদ্ লাভ করিতে পারিবেন বলিয়াই কঠোর তপস্যা করিয়া থাকেন। আপনি এই সম্পদ লাভ করিয়াও পরিত্যাগ করিতেছেন কেন? দেখুন আপনার পত্নী অতি রমণীয়া।

ইয়াং বিবুদ্ধাম্বুজপত্রলোচনাং
বিচিত্রহারাং মণিরত্নভূষিতাম্।
ঘনপ্রমুক্তেব বিদ্যুতাং নভে
মনোপমে শয়নগতাং বিরোচনাম্।

বিকসিত পদ্মের ন্যায় লোচনবিশিষ্টা, বিচিত্রহারশোভিতা, মণিরত্নভূষিতা ও মেঘ-নির্ম্মুক্ত আকাশে সমুদিত বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাশালিনী এবং মনোহরা ও শয়নগতা এই পত্নীকে উপেক্ষা করিবেন না।

তখন সিদ্ধার্থ বলিলেন :—

অপরিমিতাসুতরা ময়া ছন্দক
ভুক্তা কামানিমাং গুণাংশ্চ শব্দাদ্।
গন্ধ রসা স্পর্শাস্তথা নানাবিধা
দিব্যা যে মানুষা যে চ তৃপ্তিরতুষ্ঠ।
বজ্রাশনি পরশুশক্তি শরাশ্রবর্ষে
বিদ্যুৎপ্রভানবজ্বলিতং ফলিতঞ্চ লোহং।
আদীপ্ত শৈলশিখরাঃ প্রপতেষু মূর্দ্ধি
নো বাপ্যহং পুনর্মেয় গৃহাভিলাষম্।

হে ছন্দক, আমি এই রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ ইত্যাদি নানাবিধ কাম্য বস্তু ইহলোকে ও দেবলোকে অনন্ত কল্পকাল ভোগ করিয়াছি, কিন্তু আমার কিছুতেই তৃপ্তি হয় নাই। এক্ষণে গৃহত্যাগ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। বজ্র, কুঠার, শর, প্রস্তর, বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় প্রজ্বলিত লৌহ, আগ্নেয়গিরিশিখর ইত্যাদি আমার মস্তকে পতিত হইলেও, তথাপি গৃহস্থাশ্রমে পুনরায় আমার অভিলাষ জন্মাইতে পারিবে না।

সিদ্ধার্থের এইরূপ স্থির প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া ছন্দক রথ সজ্জিত করিল। অর্দ্ধরাত্রি সময়ে পুষ্যানক্ষত্রযোগে সিদ্ধার্থ গৃহ হইতে অভিনিষ্ক্রমণ করিলেন।

তিনি ক্রমে শাক্য, কোড্য, মল্ল ও মৈনেয় প্রভৃতি জনপদ অতিক্রম করিলেন। ছয় যোজন পথ অতিক্রমের পর রাত্রি প্রভাত হইল। তিনি তখন শরীর হইতে সমস্ত আভরণ পরিত্যাগ করিয়া ছন্দককে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন। ছন্দক যেস্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল, ঐ স্থানে একটি চৈত্য সংস্থাপিত হয়। সেই চৈত্য অদ্যাপি ছন্দকনিবর্ত্তন নামে প্রসিদ্ধ।

তদনন্তর তিনি মস্তক হইতে চূড়া ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। যে স্থানে তাঁহার চূড়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ঐ স্থানে একটী চৈত্য সংস্থাপিত হয়। উহা অদ্যাপি চূড়াপ্রতিগ্রহণ নামে প্রসিদ্ধ। অনন্তর তিনি কাষায়বস্ত্রপরিহিত একটী ব্যাধকে দেখিতে পাইয়া উহার কাষায় বস্ত্রের সহিত তাঁহার নিজের কৌষিক পট্টবস্ত্রের বিনিময় করিলেন। যে স্থানে তিনি কাষায়বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঐ স্থানে একটী চৈত্য সংস্থাপিত হয়; উহা অদ্যাপি কাষায়গ্রহণ নামে প্রসিদ্ধ।

ছন্দক সিদ্ধার্থের আভরণসমূহ লইয়া কপিলবাস্তু রাজধানীতে প্রতিগমন করিল। তাহার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শুদ্ধোদন মহাপ্রজাবতী প্রভৃতি সকলেই গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। সিদ্ধার্থের গৃহ প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই জানিয়া তাঁহারা ঐ সমস্ত আভরণ পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই পুষ্করিণী অদ্যাপি আভরণ-পুষ্করিণী নামে খ্যাত।

গোপা প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন তাঁহার স্বামী সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন।

গোপা শয্যাতো ধরণীতলে নিপত্য
কেশান্ লুনাতি অবশিরি ভূষণানি।
অহো মমার্য্যং মন পুরিদায়কেন
সর্ব্বপ্রিয়েভি ন চিরে তু বিপ্রয়োগঃ॥

গোপা শয্যা ত্যাগ করিয়া ধরণীতলে নিপতিত হইলেন। তিনি কেশগুচ্ছ ছেদন করিতে লাগিলেন ও গাত্র হইতে সমস্ত অলঙ্কার অপসারিত করিলেন। হায় আমার পরিণায়ক অপগত হইয়াছেন। আমি জীবনের সমস্ত প্রকার প্রিয়বস্তু হইতে অদ্য বিযুক্ত হইলাম।

গোপা প্রভৃতি সকলেই এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্ব ছন্দককে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া যথাক্রমে শাক্য ও পদ্মা নামধেয়া দুই ব্রাহ্মণীর আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করেন। তদনন্তর তিনি বৈবত নামক ব্রহ্মর্ষির আশ্রমে গমন করেন। পরিশেষে তিনি বৈশালী মহানগরীতে উপস্থিত হন। সেখানে আরাড় কালাম

নামক কোন উপাধ্যায়ের সহ তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। আরাড় কালামের তিন শত শিষ্য ছিল। বোধিসত্ত্ব তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কিছুকাল তদুপদিষ্ট ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন। আরাড় কালাম স্বীয় শিষ্যদিগকে আকিঞ্চন্যায়তন ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। এই মতে বিষয়বাসনাবিরহিত হইয়া সর্ব্বত্যাগী হওয়াই পরম মুক্তি। বোধিসত্ত্ব এই শিক্ষায় বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই।

অনন্তর তিনি মগধের অন্তর্গত পাণ্ডব-পর্ব্বতরাজ-সমীপে বিহার করিতে লাগিলেন। তিনি রাজগৃহ নগরে ভিক্ষা করিয়া নিজের আহার সংগ্রহ করিতেন। রাজপুরুষ লোক সকল তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। তাহারা রাজগৃহের রাজা বিম্বিসারের নিকট যাইয়া বলিল, মহারাজ, স্বয়ং ব্রহ্মা, দেবরাজ, চন্দ্র অথবা সূর্য্য আপনার নগর মধ্যে ভিক্ষা করিতেছেন। বিম্বিসার প্রাতঃকালে মহাজনকায়-সমভিব্যাহারে পাণ্ডব-পর্ব্বতরাজ পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন।

পরমপ্রমুদিতোঽস্মি দর্শনাত্তে
অবচিত্ব চ মাগধরাজ বোধিসত্ত্বম্।
প্রভ হি মম সহায় সর্ব্বকালং
অহ তব দাস্তে প্রভূতং ভুঞ্জ কামান্।
মা চ পুনর্ব্বমে বসাহি শূন্যে
মা ভূয় তৃণেষু বসাহি ভূমিবাসম্।
পরমসুকুমার তুল্য কায়ঃ
ইহ মম রাজ্যি বসাহি ভুঞ্জ কামান্।
প্রণতি গিরি বোধিসত্ত্বঃ প্রশ্নং
অকুটিলপ্রেমণীয়ং হিতানুকম্পী।
অতি ধরণিপাল তেঽস্তু নিত্যং
ন চ অহং কামগুণেষ্বিরর্থিকোঽস্মি।
কামং বিষসমা অনন্তদোষা
নরকে প্রপাতন প্রেততির্য্যগ্‌যোনৌ।
বিদুভিরিগর্হিতা চাপ্যনার্য্যকামাঃ
মহিত ময়া যথ পঞ্চথেটপিণ্ডম্।

মগধরাজ বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, আপনার দর্শন লাভ করিয়া আমি পরম প্রমুদিত হইয়াছি। আপনি আমার সহকারী হউন, আমি আপনাকে সমগ্র রাজ্য দান করিতেছি। আপনি প্রভূত কাম্য-বস্তু ভোগ করুন।

উপকারী ও দয়ার্দ্রচিত্ত বোধিসত্ত্ব মধুর, অকুটিল ও প্রেমপূর্ণ বাক্যে বলিলেন, হে ধরণীপাল, আপনার সর্ব্বদা মঙ্গল হউক, আমি কোন কাম-সুখের প্রার্থী নহি। কামনা বিষতুল্য ও অনন্ত দোষের আকর। কামের বশে লোক নরক, প্রেত, তির্য্যগ্ ইত্যাদি যোনিতে

জন্ম গ্রহণ করে। জ্ঞানিগণ এই কামনার সতত নিন্দা করিয়াছেন। আমি উহা শ্লেষ্মা পিণ্ডের ন্যায় ত্যাগ করিয়াছি।

তখন বিম্বিসার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভিক্ষো, আপনি কোন্ দেশ হইতে আগত হইয়াছেন? আপনার কোথায় জন্ম? আপনার পিতা মাতা কোথায় বাস করেন?

বোধিসত্ত্ব উত্তর করিলেন, হে ধরণীপাল, শাক্যগণের সুসমৃদ্ধিশালী কপিলবাস্তু নগর বিদ্যমান আছে। সেই নগরের রাজা শুদ্ধোদন আমার পিতা। বুদ্ধত্ব লাভের আশয়ে আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি।

তখন বিম্বিসার বলিলেন :—আপনার দর্শন লাভ করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। আমরা আপনার পিতার শিষ্য। হে স্বামিন্, যদি আপনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন, তাহা হইলে আমি আপনার ধর্ম্মের আশ্রয় লইব। এই কথা বলিয়া বিম্বিসার বোধিসত্ত্বের চরণ বন্দনা করিয়া রাজ-গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে রুদ্রক নামক কোন উপাধ্যায় রাজগৃহে অধ্যাপনা করিতেন। রুদ্রক স্বীয় শিষ্যগণের নিকট নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন সমাপত্তির উপায় ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি বলিতেন শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই পাঁচটী অবলম্বন করিয়া মোক্ষমার্গের পথিক হওয়া উচিত। মুক্তিলাভ হইলে জ্ঞান ও অজ্ঞান এতদুভয়কে অতিক্রম করিতে পারা যায়। বোধিসত্ত্ব রুদ্রকের নিকট কিছুকাল ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। তদনন্তর তিনি মগধের গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে উপস্থিত হন এবং সেখানে তিন প্রকার আধ্যাত্মিক উপমা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয়। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, যাঁহার কাম্য-বস্তুবিষয়ক রাগ, তৃষ্ণা বা পিপাসার নিবৃত্তি হয় নাই, তিনি কখনই আন্তরিক ও শারীরিক দুঃখ হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারিবেন না। যদি কোন ব্যক্তি অগ্নি উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করিয়া আর্দ্র কাষ্ঠ জলমধ্যে সংস্থাপন করেন এবং ঐ কাষ্ঠ আর্দ্র অরণি দ্বারা সংঘর্ষণ করেন, তাহা হইলে তিনি উহা হইতে কখনই অগ্নি উৎপাদন করিতে পারিবেন না, সেইরূপ যাঁহার চিত্ত রাগাদি দ্বারা আর্দ্র রহিয়াছে, তিনি কখনই জ্ঞান-জ্যোতিঃ লাভ করিতে পারিবেন না। এই উপমা বোধিসত্ত্বের চিত্তে প্রথমে উদিত হয়। তদনন্তর তিনি ভাবিলেন, যিনি আর্দ্র কাষ্ঠ লইয়া স্থলে সংস্থাপন পূর্ব্বক আর্দ্র অরণি দ্বারা উহার সংঘর্ষণ করেন, তিনিও উহা হইতে অগ্নি উৎপাদন করিতে সমর্থ হন না। সেইরূপ যাঁহাদের হৃদয় রাগাদি দ্বারা অভিষিক্ত, তাঁহারাও জ্ঞান-জ্যোতিঃ লাভ করিতে পারেন না। ইহাই দ্বিতীয় উপমা। অনন্তর তাঁহার মনে হইল, যিনি শুষ্ক কাষ্ঠ লইয়া স্থলে সংস্থাপন পূর্ব্বক শুষ্ক অরণি দ্বারা উহার সংঘর্ষণ করেন, তিনি উহা হইতে অনায়াসে অগ্নি উৎপাদন করিতে পারেন। সেই রূপ যাঁহার চিত্ত হইতে রাগাদি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে, তিনিই কেবল জ্ঞানাগ্নি লাভ করিতে সমর্থ। তৃতীয়তঃ এই উপমা বোধিসত্ত্বের মনে উপস্থিত হয়।

অনন্তর তিনি গয়াপ্রদেশে উরুবিল্ব গ্রাম সমীপে নৈরঞ্জনানাম্নী নদী দেখিতে পান।

সেই রমণীয় নদীতীরে উপবিষ্ট হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, বর্ত্তমান যুগে জম্বুদ্বীপ পঞ্চবিধ পাপ দ্বারা কলুষিত। এক্ষণে আমি জম্বুদ্বীপের মনুষ্যগণকে কিরূপে ধর্ম্মপথে অভিনিবিষ্ট করিব, ইহাই আমার চিন্তনীয়। বোধিসত্ত্ব এইরূপ চিন্তা করিয়া ষড়্‌বর্ষব্যাপিনী তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে আশ্চানক ধ্যানের অনুষ্ঠান করিলেন। যেমন বলবান্ লোক দুর্ব্বল লোককে অনায়াসে শাসন করিতে পারে, সেইরূপ বোধিসত্ত্বের চিত্ত দেহকে সংযত করিতে লাগিল। যখন বোধিসত্ত্ব আশ্চানক ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, তখন তাঁহার মুখ-বিবর ও নাসিকারন্ধ্র হইতে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হইল। তাঁহার কর্ণছিদ্র হইতে মহাশব্দ নিঃসৃত হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার কর্ণছিদ্রও রুদ্ধ হইল। মুখ নাসিকা ও কর্ণ সংরুদ্ধ হওয়ায় নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গতি ঊর্দ্ধাভিমুখী হইল। শিরঃপিণ্ড ভেদ করিয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বহির্গত হইল। ক্রমে তিনি আহার সংযত করিলেন। পরিশেষে প্রতিদিন একটী মাত্র তণ্ডুল ভক্ষণ করিতেন। তাঁহার দেহ ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে তিনি যথাবিহিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া ললিতব্যূহ নামক সমাধিতে নিমগ্ন হন। বোধিসত্ত্ব যখন নৈরঞ্জনাতীরে বোধিদ্রুমমূলে যোগাসনে আসীন হন, তখন বলিয়াছিলেন—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥

এই আসনে আমার শরীর শুষ্কতা লাভ করুক এবং আমার ত্বক্, অস্থি ও মাংস এ স্থানে বিলীন হউক; কিন্তু সুদুর্লভ বুদ্ধত্ব লাভ না করিয়া আমার দেহ এই আসন হইতে বিচলিত হইবে না।

যখন বোধিসত্ত্ব নানাপ্রকার কঠোর তপশ্চরণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার তপোভঙ্গ করিবার নিমিত্ত কামলোকের অধিপতি মার স্বীয় সহস্র পুত্র কন্যা ও অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে বোধিদ্রুমমূলে উপস্থিত হয়। মারপুত্রগণের মধ্যে যাহারা বোধিসত্ত্বের প্রতি অপ্রসন্ন, তাহারা মারের দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। আর যাহারা বোধিসত্ত্বের প্রতি বিমুখ ও মারের পক্ষাবলম্বী, তাহারা মারের বাম পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। তদনন্তর মার সৈন্যগণ বোধিসত্ত্বের তপোভঙ্গের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইল। বোধিসত্ত্বও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বুদ্ধত্ব লাভ না করিয়া তপশ্চর্য্যা হইতে বিরত হইবেন না। এই হেতু উভয় পক্ষে তুমুল সমর সংঘটিত হইল।

দক্ষিণ দিকে সার্থবাহ নামক মারপুত্র স্বীয় পিতাকে বলিল :—

যুধ্যং প্রলোভয়িতুমিচ্ছতি পরমেশ্বরং
যুধ্যং প্রমোদয়িতুমিচ্ছতি যো গজেন্দ্রম্।
যুধ্যং প্রলোভয়িতুমিচ্ছতি যো মৃগেন্দ্রং
যুধ্যং প্রমোদয়িতুমিচ্ছতি সো মরেন্দ্রম্।

যে ব্যক্তি সুপ্ত পন্নগেন্দ্র, গজেন্দ্র বা মৃগেন্দ্রকে জাগরিত করিতে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তিই কেবল ধ্যাননিমগ্ন বোধিসত্ত্বকে ধ্যান হইতে ভ্রষ্ট করিতে অভিলাষ করে।

তখন মারের বাম পার্শ্ব হইতে দুর্মতি নামক মারপুত্র বলিল :—

সন্ত্রাসনেন হৃদয়ান্যভিসংক্ষুটন্তি
লোকেষু সারসহতামপি পাদপানাম্।
কা শক্তিরস্তি মম দৃষ্টিহতস্য তস্য
সঞ্জীবিতুং জগতি মৃত্যুহতস্য বাপি।

এই সংসারে আমার দৃষ্টিতে সারবান্ বৃক্ষসমূহেরও অভ্যন্তর ভাগ বিদীর্ণ হয়। যে আমার দৃষ্টিতে আহত হইয়াছে, জগতে এমন কে আছেন যিনি তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারেন।

দক্ষিণে মধুরনির্ঘোষ বলিল :—

যঃ সাগরং তরিতুমিচ্ছতি বৈ ভুজাভ্যাম্
তোয়ঞ্চ তস্য পিবিতুং মনুজেশসত্ত্ব।
শক্যং ভবেদিহমতস্তু বদামি সত্যং
বক্তুঞ্চ বক্ত্রমভিতোপমলং নিবীক্ষেৎ।

যিনি ভুজদ্বয়ের উপর নির্ভর করিয়া সাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, অথবা যিনি সমুদ্রের সমগ্র তোয় নিঃশেষরূপে পান করিতে অভিলাষ করেন; তিনিই কেবল বোধিসত্ত্বের নির্ম্মল মুখমণ্ডল সর্ব্বতোভাবে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হন।

বামদিকে শতবাহু মারকে সম্বোধন করিয়া বলিল :—

মমেহ দেহেস্মি শতং ভুজানাং
ক্ষিপামি চৈকেন শতং শরাণাম্।
তিলস্য কায়ং প্রমথস্য তাত
সুখী ভবস্বং ব্রজ মা বিলম্বম্।

আমার এই দেহে শতবাহু বিদ্যমান আছে এবং প্রত্যেক বাহু দ্বারা আমি শতসংখ্যক বাণ নিক্ষেপ করি। হে পিতঃ, আমি বোধিসত্ত্বের দেহ ভেদ করিব। আপনি সুখী হউন, বিলম্ব করিবেন না।

দক্ষিণদিকে সুবুদ্ধি বলিল :—

শতং ভুজানাং যদি কো বিশেষো
ভূয়া কিমর্থং ন ভবন্তি রোমাঃ।
ভূশৈকমেকেন চ তৈরপি শরা-
স্তৈস্তাপি কুর্য্যান্নহি তস্য কিঞ্চিৎ।

তোমার শত বাহুই থাকুক অথবা শরীরে যত রোম আছে তাবৎসংখ্যক বাহুই থাকুক, তাহাতে কি? তুমি প্রত্যেক বাহু দ্বারা বাণসমূহ নিক্ষেপ কর, তাহাতেই বা কি? উহাতে বোধিসত্ত্বের কোনই ক্ষতি হইবে না।

অনন্তর বামদিকে উগ্রতেজাঃ বলিল, আমি বোধিসত্ত্বের শরীরে প্রবেশ করিব ; দাবাগ্নি যেমন শুষ্কবৃক্ষসমূহকে দগ্ধ করে, ঐরূপে দগ্ধ করিব। তৎক্ষণাৎ সুনেত্র নামক সৈন্য দক্ষিণদিক্ হইতে বলিয়া উঠিল, তুমি সুমেরু পর্ব্বতকে দগ্ধ করিতে পার, সমগ্র মেদিনী তোমার তেজে ভস্মীভূত হইতে পারে ; কিন্তু বোধিসত্ত্বের শরীর দগ্ধ করা তোমার সাধ্য নহে ; উহাঁর বুদ্ধি ও প্রতিজ্ঞা বজ্রের ন্যায় স্থির। বাম দিকে দীর্ঘবাহু গর্ব্বিতভাবে বলিল, হে তাত, আমি আপনার আশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়া চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রপ্রভৃতিকে উহাদের আলয় হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারি ; অবলীলাক্রমে সমুদ্রচতুষ্টয়কে জলশূন্য করিতে পারি। সেই বোধিসত্ত্বকে সমুদ্রের পরপারে নিক্ষেপ করিতে পারি। হে পিতঃ, আপনার সৈন্যসকল অপেক্ষা করুক ; আপনি শোকার্ত্ত হইবেন না। আমি এই হস্তে সেই বোধিবৃক্ষ উৎপাটন করিয়া দশ দিকে প্রক্ষেপ করিতেছি।

দক্ষিণদিকে প্রসাদপ্রতিলব্ধ নামক সৈনিক বলিল—হে দীর্ঘবাহু, তুমি মদগর্ব্বিত হইয়া দেবাসুরগন্ধর্ব্বপরিবৃত সাগরসহিত পর্ব্বতমালাপরিশোভিত মহীমণ্ডলকে বিধ্বংস করিতে পার, কিন্তু তোমার অবগত হওয়া উচিত যে তোমার ন্যায় সহস্র ব্যক্তিকে সেই বোধিসত্ত্ব গঙ্গাবালুকার ন্যায় অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করেন ; সেই ধীমান্ বোধিসত্ত্বের একটি কেশও সংচালিত করিবার ক্ষমতা তোমার নাই। এইরূপে বামদিক হইতে অসংখ্য মার-সৈন্য বোধিসত্ত্বকে আক্রমণ করিল ; ঐ সকল সৈন্যের মধ্যে ভয়ঙ্কর, অবতারপ্রেক্ষী, অনুপশান্ত, বৃত্তিলোপ, বাতজব, ব্রহ্মমতি, সর্বচণ্ডাল, দুশ্চিন্তচিন্তী প্রভৃতি প্রধান। কিন্তু বোধিসত্ত্বের সৌভাগ্যের বিষয় এই যে তাঁহার দক্ষিণ দিক্ হইতে একাগ্রমতি, পুণ্যালঙ্কৃত, স্বর্গকাম, সিদ্ধার্থ, ধর্ম্মরতি, অচলমতি, সিংহমতি, সিংহনাদী, সুচিন্তিতার্থ প্রভৃতি কয়েক জন সবল সৈন্য আসিয়া তাঁহার সাহায্য করিল। ঐ কয়েক জন সৈনিকের সহকারিতায় বোধিসত্ত্ব মারপক্ষকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিলেন। সিদ্ধার্থ নামক সৈনিক বোধিসত্ত্বকে সাহায্য করিতে যাইয়া মারপক্ষকে সতেজে বলিয়াছিল :—

বিষাগ্রমুগ্রং ত্রিভবেহ যচ্চ
রাগশ্চ দোষশ্চ তথৈব মোহঃ।
তে তস্য কায়ে চ তথৈব চিত্তে
নভে যথা পংকলবো ন সন্তি।

ত্রিসংসারে যে উগ্রতম বিষ অথবা অত্যুৎকট রাগ দ্বেষ ও মোহ বিদ্যমান আছে, তাহা বোধিসত্ত্বের শরীরে বা চিত্তে কিছুতেই লিপ্ত হইতে পারে না। দেখুন আকাশে পঙ্ক বা রজঃ কিছুই স্থান পায় না।

সিংহনাদী নামক সৈন্য মারপক্ষকে স্পষ্টই বলিয়াছিল :—

বহবঃ শৃগালা হি বনান্তরেষু
নশ্যন্তি মাদান্ন সতাং হি সিংহে।

তে সিংহনাদং তু নিশম্য ভীমং
ত্রস্তা পলায়ন্তি দিশো দশাস্থ।

বহু শৃগাল বনে চীৎকার করিয়া বেড়ায়, কিন্তু ভীষণ সিংহনাদ শ্রবণ করিলেই উহারা ভয়ে দশদিকে পলায়মান হয়।

এইরূপে যে কয়েক জন সৈন্য বোধিসত্ত্বের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল তাহারা সকলেই তেজস্বী, বীর ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

তখন মারসৈন্যগণ পরাভূত হইয়া সকলেই মারের সমীপে স্বীয় পরাক্রম ও পরাজয়ের বিষয় বর্ণন করিল। মারপক্ষের প্রধান সেনাপতি ভদ্রসেন পাপাত্মা মারকে সম্বোধন করিয়া বলিল :—

হে মার! ইন্দ্র প্রভৃতি দিক্‌পালগণ এবং অসুর কিন্নর প্রভৃতি সকলেই আপনার অনুগত। কিন্তু উহাঁরা সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করিতেছেন। আপনার পুত্রগণের মধ্যে যাঁহারা প্রভাবান্ ও মেধাশালী, তাঁহারাও বোধিসত্ত্বকে আন্তরিক নমস্কার করিতেছেন। বোধিসত্ত্বের শরীরে পুণ্য, প্রজ্ঞা, জ্ঞান, শান্তি, বীর্য্য ইত্যাদি বহুবিধ বল বিদ্যমান আছে। সেই অমিতবলশালী বোধিসত্ত্ব আপনাকে সম্পূর্ণরূপে দুর্ব্বল করিয়াছেন। হস্তী যেমন পদদ্বারা ভূমিকে প্রমর্দ্দিত করে, সিংহ যেমন শৃগালসমূহকে ব্যতিব্যস্ত করে, আদিত্য যেমন স্বীয় তেজে খদ্যোতসমূহকে পরাভূত করেন, বোধিসত্ত্বও সেইরূপ আপনাকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও তাড়িত করিবেন।

প্রধান সেনাপতির মুখে এই কথা শুনিয়া মারের কোন পুত্র অতীব ক্রুদ্ধ হইল। সে রোষের বশে আরক্তলোচন হইয়া বলিল :—

একস্য বর্ণয়তি অপ্রমেয়া
প্রভাবসে তস্য ত্বমেকস্য।
একোহি কর্ত্তুং খলু কিং সমর্থো
মহাবলং পশ্যসি কিং ন ভীমাম্।

আপনি একমাত্র বোধিসত্ত্বের সম্বন্ধে অসংখ্য কথা বলিতেছেন। এক ব্যক্তির সম্বন্ধে আপনি এত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন। একব্যক্তি কি করিতে পারে? আপনি এই মহাবল ভীষণ মারসৈন্যগণকে কি দেখিতে পাইতেছেন না?

তখন দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে একটী সৈন্য বলিয়া উঠিল :—

সূর্য্যস্য লোকে ন সহায়কৃত্যং
চন্দ্রস্য সিংহস্য চ চক্রবর্ত্তিনঃ।
বোধৌ নিষণ্ণস্য চ নিশ্চিতস্য
ন বোধিসত্ত্বস্য সহায়কৃত্যম্।

এই জগতে সূর্য্যদেব কোন সাহায্য প্রার্থনা করেন না। চন্দ্র, সিংহ ও রাজচক্রবর্ত্তীরও

কোন সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয় না। বুদ্ধত্ব লাভ করিবার জন্য যিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, সেই স্থিরযোগী বোধিসত্ত্বেরও কোন সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয় না।

প্রবল সমরের অবসানে পাপাত্মা মার খড়্গ, ধনু, কুঠার, মুষল, গদা, চক্র, বজ্র মুদ্গর ইত্যাদি নানাবিধ অস্ত্র লইয়া বোধিসত্ত্বের শরীরে ও চিত্তে নিক্ষেপ করিতে অভিলাষ করিল। কিন্তু বোধিসত্ত্বের শরীরে বা চিত্তে কোথাও ঐ সকল অস্ত্র বিদ্ধ হইল না; মার পরাজিত হইয়া দুঃখিত, লজ্জিত ও বিষণ্ণ হইল। সে পূর্ব্বভাগে গমন করিতে পারিলনা, পশ্চাদ্ভাগে নিবৃত্ত হইল না এবং পার্শ্বদিকেও পলায়ন করিতে পারিল না। তখন পশ্চাদ্মুখ হইয়া স্বীয় সৈন্যগণকে বলিল, তোমরা সকলে সমবেত হইয়া কিছুকাল অবস্থান কর; আমি দেখিব যদি অনুনয় করিয়া বোধিসত্ত্বকে যোগাসন হইতে উত্থাপন করিতে পারি। এরূপ ব্যক্তিকে সহসা বিনাশ করিতে পারা যায় না।

অনন্তর মার স্বীয় দুহিতা অপ্সরোগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, হে দুহিতৃগণ, তোমরা বোধিসত্ত্বের সমীপে যাইয়া জিজ্ঞাসা কর, তিনি সরাগ কি বীতরাগ, তিনি মূর্খ কি প্রাজ্ঞ, তিনি দীন কি ধীর। অপ্সরোগণ বোধিসত্ত্বের সমীপে গমন করিয়া দ্বাত্রিংশৎ প্রকার স্ত্রীমায়া প্রদর্শন করিতে লাগিল। তাহারা বিম্বফলোপম ওষ্ঠ, অর্দ্ধবিহসিত দন্তাবলী, অর্দ্ধনিমীলিত নয়ন ইত্যাদি প্রদর্শন পূর্ব্বক বোধিসত্ত্বের মুখমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব তখন অনুপম স্থৈর্য্য অবলম্বন করিয়া প্রশান্তভাবে যোগাসনে আসীন থাকিলেন। তাঁহার মুখ রাহুবিনির্মুক্ত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শুদ্ধ ও বিমল, উদয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী, সুবর্ণময় যূপের ন্যায় উজ্জ্বল, বিকসিত সহস্রপত্রের ন্যায় শোভাবিশিষ্ট, ঘৃতাভিষিক্ত অনলের ন্যায় দীপ্তিময়, সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় স্থির, চক্রবাড় পর্ব্বতের ন্যায় উন্নত এবং তিনি গুপ্তেন্দ্রিয় হস্তীর ন্যায় শান্ত দেখাইতে লাগিল।

মারদুহিতৃগণ নানাপ্রকার অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া বোধিসত্ত্বকে অনেক কথা বলিল, কিন্তু তাঁহাকে যোগাসন হইতে উত্তোলিত করিতে পারিল না। তাহারা অনেক প্রকার প্রলোভন প্রদর্শন করিল, কিন্তু তাহাতেও বোধিসত্ত্বের চিত্ত বিচলিত হইল না। তখন মারদুহিতৃগণ মারকে বলিল :—

রক্তা মধুরং চ ভাষতে ন চ রক্তো
শুক্লস্তহং চ নিরীক্ষতে ন চ দুষ্টঃ।
ঈর্ষ্যাং চ প্রেক্ষতে ন চ মূঢ়কাবঃ
সর্ব্বে পর্যেতি আশয়ো সুগম্ভীরঃ।
নিঃসংশয়েন বিদিতঃ পৃথু ইন্দ্রিয়োবাঃ
কামৈর্বিযুক্তমনসো ন চ রাগরক্তঃ।
নৈবাত্মসো দিবি ভুবীহ নরঃ সুরো-সা
যস্তস্য চিত্তচরিতং পরিজানয়াতে।

বা ইন্দ্রিয়াণা উপনর্ষিত তত্র তস্য
প্রচলীযু তস্য হৃদয়ং ভবিষ্যঃ সরাগঃ।
তদ্দৃষ্ট একমপি কম্পিতু নাস্য চিত্তং
শৈলেন্দ্ররাজ ইব তিষ্ঠতি সোঽপ্রকম্পঃ।
নিঃসংশয়েন বিনিহত্য স মারসৈন্যং
পূর্ব্বং জিনানুমত প্রাপ্নোতি অগ্রবোধিং।
তাতা ন রোচতি হি মনোঽপি বণে বিবাদো
বলবৎসু বিগ্রহ সুকৃচ্ছ্র অয়ং প্রয়োগঃ।

হে পিতঃ, এই বোধিসত্ত্ব ধীরে ও মধুরভাবে কথা বলেন, কিন্তু কিছুতেই আসক্ত হন না। স্থির ও গূঢ় ভাবে নিরীক্ষণ করেন, কিন্তু তাঁহার চিত্ত দূষিত নহে। ঈর্ষ্যার সহ অবলোকন করেন, কিন্তু তাঁহার চিত্ত বিমুগ্ধ হয় না। তাঁহার অন্তঃকরণ গম্ভীর এবং তাঁহার মনের ভাব বহিঃ প্রকাশিত হয় না। নিশ্চয়ই তিনি জানেন যে স্ত্রীসঙ্গে বহুদোষ ঘটে। তাঁহার চিত্ত কামসমূহ হইতে সম্পূর্ণ বিনির্মুক্ত এবং তিনি কিছুতেই আসক্ত হন না। স্বর্গে বা পৃথিবীতে এমন কোন দেব বা মনুষ্য নাই, যিনি তাঁহার চিত্তবৃত্তির অবস্থা পরিজ্ঞাত আছেন। হে তাত, আমরা তাঁহার সমীপে নানা প্রকার স্ত্রীমায়া প্রদর্শন করিয়াছিলাম এবং ভাবিয়াছিলাম তাঁহার হৃদয়ে আসক্তির উদ্রেক হইবে ও তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন। কিন্তু পিতঃ, সেই সকল দেখিয়া বোধিসত্ত্বের চিত্ত বিন্দুমাত্রও কম্পিত হইল না; তিনি পর্ব্বতরাজের ন্যায় স্থির থাকিলেন। নিশ্চয়ই তিনি মারসৈন্যগণকে নিহত করিয়া জ্ঞানিগণের অনুমোদিত বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন। হে তাত, সেই বোধিসত্ত্বের সহ বিবাদ করিতে আমাদের মনেও রুচি হয় না। বস্তুতঃ প্রবল লোকের সহ বিরোধ দুঃখে পর্য্যবসিত হয়।

পরিশেষে তাহারা মারকে বলিল :—

শ্রেয়ো ভবেৎ প্রতিনিবর্ত্তিতুমদ্য তাত।

হে তাত অদ্য প্রতিনিবৃত্ত হওয়াই আমাদের শ্রেয়ঃ হইবে।

সেই সময়ে শ্রীবুদ্ধি, তপা, শ্রেয়সী, বিদ্যুঃ, ওজঃ, বলা, সত্যবাদিনী, সমঙ্গিনী এই আটটী বোধিবৃক্ষদেবতা বোধিসত্ত্বের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তাঁহার আধ্যাত্মিক তেজস্বিতা দেখিয়া পরম আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন।

মার পরাজিত হইয়া পরিশেষে বোধিসত্ত্বকে বলিল :—

আমি কামরাজ্যের অধিপতি। ইহ সংসারে দেব, দানব, মনুষ্য ও তির্য্যক্ সকলেই আমার বশীভূত। আমি সংসার ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছি। সংসারের সকল পদার্থই আমার বশে চলিতেছে। অতএব হে বোধিসত্ত্ব, তুমি যোগাসন ত্যাগ করিয়া উত্থিত হও এবং তোমার মনকে বিষয় কামনায় রত কর।

বোধিসত্ত্ব উত্তর করিলেন :—

হে মার তুমি কামস্কন্ধ সমূহের অধিপতি, তোমার আত্মসংযম নাই; সুতরাং কোন

নিষেধ উপায়ই তোমার প্রভুত্ব নাই, তুমি দেখিবে আমি তোমার সমক্ষে বুদ্ধত্ব লাভ করিব।

এইরূপে মারসৈন্যগণ, মারস্ত্রীগণ, মারদুহিতৃগণ ও মার স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল। তখন মার অনুতাপ প্রকাশ করিয়া বলিল :—

দুঃখং ভয়ং ব্যসনশোকবিমাননঞ্চ
ধিক্কারশস্ত্রবধবন্ধনসম্ভবঞ্চ দৈন্যম্।
প্রাপ্তোঽস্মি অদ্য অপরাধ্য দুষ্টমনসো
অশ্রুত্বা বাক্যং মধুরং হিতমাত্মজানাম্।

শুদ্ধসত্ত্ব বোধিসত্ত্বের অনিষ্ট সাধন করিতে যাইয়া আজ আমি দুঃখ, ভয়, ব্যসন, শোক, অপমান, দৈন্য, ধিক্কার ইত্যাদি বহু পরিমাণে প্রাপ্ত হইলাম। আমার নিজের কল্যাণের হিতকর ও মধুর বাক্য না শুনিয়া আজ আমার এই ফল লাভ হইল।

পূর্ব্বোক্ত তপা, ওঘঃ, শ্রেয়সী প্রভৃতি দেবগণ তখন মারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

ভয়ঞ্চ দুঃখং ব্যসনঞ্চ দৈন্যং
ধিক্কারশস্ত্রং বধবন্ধনঞ্চ।
যোঽযানেকান্ লভতে দুর্বিধাত্মা
নিরপরাধেষ্বপকারাদ্ভবেত যঃ।

—হে মার, যে ব্যক্তি নিরপরাধ লোকের প্রতি অনিষ্টাচরণ করিতে অভিলাষ করে, সেই অজ্ঞান ব্যক্তি ভয়, দুঃখ, ব্যসন, দৈন্য, ধিক্কার, বধ, বন্ধন ইত্যাদি অনেক প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

দেবগণ এইরূপে মারসেনাকে পরাভূত করিয়া পরম শান্তি লাভ করিলেন। তখন চিত্ত সুপ্রসন্ন হইলে তিনি তাহাতে রাগ ধ্যান সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমতঃ সবিতর্ক, দ্বিতীয়তঃ অবিতর্ক, তৃতীয়তঃ নিষ্প্রীতিক, এবং চতুর্থতঃ অদুঃখাসুখস্মৃতিপরিশুদ্ধি বিহার করিতে লাগিলেন। চিত্তের সৎ ও অসৎ বৃত্তিসমূহের মধ্যে সদ্বৃত্তিসমূহই চালনা করিয়া এইরূপ বিহার করিলে তিনি সবিতর্কধ্যানে পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। চিত্তের সৎ ও অসৎ বৃত্তিসমূহের পরস্পর বিরোধ উপশান্ত হওয়ায় তিনি অবিতর্ক সমাধি লাভ করিলেন। যখন প্রীতি ও অপ্রীতি এতদুভয়ের প্রতি তাঁহার উপেক্ষা জন্মিল, তখন তিনি নিষ্প্রীতিক ধ্যান লাভ করিলেন। সুখ ও দুঃখ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হওয়ায় তাঁহার চিত্ত ক্রমে সুনির্ম্মল হইল। তখন তিনি অদুঃখাসুখ ধ্যান লাভ করিলেন।

তদনন্তর রাত্রির প্রথম যামে বোধিসত্ত্বের দিব্য চক্ষুঃ উৎপন্ন হইল। তিনি জাতিস্মরের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। রাত্রির মধ্যম যামে তাহার পূর্ব্বতন বিষয়সমূহ মনে পড়িল। রাত্রির শেষ যামে তিনি জগতের দুঃখের কারণ ভাবিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি বাহ্য ও আভ্যন্তর জগতের ক্রিয়া-প্রবাহের মধ্যে কিরূপ অবিচ্ছিন্ন কার্য্যকারণভাব নিহিত রহিয়াছে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইলেন। কার্য্যকারণভাবের অধীন, মনের বশবর্ত্তী হইয়া এই অনাদি সংসারের বাহ্যবস্তুসমূহ উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ লাভ করে

তেছে। আধ্যাত্মিক জগতেও কুশল এবং অকুশল চৈতসিকবৃত্তি সমূহ অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া উৎপত্তি ও নিরোধ লাভ করিতেছে। এইরূপে অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মসমূহের বশে সমগ্রসংসার ঘটীযন্ত্রের ন্যায় অবিরত আবর্ত্তন করিতেছে

জগতে কিরূপে দুঃখের উৎপত্তি হয়, ইহা চিন্তা করিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন :—

অবিদ্যাপ্রত্যয়াঃ সংস্কারাঃ, সংস্কারপ্রত্যয়ং বিজ্ঞানং, বিজ্ঞানপ্রত্যয়ং নামরূপং, নামরূপপ্রত্যয়ং ষড়ায়তনং, ষড়ায়তনপ্রত্যয়ঃ স্পর্শঃ, স্পর্শপ্রত্যয়া বেদনা, বেদনাপ্রত্যয়া তৃষ্ণা, তৃষ্ণাপ্রত্যয়মুপাদানম্, উপাদানপ্রত্যয়ো ভবঃ, ভবপ্রত্যয়া জাতিঃ, জাতিপ্রত্যয়া জরামরণশোকপরিদেবদুঃখদৌর্ম্মনস্যোপায়াসাঃ সম্ভবন্ত্যেব কেবলস্য মহতো দুঃখস্কন্ধস্য সমুদয়ো ভবতি সমুদয়ঃ।

অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি, ও জাতি হইতে জরামরণ, শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, উপায়াস ইত্যাদির উৎপত্তি হয়।

অবিদ্যা শব্দের অর্থ অজ্ঞান। এই অজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব সংসারের সৃষ্টি করিয়াছি। ঘট, পট, মনুষ্য, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি যে কোন বিষয়ের জ্ঞান হউক না কেন, উহা প্রকৃত প্রস্তাবে অজ্ঞান মাত্র। এই অজ্ঞান অনাদি এবং উহা কিরূপে প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই। এই অজ্ঞানসমূহ আমাদের মনোমধ্যে যে চিহ্ন রাখিয়া যায় তাহাকে সংস্কার বলে। আমরা অতীতকালে যে সকল পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, উহারা যদিও এক্ষণে আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহে, তথাপি ঐ সকল পদার্থের আকৃতি ও প্রকৃতি আমাদের মনোমধ্যে সংস্কাররূপে বিদ্যমান আছে। এই সংস্কার সমূহ হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। কাহারও মতে বিজ্ঞান ষড়্‌বিধ এবং কেহ বলেন উহা পঞ্চবিধ; দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্বাদ, ও স্পর্শ এই পাঁচ প্রকার বিজ্ঞান সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন মনোবিজ্ঞান বা আন্তরবিজ্ঞান নামক ষষ্ঠ বিজ্ঞানও কোন কোন গ্রন্থে স্বীকৃত হইয়াছে। যদি সংস্কারসমূহ আমাদের মনোমধ্যে বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে দর্শন শ্রবণাদি জ্ঞান উৎপন্ন হইত না। এই জ্ঞানসমূহ আবার রূপ-রসাদি পঞ্চ বিষয় ও চক্ষুঃ কর্ণাদি ষড়িন্দ্রিয় এতদুভয়ের সহ দুঢ়রূপে সংবদ্ধ। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যে সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়, উহাকে স্পর্শ বলে। ঐ স্পর্শই সুখ, দুঃখ ও অদুঃখাসুখ এই ত্রিবিধ বেদনার হেতু। বেদনা হইতে তৃষ্ণা জন্মে এবং তৃষ্ণা হইতে উপাদান বা কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। শারীরিক, বাচিক এবং মানসিক এই ত্রিবিধ কর্ম্ম হইতে ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি হয় এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলোপভোগের নিমিত্তই জীবগণ জন্ম লাভ করিয়া থাকে। জন্ম লাভ করিলেই জরা, মরণ, শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য ইত্যাদি ভোগ করিতে হয়।

অতএব অবিদ্যা বা অজ্ঞানই আমাদের দুঃখের কারণ। তিনি রাত্রির শেষ যামে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই অবিদ্যার কিরূপে নিবৃত্তি হইতে পারে এবং লোকসকল কিরূপে

দুঃখ হইতে চিরমুক্তি লাভ করিতে পারে। বহু চিন্তা করিয়া তিনি দুঃখনিবৃত্তির উপায় উদ্ভাবন করিলেন।

বোধিসত্ত্ব যে মুহূর্ত্তে জগতের দুঃখসমূহের উৎপত্তি ও নিরোধের কারণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতে বুদ্ধ এই নাম ধারণ করেন। যে তত্ত্বের অধিগম দ্বারা তিনি এই নাম লাভ করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বৃত্তান্ত বৌদ্ধদর্শনের ইতিহাস নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইবে।

বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পরও এক সপ্তাহকাল তিনি বোধিদ্রুম মূলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। পঞ্চম সপ্তাহে তিনি মুচিলিন্দ নাগরাজ ভবনে এবং ষষ্ঠ সপ্তাহে অজপালের ন্যগ্রোধমূলে অবস্থিতি করেন। সপ্তম সপ্তাহে তথাগত তাবাষণমূলে বিহার করিতেছিলেন। সেই সময়ে ত্রপুষ ও ভল্লিক নামক দুই বণিক্ সহোদর বহু লোক সমভিব্যাহারে উক্কলা হইতে উত্তরাপথে গমন করিতেছিলেন। তাঁহারা অতি ভক্তিসহকারে বুদ্ধকে আহার প্রদান করিয়াছিলেন। তদনন্তর তথাগত ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিবার জন্য বারাণসী নগরীতে মৃগদাব নামক স্থানে গমন করেন। বারাণসী গমন কালে আজীবক নামক কোন দার্শনিকের সহ বুদ্ধের সাক্ষাৎকার হয়। উভয়ের মধ্যে নানা আধ্যাত্মিক বিষয়ে কথোপকথন হয়। পরিশেষে আজীবক জিজ্ঞাসা করেন হে গৌতম, তুমি কোথায় যাইবে?

বুদ্ধ বলিলেন :—

বারাণসীং গমিষ্যামি গত্বা বৈ কাশিকাং পুরীং।
ধর্ম্মচক্রং প্রবর্ত্তিষ্যে লোকেষপ্রতিবর্ত্তিতম্।

আমি বারাণসীতে গমন করিব। কাশিকা পুরীতে গমন করিয়া সংসারে অপ্রতিবর্ত্তিত ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিব।

তখন আজীবক শ্লেষ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, হে গৌতম, আমি প্রস্থান করিলাম, তোমার গন্তব্য পথ এখনও অনেক দূরে আছে।

অনন্তর গয়া প্রদেশে সুদর্শন নামক নাগরাজ বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করেন। কিয়দ্দিবস পরে বুদ্ধ গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইয়া বারাণসী মহানগরীতে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি মহাত্মা আনন্দ, মৈত্রেয় ও কৌণ্ডিণ্য প্রভৃতি পাঁচ জন শিষ্যের নিকট নির্ব্বাণ ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করেন। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখনিবারণের উপায় এই চারিটীকে আর্য্যসত্য বলে। জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, অপ্রিয়সংযোগ এবং প্রিয়-বিয়োগ ইত্যাদি সমস্তই দুঃখশব্দবাচ্য। সংক্ষেপতঃ দুঃখই দুঃখোৎপত্তির কারণ এবং দুঃখ নিবৃত্তিতেই দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সম্যগ্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যগ্ বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যগ্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি এই আটটীকে আর্য্য ষ্টাঙ্গিক মার্গ বলে এবং ঐ আটটী অবলম্বনেই দুঃখ নিবৃত্তির উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এইরূপে এই সময়ে বুদ্ধদেব নানা দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ঐ সকলের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বৌদ্ধ দর্শনের ইতিহাস নামক প্রস্তাবে বর্ণিত হইবে।

অনন্তর বুদ্ধদেব বারাণসী নগরীতে অসংখ্য লোক মধ্যে স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। বারাণসী নগরীতেই বুদ্ধের ধর্ম্মচক্র প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। নির্ব্বাণ লাভের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বুদ্ধদেব মহাকাশ্যপ, আনন্দ ও মৈত্রেয়কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে মহাসত্ত্বগণ, জগতের অসংখ্য কোটী লোকের জ্ঞান ও ধর্ম্ম তোমাদের হস্তে নিহিত রহিল।

ললিতবিস্তরসূত্রে বুদ্ধের শেষ জীবন সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হয় নাই। মহাপরিনিব্বান সুত্ত নামক পালি গ্রন্থে বুদ্ধের শেষ জীবনের ঘটনা সমূহ বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। মহাপরিনিব্বান সুত্তের বর্ণনা অনুসারে জানা যায়, বুদ্ধদেব কয়েক বৎসর রাজগৃহ নগরে বিহার করিয়া অম্বলষ্ঠিকা নগরীতে উপস্থিত হন এবং তদনন্তর তিনি নালন্দ ও পাটলী গ্রামে গমন করেন। পরিশেষে তিনি পাবা নামক স্থানে চুন্দ নামধেয় শিষ্যের গৃহে ভোজন করিয়া আনন্দ প্রভৃতি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে হিরণ্যবতী নদী-তীরে উপস্থিত হন। উক্ত নদী অতিক্রম করিয়া তাঁহারা মল্লদিগের নিবাসভূমি কুশীনগরে উপস্থিত হন। এই স্থানে একটী শালবৃক্ষমূলে অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ হয়। তদনন্তর মগধরাজ অজাতশত্রু ঐ স্থানে একটী স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

৺ রজনীকান্ত গুপ্ত।

বঙ্গ-সাহিত্য ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ রজনীকান্তের অকালমৃত্যুতে একজন একান্ত অকৃত্রিম সেবক হারাইয়াছেন। বর্ত্তমানসংখ্যক পরিষৎ-পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধ বাহির হইবে এইরূপ তিনি ভরসা দিয়াছিলেন; বর্ত্তমানসংখ্যক পরিষৎ-পত্রিকা তাঁহার মরণের সংবাদ বহন করিতেছে।

১২৫৬ সালে ভাদ্রমাসে মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন মতুগ্রামে মাতুলালয়ে রজনীকান্তের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ৺ কমলাকান্ত দাসগুপ্ত ভেওতা গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে রজনীকান্ত সর্ব্বকনিষ্ঠ। রজনীকান্তের তিন ভ্রাতা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত উমাকান্ত দাস মহাশয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য সুখ্যাতির সহিত সম্পাদন করিয়া সম্প্রতি পেন্‌শন ভোগ করিতেছেন।

সাত আট বৎসর বয়সে রজনীকান্তের কঠিন পীড়া হয় ও তাহার ফলে তাঁহার শ্রবণশক্তি চির দিনের জন্য দুর্ব্বল হইয়া যায়। এই দৌর্ব্বল্যের জন্য তাঁহার বিদ্যালয়ে অধিকদূর পর্য্যন্ত অধ্যয়ন ও উপাধিলাভাদি ঘটিয়া উঠে নাই।

বাল্যকালে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কালেজে ভর্ত্তি হয়েন। কিছু সংস্কৃত

বিদ্যার পর আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ব্যবসায় চালাইবেন এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল। সংস্কৃত কালেজে তিনি এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন মাত্র।

বিদ্যালয় ত্যাগের পরবর্ত্তী কালে তিনি কিছু দিন পরলোকগত কবিরাজ ব্রজেন্দ্রনাথ কণ্ঠাভরণের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থ যাতায়াত করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা গবর্ণমেণ্টের অধীন চাকরি গ্রহণের জন্য উঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসায় ও চাকরি কিছুই তাহার অভিপ্রায়ানুযায়ী না হওয়ায় তিনি ঐ পথে যান নাই।

এই সময় হইতেই তাঁহার বাঙ্গালা রচনার প্রতি অত্যন্ত ঝোঁক ছিল ও বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা মনোলাভের বাঞ্ছা ছিল। তাঁহার রচিত প্রথম পুস্তক জয়দেবচরিত বাঙ্গালা ১২৮০ সালে প্রকাশিত হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে ঐ পুস্তক লিখিয়া তিনি রাজা সার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রদত্ত পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তৎপরে ১২৮২ সালে গোল্ড ষ্টুকারের পাণিনি প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া পাণিনি পুস্তক প্রকাশ করেন।

সাহিত্যচর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিবেন, রজনীকান্তের এইরূপ সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু বঙ্গদেশে সাহিত্য চর্চ্চায় জীবিকা চলিতে পারে কি না তাহা তখনও প্রমাণসাপেক্ষ ছিল। সে সময়ে রজনীকান্তের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না; কলিকাতায় খরচ অতি বেশী চালাইতেন। তাঁহার সমকালে যাঁহারা তাঁহার সহিত হিন্দু-হোষ্টেলে বাস করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তী কালে সমাজে মান্যগণ্য হইয়াছেন। রজনীকান্তের কোন উপাধিলাভ ঘটিয়া উঠে নাই। শ্রবণশক্তির দৌর্ব্বল্য তাঁহার জীবিকার্জ্জন বিষয়ে দারুণ অন্তরায় হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় ও এরূপ সময়ে সাহিত্যচর্চ্চা দ্বারা জীবন অতিবাহনের সংকল্প অসাধারণ সাহসের বা দুঃসাহসের পরিচায়ক। রজনীকান্ত সেই সাহস বা দুঃসাহস লইয়া সাহিত্যচর্চ্চা জীবনের ব্রতস্বরূপ অবলম্বন করিলেন। সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ না থাকিলে এরূপ ঘটিতে পারে না। মৌখিক অনুরাগ এইরূপ দুঃসাহস জন্মাইতে পারে না। বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালীর মধ্যে এইরূপ উদাহরণ বিরল। দ্বিতীয় উদাহরণ আছে কি না জানি না।

এই সময়ে তিনি স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির নিকট পরিচিত হন। ভূদেব বাবুর অনুরোধে তিনি সামান্য পারিশ্রমিক লইয়া এডুকেশন গেজেটে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন।

রজনীকান্তের এই সময়ে ঘোর নিঃস্ব অবস্থা। তথাপি তাঁহার প্রবল সাহিত্যানুরাগ দমিত হয় নাই। এই অবস্থাতেও তিনি পাঠের জন্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিতেন। এই অবস্থাতেই সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস লিখিবার [illegible]। [illegible] ভাবে ইতিহাস লিখিয়াও মুদ্রিত করিতে পারিতেন না। ১২৮৮ সালে বঙ্গবাসী সংবাদ পত্রের প্রতিষ্ঠা হইলে ঐ সংবাদপত্রের নিয়মিত লেখকশ্রেণীর মধ্যে রজনীকান্তের নাম বাহির হয়। ঐ বৎসর পরলোকগত রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যত্নে তিনি [illegible]

বিদ্যালয় কর্ত্তৃক এণ্ট্রান্স পরীক্ষার অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েন ও তৎপর বৎসর তাঁহার সঙ্কলিত সংস্কৃতগ্রন্থ এণ্ট্রান্সে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হয়। এই ঘটনার পর হইতে আর তাঁহাকে জীবিকার জন্য ক্লেশ পাইতে হয় নাই।

বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়া আর্য্যকীর্ত্তি নামে প্রকাশ করেন। উহাই তাঁহার বালকপাঠ্য প্রথম রচনা। তৎপরে তিনি বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্য ও বালকগণের পাঠের জন্য অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। অনেকগুলি গ্রন্থ টেক্‌ষ্টবুক কমিটির অনুমোদিত হইয়াছিল। কোন কোন গ্রন্থ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইত। এইরূপে স্কুলপাঠ্য পুস্তক-প্রচারে তাঁহার যে আয় দাঁড়াইয়াছিল, তাহার সাহায্যে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে আর সংসার চালাইবার জন্য চিন্তা করিতে হয় নাই।

গত দুইবৎসর মধ্যে তাঁহার বহুমূত্র রোগের আশঙ্কা জন্মে; নিতান্ত অন্তরঙ্গ দুই একজন বন্ধু ভিন্ন অন্যের নিকট সেই আশঙ্কার বিষয় প্রকাশ করেন নাই; এমন কি তাঁহার পরিবারস্থ কোনও ব্যক্তি এই আশঙ্কার বিষয় জানিতেন না। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্যহানির কোন বাহ্য লক্ষণই প্রকাশ না পাওয়ায় তাঁহার সেই বন্ধুগণও এবিষয়ে বিশ্বাস করিতেন না; তিনিও কোন চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই। তবে প্রত্যহ প্রাতঃকালে ভ্রমণ ও মধ্যে মধ্যে গঙ্গাস্নান অভ্যাস করিতেছিলেন। তাঁহার জীবনের কর্ত্তব্যগুলি সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। গতবৎসর পূজার পর গয়াধাম গিয়া পিতৃকৃত্য সম্পাদন করিয়া আসেন। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের শেষভাগ গত শীতকালে রচনা করিয়া তাহার মুদ্রণ কার্য্য শেষ করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। কথায় কথায় বলিতেন, নিজের ছাপাখানার কারখানার দেনাপাওনা মিটাইয়া ফেলিয়া ও স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণের একটা সুব্যবস্থা করিয়া কাশীবাস করিবেন।

গত ২রা বৈশাখ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দত্তপ্রভৃতি চারিজন বন্ধুর সহিত তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে কাশীমবাজার গিয়াছিলেন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের নিকট বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৃহ নির্ম্মাণের নিমিত্ত ভূমিপ্রার্থনা উদ্দেশ্য ছিল। সে সময়ে তাঁহার হাতে গোটা দুই সামান্য ব্রণ হইয়াছিল। কাশীমবাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া আরও গোটা দুই সামান্য ব্রণ হয়। পরে পিঠের উপর একটা ব্রণ হইয়া বৈশাখমাসটা কিছু কষ্ট পান। চিকিৎসকেরা পিঠের ব্রণকে কার্ব্বঙ্কল স্থির করায় তাঁহার মনে কিছু আশঙ্কা হয়। সেই ব্রণ ভাল হইলে সিপাহীযুদ্ধের শেষ ফর্ম্মা ছাপাখানায় দিয়া জ্যৈষ্ঠমাসে পীড়িত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিবার জন্য বাড়ী যান। বাড়ীতে থাকিতে বাম হাতের তলে একটা ব্রণ হয়। সেই ব্রণ অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ও ক্রমে প্রাণসংহারক হইয়া উঠে। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ দারুণ পীড়ায় পীড়িত হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তখন বহুমূত্র রোগের পূর্ণাবস্থা। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার রাত্রি দেড়টার সময় বিধবা পত্নী দুই কন্যা ও এক পুত্র রাখিয়া রজনীকান্ত পরলোকে গমন করিয়াছেন। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস রচনা তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান

কার্য্য। ঐ কার্য্য সম্পাদিত করিয়াই যেন তিনি আর ইহলোকে আবশ্যক বোধ করিলেন না।

রজনীকান্তের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল। তাঁহার অমায়িক ভদ্র স্বভাবে ও উদার ব্যবহারে তাঁহার বন্ধুগণ মুগ্ধ ছিলেন। এমন শান্ত স্বভাবের ও সরল ব্যবহারের দৃষ্টান্ত বিরল। যিনি একবার অল্পসময়ের জন্য তাঁহার স্পর্শে আসিতেন, তিনি তাঁহার অকৃত্রিম সারল্যে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে তাঁহার বন্ধুগণ মর্ম্মান্তিক বেদনা ব্যথা পাইয়াছেন। তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিত, যেখানে তিনি উপস্থিত থাকিতেন, সে স্থানকে আনন্দময় করিয়া তুলিতেন। সকল সময় সাহিত্যের আলোচনায়, সদালাপে অতিবাহিত করিতেন। বঙ্গসাহিত্যে রজনীকান্তের অভাব তদপেক্ষা অধিকতর শিক্ষিত জন কর্ত্তৃক পূর্ণ হইবে; কিন্তু সেই অকপট, শ্রদ্ধাশীল, অমায়িক, অনুরক্ত, সানন্দ বন্ধুর অকালমরণে তাঁহার বন্ধুসমাজ যে অভাব বোধ করিবেন, তাহা আর পূর্ণ হইবার নয়।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ স্থাপিত হওয়া অবধি রজনীকান্ত গুপ্ত উহার অন্যতম সেবক ছিলেন। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণদেবের আশ্রয়ে যখন Bengal Academy of Literature বিজাতীয় বেশ ত্যাগ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে রূপান্তরিত হয়, রজনী বাবু তদবধি উহার সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তিনিই প্রথম সম্পাদক। প্রথম দুই বৎসর তিনি যত্নের সহিত পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ রচনা ও প্রবন্ধসংগ্রহ হইতে মুদ্রণ কার্য্যের তত্ত্বাবধান ও প্রুফ দেখা সমস্ত কার্য্যই তাঁহাকে একাকী সম্পন্ন করিতে হইত। এইজন্য তাঁহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইত। পরিষদের প্রতিষ্ঠার ও উন্নতির জন্যও তিনি প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বোধ করি আর কোন সদস্যের নিকট সাহিত্যপরিষৎ এতটা ঋণী নহেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর ও তদানীন্তন সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় রজনী বাবুর পরামর্শ না লইয়া পরিষদের জন্য কোন কাজই করিতেন না। পরিষদের কার্য্যপ্রণালীর আলোচনায় তিনি প্রচুর সময়ক্ষেপ করিতেন। পরিষদের উদ্দেশ্য কিরূপ হওয়া উচিত, পরিষৎপত্রিকার আলোচনার বিষয় কিরূপ হওয়া উচিত, এই সকল বিষয় লইয়া সর্ব্বদাই আন্দোলন করিতেন। আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষণ ছিল; যে কাজে তিনি হাত দিতেন, শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত তাহা সম্পাদন করিতেন। মুখের খ্যাতিলাভের প্রয়োজনায় তিনি কোন কাজ করিতেন না। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ তাঁহার শ্রদ্ধার ও অনুরাগের আস্পদ হইয়াছিল। সাহিত্যপরিষৎ যে যে প্রধান কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, রজনীকান্ত সেই সকল কার্য্যেই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার উদ্যোগে পরিষদের পরিভাষাসমিতি ও ব্যাকরণসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি নিজের গ্রন্থ প্রকাশ দ্বারা বঙ্গসাহিত্যকে পরিপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে পরিষদে প্রস্তরলিপি প্রকাশনার প্রস্তাব করেন। তাঁহারই প্রস্তাবে সাহিত্যপরিষৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible]

বাঙ্গালা-সাহিত্যের আলোচনা প্রবেশ করিবার জন্য চেষ্টা করেন। পরিষদের প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক সর্ব্বাংশে গৃহীত হয় নাই; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাষ্ট আর্টস্ ও বি. এ. পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনার পরীক্ষা প্রচলিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থা প্রণয়নের পর হইতেই রজনীকান্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক বাঙ্গালারচনা বিষয়ে অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসিতেছিলেন। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য পরিষৎ কর্ত্তৃক ও পরিষদের বাহিরে যে চেষ্টা হয়, রজনীবাবু তাহাতে আন্তরিক উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। এই চেষ্টার আংশিক সফলতা তাঁহার নিরতিশয় আনন্দের কারণ হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরবর্ত্তী রবিবারের সাধারণ অধিবেশনে সাহিত্যপরিষৎ তাঁহার অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। ১৭ইআষাঢ় তারিখে এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। উহার কার্য্যবিবরণ যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে।

যে কোন সৎকার্য্যে সাধ্যমত সাহায্য করিতে পাইলে তাঁহার যথেষ্ট আনন্দ হইত। তিনি কোনরূপ সঙ্কীর্ণভাব বা গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিতেন না। ভিন্নমতাবলম্বীকে তিনি শ্রদ্ধা করিতে পারিতেন। রাজ-নীতি বিষয়ে তিনি কংগ্রেস মতাবলম্বী ছিলেন। কংগ্রেসের কার্য্যে, সাধারণ রাজনৈতিক আন্দোলনাদিতে তিনি পূর্ণমাত্রায় যোগ দিতে অক্ষম হইলেও তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতির ত্রুটী ছিল না। কটন সাহেবের নিউইণ্ডিয়া প্রচারিত হইবামাত্র তিনি ঐ গ্রন্থের অনুবাদ বঙ্গসমাজে প্রচার করেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে রজনীকান্তের স্থান কোথায়, তাহার নির্ণয়ের এ সময় নহে। স্বাধীনভাবে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস আলোচনায় তিনিই পথপ্রদর্শক। তৎপূর্ব্বে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রামদাস সেন প্রভৃতি ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বের স্বাধীন আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন; রজনীকান্তের প্রথম গ্রন্থ জয়দেবরচিত ও পাণিনি দেখিলে মনে হয়, তাঁহারও বোধ করি সেই পুরাতত্ত্ব আলোচনার দিকেই প্রথমতঃ প্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু শীঘ্রই তিনি সে পথ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মুসলমান ও ইংরাজ অধিকারে ভারতবর্ষের অবস্থা তাঁহার পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক গ্রন্থমাত্রেরই বিষয়।

বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য রজনীকান্ত যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার মূলে একটী কথা পাওয়া যায়; স্বজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ। এই অনুরাগই প্রথমতঃ তাঁহাকে পুরাতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল। এই অনুরাগই তাঁহাকে পরে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের স্বাধীন সমালোচনায় প্রবৃত্ত করে। ইংরাজ ঐতিহাসিকের হস্তে স্বজাতির চরিত্রে অযথা কলঙ্কলেপন দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইয়াছিলেন। সেই কলঙ্ক প্রক্ষালনের জন্য তিনি লেখনী ধারণ করেন। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিবার জন্য এই কারণে তাঁহার সঙ্কল্প হয়। আধুনিক ইতিহাসের সমগ্রভাগ হইতে

সিপাহী যুদ্ধের অংশ নির্ব্বাচন করিয়া লওয়ায় তাঁহার মনে আন্তরিকতার আবেগের কতক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাধীন ভাবে ইতিহাস আলোচনার পথ নিতান্ত সরল নহে। প্রথমতঃ ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য বৈদেশিক লেখকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আপন দেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা বা স্মরণে রাখা আমাদের স্বভাব নহে। সিপাহীযুদ্ধের মত নিতান্ত আধুনিক ঘটনা সম্বন্ধেও এদেশে কোন স্থায়ী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য বোধ করে নাই। তৎকালবর্ত্তী প্রাচীন লোক যাহারা বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদেরও স্মৃতিশক্তির উপর কোন ঐতিহাসিক সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন না। ইংরাজীতে এই একটা ঘটনা লইয়া এত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, যে তাহাতে একটা লাইব্রেরী হয়। রজনীকান্ত তাঁহার উৎকৃষ্ট লাইব্রেরীতে বৈদেশিকের লিখিত এই সমস্ত গ্রন্থই প্রায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বদেশীয়ের নিকট তিনি কোন সাহায্যই পান নাই। রজনীকান্ত যাঁহাদের রচিত ইতিহাসের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অধ্যায় উপরেই তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ তিনি যে বিষয়ের আলোচনায় হাত দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ বর্ত্তমান সময়ে দুঃসাহসের কাজ। রাজা রাণা ও কুমার সিংহ ও নানা সাহেবের পক্ষ হইয়া তিনি কথা কহিতে সাহস করিয়াছিলেন। এবং তিনি কেমন নির্ভীকভাবে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পাঠকবর্গ অবগত আছেন। আজিকার দিনে এইরূপ নির্ভীকতা প্রভুশক্তির কোপদৃষ্টি আকর্ষণ করে। রজনীকান্তের প্রতিও সেই বৃটিশ কটাক্ষ যে একবারে পড়ে নাই তাহা নহে। তিনি তাঁহার গুরুজন ও তাঁহার পরিচিত উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক তাঁহার মনের আবেগ ও ভাষা সংযত করিতে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই উপদেশ তাঁহাকে অনুসরণ করিতে পারে নাই। দরিদ্র বাঙ্গালী গ্রন্থজীবী গৃহস্থের পক্ষে ইহা সামান্য কথা নহে।

জাতীয় ভাবের রক্ষণ ও পরিপুষ্টি রজনীকান্তের মূলমন্ত্র ছিল। সবল সর্ব্বত্র দুর্ব্বলের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। আমাদের আত্মসম্মান রক্ষার অন্য উপায় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের স্বজাতির মধ্যে, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, আমাদের পদস্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই আত্মসম্মান বুদ্ধির নিতান্ত অসদ্ভাব। রজনীকান্ত যেমন একদিকে বৈদেশিকের মমতাশূন্যহস্তপ্রলিপ্ত আমাদের জাতীয় চরিত্রের মসীকালিমা প্রক্ষালিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, অন্যদিকে আমাদের প্রাচীন কালের মহাপুরুষগণের চরিত্রের চিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া স্বজাতির গৌরব স্থাপনের সহিত জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা করিয়া আপনাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতে শিখাইতেছিলেন। তাঁহার আর্য্যকীর্ত্তি, ভারতকাহিনী, প্রবন্ধমঞ্জরী প্রভৃতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা ঐ উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল। বিদ্যালয়স্থিত বালকগণের মনে ও জনসাধারণের মনে এই সকলের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ও অনুরাগ উদ্রেক করিবার চেষ্টা রজনীকান্তের পূর্ব্বে আর কেহই করেন

নাই। "আমাদের জাতীয়ভাব" "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়" "হিন্দুর আশ্রমচতুষ্টয়" "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর" প্রভৃতি উপলক্ষ করিয়া তিনি সাধারণসভায় যে সকল প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছিলেন, জাতীয় ভাবের ও জাতীয়-স্বাতন্ত্র্যের উদ্দীপনাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনিই এস্থলে অগ্রণী ও পথপ্রদর্শক।

রজনীকান্তের প্রদর্শিত পথে আজ কাল অনেকেই চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বৈদেশিকের বর্ণিত স্বদেশের কাহিনী বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করা উচিত নহে, এইরূপ একটা ভাব আমাদের স্বদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে সম্প্রতি উপস্থিত হইয়াছে। কতিপয় কৃতবিদ্য লোকে ইংরাজ ইতিহাসলেখকগণের রচনার স্বাধীন সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। রজনীকান্তের পন্থানুবর্ত্তীর আজ কাল অভাব নাই; কিন্তু একটা বিষয়ে এখনও রজনীকান্ত অদ্বিতীয় রহিয়াছেন। ইহা রজনীকান্তের ভাষা। তাঁহার ঐতিহাসিক গ্রন্থে ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধে তিনি যে ওজস্বিনী ভাষায় অবতারণা করিয়াছিলেন, তেমন ভাষায় কথা কহিতে অপরে সমর্থ হন নাই। তাঁহার ভাষা তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির সাধারণের নিকট প্রতিপত্তির অন্যতম কারণ। উপরে যে আন্তরিকতা ও সহৃদয়তাকে তাঁহার বিশিষ্ট গুণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, সেই আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা হইতে এই ভাষা উৎপন্ন। তাঁহার মনের আবেগ, বর্ণিত বিষয়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, সেই ভাষায় স্বভাবতঃ প্রকাশ পাইত; তাঁহার মর্ম্ম হইতে সেই ভাষা বহির্গত হইয়া পাঠকের মর্ম্মে গিয়া প্রতিহত হইত। ভাষার বিশুদ্ধির দিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। বাঙ্গালা রচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের কঠোর নিয়ম পালন করা উচিত কিনা, এ বিষয়ে তাঁহার মত সম্পূর্ণ উদার ও অসংকীর্ণ ছিল; তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের সর্ব্বতোভাবে অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন না; অথচ তিনি স্বয়ং যেরূপ মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ ভাষার ব্যবহার করিতেন, তাহা বাঙ্গালা লেখকগণের মধ্যে দুই এক জন ব্যতীত আর কেহ করিয়াছেন কিনা জানিনা। কিন্তু বিশুদ্ধিরক্ষার জন্য এই প্রয়াস তাঁহার রচনাকে কখনও কৃত্রিমতাদুষ্ট করে নাই। তাঁহার আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা তাঁহাকে এই দোষ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ভাষাকে তিনি কেবল মাত্র ভাব প্রকাশের উপায় স্বরূপ মনে করিতেন না। এই কারণে তাঁহার রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি সাহিত্যের শরীর পোষণ করিবে; সাহিত্য মধ্যে তাহারা আসন লাভ করিবে। সে স্থান কত উচ্চে তাহার নির্ণয়ের কাল এখনও উপস্থিত হয় নাই। বঙ্গ-সাহিত্যের বর্ত্তমান দরিদ্র অবস্থায় বাঙ্গালায় লিখিত অন্য কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থের বা ঐতিহাসিক প্রবন্ধের সম্বন্ধে এতটুকু বলা যাইতে পারে কিনা সন্দেহ স্থল।

বঙ্গসাহিত্যের সেবা রজনীকান্তের জীবনের মুখ্যতম ব্রত ছিল; তিনি আপন ক্ষমতানুসারে সেই ব্রত যথাসাধ্য পালন করিয়াছেন; এবং সেই ব্রতের পালনেই আপনার সমগ্র শক্তি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। জীবনে তিনি আর কোন কাজই করেন নাই।

তাঁহার অপেক্ষা প্রতিভাশালী লেখক বঙ্গদেশে অনেক জন্মিয়াছেন; বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের স্থান অনেক উচ্চে অবস্থিত; তাঁহাদের কার্য্যের সহিত তৎকৃত কার্য্যের তুলনার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু একমাত্র বঙ্গসাহিত্যের সুতরাং বঙ্গমাতার সেবাব্রতে তাঁহার জীবন উদ্‌যাপনের উদাহরণ অধিক আছে কিনা জানি না। এই অনুরক্ত সন্তানের অভাবে এবংগে দরিদ্রা বঙ্গমাতা সন্তাপিত হইবেন তাহাতে সংশয় নাই।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১। মহাভারত বিরাট পর্ব্ব—কাশীরাম দাস।

পুঁথির বিবরণ—পুরাতন কাগজে লেখা। পত্র সংখ্যা ৫৮, দুই পৃষ্ঠে লেখা।

শেষ—

মুনিগণ ঋষিগণ বিদায় হইলা।
কৃষ্ণসহ মৎস্য দেশে পাণ্ডব রহিলা।
মহাভারতের কথা অমৃতলহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি।
পাণ্ডবের উদয় শুনিয়ে যেই জন।
সর্ব্ব দুঃখ খণ্ডে তার ব্যাসের বচন।
সেই কথা কহি আমি পাঁচালির মত।
এত দূরে বিরাট পর্ব্ব হইল সমাপ্ত।
যে জন শ্রবণ করে তারে কর দয়া।
উদ্ধার করহ প্রভু দিয়া পদছায়া।
চন্দ্র বাণ পক্ষ বসু শক সুনিশ্চয়।
বিরাট হইয়া সাঙ্গ কাশীদাস কয়।

ইতি বিরাট পর্ব্ব সমাপ্ত।

পুঁথির তারিখ।—"সন ১২২৬ সাল তারিখ ২৯ ফাল্গুন মকাম্বা ১৭৩৭ বঙ্গাব্দের তিথি দাদশী শ্রীশ্রী৺ গোপিনাথ ঠাকুরের মৎস্যদের দিবস পোনে চারি প্রহর বেলা গতে।"

মন্তব্য। ১২২৬ সাল ১৭৪১ শকাব্দের সহিত অভিন্ন, ১৭৩৭ শকাব্দ কিরূপে হইল বুঝা গেল না। সালের অঙ্ককে সম্ভবতঃ ঠিক্ ধরিলে শকাব্দ গণনায় ভুল হইয়াছে বলিতে হইবে।

এই পুঁথির শেষ দুই ছত্র বিশেষরূপ অবধানযোগ্য। কাশীদাসী মহাভারতের কোন হস্তলিখিতে এ পর্য্যন্ত গ্রন্থ রচনার তারিখ পাওয়া গিয়াছে শুনি নাই। অন্য কোন পুঁথিতে কাশীদাসী মহাভারত রচনার তারিখ নিঃসন্দেহে নির্ণীত হয় নাই। এত বৎসর পরে

মাসের পরিষৎপত্রিকায় কাশীরাম দাসের সময়নির্ণয়বিষয়ক প্রবন্ধে দেখান গিয়াছে, কাশীরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস ১০৫৫ সালে উৎকলখণ্ড অবলম্বন করিয়া জগন্নাথ-মঙ্গল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। জগন্নাথমঙ্গলের অন্যান্য হস্তলিপি যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও ঐ তারিখ নির্ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন করে। কাশীরাম দাস তৎপূর্ব্বেই মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও ঐ জগন্নাথমঙ্গলেই দেখা যায়।

চন্দ্র বাণ পক্ষ ঋতু—অঙ্কের বামগতি নিয়মানুসারে ৬২৫১ হয়, কিন্তু উল্টাইয়া লইলে ১৫২৬ হয়। ১৫২৬ শকাব্দ বাঙ্গলা ১০১১ সাল, ইংরাজী ১৬০৪ খৃষ্টাব্দ।

জগন্নাথমঙ্গলের নির্দ্দেশানুসারে অনুমিত তারিখের সহিত এই তারিখের বিরোধ নাই। এই তারিখ যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে কাশীদাসী মহাভারতের রচনাকাল সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না। যাহাই হউক, কাশীদাসী মহাভারতের হস্তলিপির এদেশে অভাব নাই। বিভিন্ন হস্তলিপি অনুসন্ধান করিলে এবিষয়ে শেষ মীমাংসায় বিলম্ব না হইতে পারে।

২। মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব—কাশীরাম দাস।

পুঁথির বিবরণ—পুরাতন কাগজে দুই পৃষ্ঠে লিখিত। পত্র সংখ্যা ৫৫।

শেষ—

শরশয্যা শয়নে রহিলা ভীষ্মবীর।
বীরভাগ চলি গেল আপন শিবির॥
মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥
ভীষ্মপর্ব্ব শ্রবণে নির্ম্মল শুনি হয়।
শুনিতে শুনিতে হয় জ্ঞানের উদয়॥
অশ্বমেধ যাজ্ঞে সেবা অতি মোক্ষ ফল।
সে সকল সিদ্ধি হয় শ্রবণে নিশ্চল॥
দান ধ্যান তীর্থ আদি যত পুণ্য ফল।
অনায়াসে সিদ্ধি হয় না হয় চঞ্চল॥
কাশীরাম দাসের প্রণাম সাধু জনে।
অবিরত রহু মন গোবিন্দ চরণে॥
"ইতি মহাভারতের ভিষ্মপর্ব্বনি ভিষ্মপতনং
সরসষ্যা সবন কথাদি ভিষ্মপর্ব্ব সমাপ্তং।"
ভারতের পুণ্য কথা পাপের বিনাশ।
ভীষ্মপর্ব্ব কহিলেন কাশীরাম দাস॥
"ইতি ভিষ্মপর্ব্ব সপুর্ণ।"

পুঁথির তারিখ। "ইতি সন ১২২৮ বার আটাস সাল তারিখ ৪ কার্ত্তিক সকাব্দা সাতাস সৌ ২৭৮৮ আটসট্টী বারে শুক্রবার তিথি দ্বাদসি শুক্লপক্ষের দিবস দুই দণ্ড বেলা থাকে।"

মন্তব্য। সন ১২২৮ সালে শকাব্দ ১৭৪৩। পুঁথিতে শকাব্দের অঙ্ক কোনরূপ সাঙ্কেতিক হিসাবে দেওয়া হইয়া থাকিবে।

৩। মহাভারত দ্রোণ পর্ব্ব—কাশীরাম দাস।

পুঁথির বিবরণ—পত্র সংখ্যা ৪৭, দুই পৃষ্ঠে লেখা, দুই রকমের কাগজে দুই বা তিন ভিন্ন হস্তের অক্ষরে লিখিত।

শেষ—

রত্নসিংহাসনে বৈসেন ধর্ম্মের নন্দন।
ভ্রাতৃগণ সহ হইল আনন্দিত মন।
বৈশম্পায়ন কহে জনমেজয় শুনে।
এত দূরে দ্রোণ পর্ব্ব হইল সমাধানে।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।
অন্তকালে দিবেন প্রভু পাদপদ্মে স্থান।

পুঁথির তারিখ। "সন ১২৪২ সাল তারিখ ৪ ফাল্গুন বারে সমবার তিথি দ্বিতীয়া রাত্রি ১ দণ্ড প্রহর রাত্রে পুথি পুর্ণ হইল শ্রীহরি লিখিতং শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ঘোষ সাং মাহাদিয়া।"

[মাহাদিয়া জেলার সদর সংলগ্ন ক্ষুদ্র গ্রাম]

৪। মহাভারত গদাপর্ব্ব—কাশীরাম দাস।

পত্র সংখ্যা ১৫।

শেষ—

বিচিত্র পাণ্ডব কথা অমৃত সমান।
জনমেজয় জিজ্ঞাসিল মুনিদের স্থান।
মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
এতদূরে গদাপর্ব্ব হৈল সমাধান।

ইতি শ্রীমহাভারতে গদাপর্ব্বে দুর্য্যোধন রাজার উরুভঙ্গ।

গদাপর্ব্ব সমাধান পঞ্চদশ পাতে।
সুকাদ্যা পাতের পোউত্রিশ ভাদ্রের সাতিশাতে।
রাত্রে শুক্রবার তিথি পুর্ণিমা।
ঋক্ষ যোগ হয় ভাই নক্ষত্র শতভিষা।
সেরপুর মতে ভাই বার শত তিন সনে।
মোকাম দুর্গাপুর রতনসিংহ পরগনে।
আদর্শ তাহার মন শুনহ সভায়।
লিখিল পুস্তক শ্রীগৌরিশঙ্কর রায়।
পূর্ব্ব ঘার ঘরে দেড় প্রহর সময়ে।
সবজগে সৌনের পাতে পুঁথি সমাপ্ত হয়ে।

৫। মহাভারত সৌপ্তিক পর্ব্ব—কাশীরাম দাস।

পত্র সংখ্যা ১৯। একার ও সাদের অঙ্কে এখানেও মিল নাই।

শেষ—

ভারতের পুণ্য কথা শুনে পুণ্যবান্।
পৃথিবীতে নাহি সুখ ইহার সমান।

নিজয় পাণ্ডব কথা শুনে যেই জন।
ইহলোকে সুখ অন্তে বৈকুণ্ঠে গমন।
বৈশম্পায়ন কহে জনমেজয় স্থানে।
এত দূরে সৌপ্তিক পর্ব্ব হৈল সমাধানে।

"তারিখ ২৪ আশ্বীন, সকাব্দা ১৭৩৭ বারে বৃহস্পতিবার তিথি ত্রিয়োদসির দিবস পৌনে তিন প্রহর বেলা গতে। ইতি সন ১২২৭।"

৬। চম্পক-কলিকা—

পুঁথির বিবরণ—গ্রন্থকারের নাম নাই। পুঁথির তারিখ নাই। লেখকের নাম বসময় দাস—নিবাস নাই। পত্র সংখ্যা ৮, প্রথম পত্রের এক পিঠে লেখা। পয়ারের চরণ সংখ্যা প্রায় চারি শত। মাঝে কিয়দংশ গদ্য। এই পুঁথি খানির বিশেষ বিবরণ পরিষৎপত্রিকার বিগত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

৭। স্মরণ মঙ্গল—রাধাবল্লভ দাস।

আরম্ভ— অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।
প্রথমে বন্দিব গুরু গোবিন্দ চরণ।
যার কৃপালেশে হয় বাঞ্ছিত পূরণ।
অন্ধতা ঘুচয়ে যার করুণা অঞ্জনে।
অজ্ঞান তিমির নাশ করে যেই জনে।
তবে বন্দো সাবধানে বৈষ্ণব যার নাম।
এ তিন লোকের পূজ্য দয়া গুণবান।
তবে বন্দো ভক্তগণ রসিক যার হিয়া।
বিকাইনু রাঙ্গা পায় পদরেণু পাঞা।
অদ্বৈত গোসাঞি বন্দো পূজ্য তিন লোকে।
যাহার করুণায় লোক চৈতন্য গায় সুখে। ইত্যাদি।

শেষ— যুগলকিশোর লীলা অমৃতের সিন্ধু।
হেন প্রেম সেবা মোরে না মিলিল এক বিন্দু।
উদ্দেশ করিবে মাত্র সেবা অনুসারে।
লীলারে করিল স্তুতি দয়া কর মোরে।
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সূত্ররূপে কহিল অষ্ট কালের আখ্যান।
শ্রীরূপমঞ্জরী চরণ করি আশ।
স্মরণমঙ্গল কহে রাধাবল্লভ দাস। ইতি স্মরণমঙ্গল সমাপ্ত।

পুঁথির বিবরণ—মোটা কাগজ, মোটা হরপ, পত্র সংখ্যা ১৭, প্রথম ও শেষ পত্র এক পিঠে লেখা। পয়ারের চরণসংখ্যা প্রতি পত্রে প্রায় পঁচিশ। পয়ার ব্যতীত দীর্ঘ ছন্দ (ত্রিপদী) আছে। পুঁথির তারিখ বা লেখকের নাম নাই।

৮। অমৃতরসাবলি—গ্রন্থকারের নাম নাই।

আরম্ভ—

শ্রীগুরুচরণারবিন্দ, সাবধান হঞা বন্দ
আশা হইতে তিনির বিনাশে।
কৃপা কর নিজ গুণে মহিমা দেহ জগজনে
এই নিবেদন করো দাসে॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ
সভে কর আমিহ পুরা॥

নাহি মোর ভক্তি লেশ সভে মোর গাত্রশেষ
এই ভিক্ষা মাগে মোর মন॥
বন্দো রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ
সভে মেলি মোরে কৃপা কর।
ইত্যা—

শেষ—

শ্রীমুকুন্দ পাদপদ্ম করিয়া সহায়।
অনেক পরিশ্রম করি গ্রন্থ কৈল সায়॥
রসিকগণের কাছে গ্রন্থ কৈল সমর্পণ।
জোড় হাত করি করো এই নিবেদন॥
এই রাগ ভক্তি তথে নাহি বৈসে গন্ধ।
সহজ ইহার নাম রাগের সম্বন্ধ॥
বৈষ্ণব বৈরাগী এই প্রাণ বৈসে মর্ম্ম।
তাহাবে অনেক ব্যাধি এই রস মর্ম্ম॥

বৈরাগ্যের বিধি এই বৈষ্ণবের আচার।
অন্যের সধর্ম্ম নহে অন্যের আচার॥
সদা ব্রজে বাস যার রসি ভক্তগণ।
সত্যসিদ্ধ মানুষ এই তাহার লক্ষণ॥
শ্রীমুকুন্দ পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
অমৃতরসাবলি গ্রন্থ কৈল সমাপন॥
ইতি শ্রীঅমৃতরসাবলি গ্রন্থ সম্পূর্ণ।
"শ্রীকালীদাস ইদং পুস্তকং।"

"লিখিতং শ্রীমোহন দাস সাং প্রেমনগর সন ১২৫৮ সাল তা ২৯ ফাল্গুন।"

পুঁথির বিবরণ—তুলোট কাগজ, পত্র সংখ্যা ১১, প্রথম ও শেষ পাতা একটি হাতে লেখা। গ্রন্থকার আপনাকে মুকুন্দদাস গোস্বামীর শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, ও গ্রন্থারম্ভে ও গ্রন্থশেষে গ্রন্থোৎপত্তির ও সহজ ভজন প্রচারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতেছেন; কিন্তু আপনার নাম দিতে ভুলিয়াছেন। এই গ্রন্থ খানি প্রকাশের যোগ্য।

৯। রাগময়ী কণা—কৃষ্ণদাস।

আরম্ভ—

প্রথমে বন্দিব শ্রীগোবিন্দচরণ।
যার কৃপালেশে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
তবে বন্দো সাবধানে বৈষ্ণব গোসাঞি।
কৃষ্ণপ্রেম ধন দিতে আর কেহ নাঞি॥

শেষ—

এতেক লক্ষণ কহিল শ্রীজীব গোস্বামী।
শ্রীরূপচরণ বিনু যার গতি নাই॥
গ্রন্থ রাগময়ী তার চুম্বক কহিলা।
ইহাতে সাধক কিছু বুঝিতে পারিলা॥

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
রাগময়ী কণা কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি রাগময়ীকণা গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

পুঁথির বিবরণ—তুলোট কাগজ—পত্র সংখ্যা ৭। লেখকের নাম বা পুঁথির তারিখ নাই। অধিক দিনের নকল নহে।

১০। আত্মজিজ্ঞাসা—কৃষ্ণদাস।

আরম্ভ—অথ আত্মজিজ্ঞাসা।

তুমি কে আমি জীব কোন্ জীব তটস্থ জীব তাক কোথা ভাতে ভাত কিরূপে হইল তত্ত্ববস্তু হইতে হইল। ইত্যাদি।

শেষ—

রসের নরম জানি প্রভুরে ভজিবে।
প্রভু সুখী সুখী হবে ব্রজেতে রহিবে।
অবশ্য মিলিবে তারে নিত্য বৃন্দাবন।
আনন্দে সেবিবে সেই প্রভুর চরণ।
সহচরী সঙ্গে আমাকে তোমার চরণ আশ।
আত্মজিজ্ঞাসা সারাৎসার কহে কৃষ্ণদাস।
ইতি আত্মজিজ্ঞাসা সারাৎসার গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

পুঁথির বিবরণ—পত্রসংখ্যা ৫। বেশী দিনের নকল নহে। লেখকের নাম বা পুঁথির তারিখ নাই।

১১। পদ্মশৃঙ্গার গ্রন্থ—নরসিংহ দাস।

আরম্ভ—

রাগাশ্রয়-বস্তু তত্ত্ব এই নিরূপণ।
সামান্য বিশেষরূপ কহি এই ক্রম।
ভূত আমার আশ্রয় স্থিতি হয় যেই কাল।
অনুক্ষণ জীব তাহা করয়ে বিশ্রাম।
উদ্দীপন ঋতু সূর্য্য ভ্রমণ সংযোগে।
তিন দিন পূর্ব্বে হয় আশ্রয় অনুরাগে।

শেষ—

নরহরি বলি যারে ভাগবতে গায়।
সেই প্রভু অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি।
কবিরাজ গোসাঞি যেই লিখিল সিদ্ধান্ত।
যাথে বর্ত্তে সেই বুঝে সিদ্ধান্তের অন্ত।
আশ্রম আচার যার কি বুঝিবে সেই।
বেদধর্ম্ম লঙ্ঘি ইহা নিতে পারে যেই।
সেই এবে অবতীর্ণ পুরুষ যার নারী।
শৃঙ্গার মাধুর্য্য হয় রূপের ভিকারী।
এই চব্বিশ চন্দ্র যে জন করবে বিশ্বাস।
পদ্মশৃঙ্গার গ্রন্থ কহে নরসিংহ দাস।
নির্জ্জনে বসিয়া ইহা আলাপ করিবে।
আপন সমান বিনা অন্যে নাহি দিবে।
ইতি শ্রীপদ্মশৃঙ্গার গ্রন্থ সমাপ্ত।

পুঁথির বিবরণ—পত্রসংখ্যা ৫, অল্প দিনের লেখা, লেখকের নাম বা লেখার তারিখ নাই।

১২। নরোত্তম বিলাস—নরহরি দাস

সম্পূর্ণ গ্রন্থ—পত্রসংখ্যা ১১০, শকাব্দ ১৮১৩ (সন ১২৯৮) ১৬ই ফাল্গুন তারিখে লেখা শেষ।

১ হইতে ৫ সংখ্যা পর্য্যন্ত পুঁথির ঠিকানা জেমো নূতন বাটী, কান্দি, মুর্শিদাবাদ। ৬ হইতে ১২ পর্য্যন্ত পুঁথির ঠিকানা শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর ঘোষ, জেমো বিশ্বাসপাড়া, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।

পত্রিকা-সম্পাদক।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

কমলাকর ভট্ট।

কমলাকর ভট্ট খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বারাণসী নগরের প্রসিদ্ধ ভট্ট ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামকৃষ্ণ ও মাতার নাম উমা দেবী। তিনি বিশ্বামিত্রগোত্রজ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতামহের নাম নারায়ণ ভট্ট। এই নারায়ণের পিতার নাম রামেশ্বর এবং পিতামহের নাম গোবিন্দ ভট্ট। গোবিন্দ ভট্ট হইতে কমলাকর চারি পুরুষ অন্তর। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাষ্ট্রীয় ভট্ট ব্রাহ্মণ কুলে গোবিন্দের জন্ম হয়। গোবিন্দ ভট্ট পুনা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। গোবিন্দ পশ্চিম ভারতের অন্তর্গত স্বীয় জন্মস্থান পুনা নগর পরিত্যাগ করিয়া, সপরিবারে ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী বারাণসীতে আগমন করেন। সম্ভবতঃ মুসলমানদিগের উপদ্রবে গোবিন্দ ভট্ট জন্মভূমি পরিত্যাগে বাধ্য হইয়া কাশীতে উপনিবিষ্ট হন। গোবিন্দের প্রতিষ্ঠিত ভট্টবংশে অনেকানেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আবির্ভূত হন। গোবিন্দ ভট্টের রচিত "বৃহস্পতি-সব-প্ররোগ" নামে স্মৃতি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। ভট্টবংশ বৈদিক যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে ও স্মৃতি শাস্ত্রের আলোচনায় বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

"বৃহস্পতিসর্ব্বস্বান্ত কৃতঃ সংক্ষেপতো ময়া।
অভ্যধায়ি প্রয়োগোঽয়ং গোবিন্দেন মনীষিণা॥"

কমলাকর ভট্ট অতি বিখ্যাত স্মার্ত্ত গ্রন্থকার। তিনি বহুতর স্মৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার রচিত "নির্ণয়সিন্ধু" ও "বিবাদতাণ্ডব" অদ্যাপি বারাণসী ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে প্রামাণিক স্মৃতিগ্রন্থ বলিয়া সমাদৃত রহিয়াছে। কমলাকর ও তাঁহার পিতৃব্যপুত্র নীলকণ্ঠ ভট্ট উভয়েই সুনিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। উভয়েই স্মৃতিশাস্ত্রের বিবিধ পুস্তক রচনা করিয়া, আপনাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, গবেষণা ও লিপি চাতুর্য্যের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। উভয়ের প্রণীত গ্রন্থই বারাণসী ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে স্মৃতি প্রামাণিক বলিয়া অদ্যাপি প্রতি হিন্দুর গৃহে গৃহে আদৃত রহিয়াছে। নন্দ পণ্ডিত, [illegible] মিশ্র এবং বালকৃষ্ণ ভট্ট—কমলাকর ও নীলকণ্ঠ ভট্টের সমসাময়িক গ্রন্থকার। আপনা [illegible]

আয়াসে কমলাকর ও নীলকণ্ঠ ভট্টের যে বংশাবলী সংগ্রহ করিয়াছি, নিম্নে তাহা প্রদান করিয়া, কমলাকর ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের রচিত গ্রন্থের বিবরণ প্রকাশ করিব। এই বংশাবলীর সাহায্যে পরবর্ত্তী বিবরণ সুখবোধ্য হইবে।

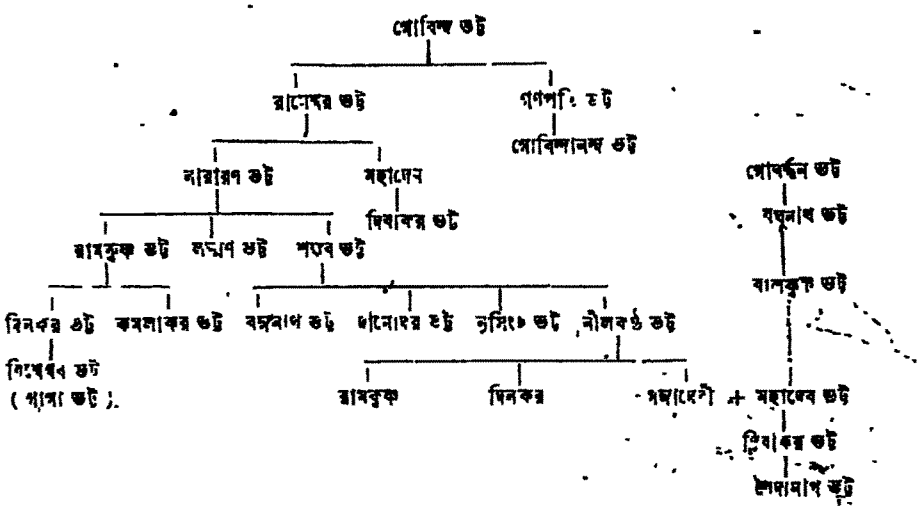

পূর্ব্বোদ্ধৃত বংশাবলীতে পৌর্ব্বাপর্য্য বিষয়ে যথোচিত সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছে। ইহা হইতে বৈবাহিক সম্পর্কে সম্বদ্ধ সমসাময়িক দুইটী বিভিন্ন ভট্টবংশের বিবরণ জানা যাইতেছে। নীলকণ্ঠের দুহিতা গঙ্গাদেবী ভরদ্বাজগোত্রীয় বালকৃষ্ণ ভট্টের পুত্র মহাদেব ভট্টের সহিত পরিণীতা হয়েন। মহাদেব ভট্টের ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষ ও অধস্তন দুই পুরুষের নাম সংগৃহীত হইয়া এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এবম্বিধ বংশাবলী যত অধিক সঙ্কলিত হইবে, সেই পরিমাণে ঐতিহাসিক জ্ঞান সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইয়া, সাহিত্যের অন্ধতমসাবৃত অংশ আলোকিত করিবে। এবম্বিধ বংশমালা সংস্কৃত সাহিত্যে বড়ই বিরল ও দুষ্প্রাপ্য।

গোবিন্দ ভট্টের পুত্র রামেশ্বর "ধর্ম্মরত্নাকর" নামক গ্রন্থে গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় যাবতীয় কার্য্য সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি মৈথিল ছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রামেশ্বর বারাণসী নগরে আবির্ভূত হন। মৈথিল স্মার্ত্ত চণ্ডেশ্বর ঠাকুরের স্মৃতি গ্রন্থের অনুকরণে রামেশ্বর 'রত্নাকর' নাম দিয়া থাকিবেন।

"নত্বা বাগীশ্বরীং দেবীং হরং বিঘ্নহরং তথা।
রামেশ্বরেণ ক্রিয়তে ধর্ম্মরত্নাকরো মুদে॥

ইতি শ্রীমহামহোপাধ্যায়-ভট্ট-শ্রীরামেশ্বরবিরচিতো ধর্ম্মরত্নাকরঃ সমাপ্তঃ।' (ধর্ম্মরত্নাকর)

রামেশ্বর ভট্টের পুত্র নারায়ণ ভট্ট খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বারাণসী নগরে

বর্ত্তমান ছিলেন। "তত্ত্বকমলাকরে" কমলাকর ভট্ট স্বীয় পিতামহ নারায়ণ ভট্টকে [illegible] 'জগদ্গুরু' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। স্বপ্রণীত "জলাশয়োৎসর্গবিধি" গ্রন্থে [illegible] স্বাপনার পূর্ব্বতন স্মৃতিকার লক্ষ্মীধর ও শূলপাণি ভট্ট এবং মৈথিল স্মার্ত্ত হরিনাথ উপাধ্যায় জলাশয়োৎসর্গ সম্পর্কে অভিমতের সমালোচনা করিয়া তাহার অসারতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে হরিনাথ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা [illegible] মিশ্রের পূর্ব্বে আবির্ভূত হন। চণ্ডেশ্বর ঠক্কুর খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। চণ্ডেশ্বর ঠক্কুর ও অনিরুদ্ধ ভট্ট সমসাময়িক গ্রন্থকার। চণ্ডেশ্বরের [illegible] রুদ্রধর খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে মিথিলায় জন্মগ্রহণ করেন। রুদ্রধরের [illegible] হরিনাথের পূর্ব্বে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীদত্ত মিশ্র আবির্ভূত [illegible] শ্রীদত্তের পুত্র রুচিপতি মিশ্র খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মলাভ করেন। ইহার ষোড়শ শতাব্দীতে মণিক মিশ্র, বর্দ্ধমান মিশ্র, মহেশ ও দেবনাথ ঠক্কুর মিথিলায় আবির্ভূত হন। সোম ভট্টের পৌত্র দেবনাথ ঠক্কুর তর্কপঞ্চানন স্বপ্রণীত "অধিকরণ কৌমুদী" নামক মীমাংসাশাস্ত্রীয় গ্রন্থে পূর্ব্বতন মৈথিল স্মার্ত্ত গ্রন্থকারদিগের উল্লেখ করিয়াছেন।

"পুরাণমজরং দেবং কামদং কামরূপিণম্।
অনিদানং নিদানন্তং যোগিনং ভোগিনং নুমঃ॥
ধর্ম্মশাস্ত্রেঽধিকরণং বিচারেষূপকারকম্।
বিদুষা দেবনাথেন নির্ব্বন্ধেন নিবধ্যতে॥
রত্নাকরে কল্পতরৌ শ্রীদত্ত-হরিনাথয়োঃ।
বাচস্পতৌ নিগূঢ়ং যৎ তন্ন্যবন্ধি গুরুক্রমাৎ॥
সোমভট্টোপদিষ্টেন পথা সঞ্চরতো মম।
মীমাংসা-বিপয়ারণ্যে শরণং বৈত ভাবতী॥

ইতি শ্রীমহামহোপাধ্যায়দেবনাথঠক্কুরনির্ম্মিতা অধিকরণকৌমুদী সমাপ্তা।"

নারায়ণ ভট্ট স্বলিখিত "জলাশয়োৎসর্গবিধি" গ্রন্থের আরম্ভে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। 'ত্রিস্থলীসেতু' নামে তীর্থযাত্রা বিষয়ক গ্রন্থের আরম্ভে এই পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে *। 'শ্রাদ্ধকৃত্য' নামক পুস্তক উক্ত ত্রিস্থলীসেতুরই অন্তর্ভুক্ত।

"সরস্বতীং নমস্যামঃ প্রত্যূহব্যূহ-হানয়ে।
যদেকজ্ঞানচিন্তানাৎ চিতেঃ সঞ্চিতিরুত্তমা॥

---

* Dr. R. L. Mitra's "Notices of Sanskrit Mss," V 146, VII 50, [illegible] II. 202 IV. 166.

বিঘ্নাধিপং নমস্তুভ্যং বিঘ্নসঙ্ঘ-বিঘাতয়ে।
প্রবন্ধং রচয়াম্যুচ্চৈর্বুদ্ধিশুদ্ধিং বিধেহি মে ॥
বিশ্বামিত্রকুলোদধৌ বিধুরিবাখণ্ডঃ কলানাং নিধিঃ
বাগ্‌গুম্ফে নিখিলেঽপি যস্য বসুধা শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈশ্চিতা।
বিদ্যাপদ্ম-বিকাশনৈক-তরণিঃ শ্রীভট্টগোবিন্দভঃ
সংখ্যাবদ্-গণনাগ্রণীর্বিজয়তে শ্রীভট্টরামেশ্বরঃ ॥
শ্রিতা বারাণসী তেন নগরী ন গরীয়সী।
যতোঽন্যনগরী হেমনগরীতিমুপেয়ুষী ॥
শাস্ত্রেষ্বধীতী পিতুরেব যঃ শ্রুতীঃ
স্মৃতীঃ সমালোক্য চ দেশরীতীঃ।
নারায়ণস্তত্তনয়োঽবিমুক্তে
জলাশয়োৎসর্গবিধিং বিধত্তে ॥
যদ্যপীহ বুধোদ্গীতা গ্রন্থাঃ সন্তি পরঃ শতাঃ।
তথাপীহ বিশেষো যঃ পণ্ডিতৈঃ স বিবিচ্যতাম্।

ইতি ভট্টরামেশ্বরসূনু* নারায়ণভট্টবিরচিতো জলাশয়োৎসর্গবিধিঃ সমাপ্তঃ।"

ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই নারায়ণ ভট্টকে "বেণীসংহার-নাটক" প্রণেতা শ্রী গোত্রজ ভট্ট নারায়ণের সহিত অভিন্ন কল্পনা করিয়া গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ভট্ট নারায়ণ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রাজা আদিশূরের সভায় অবস্থিতি কালে "বেণীসংহার নাটক" রচনা করেন। তিনি কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আনীত ও উপনিবিষ্ট হন। ভট্ট নারায়ণ শাণ্ডিল্য গোত্রজ ক্ষিতীশের পুত্র। এই নারায়ণ ভট্ট বিশ্বামিত্রগোত্রীয় ব্রাহ্মণ। তিনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ রামেশ্বরের পুত্র। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বারাণসী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'ধর্ম্মরত্নাকর' ও 'প্রয়োগরত্ন' নামে স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

"ভট্ট-রামেশ্বরসুতো ভট্টনারায়ণঃ সুধীঃ।
নত্বা শিবৌ সংবিচার্য্য কুরুতেঽস্ত্যেষ্টিপদ্ধতিম্ ॥
"ভবানীশঙ্করৌ নত্বা ভট্টরামেশ্বরাত্মজঃ।
ভট্ট-নারায়ণঃ কাশীং বিবিনক্তি সদুক্তিভিঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্বিদ্বন্মুকুটমাণিক্যদাক্ষিণাত্যালঙ্কারশ্রীমদ্ভট্টরামেশ্বরসূরি-সুনু-নারায়ণ-ভট্ট-বিরচিতে ত্রিস্থলীসেতৌ কাশীপ্রকরণে তন্মরণমুক্তিবিচারঃ।"

---

* *Ibid.* III. 334

নারায়ণ ভট্টের রচিত স্মৃতি গ্রন্থের নাম 'পদ্ধতি'। তাহার রচিত [illegible] 'রুদ্রপদ্ধতি', 'ঔদ্ধদেহিক পদ্ধতি' এবং 'জীবচ্ছ্রাদ্ধপ্রয়োগ পদ্ধতি' পাওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থ তাঁহার রচিত 'প্রয়োগরত্নে' অন্তর্গত।

"ভট্টরামেশ্বরসুতো ভট্টনারায়ণঃ কৃতী।
প্রণম্য রীতিং তনুতে রুদ্রানুষ্ঠানপদ্ধতিম্॥
রামেশ্বরভট্টাম্বুজ-নারায়ণসুবিণা কাশ্যাম্।
কর্ম্মঠসজ্জন-তুষ্ট্যৈ রুদ্রানুষ্ঠানপদ্ধতী রচিতা॥
গ্রন্থাননেব্‌নালোক্য বিচার্য্য সদসচ্চ যঃ।
কৃতঃ শ্রমস্তেন বিভুঃ শঙ্করঃ শ্রীয়তাং মম॥"

রুদ্রপদ্ধতি

"ভট্টরামেশ্বরসুতো ভট্টনারায়ণঃ সুধীঃ।
ব্যধত্ত রুচিরাং কাশ্যামৌর্দ্ধদেহিকপদ্ধতিম্॥
আশ্বলায়নমার্গেণ সহি পদ্ধতয়ঃ শতম্।
ভাষ্যস্য বিশেষো যঃ পণ্ডিতৈঃ সোঽবধার্য্যতাম্॥

ইতি শ্রীমদ্বিবুধকুটুম্বাণিকহীবাহুরশ্রীমদরামেশ্বরভট্টসুনু-শ্রীনভট্টনারায়ণ কৃতে প্রয়োগরত্নে ঔদ্ধদেহিকপদ্ধতিঃ সমাপ্তা।"

অপর এক নারায়ণ ভট্ট খৃষ্ট অব্দে 'সাধনদীপিকা' রচনা করেন। ইহাতে বৈষ্ণবদিগের অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াকলাপ বিবৃত করিয়াছেন। এই নারায়ণ ভট্ট বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত বহুতর উপনিষদের 'দীপিকা' ভাষ্য বিদ্যমান আছে। তিনি কান্যকুব্জাগত শাণ্ডিল্যগোত্রজ বল্লালী কুলীন ব্রাহ্মণ। [illegible] সঙ্কেতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ হন না। এই নারায়ণ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য হইতে অষ্টম উর্দ্ধতন পুরুষ।

শাণ্ডিল্যগোত্রজ অপর এক নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় রঘুনন্দনের সময়ে ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। এই নারায়ণই 'সাধনদীপিকা' রচনা করেন বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি চৈতন্যদেবের ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। নারায়ণের পিতার নাম শঙ্কর।

"শ্রীকৃষ্ণং পরমানন্দং সচ্চিদানন্দরূপিণম্।
বন্দে গুরুং কৃপাসিন্ধুং বৈষ্ণবাচারসিদ্ধয়ে॥
সদাচারাবিরোধেন মন্ত্রশাস্ত্রানুসারতঃ।
সাধনস্য হি ভাবস্য দীপিকেয়ং প্রতন্যতে॥

শঙ্করং শঙ্করং নত্বা সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেদিনম্।
সেবিনং সর্ব্বধর্ম্মাণাং কান্যকুব্জকুলোদ্ভবম্॥
বক্ষ্যে প্রকাশ এতস্মিন্ গুরুশিষ্যাদিলক্ষণম্॥

ইতি নারায়ণভট্টবিরচিতায়াং সাধনদীপিকায়াং সমুচ্চয়োদ্যাম সপ্তমঃ প্রকাশঃ।"

এই নারায়ণের পুত্র কৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্বের অনুকরণে "কৃত্যতত্ত্ব", "শুদ্ধিসার" এবং "প্রায়শ্চিত্তকৌমুদী" রচনা করেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থের শেষভাগে কৃষ্ণদেব আপনার বৈষ্ণবত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। চৈতন্য দেবের বিখ্যাত উক্তি 'প্রায়শ্চিত্তকৌমুদীর' শেষভাগে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে কৃষ্ণদেব খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হন।

নমস্কৃত্যাখিলৈর্দ্দেবৈর্বন্দ্যং শ্রীপরমেশ্বরম্।
তনুতে কৃষ্ণদেবেন প্রায়শ্চিত্তস্য কৌমুদী॥
অত্র চ হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

প্রায়শ্চিত্ত-কৌমুদী।

"বেদান্তবেদ্যং শ্রীরামং প্রণম্য সম্মুদে ময়া।
বালানাং সুখবোধায় শুদ্ধিসারো বিতন্যতে॥

ইতি বন্দ্যঘটীয় শ্রীকৃষ্ণদেবসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যকৃতৌ শুদ্ধিসারঃ সমাপ্তঃ।"

স্বরচিত কৃত্যতত্ত্বে কৃষ্ণদেব রঘুনন্দনের প্রণীত তিথিতত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন।

"বেদান্তবেদ্যং শ্রীরামং প্রণম্য সম্মুদে ময়া।
ক্রমাৎ দ্বাদশগাদেষু কৃত্যতত্ত্বং প্রচক্ষতে॥
নারায়ণো বন্দ্যকুলাগ্রজন্মা
তস্যাত্মজঃ শ্রীযুতকৃষ্ণদেবঃ।
প্রণম্য রামস্য পদারবিন্দং
প্রযোগসারং কুরুতেঽব্দসঙ্গবম্॥
তিথিতত্ত্বেষু সঙ্কেয়ং প্রমাণঞ্চাস্য কোবিদৈঃ।
বৈশাখাদিক্রমেণৈব প্রপঞ্চো গৌড়ে নিবধ্যতে॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণদেবসার্ব্বভৌমকৃতে কৃত্যতত্ত্বে প্রয়োগসারে দোলযাত্রাপদ্ধতিঃ। সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।" (কৃত্যতত্ত্ব)

মহাদেব নামে নারায়ণভট্টের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। এই মহাদেব ভট্ট "স্মার্ত্তপ্রায়শ্চিত্তপ্রয়োগ" নামে গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। অন্য এক ভ্রাতার নীলকণ্ঠের "দানচন্দ্রিকার" তিনি ভূমিকা দিয়াছেন। তাঁহার মাতার নাম গঙ্গা ও পিতার নাম মহাদেব। রামকৃষ্ণ, লক্ষ্মণ ও শঙ্কর নামে নারায়ণ ভট্টের তিন পুত্র জন্মে। নারায়ণভট্টের পত্নীর নাম লক্ষ্মী। রঘোগবংশীয় রাজা লক্ষ্মীসিংহের আদেশে নারায়ণভট্ট "হোত্রকল্পদ্রুম" নামে বৈদিক সাগযজ্ঞ বিষয়ে এক গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তক পাঁচ কুসুমে বিভক্ত।

নত্বা হেরম্বমীশং গিরিবরতনয়াং ক্ষেমকেভু গুরু তৌ
লক্ষ্মীনারায়ণাখ্যাবপি নিজপিতরৌ লক্ষ্মণঃ শাস্ত্রদর্শী।
প্রীত্যর্থং হোত্রকল্পদ্রুমমিহ বিবুধস্বান্তরত্তেবিধত্তে
লক্ষ্মীমুক্তাং রঘেলাবয়-জলধি-বিধোর্ভাবসিংহস্য রাজ্ঞঃ॥
প্রণম্য শারদাং দেবীং পিতৃব্যচরণৌ তথা।
বিচার্য্য সূত্ররত্নাদি কুর্ব্বে হোত্রস্য সংগ্রহম্॥

ইতি শ্রীনদ্‌রঘেলবংশাবতংস-সিদ্ধি-শ্রীভাব-সিংহদেবকাবিতে ষড়্‌দর্শনবিন্নারায়ণভট্টাত্মজ-লক্ষ্মণভট্টকৃতে হোত্রকল্পদ্রুমে অগ্নিষ্টোমে সুত্যাকাণ্ডং নাম পঞ্চমং কুসুমম্॥

নারায়ণভট্টের অন্যতম পুত্র শঙ্কর ভট্ট নীলকণ্ঠ ভট্টের পিতা। পার্থসারথি মিশ্রের কৃত মীমাংসাশাস্ত্রীয় 'শাস্ত্রদীপিকা' নামক গ্রন্থ অবলম্বনে শঙ্কর ভট্ট 'প্রকাশ' নামে তাহার ভাষ্য রচনা করেন। ইহাতে তিনি আপনার জনক নারায়ণভট্টকে পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞ ও মীমাংসা দ্বৈতদর্শনবিৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ত্রিমল্লভট্ট বৈদ্যের পুত্র অপর এক শঙ্কর ভট্ট নানা পরিচ্ছেদে "রসপ্রদীপ" নামে খণ্ডকাব্য রচনা করেন।

ত্রিমল্লভট্টবৈদ্যস্য তনুজঃ শঙ্করঃ কৃতী।
ছিত্রান্ গ্রন্থান্ সমালোচ্য তনোতি রসদীপকম্॥
(রসদীপক)

নারায়ণের পুত্র শঙ্করভট্টের রঘুনাথ, দামোদর, নৃসিংহ ও নীলকণ্ঠ নামে চারি পুত্র জন্মে তন্মধ্যে নীলকণ্ঠ সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছিলেন। নৃসিংহ ভট্ট দত্তকপুত্র গ্রহণ সম্পর্কে 'দত্তকপুত্রবিধান' নামে স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ডাক্তার আফ্রিট মতে শঙ্কর ভট্ট খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বারাণসী নগরে আবির্ভূত হইয়া "দ্বৈতনির্ণয়" নামে মীমাংসাগ্রন্থ রচনা করেন।

আশ্বলায়নের গৃহ্য সূত্র অবলম্বনে রামকৃষ্ণভট্ট 'বাক্যশক্তি' মীমাংসা শাস্ত্রীয় অর্থ কৌমুদী' ও স্মৃতিশাস্ত্রীয় 'জীবৎপিতৃকতর্পণসংগ্রহ' রচনা করেন। কমলাকর ভট্ট 'কাম্যনৈমিত্তিকপিণ্ডদানপ্রয়োগ' রচনা করেন।

শ্রীভট্টরামেশ্বরসূরিসূনু-শ্রীভট্টনারায়ণসূরিসূনুঃ।
শ্রীরামকৃষ্ণঃ স্বধিয়া ব্যধত্ত, জীবে পিতর্য্যাত্মজকার্য্যশুদ্ধিম্ ॥

(জীবৎপিতৃকর্ত্তব্যসঙ্গ্রহ)

শ্রীমন্নারায়ণাখ্যাৎ সমজনি বিবুধো রামকৃষ্ণাভিধানঃ
তৎ-সূনুঃ সর্ব্ববিদ্যাম্বুধিনিজচুলুকীকারতঃ কুম্ভজন্মা।
দৃষ্ট্বা নানা-নিবন্ধান্ ব্যরচয়দতুলা গ্রন্থমালাকরাখ্যং
পিত্রোঃ পাদাব্জসঙ্গো রঘুপতিপদয়োঃ স্বাশ্রমং প্রার্থয়ংশ্চ ॥

(কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনদীপদানপ্রয়োগ)

নন্দসূনুং নমস্কৃত্য সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বরম্।
নিরূপ্যতেঽধিকরণং রামকৃষ্ণেন বিশ্রুতম্ ॥

কমলাকর ভট্টের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম দিনকর ভট্ট। দিনকর 'দিনকরোদ্যোত' নামে স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। গ্রন্থ সমাপ্তির পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয় সেই পুস্তক তাঁহার সুযোগ্য পুত্র বিশ্বেশ্বর ভট্টের দ্বারা সম্পূর্ণ হয়। বিশ্বেশ্বরের অপর নাম গাগাভট্ট। তিনি মহারাষ্ট্রের সুবিখ্যাত নরপতি ছত্রপতি শিবাজীর (১৬২৭—৮০ খৃঃ) সভাপণ্ডিত ছিলেন। 'দিনকরোদ্যোতের' অন্তর্গত 'অশৌচকান্তে' বিশ্বেশ্বরভট্ট এইরূপে আপনার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার মাতার নাম প্রভাদেবী।

মীমাংসৈকধুরন্ধরঃ শ্রুতিধরঃ ন্যায়েঽপি বাগীশ্বরঃ।
সাহিত্যাম্বুধিসাগরঃ সুজনতাবল্লী-রসালদ্রুমঃ।
যং বিদ্বন্মণিশেখরো দিনকরঃ প্রাসূত বিশ্বেশ্বরং
তেনাশৌচনিবন্ধনো দিনকরোদ্যোতোঽধুনা পূর্য্যতে ॥
অথাপদ্যনভাধ্যক্ষ নিবহানন্দদায়িনী।
শিব-ছত্রপতের্ভূয়াচ্ছিবদ্যুমণিদীপিকা ॥

ইতি শ্রীমদ্-বিদ্বন্মুকুটমাণিক্যমরীচি-গঞ্জরীপুঞ্জ-পিঞ্জরিত-পদদ্বন্দ্বারবিন্দ-শ্রীনারায়ণভট্টসূরিসূনু-রামকৃষ্ণভট্টাত্মজ-ভট্টদিনকর-তনয়-গাগাভট্টাপরনামকবিবর্য্যভট্টপরিপূর্বিতে দিনকরোদ্যোতে অশৌচকাণ্ডে দ্রব্যশুদ্ধিবিচারঃ শুদ্ধোদ্যোতঃ সমাপ্তিঃ।

মহর্ষি জৈমিনির মীমাংসা সূত্র অবলম্বনে বিশ্বেশ্বর ভট্ট "শ্রীমীমাংসাকুসুমাঞ্জলি" রচনা করেন।

"উমামহেশসদৃশৌ লক্ষ্মীনারায়ণাবিব।
প্রাভাদিবাকরসমৌ পিতরৌ সমুপাস্মহে॥
মীমাংসাকুসুমানামঞ্জলিরেষোঽর্পণায় দত্তঃ।
শ্রীরামপাদলগ্নো বাসেন দিশঃ কৃতার্থয়তু॥
বিশ্বেশ্বরাপরাখ্যস্য গাগাভট্টমনীষিণঃ।
কৃতিঃ করোতু কৃতিনাং হৃদয়ে বাসমাদরাৎ॥"

(মীমাংসাকুসুমাঞ্জলি)

ভট্ট নীলকণ্ঠের পুত্র দিনকর ভট্ট খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বারাণসী নগরে জন্ম-গ্রহণ করেন। ইঁহার দিনকরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম রামকৃষ্ণ। দিনকর ভট্ট সতীদেবীর গর্ভে জন্মলাভ করেন। দিনকরের ভগিনী গঙ্গাদেবী ভরদ্বাজ গোত্র মহাদেব ভট্টের সহিত পরিণীতা হন। দিনকর ভট্ট 'ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীদীপিকা' রচনা করেন। নবদ্বীপের সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের প্রণীত 'ভাষাপরিচ্ছেদ' ও তাহার ভাষ্য 'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী' অবলম্বনে, দিনকরের 'দীপিকা' রচিত হয়। নৈয়ায়িক সমাজে ইহা 'দিনকরী টীকা' নামে পরিচিত।

"ভানুং প্রণম্য পরিভাব্য চ শাস্ত্রসারং
মুক্তাবলীকিরণ এষ পিতৃপ্রদিষ্টঃ।
সদ্যুক্তিভির্দিনকরেণ করেণ সোঽয়ং
নীতঃ প্রকাশপদবীং সুধিয়াং মুদেঽস্তু॥
মুক্তাবলীপ্রকাশোঽয়মজ্ঞানতিমিরাপহঃ।
তেন সন্তোষমায়াতু নীলকণ্ঠঃ সতীপ্রিয়ঃ॥"

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে কমলাকর ভট্টের রচিত "নির্ণয়সিন্ধু" ও "বিবাদতাণ্ডব" অদ্যাপি বারাণসী ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া সমাদৃত ও সম্মানিত রহিয়াছে। এই সকল পুস্তকে বিজ্ঞানেশ্বরের প্রণীত সুবিখ্যাত 'মিতাক্ষরা'র মত গৃহীত ও আলোচিত হইয়াছে। কমলাকর আপনার সমসাময়িক স্মার্ত্ত বারাণসীবাসী নন্দ পণ্ডিতের মতের প্রতিবাদ করিয়া তাহার অসারতা প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 'সংস্কারপদ্ধতি' গ্রন্থে কমলাকর ভট্ট হলদত্তের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণতনয়ঃ কমলাকরসংজ্ঞিতঃ।
শ্রীরামং পিতরৌ নত্বা সংস্কারান্ বক্তি সাম্প্রতম্॥"

(সংস্কার পদ্ধতি)

"প্রণম্য রামং পিতরং কমলাকরশর্ম্মণা।
রামকৃষ্ণতনুজেন শূদ্রধর্ম্মো বিতন্যতে॥"

(শূদ্রধর্ম্মতত্ত্ব)

"শ্রীরামং পিতরৌ নত্বা কমলাকরশর্ম্মণা।
অর্থশব্দৌ নিরূপ্যাথ শাস্ত্রতত্ত্বং নিরূপ্যতে॥"

"ইতি শ্রীজগদ্গুরু-মীমাংসক-নারায়ণভট্ট-সুনু-রামকৃষ্ণভট্টাত্মজ-কমলাকরভট্টকৃতে তত্ত্ব-কমলাকরে প্রথমোঽধ্যায়ঃ। শুভমস্তু। সংবৎ ১৬২৫ সমবে চৈত্র সুদি ৮বার শুক্র-বারুণা-কারে।" (তত্ত্বকমলাকর)। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে ১৬২৫ সংবৎ (১৬৬৮ খৃঃ) চৈত্রী শুক্ল চতুর্থীতে শুক্রবারে ইহা লিখিত হয়।

"নারায়ণার্য্যজশ্রীমদ্রামকৃষ্ণস্য সূনুনা।
কমলাকরসংজ্ঞেন পূর্ত্তং সম্যগিহোচ্যতে॥"

(পূর্ত্তকমলাকর)

'শান্তিরত্নে' কমলাকর ভট্ট চণ্ডীপাঠ ও দেবীর পূজাপদ্ধতি বিবৃত করিয়াছেন। ইহাতে তিনি স্ব-প্রণীত "নির্ণয়সিন্ধু"র উল্লেখ করিয়াছেন।

"নত্বা সীতাপতিং রামং ভবাব্ধিতরণে তরিং।
গৃহস্থানাং হিতার্থায় শান্তিরত্নং বিতন্যতে॥
শ্রীমন্নারায়ণাখ্যাৎ সমজনি বিবুধো রামকৃষ্ণাভিধানঃ
তৎসুনুঃ সর্ব্ববিদ্যাজলনিধিনিচুলীকারতঃ কুম্ভজন্মা।
দৃষ্ট্বা নানানিবন্ধান্ ব্যরচয়দতুলং গ্রন্থমাকরাখ্যং
পিত্রোঃ পাদাব্জভৃঙ্গো রঘুপতিপদয়োঃ সংশ্রয়ং প্রাপ্য যত্নাৎ॥
যো ভাট্টতত্ত্বগহনার্ণবকর্ণধারঃ
শাস্ত্রান্তরেষু নিখিলেষু চ মর্ম্মবেত্তা।
সোঽত্র শ্রমোঽস্তি বিহিতঃ কমলাকরেণ
প্রীতোঽমুনাস্তু সুকৃতী-বুধরামকৃষ্ণঃ॥"

(শান্তিরত্ন)

"শ্রীরামকৃষ্ণপিতরং নত্বোমাখ্যাঞ্চ মাতরম্।
কমলাকরসংজ্ঞেন তীর্থযাত্রা বিবিচ্যতে॥"

(তীর্থকমলাকর)

এই তীর্থকমলাকরে 'দানকমলাকরের' উল্লেখ আছে। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে কমলাকর রামকৃষ্ণের ঔরসে ও উমাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। 'তত্ত্বকমলাকরের' শেষ-ভাগে যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় ১৬৩৮ খৃঃ অব্দে উহা লিখিত হয়। ইহা হইতে কমলাকর ভট্টের অধস্তন আবির্ভাব কাল খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে। কমলাকর ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দের পর প্রাদুর্ভূত হইতে পারেন না এই সত্য ইহা দ্বারা নির্ণীত হইতেছে।

হেমাদ্রি ও মাধবাচার্য্যের রচিত স্মৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে, কমলাকর ভট্ট 'নির্ণয়সিন্ধু' ও 'নির্ণয়কমলাকর' রচনা করেন। ইহাতে বিস্তারিত ভাবে তিনি আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া গ্রন্থ সমাপ্তির কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে 'মিতাক্ষরা'র মত উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে কমলাকর একশ একত্রিশ জন প্রাচীন স্মৃতিকার মতের আলোচনা করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর সংহিতায় বিশ জন স্মৃতিশাস্ত্র-প্রণেতা ঋষির নাম দেখা যায়।

শ্রুতা মে মানবা ধর্ম্মা বাশিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা।
গার্গেয়া গৌতমীয়াশ্চ তথা চৌশনশাঃ শ্রুতাঃ॥
অত্রেবিষ্ণোশ্চ সংবর্ত্তাদক্ষাদঙ্গিরসস্তথা॥
শাতাতপাচ্চ হারীতাদ্ যাজ্ঞবল্ক্যাত্তথৈব চ।
আপস্তম্বকৃতা ধর্ম্মাঃ শঙ্খস্য লিখিতস্য চ॥
কাত্যায়নকৃতাশ্চৈব তথা প্রাচেতসামুনেঃ।
শ্রুতা হ্যেতে ভবৎপ্রোক্তাঃ শ্রুতার্থা মে ন বিস্মৃতাঃ॥

(পরাশর সংহিতা)

পরাশরের নির্দ্দিষ্ট কশ্যপ, গর্গ ও প্রচেতার পরিবর্ত্তে, যাজ্ঞবল্ক্য বশিষ্ঠ, ব্যাস ও বৃহস্পতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

মন্বত্রি-বিষ্ণু-হারীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরো-
যমাপস্তম্ব-সংবর্ত্তাঃ কাত্যায়নো বৃহস্পতিঃ॥
পরাশরো ব্যাস-শঙ্খ-লিখিতা দক্ষ-গৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ॥

(যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি)

পৈঠীনসি ছত্রিশ জন ধর্ম্মশাস্ত্রকার ঋষির নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

তেষাং মন্বঙ্গিরো-ব্যাস-গৌতমাত্র্যুশনো-যমাঃ।
বশিষ্ঠো দক্ষ-সংবর্ত্ত-শাতাতপ-পরাশরাঃ॥
বিষ্ণুপস্তম্ব-হারীতাঃ শঙ্খঃ কাত্যায়নো ভৃগুঃ।
প্রচেতা নারদো যোগি-বৌধায়ন-পিতামহাঃ॥
সুমন্তুঃ কাশ্যপো বজ্রঃ পৈঠীনো ব্যাঘ্র এব চ।
সত্যব্রতো ভরদ্বাজো গার্গ্যঃ কার্ষ্ণাজিনিস্তথা॥
জাবালির্জমদগ্নিশ্চ লৌগাক্ষিব্রহ্মসম্ভবঃ।
ইতি ধর্ম্মপ্রণেতারঃ ষট্ ত্রিংশদৃষয়স্তথা॥

পদ্মপুরাণে অত্রির নাম পাওয়া যায় না। মরীচি, পুলস্ত্য, প্রচেতা, ভৃগু, নারদ, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, দেবল, ঋষ্যশৃঙ্গ, গর্গ, বৌধায়ন, পৈঠীনসি, জাবালি, সুমন্তু, পাবক্রব, লৌগাক্ষি ও কৌথুমীর নাম দেখা যায়। 'সংস্কার কৌস্তুভ' নামক স্মৃতি গ্রন্থে কমলাকর ভট্টের পূর্ব্ববর্ত্তী অনন্তদেব এক শ চারি জন স্মৃতিকার ঋষির নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "নির্ণয়সিন্ধু" গ্রন্থে কমলাকর ভট্ট এক শ একত্রিশ জন স্মৃতি-প্রণেতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

১৬৩৮ সংবৎ অব্দে (১৫৮১ খৃষ্টাব্দে) কমলাকর ভট্ট কর্ত্তৃক "নির্ণয়সিন্ধু" তিন পরিচ্ছেদে সমাপ্ত হয়। স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে ১৫৭২ খৃঃ (১৬২৯ সংবৎ) এবং শ্রীযুক্ত রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীর মতে ১৬৬৮ সংবৎ (১৬১১ খৃঃ) কমলাকর ভট্টের নির্ণয়-সিন্ধু রচিত হয়। এই উভয় মতই ভ্রমাত্মক ও অমূলক। 'নির্ণয়সিন্ধু'র নির্দ্দিষ্ট বচন হইতে জানা যাইতেছে যে কমলাকর ভট্ট খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বারাণসী নগরে মহারাষ্ট্রীয় বিশ্বামিত্র-গোত্রজ ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামকৃষ্ণ এবং মাতার নাম উমা দেবী। 'নির্ণয়সিন্ধু' হইতে কমলাকর ভট্টের বিস্তারিত পরিচয় নিম্নে উদ্ধৃত হইল। তাঁহার অধস্তন ষষ্ঠ ও সপ্তম পুরুষ অদ্যাপি বারাণসী নগরে বাস করিতেছেন।

"কারুণ্যৈকনিকেতং রামং সীতালতাযুক্তং।
বিশ্বামিত্রাঘবায়ব্রততি-সমালম্বশাখিনং বন্দে॥
বেদার্থধর্ম্মরক্ষায়ৈ মায়ামানুষরূপিণম্।
পিতামহং হরিং বন্দে ভট্টনারায়ণাহ্বয়ম্॥

---

[৯] Dr. R. L. Mitra's Notices of Sanskrit Mss X. 323. Raj kumar Sarvadhikari's *Tagore Law Lectures*, p. 406-408.

যৎপাদসংস্মৃতিঃ সর্ব্বমঙ্গলপ্রাপ্তিভূর্মতা।
তান্ ভট্টরামকৃষ্ণাখ্যান্ শ্রীতাতচরণান্নুমঃ॥
সর্ব্বকল্যাণ-সন্দোহ-নিদানং যৎপদদ্বয়ম্।
তানশ্বীসোদরান্নত্বাখ্যাং নৌমি সাদরম্॥
বিন্ধ্যমিব-পাদ্রিজালস্বীকৃতবিগ্রহম্।
জনয়ামঃ ভ্রাতরং ভট্টদিবাকরমুপাস্মহে॥
হেমাদ্রি-সাধব-মতে প্রবিচার্য্য সম্যগ-
আলোচ্য তত্ত্বমথ তীর্থকৃতাং পরেষাম্।
শ্রীরামকৃষ্ণতনয়ঃ কমলাকরাখ্যঃ
কালে তথামতি বিনির্ণয়মাতনোতি॥
যো ভাট্টতন্ত্রগহনার্ণবকর্ণধারঃ
শাস্ত্রাঙ্কুরেষু নিখিলেষপি মর্ম্মবেত্তা।
যোঽত্র শ্রমঃ কিল কৃতঃ কমলাকরেণ
প্রীতোঽমুনাস্তু সুকৃতী বুধরামকৃষ্ণঃ॥
শ্রীভট্টরামেশ্বরসূরিসূনু-
শ্রীভট্টনারায়ণসূরিসূনোঃ।
শ্রীরামকৃষ্ণস্য সুতঃ কৃতীমং
ব্যধাদ্বিবদ্ধং কমলাকরাখ্যঃ॥
নানানির্ণয়বদ্ধানির্ণয়সিন্ধুঃ প্রোচ্যতাং বিবুধাঃ॥
নির্ণয়সরোজবদ্ধানির্ণয় কমলাকরোঽপ্যস্তু।
বসু-ধাতু-ঋতু-ভূ-মিতে গতেঽব্দে (=১৬৩৮)
নরপতি-বিক্রমতোঽথ যাতি রৌদ্রে।
তপসি শিবতিথৌ সমাপিতোঽয়ং
রঘুপতিপাদসরোরুহেঽর্পিতশ্চ॥'

(নির্ণয়সিন্ধু)

রাজকুমার বাবু শেষোদ্ধৃত শ্লোকটী মাত্র উদ্ধৃত করিয়া, 'ধাতু' শব্দের পরিবর্ত্তে 'নৃপ' শব্দ পাঠ করিয়াছেন। এই ভ্রান্ত পাঠের উদ্ধার দ্বারা, তিনি ১৬৬৮ সংবতে কমলাকর ভট্টের 'নির্ণয়সিন্ধু' রচনার কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বোম্বের বিখ্যাত উকীল স্বর্গীয় বিশ্বনাথ মণ্ডলিকের প্রকাশিত সটীক মনুসংহিতার ভূমিকা অবলম্বনে রাজকুমার বাবু [illegible]

কমলাকর ভট্টের বিবরণ সমাপ্ত করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে কমলাকরের বিস্তারিত বিবরণ সর্ব্বপ্রথম সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে তাহার পূর্ব্ব পুরুষগণের বিবরণ যথাসাধ্য সংগৃহীত হইয়াছে। ভবিষ্যতে কমলাকর ভট্টের পিতৃব্যপুত্র নীলকণ্ঠ ভট্টের বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

বৈদিক সমালোচনা।

তিন বেদ কি চারি বেদ।—বেদের সংখ্যা চারিটি, অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ। এই চারি বেদে পদ্য, গদ্য এবং গান এই তিন প্রকার রচনা দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্য রচনার প্রাচীন নাম ঋক্, গদ্য রচনার প্রাচীন নাম যজুঃ, এবং গান রচনার প্রাচীন নাম সাম। সাম ত্রিবিধ—লেশগান, আর্ষিগান, ছন্দগান। যে সকল সামের মূল কেবল ঋক্ অর্থাৎ পদ্যমন্ত্র, অর্থাৎ কোন একটি পদ্যমন্ত্র গানে বাঁধিয়া যে সাম উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকে লেশগান বলে। যে সকল গানের মূল যজুঃ অর্থাৎ গদ্যমন্ত্র, তাহাদিগকে আর্ষিগান বলে। যে সকল সামের মূল ঋক্ ও যজুঃ মিশ্রিত, তাহাদিগকে ছন্দগান বলে। ঋক্ ও যজুঃ হইতে সাম উৎপন্ন করিবার বিস্তৃত নিয়মাবলী আছে। উক্ত তিন প্রকার রচনা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার রচনা পূর্ব্বকালেও ছিল না, এবং ইদানীন্তন কালেও দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং চারি বেদে যত মন্ত্র আছে, তাহাদের একটিও ঋগ্-যজুঃ-সাম-লক্ষণাতিরিক্ত নহে। এই ত্রিবিধ রচনাবিশিষ্ট বলিয়াই বেদের আর একটি নাম ত্রয়ী; যথা শতপথ ব্রাহ্মণ (৫, ৬, ৭, ১):—ত্রয়ী বৈ বিদ্যা ঋচো যজুংষি সামানি"; মীমাংসাদর্শন (২।১।৩২, ৩৩, ৩৪):—তেষামৃগ্ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা। গীতিষু সামাখ্যা। শেষে যজুঃশব্দঃ। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে বেদের মন্ত্র ভাগেরই ত্রয়ীত্ব মুখ্য, ব্রাহ্মণ ভাগের ত্রয়ীত্ব গৌণ।

জ্ঞানার্থ বিদ্ ধাতু হইতে বেদশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; সুতরাং বেদ ও বিদ্যা একার্থবোধক। যথা ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ (১, ১৭, ১-১০):—প্রজাপতির্লোকানভ্যতপৎ ... অগ্নের্ঋচো বায়োর্যজুংষি সামাদিত্যাৎ। স এতাং ত্রয়ীং বিদ্যামভ্যতপৎ"। আদি সভ্য কালে এই ভারতবর্ষে যে সকল ঋষি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বিবিধ বিদ্যার আধার ছিলেন; এই জন্য তাঁহাদের দৃষ্ট মন্ত্রগুলি তৎকালে বেদনামে উক্ত হইয়াছিল কালক্রমে যখন ব্রাহ্মণ গ্রন্থের আবির্ভাব হইল, উহাদের ঋগাদিলক্ষণ না থাকিলেও বৈদিকমন্ত্র সকলের যাগাদিতে বিনিয়োগের অভিধায়ক বলিয়া উহারাও বেদনাম বাচ্য

হইল। যথা যজ্ঞপরিভাষাসূত্র (৩৪) :— মন্ত্রব্রাহ্মণযোর্বেদনামধেয়ম্। "বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ (২।১৬৫)" এই মনুবচনে বেদ-শব্দে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়ই বুঝাইতেছে।

বেদের আর একটি নাম শ্রুতি। বেদ চিরকাল গুরুপরম্পরায় শ্রুত হইয়া আসিতেছে, কেহ কখনও একটি মন্ত্রেরও প্রণয়নকাল নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। ব্রাহ্মণগ্রন্থে নিরুক্তকারের পূর্ব্বের মনুসংহিতায় শ্রুতি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহার কালের পর শ্রুতি শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। আম্নায়, ছন্দঃ, স্বাধ্যায়, আগম ও নিগম, এই সকল শব্দ বেদের অপর পর্য্যায়।

এই বেদগ্রন্থ ত্রিবিধ বচনাত্মক বলিয়া ত্রয়ীনামে প্রসিদ্ধ হইলেও যাগাদি কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ কালক্রমে চতুর্ভাগে বিভক্ত হইয়া ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি নাম লাভ করিয়াছে। অথর্ব্বা নামক ঋষিই যজ্ঞাদি প্রক্রিয়ার প্রথম প্রকাশক এবং তিনিই পূর্ব্বোক্ত চারি নামে বেদত্রয়ের বিভাগ করেন। যথা ঋক্‌সংহিতা (১০।৯০।৯) :—"যজ্ঞৈরথর্ব্বা প্রথমঃ পথস্ততে"; ঋঃ সঃ (৭।৭।৪।৫) :—"অগ্নির্ঘ্রাতো অথর্ব্বণা", অথর্বসংহিতা (৭।১।২) :—"অথর্বাণং পিতরং দেববন্ধুং মাতুর্গর্ভং পিতরমুং যুবানম্। য ইমং যজ্ঞং মনসাচিকেত প্র নো বোচস্তমিহেহ ব্রবঃ"। বৈদিক যজ্ঞে চারিজন প্রধান ঋত্বিক্ থাকিয়া হইয়া থাকেন, যথা: হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্‌গাতা এবং ব্রহ্মা। হোতার ব্যবহার্য্য মন্ত্র সকল প্রায় সমস্তই ঋক্ অর্থাৎ পদ্য মন্ত্র, দুই তিনটি যজুঃ অর্থাৎ গদ্যমন্ত্রও আছে, উক্ত ঋক্ সকল একত্রে নিবদ্ধ হইয়া যে গ্রন্থ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকে ঋক্‌সংহিতা বলে। উক্ত মন্ত্র সকলের অর্থ ও বিনিয়োগাদির অভিধায়ক গ্রন্থের নাম ঋগ্‌ব্রাহ্মণ। উক্ত দুই গ্রন্থই এক্ষণে ঋগ্বেদ নামে প্রসিদ্ধ। অধ্বর্য্যুর ব্যবহার্য্য মন্ত্র সকল অধিকাংশই যজুঃ, কতকগুলি ঋক্ও আছে; ঐসকল ঋক্ ও যজুঃ একত্রে নিবদ্ধ হইয়া যজুঃসংহিতা উৎপন্ন হইয়াছে, এবং উহাদের অর্থ ও বিনিয়োগাদির অভিধায়ক গ্রন্থ যজুর্ব্রাহ্মণ। উক্ত দুই গ্রন্থই এক্ষণে যজুর্বেদ নামে প্রসিদ্ধ। উদ্‌গাতার ব্যবহার্য্য মন্ত্র সকল ত্রিবিধ; সাম এবং ঐ সকল সামের মূলীভূত ঋক্ ও যজুঃ। উক্ত ঋক্, যজুঃ ও সাম একত্র নিবদ্ধ হইয়া সামসংহিতা উৎপন্ন হইয়াছে, এবং উহাদের অর্থ ও বিনিয়োগাদির অভিধায়ক গ্রন্থ সামব্রাহ্মণ। উক্ত দুই গ্রন্থই সামবেদনামে প্রসিদ্ধ। যাঁহারা কেবল ঋগ্বেদমাত্র অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকে ঋগ্বেদী বলে। যাঁহারা কেবল যজুর্ব্বেদমাত্র অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকে যজুর্ব্বেদী বলে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে যজুঃ সংহিতায়ও ঋক্ও আছে, সুতরাং যজুর্ব্বেদীদিগকে ঋক্ও জানিতে হয়, এবং সেই জন্য তাঁহাদিগকে দ্বিবেদী বা ভাষায় দুবে বলে। যাঁহারা সামবেদমাত্র অধ্যয়ন অধ্যাপন ও ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকে সামবেদী বলে। সামসংহিতার সামের মূলীভূত ঋক্ ও যজুঃ উভয়ই আছে; সুতরাং সামবেদীদিগকে ঋক্ এবং যজুঃ ও জানিতে হয়, এবং সেই জন্য তাঁহাকে ত্রিবেদী বা ভাষায় ত্রিবাড়ী অথবা তিবারী বলে। হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্‌গাতার ব্যবহার্য্য ভিন্ন

আরও অনেকগুলি মন্ত্র আছে; উহারা একত্র নিবদ্ধ হইয়া অথর্বসংহিতা উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে ঋক্, যজুঃ ও সাম এই ত্রিবিধ মন্ত্রই আছে। উহাদের অর্থ ও বিনিয়োগাদির অভিধায়ক গ্রন্থই অথর্ববাহ্মণ। উক্ত দুই গ্রন্থ অথর্ববেদ নামে প্রসিদ্ধ। যজ্ঞে ব্রহ্মা নামে যে ঋত্বিক্ বৃত হইয়া থাকেন, তাঁহাকে যজ্ঞের তত্ত্বাবধারণ করিতে হয়, অর্থাৎ হোতাদি অপর তিনজন ঋত্বিকের কার্য্য যথাবিধানে হইতেছে কি না দেখিতে হয়; এবং তাঁহার নিজের বিশেষ কার্য্যও আছে। সুতরাং সমস্ত ঋক্, যজুঃ ও সাম তাঁহার জানা আবশ্যক; অতএব ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ এই সমস্তই তাঁহাকে অধ্যয়ন করিতে হয়; অথর্ববেদ ব্যতিরেকে ব্রহ্মার কার্য্য হইতে পারে না। যথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৫।৫।৮):—"যদৃচৈব হোত্রং ক্রিয়তে যজুষাধ্বর্য্যবং সাম্নোদ্গীথং ব্যাহৃত্য ত্রয়ী বিদ্যা ভবত্যথ কেন ব্রহ্মত্বং ক্রিয়তে ইতি ত্রয্যা বিদ্যয়েতি ব্রূয়াৎ।" এস্থলে ত্রয্যা বিদ্যা বলাতে সমস্ত ঋক্, যজুঃ ও সাম বুঝাইতেছে। যাস্কীয় নিরুক্ত (১১।৩।৩):—"ব্রহ্মা সর্ব্ববিদ্যঃ সর্ব্বং বেদিতুমর্হতি।" যেরূপ হোতৃবেদ ঋগ্বেদের নামান্তর, অধ্বর্যুবেদ যজুর্বেদের নামান্তর, ও উদ্গাতৃবেদ সামবেদের নামান্তর, সেইরূপ ব্রহ্মবেদ অথর্ববেদের নামান্তর। যথা গোপথব্রাহ্মণ (১।২।১৭):—"চত্বারো বা ইমে বেদা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদো ব্রহ্মবেদ ইতি। চতস্রো বা ইমে হোত্রাঃ—হৌত্রমাধ্বর্যবমৌদ্গাত্রং ব্রহ্মত্বমিতি।" অথর্ববেদীদিগের ঋক্, যজুঃ ও সাম তিনেরই জ্ঞান আবশ্যক; সেই জন্য অথর্ববেদীদিগকে চতুর্ব্বেদী বা ভাষায় চৌবে বলে।

কি কারণে বেদ চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে এবং কি জন্য বেদকে ত্রয়ী বলে এ সম্বন্ধে আমরা যে মত প্রকাশ করিলাম, তাহা আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের অনুমোদিত নহে। তাঁহারা বলেন, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ এই তিনটিই প্রাচীন এবং অথর্ববেদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক; সেই জন্য প্রাচীন কালে বেদের ত্রয়ীনাম প্রচলিত ছিল। প্রাচীনতম গ্রন্থে তিন বেদের উল্লেখ দেখা যায়, যথা ছান্দোগ্যব্রাহ্মণে (৬।১৭),—অগ্নেরৃচো বায়োর্যজুংষি সামান্যাদিত্যাৎ। স এতাং ত্রয়ীং বিদ্যামভ্যতপৎ; মনুসংহিতা (১।২৩),—'অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্মসনাতনম্। দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্যজুঃসামলক্ষণম্'। অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন গ্রন্থেই অথর্ব্ব বেদের উল্লেখ দেখা যায়, যথা বৃহদারণ্যকে (৪।৪।১০):—'অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ;' মহাভারতে (আদিপর্ব্ব ১৬৮, ২৬৯ শ্লোক):—একতশ্চতুরো বেদান্ ভারতঞ্চৈতদেকতঃ। পুরা কিল সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সমেত্য তুলয়া ধৃতম্॥ চতুর্ভ্যঃ সরহস্যেভ্যো বেদেভ্যোঽধিকং যদা। তদা-প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ মহাভারতমুচ্যতে॥' অতএব ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ এই তিনটিই ত্রয়ী শব্দবাচ্য, এই মত কোনক্রমেই সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। উক্ত পণ্ডিতেরা মনে করেন যে ঋগ্বেদে কেবল ঋঙ্মন্ত্র, যজুর্বেদে কেবল যজুর্মন্ত্র ও সামবেদে কেবল

সমন্বয় আছে। এরূপ সংস্কার যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হইবে। সামবেদে সামমূলক ঋক্ ও যজুঃ সকলের ঋক্‌ত্ব ও যজুষ্ট্ব স্বীকার্য্য, এবং এরূপ স্বীকার করিলে তাহার সামবেদত্ব অব্যাহত থাকে। সেইরূপ ব্রহ্মন্ নামের নামে অথর্ব্ব বেদের নামকরণ হইলেও তাহাতে যে সকল ঋক্, যজুঃ ও সাম আছে, তাহাদের ঋক্‌ত্ব, যজুষ্ট্ব ও সামত্ব স্বীকার্য্য হইবে না কেন, এবং অথর্ব্ববেদ ত্রয়ীপদ বাচ্য হইবে না কেন? প্রাচীনতম গ্রন্থে অথর্ব্ব বেদের উল্লেখ নাই এ কথাটি কেবল একদেশদর্শিত্বের পরিচায়ক। ছান্দোগ্যে অথর্ব্ব বেদের উল্লেখ আছে যথা :—"ঋগ্বেদং সিষ্যোঽধীতে যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণঞ্চতুর্থম্ (৭।৭); মনুসংহিতাতেও অভিচারেষু ও কৃত্যাসু এই দুই শব্দের উল্লেখ থাকায় অথর্ব্ববেদ মনু কর্ত্তৃক স্বীকৃত ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। শতপথ ব্রাহ্মণে ও মহাভারতে যেরূপ চারিবেদের উল্লেখ আছে, সেইরূপ তিন বেদের একত্র শব্দেরও উল্লেখ আছে, যথা :—"ত্রয়ো বেদা অজায়ন্ত" শতপথ ব্রাহ্মণ (১১।৫।৮), "অগ্নিহোত্রং ত্রয়ী বিদ্যা" (মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১০০ অধ্যায়, ৬৫ শ্লোক), "ত্রিষু কর্ম্মে ত্রয়ীমূলে" (মহা: সভা: ৫অ: ৯৮ শ্লোক)। সুতরাং গ্রন্থের প্রাচীনত্ব ও অর্ব্বাচীনত্বের সহিত বেদের ত্রয়ীত্ব ও চতুষ্টয়ত্বের কোনও সম্বন্ধ নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আরও বলেন যে পাণিনি অথর্ব্ব বেদের উল্লেখ করেন নাই, সুতরাং উহা অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন। একথাও একদেশদর্শিত্বের পরিচায়ক মাত্র। অথর্ব্ববেদীয় শৌনক সংহিতাদির উল্লেখ পাণিনিতে আছে, যথা "শৌনকাদিভ্যশ্ছন্দসি" (৪।৩।১০৫)। চতুর্ব্যায়ী কৌশিক কল্পসূত্র অথর্ব্ববেদীয়; উক্ত কৌশিক সূত্রের উল্লেখ পাণিনিতে আছে, যথা—"কাশ্যপকৌশিকাভ্যামৃষিভ্যাং ণিনিঃ" (৪।৩।১০৩)। ছন্দোগদিগের ধর্ম্ম বা আম্নায় এই অর্থে পাণিনি যেরূপ ছান্দোগ্য পদ সিদ্ধ করিয়াছেন, সেইরূপ "আথর্ব্বণিকস্যৈকলোপশ্চ" (৪।৩।১৩৩) এই সূত্রদ্বারা আথর্ব্বণিকদিগের ধর্ম্ম বা আম্নায় এই অর্থে আথর্ব্বণ শব্দ সিদ্ধ করিয়াছেন। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে অথর্ব্ব বেদ পাণিনির বিদিত ছিল।

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বোক্ত চারি বেদ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুই ভাগে বিভক্ত। এই সংজ্ঞাপরিভাষা সূত্র :—"মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্ব্বেদনামধেয়ম্"। যাস্কের মতে যাহা দ্বারা অর্থ প্রকাশ করা যায় তাহা মন্ত্র, "মন্ত্রো মননাৎ" (৭।৩।৬)। বেদের মন্ত্রভাগের অপর নাম সংহিতা। বেদের যে ভাগে যজ্ঞের বিধি উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ কোন বিশেষ যজ্ঞে সংহিতাভাগের যে সকল মন্ত্র কিরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার নাম ব্রাহ্মণ; যথা "কর্ম্মচোদনা ব্রাহ্মণানি" (যজ্ঞপরিভাষাসূত্র, ৩৫ সূত্র)। বিধি বিধিবাক্য, অর্থবাদ, নিন্দাবাদ ও অজ্ঞাতজ্ঞাপক। যে সকল বিধি কর্ম্মকাণ্ডগত, তাহা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত, 'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্রে আসীৎ' ইত্যাদি ব্রহ্মকাণ্ড বাক্য দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

এইরূপ বাক্যকে অর্থবাদও বলা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থের অনেক স্থলে বিধি ও অর্থবাদ এক বাক্যে সন্নিবেশিত আছে, যথা "বায়ব্যাং শ্বেতমালভেত; বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" এই বাক্যের প্রথমাংশ বিধি ও দ্বিতীয়াংশ অর্থবাদ। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে ব্রাহ্মণ গ্রন্থের অনেক স্থলে মন্ত্রও আছে; ঐ সকল মন্ত্র সংহিতা ভাগে নাই। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বৈদিকমন্ত্রের বিধান কালে অনেক স্থলে নানা প্রকার গল্প দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ গল্প লিখিবার কারণ এই যে কেবল ক্রমাগত বিধি লিখিলে অত্যন্ত নীরস হইবে; গল্পচ্ছলে বিধান করিলে সহজেই স্মরণ থাকিবে। ঐ সকল গল্পের মধ্যে কতকগুলিতে নীতি, কতকগুলিতে চিকিৎসা, কতকগুলিতে বিজ্ঞান ও রীতি পাওয়া যায়।

বেদের মন্ত্র বা সংহিতা ভাগ দ্বিবিধ:—নির্ভুজ সংহিতা বা আর্ষীসংহিতা এবং প্রভৃগ্ন সংহিতা। নির্ভুজ সংহিতায় মন্ত্র সমূহের যথাযথ প্রসিদ্ধ পাঠ সকল থাকে, যথা ঋক্-সংহিতায় "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্" ইত্যাদি। প্রভৃগ্ন সংহিতা আবার দ্বিবিধ—পদসংহিতা ও ক্রমসংহিতা। "অগ্নিম্ ঈলে, পুরঃ হিতম্" এইরূপ পদবিশ্লেষ করিয়া পাঠ করিলে পদসংহিতা পাঠ হইল। "অগ্নিম্ ঈলে: ঈলে পুরোহিতম্; পুরো হিতমিতি পুরঃ হিতম্" এইরূপ পাঠকে ক্রমসংহিতা পাঠ বলে। এই ক্রমসংহিতা অবলম্বন করিয়া জটাদি অষ্টবিধ বিকৃতি উৎপন্ন হইয়াছে; যথা বিকৃতিবল্লী নামক বৈদিক গ্রন্থে (১।৫):—"জটা মালা শিখা লেখা ধ্বজো দণ্ডো রথো ঘনঃ। অষ্টৌ বিকৃতয়ঃ প্রোক্তাঃ ক্রমপূর্ব্বা মুনীষিভিঃ॥" অতএব প্রত্যেক মন্ত্রের একাদশ প্রকার সংহিতা পাঠ আছে। অতি প্রাচীনকালে মন্ত্র সকল গুরুপরম্পরায় শ্রুত হইয়া আসিত; পুঁথি লিখিবার প্রণালী প্রচলিত ছিল না। মন্ত্রগুলি যাহাতে অবিকৃত ভাবে পরিরক্ষিত হয়, উহাদের মধ্যে কেহ কোন শব্দ প্রক্ষেপ করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যেই জটাদি পাঠের সৃষ্টি হইয়াছিল।

বেদের শাখা। বৈদিক সংহিতা সকলের বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা অধ্যয়ন ও অধ্যাপন হওয়ায় উচ্চারণ ভেদ, পাঠভেদ ও পাঠের ন্যূনাতিরিক্ততা উৎপন্ন হইয়াছে; এবং আচার্য্যদিগের প্রকৃতি বৈষম্য ও স্ব স্ব দেশ ও কালাদির অনুরোধ হেতু বৈদিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ভেদ উৎপন্ন হইয়াছে। এই জন্য বেদের অনেক শাখা হইয়াছে। পাতঞ্জল মহাভাষ্যে পস্পশাহ্নিকে ঋগ্বেদের একবিংশতি শাখা, যজুর্ব্বেদের শতশত শাখা, সামবেদের সহস্র শাখা এবং অথর্ব্ব বেদের নব শাখা কথিত আছে। চরণব্যূহ নামক গ্রন্থে ঋগ্বেদের পঞ্চশাখা, যজুর্ব্বেদের ষড়শীতি শাখা, সামবেদের ষোড়শ শাখা, ও অথর্ব্ব বেদের নব শাখা কথিত আছে। উক্ত সমস্ত শাখা এক্ষণে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ ঋগ্বেদের শাকল ও শাঙ্খ্যায়ন এই দুইটি প্রধান শাখা। শাকল্য নামক আচার্য্যের পাঁচ শিষ্য ছিলেন; তাঁহাদের দ্বারা অধ্যাপিত হইয়া এই শাকল সংহিতা, শৈশিরীয়া, বাষ্কলী, সাঙ্খ্যা, বাৎস্যা ও আশ্বলায়নী এই পঞ্চ শাখা উৎপন্ন করিয়াছে। সেইরূপ শাঙ্খ্যায়ন শাখা হইতে ষোড়শ প্রকার শাখা

হইয়াছে। এইরূপ যজুর্বেদের প্রথমে চারিটি প্রধান শাখা ছিল, চরকাধ্বর্য্যু, [illegible], তৈত্তিরীয়। কালক্রমে একটি হইতে ঊনবিংশতি, দ্বিতীয় হইতে সপ্তদশ ও তৃতীয় হইতে ছয় শাখা হইয়াছে। বাজসনেয়ের দুই শাখা এক্ষণে প্রচলিত আছে, কাণ্বী, মাধ্যন্দিনী ও মাধ্যন্দিনী।

এক বেদের অনেক শাখা হইলেও, যেকোন একটি শাখা অধ্যয়ন করিলেই সেই বেদ অধ্যয়ন করা হয়, কারণ শাখা সকলের স্বরূপতঃ কোন বিভিন্নতা নাই। এই হেতু সায়ণ চারি বেদের এক একটি শাখারই ভাষ্য করিয়াছেন। যদি প্রত্যেক বেদের সমস্ত শাখা অধ্যয়ন স্বীকার্য্য হয়, তাহা হইলে "বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ" (২।১৬৫) এবং "ষট্‌ত্রিংশদাদিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্" (৩।১) এবং "বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্" (৩।২) ইত্যাদি মনুবচনের কোন সার্থকতা থাকে না। অতএব ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে বেদের শাখাভেদ মন্বাদি স্মৃতির অধ্যয়নের জন্য নহে; কিন্তু ভিন্নকালে ও ভিন্নদেশে লিখিত একই গ্রন্থের আদর্শ পুস্তক সমূহে যেরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়, বেদের শাখাভেদও অনেকটা সেইরূপ। কিন্তু বাজসনেয় ও তৈত্তিরীয় শাখার মধ্যে পরস্পর এত অধিক পার্থক্য দৃষ্ট হয়, যে উহাদিগের শুক্ল ও কৃষ্ণ নাম হইয়াছে। শুক্লযজুর্বেদাদি সংহিতা বাজসনেয় শাখাকে শুক্ল যজুঃ এবং ঔখ্যাদি ছয় তৈত্তিরীয় শাখাকে কৃষ্ণ যজুঃ বলে। শুক্ল যজুঃ ও কৃষ্ণ যজুঃর মধ্যে যেরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয়, অন্য কোন বেদের কোন দুইটি শাখার মধ্যে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। শুক্ল যজুঃর দুইটি মাত্র শাখা এক্ষণে পাওয়া যায়, কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন। কৃষ্ণ যজুরও দুইটি শাখা পাওয়া যায়। চরকাধ্বর্য্যুর কেবল কঠশাখার নামে এক শাখা পাওয়া যায়। সায়ণাচার্য্যের নিজের শাখা তৈত্তিরীয়। কাণ্বশাখা উড়িষ্যায় প্রচলিত আছে। সায়ণ এই কাণ্ব শাখারও ভাষ্য করিয়াছেন; কিন্তু উহা সমগ্র পাওয়া যায় না। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের নিকট কাণ্ব শাখার প্রথম বিংশতি অধ্যায়ের মাত্র ভাষ্য আছে।

সংহিতা সমূহের পৌর্ব্বাপর্য্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ঋগাদি সংহিতার পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ঋক্ সংহিতা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, কিন্তু তাহার দ্বিতীয় মণ্ডল অপেক্ষাকৃত নূতন এবং দশমমণ্ডল তাহার পরিশিষ্ট স্বরূপ। সামসংহিতার ঋক্ সকল ঋক্ সংহিতা হইতে উদ্ধৃত। শুক্ল যজুঃসংহিতা সামসংহিতা অপেক্ষা আধুনিক এবং অথর্ব্বসংহিতা সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক। এইমত আমাদের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অথর্বা ঋষি যজ্ঞাদির সৌকর্য্যার্থ ত্রিবিধ রচনাত্মক বৈদিক মন্ত্র সকল চারিভাগে বিভক্ত করেন; তাহারই যত্নে ঋগাদি চারি সংহিতা উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব তাহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য কিরূপে সম্ভবপর? আমরা একথা বলিতেছি না, যে সমস্ত বৈদিক মন্ত্র এক সময়ে উৎপন্ন হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন ঋষি হইতে ভিন্ন ভিন্ন

মন্ত্রসকল উৎপন্ন হইয়াছিল একথা অবশ্য স্বীকার্য্য; কিন্তু ঋগাদি সংহিতার প্রাচীনত্ব ও অর্বাচীনত্বের বিচার কোন ক্রমেই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। "ঋগ্-যজুঃ-সাম-লক্ষণম্" এই মনুবচনে ঋক্ শব্দের প্রথম প্রয়োগ দেখিয়া যদি পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ঋক্ সংহিতার সর্ব্ববেদ প্রাথম্য সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক।

সমাসবিশিষ্ট পদে অল্পস্বরবিশিষ্ট শব্দের পূর্ব্বনিপাত হয়; সেই জন্য ঋক্ শব্দের এই স্থলে পূর্ব্বনিপাত হইয়াছে। সায়ণাচার্য্য ঋগ্বেদভাষ্য ভূমিকাতে ঋগ্বেদের প্রাথম্য স্বীকার করিয়াছেন এরূপ বোধ হয় না। প্রত্যুত তিনি ঋগ্বেদ অপেক্ষা যজুর্ব্বেদেরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন; "তস্মাৎ কর্ম্মসু যজুর্ব্বেদস্য প্রাধান্যম্"। ঋক্ সংহিতাতে যজুঃ ও সামের এবং বিশেষ বিশেষ সামের নামের উল্লেখ আছে, যথাঃ—"গায়ৎসাম নভন্যম্" (১ম মণ্ডল), "যজুষা রক্ষমাণঃ" (৫ম মণ্ডল); "তমু সামানি যেমিরে" (৫ম মণ্ডল); "রথন্তরে সূর্য্যম্পর্যপশ্যৎ" (১ম মণ্ডল); প্রগায়ত্রেণ গায়ত (৯ম মণ্ডল)। যদি ঋক্ সংহিতা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হইত, এবং উহার প্রণয়নকালে যজুঃ ও সাম না থাকিত, তাহা হইলে উহাতে যজুঃ ও সামের উল্লেখ কিরূপে সম্ভবপর? ঋক্ সংহিতার দ্বিতীয় মণ্ডল যে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন, একথারও কোন প্রমাণ নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে দ্বিতীয় মণ্ডলে হোত্রাদি যাজ্ঞিক নাম দৃষ্ট হয়, সুতরাং উহা যজ্ঞকালে উৎপন্ন। একথা কেবল একদেশদর্শিত্বের পরিচায়ক; কারণ ঋগ্বেদের অন্যান্য মণ্ডলেও যাজ্ঞিক নামের উল্লেখ আছে, যথাঃ—প্রথম মণ্ডলে হোত্রম্, পোত্রম্, প্রশাস্তা, ব্রহ্মা; অষ্টম মণ্ডলে ঋত্বিয়ম্ ইত্যাদি। যে সকল মন্ত্রে হোত্রাদি শব্দের প্রয়োগ আছে, উহারা যজ্ঞকালে উৎপন্ন হইলেও, প্রথমাদি মণ্ডল অপেক্ষা দ্বিতীয় মণ্ডল যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক, একথা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। দশম মণ্ডল ঋগ্বেদের পরিশিষ্ট স্বরূপ এই কথার প্রমাণস্বরূপ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে উহার ভাষা অনেক স্থলে লৌকিক সংস্কৃতের ন্যায়, এবং উহার অন্তর্গত মন্ত্র সমূহে অনেক আধুনিক ভাব লক্ষিত হয়। আমরা কিন্তু এরূপ ভাষাগত ও অর্থগত পার্থক্যের উপলব্ধি করিতে অক্ষম। আর এক কথা এই যে প্রচলিত ঋক্ সংহিতাতে দ্বিবিধ বিভাগ দেখা যায়, মণ্ডল, অনুবাক ও সূক্ত দ্বারা বিভাগ, এবং অষ্টক, অধ্যায় ও বর্গদ্বারা বিভাগ। এই দ্বিবিধ বিভাগ যে দুইটি শাখাকৃত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অষ্টক, অধ্যায় ও বর্গদ্বারা বিভক্ত সংহিতাতেও কিঞ্চিৎ পাঠাধিক্যও আছে। সপ্তম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ের ঊনবিংশতিতম বর্গ হইতে দশম মণ্ডল আরম্ভ হইয়াছে। অতএব অষ্টক বিভাগে পৃথক্‌রূপে দশম মণ্ডলই নাই, সুতরাং দশম মণ্ডলের পরিশিষ্টত্ব কিরূপে সম্ভব?

সামবেদীয় ঋক্ সকল ঋক্ সংহিতা হইতে উদ্ধৃত এ কথারও কোন প্রমাণ নাই। "তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত" ইত্যাদি পুরুষ সূক্তান্তর্গত মন্ত্র দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে

যে সামবেদের ঋক্ গুলি পৃথক্ উৎপন্ন হইয়াছে, ঋগ্বেদ হইতে উদ্ধৃত হয় নাই। উক্ত মন্ত্র ছন্দাংসি শব্দের অর্থ সামবেদীয় ঋক্ সমূহ। যাহারা সামগান করেন তাহাদিগকে ছন্দোগ বলে, ঋগ্বেদ কখনও বলে না। সাম বেদে এখন অনেক গুলি ঋক্ আছে যাহা [illegible] যজ্ঞ কার্য্যের, পৌর্ব্বাপর্য্য যে সময়ে বিকীর্ণ ঋক্ সকল চয়ন করিয়া ঋগ্বেদীয় সূক্ত সকল সংগৃহীত হইয়াছে, সেই সময়েই সামবেদীয় ঋক্ সকল সংগৃহীত হইয়া বর্ত্তমান আকারে বিন্যস্ত হয়।

বিভিন্ন শাখার ব্রাহ্মণ।—ব্রাহ্মণগ্রন্থের লক্ষণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। [illegible] বেদের প্রত্যেক শাখার যে বিভিন্ন ব্রাহ্মণ আছে তাহা নহে; এবং সকল শাখার যে ব্রাহ্মণ তাহাও নহে। ঋগ্বেদের শাকল নামে প্রসিদ্ধ যে পাঁচটি শাখা আছে, তাহার ঐতরেয় ও বহ্বৃচ নামে প্রসিদ্ধ একই ব্রাহ্মণ গ্রন্থ। কৌষীতকী আদি অপর চারিটি শাখার ব্রাহ্মণ কৌষীতকি বা শাঙ্খায়ন নামে প্রসিদ্ধ। যজুর্ব্বেদের চরকাধ্বর্য্যু নামে উনবিংশ শাখার একটি ব্রাহ্মণ মৈত্রায়ণী বা অধ্বর্য্যু ব্রাহ্মণ নামে প্রসিদ্ধ। সপ্তদশ ব্রাহ্মসনেয় শাখার ব্রাহ্মণ বাজসনেয়ক বা শতপথ নামে প্রসিদ্ধ। তৈত্তিরীয় ছয় শাখার একই তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। সামবেদের যে তিনটি শাখা এক্ষণে প্রচলিত আছে, তাহাদের সকলেরই ছান্দোগ্য নামক একটি ব্রাহ্মণ ইদানীং প্রচলিত হইয়া থাকে। উক্ত ব্রাহ্মণের প্রথম পঞ্চবিংশ অধ্যায় প্রৌঢ় নামে প্রসিদ্ধ; তাহার পরবর্ত্তী পঞ্চাধ্যায়কে অদ্ভুত বা ষড়্বিংশ বলে; তাহার পর দুই অধ্যায়কে সংহিতোপনিষদ্ বলে; অবশিষ্ট অষ্টাধ্যায় ছান্দোগ্য উপনিষদ্ নামে প্রসিদ্ধ। সায়ণাচার্য্য সকল উহার সামবিধান, আর্ষেয়, দৈবত, সংহিতোপনিষৎ ও বংশ এই পাঁচ খানি গ্রন্থ প্রকৃত ব্রাহ্মণ নহে, এইজন্য ইহাদিগকে অনুব্রাহ্মণ বলে এবং এই জন্যই পাণিনি—"অনুব্রাহ্মণাদিনিঃ" (৪।২।৬২) সূত্রটি করিয়াছেন। অথর্ব্ববেদের কেবল গোপথ নামে একখানি ব্রাহ্মণ [illegible]

আরণ্যক।—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত আরণ্যক নামে বেদের আর একটি ভাগ আছে। এই ভাগ অরণ্যে অধীত হইত বলিয়া ইহার নাম আরণ্যক। যে সকল মন্ত্র যজ্ঞে ব্যবহৃত হয় না, কেবল পরমাত্মার উপাসনার প্রয়োজন হয়, তাহারাই আরণ্যক। আরণ্যকাংশ সংহিতা ভাগেও থাকিতে পারে এবং ব্রাহ্মণ ভাগেও থাকিতে পারে। আরণ্যকের বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে স্বতন্ত্র নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা বস্তুতঃ স্বতন্ত্র অংশ নহে। পাণিনির সময় আরণ্যক শব্দের পূর্ব্বোক্ত অর্থে ব্যবহার ছিল না; কিন্তু আরণ্যকান্তর্গত মন্ত্র সকল অবশ্যই ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বেদের উৎপত্তি নির্ণয়।—বৈদিক মন্ত্র সকলের উৎপত্তিকাল নির্ণয় করা অসম্ভব। মীমাংসকেরা বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়াছেন। মন্বাদি স্মৃতিতে "তাপ্তেঽনৃষ্টে স্বয়ম্ভুবা" "অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু" ইত্যাদি বচন দ্বারা বেদের অদ্ভুতকর্ত্তৃত্ব [illegible]

হইতেছে। ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, "সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণ ঋষয়ো বভূবুঃ, তেঽবরেভ্যোঽসাক্ষাৎকৃতধর্ম্মভ্যঃ উপদেশেন মন্ত্রান্তসম্প্রাদুঃ উপদেশেন গ্লায়ন্তোঽবরে বিল্মগ্রহণায়েমং গ্রন্থং সমাম্নাসিষুর্বেদং চ বেদাঙ্গানি চ (নিরুক্ত ১।৬।৫-)"। ইহা দ্বারা বেদের আম্নাতত্ব ও আর্ষত্ব সিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু আম্নাত শব্দের অর্থ কৃত নহে; উহার অর্থ অভ্যস্ত। যাহা পূর্ব্ব হইতে আছে, তাহারই অভ্যাস হইতে পারে; এইজন্য অমুক ঋক্ বা অমুক যজুঃ বা অমুক সাম অমুক ঋষি কর্ত্তৃক আম্নাত বা দৃষ্ট বলা যায়, 'কৃত' বলা যায় না। বস্তুতঃ বৈদিক গ্রন্থ সকল তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, দৃষ্ট, প্রোক্ত এবং কৃত। যাহার রচয়িতা এবং উৎপত্তি কাল দুয়ের কিছুই নির্ণয় করা যায় না, তাহাকে দৃষ্ট বলে, বৈদিকমন্ত্র সকল সমস্তই দৃষ্ট। যাহার রচয়িতা নির্ণয় করা যায় কিন্তু উৎপত্তিকাল নির্ণয় করা যায় না, তাহাকে প্রোক্ত বলে; ঋগাদি সংহিতাগুলি সমস্তই প্রোক্ত। যাহার রচয়িতা ও উৎপত্তিকাল উভয়ই নির্ণয় করা যায়, তাহাকে কৃত বলে; পাণিনির সময় হইতে কৃতগ্রন্থের আরম্ভ হইয়াছে। মন্ত্ররচনা বহুযুগ পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে, সুতরাং কোন বিশেষ মন্ত্রের রচয়িতা বা কাল নির্ণয় কিরূপে সম্ভব? যদি কেহ বলেন যে ব্যক্তি নির্ণয় হইলেই কাল নির্ণয় হইতে পারে, ইহার উত্তরে আমরা বলি যে বৈদিক মন্ত্র সম্বন্ধে ব্যক্তিনির্ণয়ও অসম্ভব। অমুক ঋষি অমুক মন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন এরূপ কুত্রাপি লিখিত নাই। যদি দৃষ্ট শব্দ কৃতবাচক বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও ব্যক্তি নির্ণয় সহজ নহে; কারণ ঋষিদিগের নাম অনেক স্থলে কল্পিতমাত্র, যথা অগ্নি, বায়ু, প্রজাপতি ইত্যাদি এরূপ নাম হইতে ব্যক্তি নির্ণয় সম্ভবপর নহে। যদি কোন মন্ত্রে বসিষ্ঠ বা ভৃগু নামের উল্লেখ থাকে, তাহা হইলে এই বসিষ্ঠ বা ভৃগু কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহা কিরূপে নির্ণীত হইবে? অতি প্রাচীন নিরুক্তকার যাস্ক ঋগ্বেদের কেবল পাঁচ শাখার উল্লেখ করিয়াছেন; তাঁহার পূর্ব্বে ঋগ্বেদের অন্যান্য অনেক শাখা বিলুপ্ত হইয়াছিল। মন্ত্রকালের কীদৃশ প্রাচীনত্ব তাহা এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থসকলেরও কাল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করা বৃথা। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে মন্ত্র ভাগের পরে ব্রাহ্মণ ভাগ উৎপন্ন হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৮।৪।৭) এক বচন আছে "এতেন হ বা ঐন্দ্রেণ মহাভিষেকেণ তুরঃ কাবষেয়ো জনমেজয়ং পারিক্ষিতমভিষিষেচ" এবং তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে আছে "জনমেজয়শ্চার্জুনো গ্রাবঃ" (২৫।১৫) এই প্রকার বচন দ্বারা যদি কেহ এরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে অর্জ্জুন প্রপৌত্র জনমেজয়ের বহুদিন পরে, যুধিষ্ঠিরের রাজ্য কাল হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যূন দ্বিতীয় শতাব্দীতে, উক্ত ব্রাহ্মণ গ্রন্থদ্বয় প্রণীত হইয়াছিল, তাহা হইলে সে সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। কারণ উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ পাণিনির সমকালিক হইয়া পড়ে; কিন্তু পাণিনি ব্রাহ্মণ গ্রন্থের প্রোক্তত্ব স্বীকার করিয়াছেন; সমকালিক গ্রন্থের প্রোক্তত্ব স্বীকার

কিরূপে সম্ভব? বস্তুতঃ অতি প্রাচীন কালে পরীক্ষিৎ ও জনমেজয় নামে কোন ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই নামানুসারে অভিমন্যু পুত্রের নাম পরীক্ষিৎ ও তাঁহার পুত্রের নাম জনমেজয় রাখা হইয়াছিল। সেইরূপ বেদে ভোজ নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা ঋক্‌সংহিতা (৮।৬।৪৫) "ভোজস্যেদং পুষ্করিণীব বেশ্ম"; ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে "তোজাঃ ভোজপিতরম্"। এই ভোজ যে আধুনিক ভোজবংশ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এ বিষয়ে কি কোন সন্দেহ হইতে পারে? এইরূপ শতপথব্রাহ্মণপ্রবক্তা যাজ্ঞবল্ক্য ও বার্ত্তিককার কাত্যায়ন কিম্বা পাণিনির সমকালিক নহেন, প্রত্যুত তাঁহাদের বহু পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সেইরূপ তৈত্তিরীয় প্রথমারণ্যকের "সংহিতাযাং ব্যাসো নারায়ণঃ" (১।১।২) এই বচনোক্ত ব্যাস যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক ব্যাস হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ব্যাস এই নামটি বংশের নাম, পূর্ব্বকালে আর্য্যেরা বংশের নাম ব্যাস করিতেন। এইরূপ সামবেদীয় বংশ ব্রাহ্মণে অনেক গোভিলের উল্লেখ আছে। কৌথুম শাখাবলম্বীদিগের যে গৃহ্য সূত্র গোভিলপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, উহা বংশস্থ যে বহু গোভিলের মধ্যে কোন্ গোভিল প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা কিরূপে নির্ণীত হইবে? অতএব নাম দেখিয়া কাল নির্ণয় করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব।

অথর্ব্বসংহিতার "ঊনবিংশকাণ্ডীয় সপ্তম সূক্তে কৃত্তিকা নক্ষত্রের উল্লেখ আছে। কোন কোন কালনির্ণেতা ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে যৎকালে অথর্ব বেদ রচিত হইয়াছিল তখন কৃত্তিকা রাশিচক্রের প্রথম নক্ষত্র ছিল, এবং তাহা হইলেই জ্যোতিষের গণনায় এ গ্রন্থ সার্দ্ধ তিন সহস্র বা সার্দ্ধ চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে অথর্ব্ব বেদ রচিত হইয়াছিল। এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত বলা যাইতে পারে না, কারণ অয়ন গতির নিয়মানুসারে আর পঞ্চবিংশ সহস্র বৎসর অন্তর কৃত্তিকা রাশিচক্রের প্রথম নক্ষত্র হইবে। অথর্ব বেদ রচিত হইবার পর এইরূপ যে কতবার হইয়া গিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে অথর্ব বেদের রচনা কাল সার্দ্ধ তিন বা চারি সহস্র বৎসরের কম নহে, তাহা অপেক্ষা যে কত অধিক, তাহার কোন নির্ণয় নাই। অথর্বসংহিতাতে এইরূপ আর একটি বচন আছে, "ভানুরাশ্লেষা অয়নং মঘাসু"। ইহা হইতে যদি সিদ্ধান্ত করা যায় যে অথর্ব বেদ প্রণয়ন কালে অশ্লেষার শেষে বা মঘার প্রথমে অয়নারম্ভ হইয়াছিল, তবে তাহাতেও অথর্ব বেদ প্রণয়নের প্রকৃত কাল নির্ণীত হইতে পারে না।

বৈদিক মন্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়।—প্রত্যেক বৈদিক মন্ত্র সম্বন্ধে চারিটি বিষয় জানিবার আছে, যথা, ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা ও ব্রাহ্মণ বা বিনিয়োগ। অমুক মন্ত্রের অমুক ঋষি বলিলে কি বুঝায়, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পাদ ও অক্ষর সংখ্যানুসারে ছন্দ নির্ণীত হইয়া থাকে। যে মন্ত্রে যাহার স্তুতি বা বর্ণন করা যায় অথবা যাহার নিকট যে মন্ত্রে প্রার্থনা বোধিত হয়, সেই মন্ত্রের উহাই দেবতা। যে মন্ত্র যে কার্য্যে প্রযুক্ত হয়,

উহার বিনিয়োগ। মন্ত্র ব্রাহ্মণের অন্তর্গত মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ গোভিল গৃহ্য সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বৈদিক মন্ত্রের অর্থ।—অধিকাংশ বৈদিক মন্ত্রেরই তিন প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে:—আধ্যাত্মিক অর্থাৎ ঈশ্বরসম্বন্ধীয় অর্থ; অধিদৈবিক অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় অর্থ; এবং অধিযজ্ঞীয় অর্থাৎ যজ্ঞসম্বন্ধীয় অর্থ। সায়ণাচার্য্য এ কথা স্বীকার করিয়াছেন, এবং দুই এক স্থলে মন্ত্রের ত্রিবিধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে কেবল অধিযজ্ঞীয় ব্যাখ্যা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। যে সকল বৈদিকাচার্য্য উদাত্তাদি স্বর সংযোগে ঋক্ ও যজুর আবৃত্তি এবং সামগান শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রায়ই বৈদিক ব্যাকরণ ও নিরুক্তাদি এবং মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিতে পারেন না। যাঁহারা ব্যাকরণাদি ও মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দেন, তাঁহারা আবৃত্তি ও গান শিক্ষা দিতে পারেন না।

শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবি লালা জয়নারায়ণ।

যাঁহারা মনে করেন শত বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ব বঙ্গে কোন যশস্বী কবি জন্ম গ্রহণ করেন নাই, শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন বিরচিত "বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য" নামক উপাদেয় গ্রন্থখানা পাঠ করিলে তাঁহাদের সেই ভ্রম অনেক তিরোহিত হইতে পারিবে। এমন কি দেখা যায় কুল শ্রীগ্রামনিবাসী বিপ্রদাস গুপ্তের পূর্ব্বে অন্ন সংখ্যক বঙ্গীয় কবি যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন। বিজয় গুপ্ত প্রণীত মনসামঙ্গল গ্রন্থ ১৪০০ শকে বিরচিত হয়। সেই হিসাবে সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ব বঙ্গে কবিত্বের সূচনা দেখা যায়। তৎপূর্ব্বে যে এইরূপ আরও দুই-চারিটী কবি জন্ম গ্রহণ না করিয়াছিলেন এমন বোধ হয় না। তবে তাঁহাদের নাম আজি পর্য্যন্তও কেহ ততটা পরিজ্ঞাত নহেন।

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জপসানিবাসী লালা কবি মহোদয়গণের নাম ও জীবন-বৃত্তান্ত অনেকটা পরিজ্ঞাত আছেন। সম্প্রতি জয়দেবপুর সাহিত্য সমালোচনী সভা হইতে "মাধাতিমিরচন্দ্রিকা" নামক আধ্যাত্মিকভাবপরিপূর্ণ এক খানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উহা আজিও সাধারণের নেত্রবর্ত্তী না হইয়া সভার পুস্তকাগারে নিদ্রিতাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় ও তদীয় সুযোগ্য মন্ত্রী কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর মনোযোগ করিলে এই গ্রন্থ অচিরে প্রকাশিত হইয়া সর্ব্ব সাধারণের গোচর হইতে পারে।

আমরা এস্থলে যে মহোদয়ের নাম লইয়া এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম, মাধাতিমির-চন্দ্রিকা গ্রন্থপ্রণেতা লালা রামগতি রায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। কবি জয়নারায়ণ

সংস্কৃত ও পারস্য ভাষাতে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, শারদার বিপুল অনুগ্রহে কবিতা বিরচনে ও সমস্যা পূরণে তিনি বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

হরিলীলা ও চণ্ডিকামঙ্গল নামক দুইখানা কাব্যগ্রন্থ তৎকর্ত্তৃক বিরচিত হয়। হরিলীলা প্রচলিত সত্যনারায়ণের পাচালির বিষয় লইয়া লিখিত। কিন্তু তাহা মূল পাচালির ন্যায় ক্ষুদ্র না করিয়া একখানা বৃহৎ কাব্যাকারে সুগঠিত হয়। চণ্ডিকামঙ্গল কবিকঙ্কণের চণ্ডী কাব্যের অনুসরণে বিরচিত। কিন্তু তাহাতে মাধব আলোচনার উপাখ্যানটী পরিত্যক্ত হয় হইয়াছে।

মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, বিজয় গুপ্ত প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী কবিরা প্রত্যাদেশের বশবর্ত্তী হইয়া কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথার্থই এইরূপ অনুস্তের বশবর্ত্তী হইয়া কবি কাব্য রচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কি ঐ কথাটা তৎ সময়ের কৈফিয়তের কার্য্য ছিল, তাহা আলোচনা করিবার আর প্রয়োজন নাই। কিন্তু কালকেতু ব্যাধ ও ধনপতি সদাগর প্রভৃতির মূল বিবরণ কোন গ্রন্থে আছে কি না পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। আমাদের কবি জয়নারায়ণ কিন্তু এতদ্বিষয়ের এই উপায় অবলম্বন করিয়া প্রত্যাদেশের স্থানে "পুরাণের" দোহাই দিয়াছেন।

মাননীয় ৺রামগতি ন্যায়রত্নমহাশয় "বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" গ্রন্থে, কবিকঙ্কণকৃত চণ্ডীর সমালোচনা স্থলে বলিয়াছেন "এই গ্রন্থস্থ কালকেতুর ব্যাধ ধনপতি সদাগর প্রভৃতির উপাখ্যান কবির স্বকপোলকল্পিত কি ইহার কোনরূপ পৌরাণিক মূল আছে, তাহা বিবৃত করিতে পারা যায় না। আমরা শুনিয়াছিলাম পদ্মপুরাণে কালকেতু প্রভৃতির উপাখ্যান এবং কালিকা পুরাণে শ্রীপতি সদাগরের উপাখ্যান বর্ণিত আছে, কিন্তু আমরা এই দুই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম, কোথাও তাহা দেখিতে পাইলাম না।" আমরা কিন্তু চণ্ডী কাব্যের মূল সূত্র কি তাহা জয়নারায়ণের কাব্যে স্পষ্ট উল্লিখিত দেখিতেছি। চণ্ডিকামঙ্গল গ্রন্থ হইতে সেই অংশটুকু নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

যেরূপে প্রকাশ হৈল চণ্ডীর এ কথা।
পূর্ব্বাচার্য্য প্রসঙ্গ যে মত আছে গাঁথা॥
সেই অনুসারে শুন নূতন রচন।
গাহিছে যে মত কথা পুরাণ বচন॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের উত্তর খণ্ডেতে।
লিখা মহামায়া প্রতি বিষ্ণুর স্তবেতে॥
অবতীর্ণ হৈয়া ভূমি যশোদার গর্ভে।
কংস ছলি বিন্ধ্যবাসী হবে নিজ গর্ব্বে॥

এইরূপ স্তবে আছে বিস্তর কথন।
তাতে এক শ্লোক এই রূপেতে লিখন ॥
ভারতভূমেতে চণ্ডী-লীলা প্রকাশিয়া।
কালকেতু উদ্ধারিবে গোধিকা হইয়া ॥
মঙ্গলচণ্ডিকা নাম করিয়া প্রকাশ।
সম্বরণে করিবর করিবেন গ্রাস ॥
বণিক সুতকে ফেলি ঘোর সঙ্কটেতে।
উদ্ধার করিবে নৃপ শালবান হাতে ॥

বলা বাহুল্য বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণোক্ত শ্লোকগুলি মূল চণ্ডীকাব্যের ভিত্তি। যে শ্লোকের তাহাতে উল্লেখ আছে, জয়নারায়ণ তাহাও গ্রন্থমধ্যে উদ্ধৃত করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। বঙ্গবাসী পত্রিকার আপিস হইতে যে বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ মুদ্রিত হইয়াছে, উহার উত্তরখণ্ডের ষোড়শ অধ্যায়ে (২১০ পৃষ্ঠায়) এই শ্লোকটী আমরা পাইয়াছি যথা—

ত্বং কালকেতুবরদা ছলগোধিকাসি
যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা।
শ্রীশালবাহননৃপাদ্ বণিজঃ সসুনোঃ
রঙ্গে হ্যমুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী ॥

জয়নারায়ণ স্বয়ং কোন গ্রন্থ না দেখিয়া বা পাঠ না করিয়া কিছু লিখিতে প্রয়াস পান নাই। তাঁহার বহুশাস্ত্রদর্শিতার পরিচয় নানা পদাবলিতে বিশেষতঃ দেব দেবীর বন্দনায় স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। এস্থলে সংক্ষেপে তাহার একটুকু পরিচয় প্রদান করা হইল। যথা—

"পার্ব্বতীর কোলে হর্ষে বসি বাল্যকালে।
শুণ্ডে শিবশির হতে আনি গঙ্গাজলে ॥
ধৌত করি মাতৃস্তন দুগ্ধ পান কৈলা।
ষড়ানন মুখের উচ্ছিষ্ট না খাইলা ॥"
"পক্কবিম্ব ওষ্ঠাধর, ভুজ চারি মনোহর
সুললিত মৃণাল বলনি।
তরুণ পল্লববর, সুললিত শোভাকর
ঢড় ঢড় চুয়ায় লাবনি ॥
দ্বিকর বীণাতে রত, সপ্ত তন্ত্রে পরিমিত
ধ্বনি পরিবাদিনী ললিত।

নানা সুমিলের তানে, মধুর মধুর গানে
স্বীয় ভাবে আপনি মোহিত ॥
শ্বেত পদ্ম সূত্র আর, দ্বিকরেতে শোভে মার
গলে শোভে গজমতি হার।
কুচভারে কটি নত, মেখলাতে সুরঞ্জিত
বিনিন্দিত সেখরি মাঝার ॥
কৃষ্ণ, নীল, রক্ত, গৌর অশেষ বরণে।
চতুর্ভুজা দ্বিভুজাদি কতেক কারণে ॥
একবক্ত্রা দ্বিবক্ত্রা ত্রিবক্ত্রা ত্রিনয়নে।
অসংখ্য স্বরূপে হর গৌরীর বিধানে ॥
নানা কারণেতে নানারূপপ্রকাশিনী।
শিবকৃষ্ণ-ক্রোড়া মাতা গণেশজননী ॥

কবি প্রথমতঃ হরি-লীলা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তৎপশ্চাৎ চণ্ডিকামঙ্গল গ্রন্থ বিরচিত হয়। হরিলীলা রচনায় শাকের স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। যথা—

অত্রি পুত্র স্মর নেত্র ষড়াননানন।
বসুমতী শাকে পুথি হল সমাপন ॥
নারায়ণ প্রভুপদে করি দৃঢ় মন।
ষোড়শ চৌরাশী শাকে পুস্তক লিখন ॥

অতএব জানা গেল ১৬৯৪ শাকে হরিলীলা বিরচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে কবি স্বীয় মাতার নামও উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

সুমতিসুতের বাক্য, শুন হে পুণ্ডরীকাক্ষ
লক্ষ্য নাই ভূমি পরে ভবে ॥

পিতার পরিচয় তদগ্রজ রামগতি রায় কৃত মাসাতিমির চন্দ্রিকাগ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

ব্রহ্মপুত্র-মহাতীর্থ পূর্ব্বেতে প্রচার।
পশ্চিমেতে পদ্মাবতী বিদিত সংসার ॥
মধ্যেতে বিক্রমপুর রাজ্য মনোহর।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাহে সদ্‌জ্ঞানী বিস্তর ॥

বিশিষ্ট অম্বষ্ঠ শ্রেণীর বসতির স্থান।
জপসা নামেতে গ্রাম তথায় প্রধান॥
শ্রীরামপ্রসাদ রায় বিখ্যাত তাহাতে।
বৈদ্যশ্রেষ্ঠ লালা খ্যাতি যাঁর নিজামতে॥
জপসা উত্তম গ্রাম বসতি আলয়।
রামগতি নামে তাঁর প্রধান তনয়॥

জয়নারায়ণ আপনার ও ভ্রাতৃগণের বিরচিত গ্রন্থাবলীর পরিচয় মাধবসুলোচনার উপাখ্যানে ছদ্মবেশী সুলোচনার মুখ হইতে সুন্দর কৌশলে বাহির করিয়াছেন। নায়িকা হিরণ্যাক্ষের বিদ্যাধরকে রমণীর প্রেম হইতে বিমুক্ত করিবার ব্যপদেশে উপদেশ ছলে বলা হইয়াছে, যথা—

বিধিমত করয়ে যে একাদশী ব্রত।
নারায়ণে ডাকি শুন হরিলীলামৃত॥
নারায়ণ অগ্রজের নূতন রচন।
মন দিয়া তাহা যে যে করহ শ্রবণ॥
লিখিয়াছে পুথি ভবকলহ-ভঞ্জিকা।
বোধ হেতু শুন মায়াতিমির-চন্দ্রিকা॥
অনুজ তাহার দিব্য সুকাব্য রচিছে।
পার্ব্বতীর পরিণয় নাম রাখিয়াছে॥
মহাভক্তিসার গ্রন্থ করেছে রচনা।
সে রহস্য শুনিলে ভুলিবে সুলোচনা॥

রামগতি জয়নারায়ণের অগ্রজ এবং রাজনারায়ণ তাঁহার অনুজ ছিলেন। তাঁহারা কে কি গ্রন্থ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় এস্থলে পাওয়া গেল। এতদ্ভিন্ন রামগতিসংগৃহীত "যোগ-কল্পলতিকা" ও রাজনারায়ণ কৃত "কালীকল্পলতিকা" নামে আরও দুইখানা সংস্কৃত গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বোধ হয় চণ্ডিকামঙ্গল গ্রন্থ বিরচনের পর এই গ্রন্থদ্বয় বিরচিত হওয়ায় তন্মধ্যে উহাদের নামের উল্লেখ হয় নাই। কবির কনিষ্ঠ অপর ভ্রাতা কীর্ত্তিনারায়ণ কৃত একখানা সংক্ষিপ্ত সত্য নারায়ণের পুঁথির কথা শুনা যায়। হরিলীলা পাঠ করিয়া সত্যনারায়ণের "সিন্নি" পূজা ইত্যাদি হইতে প্রায় বিরাম অতিবাহিত হইয়া যাইত, এইজন্য বোধ হয় কীর্ত্তিনারায়ণ উহা সংক্ষেপ করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুঁথির ভণিতায় এইরূপ ছিল, যথা—

কবি নারায়ণের অনুজ নারায়ণ।
সংক্ষেপ রচিল পুথি ক্রিয়ার কারণ॥

কবি তৎকৃত চণ্ডিকামঙ্গলের একস্থলে লিখিয়াছেন—

গৌড় রাজ্য পূর্ব্ব ভাগে বিক্রমপুরেতে।
রচিলাম এই গ্রন্থ ধর্ম্ম-প্রসঙ্গেতে॥
গঙ্গা দয়াময়ী অনুরোধে এতদূর।
শুনিলে কলুষ খণ্ডে এ কথা মধুর॥

গঙ্গামণি কবির ভাগিনেয়ী, দয়াময়ী তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে মাধবমনোচেতনাখ্য উপাখ্যানটী ক্রিয়াযোগসার গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়া চণ্ডিকামঙ্গল গ্রন্থে সংযোজিত করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় গঙ্গাদেবীর প্রকৃত পরিচয় না পাইয়া লিখিয়াছেন "বিক্রমপুর অঞ্চলে গঙ্গানাম্নী এক রমণী কবি এক শতাব্দী পূর্ব্বে অনেক গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি এখনও এ দেশে বিবাহোপলক্ষে গীত হইয়া থাকে"। আমরা ১৩০৬ সনের বৈশাখ মাসের "নির্ম্মাল্য" পত্রিকায় আনন্দময়ী ও গঙ্গামণি সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে গঙ্গাদেবীর প্রকৃত পরিচয় ও তৎকৃত একটী গানের নমুনা প্রদান করা হইয়াছে। গঙ্গা ও আনন্দময়ী উভয়ে বিদুষী ললনা বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। দীনেশবাবু আনন্দময়ী সম্বন্ধে বিস্তর লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে একস্থলে "আনন্দময়ী গুপ্তার যেরূপ রচনার পারিপাট্যের উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহাকে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী শিক্ষিতা মহিলাগণের অন্ততঃ সমকক্ষ গণ্য করিতে হইবেক।" আমি ১৩০৪সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতী পত্রিকাতে আনন্দময়ী সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে তাঁহার একটি সুন্দর কবিতা ও জীবনচরিত বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করা। নির্ম্মাল্য পত্রিকাতে তদ্ বিরচিত একটী গান প্রকাশ করি। সভ্য মহোদয়গণ এই উভয় পত্রিকা পাঠ করিলেই এই বিদুষী ললনাদ্বয়ের সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারিবেন। কবি জয়নারায়ণ তৎকৃত হরি-লীলা গ্রন্থে আনন্দময়ী রচিত দুইটী কবিতা সন্নিবেশিত করিয়া তাঁহার গুণের পরিচয় অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। কবি আপন গুণবতী ভ্রাতুষ্পুত্রীর কথা বিস্মৃত হন নাই। চণ্ডিকামঙ্গলের অন্তস্থলে খুল্লনার মাতার মুখ হইতে আশীর্ব্বাদ বাণী ছলে বাহির করিয়াছেন। যথা—

সুরধুনী সুনন্দার তীরেতে রহিয়া।
তারা দক্ষিণার পদ বিস্তর সেবিয়া॥
ভাগ্যে এ আনন্দময়ী উদরেতে ধরি।
এস প্রাণ সুধামুখী আঁখি ভরে হেরি॥

এই আনন্দময়ী শব্দটী বস্তুতঃ আপন ভ্রাতুষ্পুত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। এইরূপ পরিবারস্থ সজ্জন সুধীগণের নাম ও তাঁহাদের গুণের পরিচয় তৎকৃত গ্রন্থের স্থানে স্থানে দেখা যায়।

যে মহান্ বংশে বহু সুধী পণ্ডিতের জন্ম হওয়ায় বঙ্গভূমির গৌরব যথেষ্ট সংবর্দ্ধিত হইয়াছে, যে বিনায়ক বংশে মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক, চক্রদত্তের টীকাকার শিবদাস সেন, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বংশের পরিচয় জানিতে অনেকেরই আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে। ১৩০৬ সালের তৃতীয়সংখ্যক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন শীর্ষক প্রবন্ধে তাহা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা গিয়াছে। অতএব উহার বিস্তৃত আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। আমাদের লালা পরিবারও বিনায়ক কুলোৎপন্ন। অতএব সংক্ষেপে তাঁহাদের বংশ পরিচয় এস্থলে প্রকাশ করা গেল।

রাজা শ্রীহর্ষ সেনের পুত্র বিমল সেন, তৎপুত্র ধন্বন্তরি সেন, তৎপুত্র গণ্ডাগী সেন, তৎপুত্র হিঙ্গু সেন, বাটী বৈদ্যগণের মধ্যে এই মহাত্মা সর্ব্বপ্রথম বঙ্গে আগমন করিয়া সেনহাটীতে বাস করিতে থাকেন। যথা—

যস্মাৎ মধ্যে হিঙ্গুসেনঃ কৌলীন্যে খ্যাতিমীয়িবান্।
বাটীং ত্যক্ত্বা সেনহট্টনগরীমধ্যুবাস সঃ॥

কবিকণ্ঠহারকৃত কুলপঞ্জিকা।

তাঁহার যথাক্রমে দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে; তন্মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠদ্বয় অবাধে কাশীবাসে গতিত হয়; অবশিষ্ট উচনী, ডমন, বিকর্ত্তন, বলভদ্র বংশপ্রবর্ত্তক বলিয়া পরিগণিত হন। বলভদ্র সেনের পুত্র অনিরুদ্ধ সেন সেনহাটি পরিত্যাগ করিয়া ইটনা গ্রামে বাস করিতে থাকেন। অনিরুদ্ধের পুত্র অর্জ্জুন, তৎপুত্র বাচস্পতি, তৎপুত্র হৃষীকেশ সেন, তৎপুত্র যশশ্চন্দ্র সেন, তৎপুত্র গোবিন্দ সেন। এই মহাত্মার নাম পর্য্যন্ত কবিকণ্ঠহারকৃত কুলপঞ্জিকায় দেখা যায় যথা—

যশশ্চন্দ্রাচ্চ গোবিন্দঃ সেনঃ শ্রীপতিজাসুতঃ।

এই গোবিন্দ সেনের পুত্র বেদগর্ভ সেন ইটনা পরিত্যাগ করিয়া বিক্রমপুর দাখনীগা গ্রামে বাস স্থাপন করেন। বেদগর্ভের প্রথম পুত্র নীলকণ্ঠের বংশে জপসার লালা ও দ্বিতীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণের বংশে রাজনগরের রাজবংশের উদ্ভব হয়।

এ পর্য্যন্ত আমরা কেবল কবির জীবনঘটিত কথা লইয়াই সময় ক্ষেপণ করিলাম, কিন্তু তৎকৃত কবিতার রসাস্বাদন করাইয়া শ্রোতৃগণকে উহার গুণাগুণ নির্ব্বাচনের সময় দেওয়া হয় নাই; এজন্য চণ্ডিকামঙ্গল ও হরিলীলা গ্রন্থ হইতে কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া তাহার নমুনা দেওয়া গেল।

কবিকঙ্কণ কৃত চণ্ডীকাব্য সহিত জয়নারায়ণের চণ্ডীর তুলনা করা আমাদের সাধ্য নয়। তবে এইমাত্র বুঝিতে পারি বৃদ্ধ কবি যেমন স্বপ্রণীত কাব্যে নানা রসের অবতারণা করিয়া শ্রোতৃবর্গের আনন্দবর্দ্ধন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; জয়নারায়ণ ততটা সমর্থ হন নাই। কবি হরিলীলা প্রণয়ন কালে নানা রসের সমাবেশ করিয়া যেমন ভারতচন্দ্রের

সমকক্ষতা লাভের অভিলাষী হইয়াছিলেন; আবার চণ্ডীকাব্য রচনাকালে সেই পথ পরিত্যাগ করিতে যথেষ্ট সময় পাইয়াছিলেন। কিন্তু সেই পথ একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই।

ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

নাভি কূপে যেতে কাম কুচশম্ভু বলে।
ধরিল কুণ্ডল তার রোমাবলী ছলে॥

অমনি জয়নারায়ণ লিখিলেন—

নাভিকূপে ছিলরে নবীন ভুজঙ্গিনী।
ঊর্দ্ধে উঠেছিল হতে পবনভোজিনী॥
খগপতি চঞ্চু সম দেখি তার নাসা।
কনকগিরির মাঝে করিলেক বাসা॥

পাঠক মহোদয়গণ ভারতচন্দ্রের কামভস্মবর্ণনার সহিত এই কবির বর্ণনা একত্র সমালোচনা করুন।

একবার নাহি পারে, পুনশ্চ সন্ধান করে
স্মর নিজ শরে চুম্ব দিয়া।
জোখায়ে রতির বুকে, ধনুকে পুনশ্চ তাকে
যুড়িলেক সাবধান হৈয়া॥
নিরখে শঙ্কর পানে, করিয়া জন লোকনে
দেখে যেন রজত অচল।
তেজ শত সূর্য্য প্রায়, শত চন্দ্র সম তায়
রত্নবেদি পরে ঝলমল॥
নিমুদ্রিত ত্রিলোচন, ব্রহ্মেতে অর্পিত মন
স্পন্দহীন সকল শরীর।
নিশ্চল বায়ু পরে যেন, শুভ্র জলধর তেন
জলশূন্য না পড়িছে নীর॥
জটাতে মণ্ডিত শির, ভালে আধ শশধর
বিভূতি রঞ্জিত সর্ব্ব গায়।
গলে নাগ রাজ মালে, কালকূট কণ্ঠে জ্বলে
নিত্যানন্দ ঢড় ঢড় কায়॥

দেখি হেন ত্রিপুরারি, মার বলে মরি মরি
ব্যস্তভাবে দুই হস্ত কাঁপিল।
হাত হতে ছুটি শর, মহাদেব হৃদিপর
স্পর্শমাত্র ভাঙ্গিয়া পড়িল॥
ছিল মন ব্রহ্মযোগে, সে সনে মদন যাগে
প্রভু মনে বিচার করিল।
কেন হেন হল মন, অকস্মাৎ কি কারণ
পাষাণেতে কর্দ্দম হইল॥
সকলি জানিল ধ্যানে, আপনি আপন জ্ঞানে
দেবচক্রে যা কৈল মদন।
অন্তরে জন্মিল রোষ, জানিয়া মদনদোষ
মেলিলেক ললাট লোচন॥
কামাগ্নি রিদ্যুত হৈল, হুঙ্কারে পবন বৈল
পৈল ধেয়ে মদনের অঙ্গে।
পরশে পুড়িল তেন, অগ্নিতে আহুতি যেন
দাবানলে যেমন পতঙ্গে॥
দহনে পতঙ্গ হৈল, হুতাশনে হবি পাইল
হল বাদ দীপে ঝঞ্ঝাবাতে।
গরুড় অহিতে রণ, সিংহ মৃগে হনাহন
মুষিক যুঝিল করিসাতে॥
নিরখিয়া দেবগণ, ঘন ডাকে ত্রিলোচন
রক্ষ রক্ষ দয়াল দীনেশ।
যাবৎ এ দেববাণী, শিব কর্ণে হয় ধ্বনি
তাবৎ মদন ভস্মশেষ॥

বাবু দীনেশচন্দ্র সেন তৎকৃত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, জয়নারায়ণের রতি-বিলাপটি ভারতচন্দ্রের রতি-বিলাপ হইতে সুন্দর, আমরা উহার কতকাংশ এইস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।—

বলে ওহে দেবরাজ, কৈলে কি দারুণ কাজ
সভে মিলি কি কাম সাধিলে।

ঘর হতে ডাক দিয়া, প্রকারে পতি পুড়িয়া
ছাই দিলে রতির কপালে ॥
ও বসন্ত কুলনাশা, কোকিল কুরব ভাষা
সর্ব্বনাশা সমীরণ ওরে।
সকলে সহায় হলি, শিব রণে নিয়া এলি
কেবল আমারে নজাবারে ॥
অন্য নায়িকার ঘরে, নিশিতে বঞ্চিয়া ভোরে
মোর কাছে এসেছিলা তুমি।
খণ্ডিতা অধীর হৈয়া, মন রাগে নাহি লইয়া,
মন্দ কাজ করেছিনু আমি ॥
বকুলের মালা দিয়া, গলাতে বন্ধন কইরা
কর্ণ উতপলে বেঁধেছিলে।
সেই অভিমান মনে, করিয়া আমার সনে
রস রঙ্গ সকলি ত্যজিলে ॥
আর দুঃখ মনে রইলে, একদিন নৃত্যকালে
পদের নূপুর খসেছিল।
ত্বরা তুমি দিলে পায়, বিলম্ব হইল তায়
দিতে দিতে তাল ভঙ্গ হইল ॥
তাতে আমি মান করি, নৃত্য গীত পরিহরি
বসিয়া রহিনু মৌনী হইয়া।
যত সাধ্য কৈলে তুমি, পুন না নাচিনু আমি
তাতে আছ বিরলে শুইয়া ॥

কবির রোমন্থ ও প্রাঞ্জল রচনার আর একটি অংশ চন্দ্রিকালা গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রস্তাব শেষ করিব।

পাখীগণ ইতি উতি নিজ বাসা ছাড়ে।
বিরলে ডাকিছে কাক ভূমে পাছি পড়ে ॥
চন্দ্রভান করযুগ ধরি সুনেত্রার।
যাই বলি বিদায় মাগিছে বার বার ॥

উষাকালে যাত্রা করি যায় চন্দ্রভান।
সজল নয়নে ধনী পাছেতে পয়ান॥
যতদূর আখি চলে রহে দাড়াইয়া।
সুধাকর যায় ইন্দীবর ভাড়াইয়া॥
নিশি ভরি কুমুদিনী কৌতুকী আছিল।
রবি আলাপনে মুখ মলিন হইল॥

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

ভাষাতত্ত্ব।

মন্তব্য— এই প্রবন্ধের লেখক ইংরাজী ভাষার অধ্যাপনাকার্য্যে দশবৎসর যাবৎ নিযুক্ত। সুতরাং তাঁহার প্রবন্ধ ইংরাজী ঘাঁচে ঢালা। ইহা পরিহার করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। বাঙ্গালা ভাষায় অনুচ্ছেদ-পারম্পর্য্য সম্বন্ধে যে নীরবতাই হইয়া বাঙ্গলিবিবা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, সেই গুলির দিকেই দৃষ্টি করিবেন।—লেখক

বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদিগের মধ্যে প্রায়ই শুনা যায় যে ইংরাজী ভাষা বাঙ্গালা ভাষা হইতে এতই বিভিন্ন প্রকৃতির যে পরস্পরের মধ্যে কোনও নিয়মের ঐক্য নাই। এই বৈষম্যই ভিন্নজাতীয় শিক্ষার্থীর ইংরাজী ভাষা শিক্ষা বিষয়ে প্রধান অন্তরায়। প্রকৃতপক্ষে উভয় ভাষার ভিতর অনেক প্রভেদ।

(১) বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়াই এই বৈষম্য ভাষার সকল অঙ্গেই দেখা যায়। ইংরাজী f, s, v, z এই চারিটী অক্ষরের অনুরূপ কোনও অক্ষর বাঙ্গালী বর্ণমালায় নাই। সংস্কৃত ভাষায় দন্ত্য 'স' এর উচ্চারণ ঠিক s এর অনুরূপ বটে; কিন্তু বাঙ্গালা দেশে দন্ত্য 'স' এর ঐ উচ্চারণ প্রচলিত নাই, কেবল 'ত' 'স্ত' প্রভৃতি যুক্তাক্ষর বর্ণে অবিকল সংস্কৃত উচ্চারণ শুনা যায়। v ও 'ভ'য়ে এক উচ্চারণ নহে, তাহা বোধহয় কাহাকেও বুঝাইতে হইবেনা। zএর অনুরূপ বর্ণ আরবী ও পার্সীতে আছে, কিন্তু বাঙ্গালায় নাই। (২) ইংরাজীতে পদ-বিন্যাস প্রণালী বাঙ্গালা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বাঙ্গালায় কর্ম্ম ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসে, ইংরাজীতে পরে বসে; বাঙ্গালায় *preposition* বিশেষ্য পদের পরে যায়, ইংরাজীতে পূর্ব্বে যায়; ইংরাজী I have, I had. I met him, প্রভৃতি পদের বাঙ্গালায় অনুরূপ অনুবাদ হয় না। (৩) এতদ্ভিন্ন ভাষার আচার (*idiom*) গত বৈষম্য আরও অধিক। বাঙ্গালায় বলিবে 'সুতা ছেঁড়া', ইংরাজীতে বলিবে 'breaking a thread;' বাঙ্গালা 'হাওয়া খাওয়া' 'ঔষধ খাওয়া' ইত্যাদির ইংরাজীতে অনুরূপ অনুবাদ চলিবে না।

বিভিন্ন জাতির ভাষায় এরূপ বৈষম্য থাকা কোনও প্রকারেই বিস্ময়জনক নহে। কিন্তু জাতি ও ভাষা বিভিন্ন হইলেও মানবজাতির দাঁড়াইবার একটা সাধারণ ভূমি আছে।

সকল ভাষাতেই বহুকগুলির এই জাতিসিদ্ধ নিয়মে প্রথমে [illegible] ভাষার প্রকাশের ভাষাও একই নিয়মে গঠিত হইয়াছে। ভাষা গঠনের এই [illegible] গুলি প্রণিধান করিয়া দেখিলে বিভিন্ন জাতীয় ভাষার মধ্যে সৌসাদৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত বিস্মিত হইতে হয়। আমরা নিম্নে এই সৌসাদৃশ্যের কতকগুলি উদাহরণ দিব।

(১) উচ্চারণ-গত সৌসাদৃশ্য। বাঙ্গালায় school, steel, scheme শব্দ উচ্চারণ করিতে ইস্কুল, ইষ্টিল, ইস্কিম প্রভৃতি হইয়া পড়ে। ইহা বিদেশীর নিকট বিকৃত উচ্চারণ বলিয়াই বিবেচিত হয়। অবশ্য এ শব্দগুলি ইংরাজী মিশ্রিত উচ্চারণ করিবে, এরূপ শিক্ষিত লোকে বলিয়াও থাকেন। কিন্তু সেরূপ বলিতে আমরা [illegible] যাওয়ায়, সব জাতির মধ্যেই শব্দের প্রথমে স্ক, স্প প্রভৃতি সংযুক্ত বর্ণ লাগিলে উচ্চারণ কষ্ট হয়। এই কষ্ট নিবারণ উদ্দেশ্যেই ইংরাজী ভাষায় কতকগুলি *doublets* দেখা যায়, যথা —special, especial ; scape, escape ; spy, espy ; ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ মাত্রেই জানেন যে পূর্ব্বোক্ত কারণেই এই বিকল্পিত পদগুলির সৃষ্টি হইয়াছে।

(২) কতক বৎসর পূর্ব্বে সাধনা পত্রিকায় দেখিয়াছিলাম 'হিম ঋতু' [illegible] কবিতাংশের সমালোচনায় সমালোচক বলিয়াছিলেন যে ইহা ইংরাজী ভাব ও ভাষার [illegible] অনুবাদ, এদেশের ভাষায় উহা চলিতে পারেনা। তাহার কারণও অতি সহজবোধ্য ; [illegible] প্রধান দেশে উষ্ণ বস্তু মাত্রই মনোহর। ইংরেজের দেশে warm welcome, [illegible] reception বলিলে যে ভাব আসিবে, বাঙ্গালা দেশে তাহা হইতে পারেনা। ইহা [illegible] উল্লিখিত সমালোচনা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু একটী স্থলে বিপর্য্যয় দেখা যায়। 'হিম ঋতু' থাকা একটী চলিত কথা ; ইংরাজী cold বলিলে ইংরেজের মনে যে ভাবের উদয় হয়, চলিত কথায় ত সেই ভাব রহিয়াছে। ইহা বিস্ময়জনক নহে কি ?

(৩) সকল ভাষাতেই শব্দের অর্থের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইহা ভাষামধ্যে সাধারণ ধর্ম্ম প্রাচীন কবিগণ যে অর্থে যে শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, আধুনিক ভাষায় তাহার সে অর্থ [illegible] এরূপ উদাহরণ বিরল নহে। এ বিষয়ে ইংরাজী ও বাঙ্গালায় একই ভাবে অর্থের [illegible] হইয়াছে, ইহাতে একটু কৌতুক আছে। (ক) ইংরাজী force এবং power শক্তি বুঝায়, Elizabethan English এবং পরবর্ত্তী কবিগণের কাব্যে 'সৈন্য' বুঝায়, বাঙ্গালায় 'বল' ঠিক এই দুই অর্থে ব্যবহার দেখা যায়। (খ) ইংরাজীতে metal ও mettle আদৌ এক শব্দ ; পরে metal ধাতু ও mettle প্রকৃতি অর্থে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় ধাতু বলিলে metal বুঝি। 'নবম ধাতের' 'চড়া ধাতের' বিরক্ত হাতে [illegible] ইত্যাদি লৌকিক বাক্যে ধাত (ধাতুর অপভ্রংশ) ঠিক mettle অর্থে ব্যবহৃত হয়। (গ) ইংরাজী error অর্থে ভুল ; Elizabethan English এ error শব্দ [illegible] কোন

* সংস্কৃত হিম শব্দে বরফ বুঝায়। শৈত্য ভিন্ন হিমের আর একটি গুণ কাঠিন্য বা rigidity। উদাহরণে rigid, stiff এই ভাব আসিতেছে না কি ?—পঃ সঃ।

স্থলে 'বোবা' অর্থে পাওয়া যায়; লাটিন হইতে উৎপন্ন knight-errant শব্দে ভ্রমণশীল বুঝায়। বাঙ্গালায় (সংস্কৃতে) ভ্রম, ভ্রান্তি এবং ভ্রমণ একই ধাতুর বিভিন্ন অর্থ। (ঘ) ইংরাজী lust শব্দ প্রথমে ইচ্ছা অর্থে (যথা—lust of gold) ব্যবহৃত ছিল, পরে ইহার কদর্থ ঘটিয়াছে। বাঙ্গালায় (সংস্কৃতে) অর্থকাম, স্ত্রীকাম, পুত্রকাম, কামনা ইত্যাদি স্থলে কাম শব্দের ইচ্ছা অর্থ. কাম শব্দের অপর অর্থ সকলেরই বিদিত আছে।

(৫) উভয় ভাষার সৌসাদৃশ্য প্রবাদ বাক্যে অধিকতর দেখা যাইবে। কেননা এ সকল স্থলে সকল জাতির জ্ঞানিজন একই ভাবের জ্ঞান একরূপ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। To rob Peter, to pay Paul গরু মেরে জুতো দান, The wearer best knows where the shoe pinches দেদোর মর্ম্ম দেদোয় জানে; mare's nest পেত্নীর ডিম; ইত্যাদি স্থলে একই শিক্ষা, যদিও দৃষ্টান্তে বিভিন্নতা আছে। একটী স্থলে দৃষ্টান্তও উভয়ত্রই এক; যথা,—'The cat would eat fish and would not wet her feet' ধরি মাছ না ছুঁই পানি। ঠিক এই প্রবাদ বাক্য লাটিন ও ফরাসী ভাষায়ও প্রচলিত আছে।

(৬) ইংরাজীতে কতকগুলি *phrase* এবং প্রবাদ বাক্য আছে, তাহাদের চমৎকারিত্বের একটী নিদান, অনুপ্রাস। যথা—fret and fury, storm and stress, stock and stone, might and main; fat, fair and forty; plundering and blundering (রাজনীতি); where there is a *will*, there is a *way* ইত্যাদি। কুতূহলী পাঠক মহাশয় Rowe-Webb এর Hints নামক গ্রন্থ দেখিলে অনেক উদাহরণ পাইবেন। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। নিম্নে একটী তালিকা দেওয়া হইল।

ইংরাজী penny-wise, pound-foolish প্রবাদ বাক্যের অনুবাদ হইয়াছে 'অড়ার কড়া কাহনে কানা'। এটী কবির লেখনীপ্রসূত, সুতরাং আসল অপেক্ষা নকল অধিকতর মনোহর হইয়াছে। আসলে উভয় বাক্যাংশে অনুপ্রাস (p, p) ছিল, এবং penny ও pound এর মধ্যে অসঙ্গতি বা বিরোধ ছিল; নকলে তদপেক্ষাও শ্রুতি সুখদ হইয়াছে। কিন্তু এটী নকল। 'দেশের জন্য ও দশের জন্য' একটী বাক্য আজ কাল দেখা যায়, কিন্তু ইহাও হাতগড়া। নিম্নের উদাহরণগুলি নৈসর্গিক নিয়মে স্বতঃই ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

(ক) প্রবাদ বাক্য যথা—

রাস ভঙ্গি কি বহিম ভঙ্গি।	যে নি কুকুর তেম্‌নি মুগুর।
রাগে মারলেও মারবে, রাবণে	যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল।
মারলেও মারবে।	কাবের মধ্যে দুই, পাই আর শুই।
হাকিম ফেরে ত হুকুম ফেরে না।	উড়ে এসে, জুড়ে বসা।
বুড়াবয়সে চূড়াকরণ।	তিলকে তাল করা (make a Mountain
পেটে খেলে পিঠে সয়।	of a *mole*-hill)
পেঁয়াজও গেল, পয়জারও গেল।	ভয়ও নাই, ভরসাও নাই।

পিড়েয় (রাওয়ায়) বসে, পেঁড়ের খবর　　মুখের চেয়ে সোয়াস্তি (স্বস্তি) ভাল ;
দেওয়া।　　লাগে তীর না লাগে তুক্কো

সাধুভাষা (সংস্কৃত)।

জিয়া কাণ্ড।	শিশিরে সমুদ্রা
দোল দুর্গোৎসব।	জীবন যৌবন।
দেব দ্বিজ।	গয় গঙ্গা।
ঘট পট।	নিদ্রা তন্দ্রা।
ডিম্ব ডবিম্ব।	শান্তি স্বস্ত্যয়ন।
দয়া মায়া।	ধ্যান ধারণা।
দয়া দাক্ষিণ্য।	দীন হীন।
মান মর্য্যাদা।	দীন দুঃখী।
মান অপমান।	যত্র জীব তত্র শিব।
সু গুরু।	কৃষ্ণ বিষ্ণু।
ছায়া ও কায়া (কায)।	সভা সমিতি।
সত্য মিথ্যা।	আশা ভরসা।
গদ্য পদ্য।	জ্ঞান গোচর।
বাগ্বিতণ্ডা।	শ্রাদ্ধ শান্তি।

গ্রাম্য ভাষা।

(১)

ধুম ধামাক্কা	কাপড় চোপড়
ঘুম ধারাক্কা	বিষয় আশয়
ছেলে পিলে	চেয়ে চিন্তে
কাটকি লাটকি	যের ফাঁপর
বো সো	তরী তরকারি
ঘোড়া তাড়া	লোহা লক্কড়
আলে পালে	লোক লস্কর
পাকে প্রকারে	কাই ফরমাশ
মিলে জুলে	গণ্ড গোল
নিকাশ প্রকাশ	(গোবর গণেশ)
হিসেব কিতেব	(গো বে গোবিন্দ)
অসুখ বিসুখ	

(২)

কাজ কর্ম্ম	মাথা মুণ্ড
করা কম্মা	আপদ বিপদ

ভয় ভীত
ভুল ভ্রান্তি
চালাক চতুর
মিলে মিশে
জীব জন্তু
মাল মসলা
বাছ বিচার
বাছ গোঁছ
আচার বিচার
ঘোর ঘের
তত্ত্ব তল্লাস
দলীল দস্তাবেজ
জোর জবরদস্তি
ছেলে ছোকরা
দাঙ্গা হাঙ্গামা
মামলা মোকদ্দমা
হাঙ্গামা হুজ্জুত
খোঁজ খবর
বর্ষা বাদল
জ্ঞাত গোষ্ঠী
চোর ছেঁচড়
মুটে মজুর
পাড়া পড়সী

পীর প্যাগম্বর
ফুটো ফাটা
ফুটো চটা
কুটো কাটা
ধর পাকড়
ভাই ভারাদ
চিঠি চপাটি
তাড়া হুড়ো
মাঝে নিশেলে
হাসি খুসি
পাস পার্ব্বণ
পূজা পার্ব্বণ
ধরম করম
ঐর জারি
জ্বর জ্বালা
জ্বালা যন্ত্রণা
ভয় ভাবনা
দায় দৈব
খুন খারাপী
মায়া ধরা
সাড়া শব্দ
ছোট খাট
রাজা রুজি (উজীব)

(৩)

দোল দুর্গোৎসব
অতিথ অভ্যাগত
ব্রাহ্মণ বষ্টম
তিলী মালী
তিলী তামুলী
মুচি মুসলমান
মুচি মুদ্দফরাস
জেলে মালা

মাঝি মাল্লা
ধোপা নাপিত
ছুলি মালী
নাম ধাম
কড়া ক্রান্তি
পশু পাখী
গেঁড়ি শুগলি
কচু ঘেঁচু

দাতা পাতা
শাক সবজি
ক্ষীর সর
শাক শুক্তনি
পায়েস পিঠে
পাঙ্গা গঙ্গা
লুচি কচুরি
দুধ দই
মণ্ডা মেঠাই
ঝাল ঝোল
ফুল ফল
জাতি যুথী
মশা-মাছি
মেষ মহিষ
কচু কুমড়ো
কাণা কুব্জো
নাকে মুখে
চোকে মুখে
নাক কাণ
কাঁদা কাদা
কাকে কোকিলে
মাছ মাংস
মদ মাস
দাদা সিধে
গণা গাঁথা
নাড়ি ভুঁড়ি
বিড়ে বাড়ুন
চুনা চন্দন

ছাতা ছড়ি
জুতো ছাতা
কাপড় চাদর
গড়া চূড়া
সোণার সোহাগা
শাঁখা সাড়ি
শাঁখা সিন্দুর
ঢাক ঢোল
গাড়ু গামছা
হুকো কলকে
ঘটি বাটী
ঘাট মাঠ
ভিটে মাটি
চড় চাপড়
ঘর বর
হেলে দুলে
দশ বিশ
হনু ভানু
বাম শ্যাম
বাদু মাধু
ভাই ভগ্নী
পিতা মাতা
মা মাসী
মাসী পিসী
মায়ে ছাযে
মায়ে পোয়ে
বাপে বেটায়

(৫)

মেয়ে মরদ
মাগী মিন্‌সে
সদর অন্দর

ঘরে বাইরে
নরম গরম
উত্তম মধ্যম

হুখে সুখে	ঠাকুর কুকুর
মিছে সাঁচ	কালা ধলা
আগা গোঁড়া	রাজা প্রজা
তেঁতুল তলে	রাজা রায়ত
সাঁঝ সকাল	বিল খাল
সকাল বিকাল	ডেঙ্গা ডহর

পুনশ্চ—

কবির কাব্যে অনেক সুন্দর অনুপ্রাস দেখা যায়। কিন্তু সেগুলি কাব্য হিসাবে সুন্দর, ভাষাতত্ত্বে তাহাদিগের কোনও মূল্য নাই। কেন না সেগুলি কবির হাত পড়া, ভাষার স্বভাব গুণে স্বতঃ উদ্ভূত হয় নাই। এই কারণে বিশুদ্ধ সংস্কৃতমূলক শব্দগুলিরও তত আদর নাই। গ্রাম্য ভাষায় যে সকল শব্দ আপনা হইতে চলিয়া আসিতেছে, সেইগুলিই নিশেষরূপে কৌতুকাবহ ও শিক্ষাপ্রদ।

যদ্ ও তদ্ শব্দের নিষ্পন্ন পদগুলির মধ্যে এই অনুপ্রাসগত মিল আছে. সংস্কৃত ও বাঙ্গালা এই উভয় ভাষাতেই তাহা দেখা যায়; ইংরাজিতেও then—when, thence—whence, ইত্যাদিতেও ঐ মিল রহিয়াছে। এগুলির স্বতন্ত্র উদাহরণ দেওয়া গেল না

অপর কতকগুলি শব্দ আছে, সেগুলি প্রকৃত পক্ষে স্বতন্ত্র শব্দ নহে। শব্দের বীপ্সা করিয়া অপভ্রংশে তাহাদের সৃষ্টি। ভাত টাত, জল টল, ইহার উদাহরণ। এই জাতীয় শব্দের একটী তালিকা এবং তাহাদের গঠন প্রণালী সম্বন্ধে একটী চিন্তাশীল প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় পূর্ব্ব এক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

[লেখক মহোদয়ের প্রদত্ত শব্দযুগ্মের তালিকাটি আমরা চারি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া প্রকাশ করিলাম। এইরূপ বিভাগে বিভিন্নশ্রেণীর অন্তর্গত শব্দের সম্বন্ধ-নির্ণয়ে কতকটা সুবিধা হইতে পারে। লেখক মহাশয় কেবল মাত্র উচ্চারণগত অনুপ্রাস অবলম্বন করিয়া শব্দযুগ্মগুলির নির্ব্বাচন করিয়াছেন। রবীন্দ্র বাবুর প্রসঙ্গে "জল টল" "ঘর টর" "ছাতা টাতা" প্রভৃতি যে সকল শব্দযুগ্মের উল্লেখ আছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক সেগুলিকে এই তালিকায় স্থান দেন নাই। কিন্তু দেখিতে গেলে ঐ শ্রেণীর শব্দযুগ্মের সহিত এই শ্রেণীর শব্দযুগ্মের মৌলিক প্রভেদ বড় একটা নাই। 'জল টল' অর্থে জল এবং তৎসদৃশ অন্য পদার্থ; 'ছাতা টাতা' এখানে 'টাতা' অর্থে ছাতা জাতীয় অন্য পদার্থ; সেইরূপ বর্ত্তমান তালিকান্তর্গত 'ছেলে পিলে' অর্থ ছেলে ও তৎশ্রেণীস্থ মনুষ্য, 'কাপড় চোপড়' এখানে 'চোপড়' অর্থে কাপড় জাতীয় পদার্থ: এইরূপ অনির্দ্দিষ্ট সজাতিক বা সশ্রেণীক পদার্থের উল্লেখের জন্য সাধারণ নিয়ম আদ্য অক্ষরে 'ট' বসান। ছেলে পিলে, কাপড় চোপড় প্রভৃতি স্থলে সেই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম

হইয়া কেবল 'ট' বদলে অন্য একটা বর্ণ বসিয়াছে মাত্র। 'জল টল' এর 'টল', 'ছাতা টাতার 'টাতা' যেমন অভিধানে স্বতন্ত্র শব্দ বলিয়া স্থান পায় না, সেইরূপ 'পিলে' 'চোপড়' শব্দের অভিধানে স্বতন্ত্র স্থান নাই। ছেলে ও কাপড়ের পার্শ্বে বসিয়া উহাদের বা কিছু অর্থবাহি। 'আশে পাশে' 'পাকে প্রকারে' 'নিকাশ প্রকাশ' প্রভৃতি প্রত্যেক স্থলে প্রত্যেক যুগ্মের দ্বিতীয় শব্দটির ('পাশে' 'প্রকারে' 'প্রকাশ') অভিধানে স্থান আছে বটে, কিন্তু এটাও যেন আবশ্যিক ভাবে ঘটিয়া লিখিয়াছে। উহাদের পাতির কেবল অনুপ্রাসের অনুরোধে, তাহাদের স্বতন্ত্র অর্থ থাকার জন্য নহে। তালিকার মধ্যে প্রথম হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই অনুপ্রাসের অনুরোধ বলবান্। দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত প্রত্যেক যুগ্মকের অন্তর্গত দুইটি শব্দই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিশিষ্ট আভিধানিক শব্দ, কিন্তু যুগ্মক মধ্যে তাহাদের স্থান মুখ্যতঃ অনুপ্রাসের, গৌণতঃ অর্থগত সম্বন্ধের অনুরোধে। এই অর্থগত সম্বন্ধ ক্রমশঃ কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সহজেই বুঝা যাইবে।

প্রথম শ্রেণী—

কাপড় চোপড়=কাপড় ও তজ্জাতীয় অন্য পদার্থ।

হিসেব কিতেব=হিসাব ও তৎসদৃশ অন্য ব্যাপার।

লোহা লক্কড়=লোহা ও অন্যান্য লোহানির্ম্মিত পদার্থ।

দ্বিতীয় শ্রেণী—

'কাজ কর্ম্ম' 'মাথা মুণ্ড' 'ছেলে ছোকরা' 'পূজা পার্ব্বণ' 'ছোট খাট' 'ভাই ভারাদ' এই সকল স্থলে উভয় শব্দই তুল্যার্থক বা প্রায় তুল্যার্থক। কাজেই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে কোন প্রভেদ নাই। কেবল প্রথম শ্রেণীর 'চোপড়' ও 'কিতেব' আভিধানিক শব্দ নহে; দ্বিতীয় শ্রেণীর 'কর্ম্ম' 'মুণ্ড' প্রভৃতি স্বাধীন আভিধানিক শব্দ।

তৃতীয় শ্রেণী—

'শ্রাদ্ধ শান্তি' 'মশা মাছি' 'ফুল বল' 'ফুলি মালী' প্রভৃতি স্থলে উভয় শব্দ সমান জাতি সম শ্রেণী, সহ-অবস্থান, একত্র অবস্থিতি প্রভৃতি বিবিধ সম্পর্ক সূচনা করিতেছে। এই একত্র অবস্থিতি বা এক কার্য্যে বিনিয়োগ প্রভৃতি association এর সম্পর্ক ক্রমশঃ বিরোধ বা contrast এর সম্পর্কে পরিণত হইয়াছে। 'ভাই ভগ্নী' 'মায়ে পোয়ে' 'ঘাট মাঠ' প্রভৃতি স্থলে এই বিরোধের ভাবটাই যেন প্রবল।

চতুর্থ শ্রেণী—'ঘরে বাহিরে' 'সদর অন্দর' 'তেলে জলে' 'রাজা প্রজা' প্রভৃতি স্থলে এই বিরোধ বা contrast এর সম্পর্কটাই প্রবল দাড়াইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে যে তুল্যার্থকতা অথবা স্বজাতীয়ত্ব সম্বন্ধ প্রবল ছিল, এক্ষণে তাহা বিপরীতার্থকতার ও বিরোধী ভাবের ব্যাপক সম্পর্কে দাঁড়াইয়াছে।

পত্রিকা-সম্পাদক।

ভৌগোলিক পরিভাষা।

যে ভৌগোলিক পরিভাষা প্রণয়ন করিতে সাহিত্য পরিষৎ সন ১৩০৩সালে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ১৩০৬ সালের শেষভাগে তাহার সংস্কার হইয়াছে। অবশ্য ইহাও শেষ সংস্কার নহে। সেই পরিভাষার কতকগুলি দোষ দেখাইয়াছিলাম। সুখের বিষয় নূতন পরিভাষায় সে দোষগুলির পরিহার হইয়াছে। ভৌগোলিক পরিভাষা ছিল না বা এক্ষণে চলিত নাই, এমন নহে। অনেক দিন হইতে বঙ্গবিদ্যালয়ে ভূগোল পঠিত হইতেছে। ভাল হউক, মন্দ হউক, সেই পরিভাষা একেবারে বর্জনীয় নহে। কোন্ শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার দোষ কি, অগ্রে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া পরে নূতন নির্ব্বাচিত শব্দ যোগ করিলে বিচারের পক্ষে সুবিধা হইত।

এবারে শব্দগুলির এক একটা স্থূল শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে, এবং কোন্ শব্দ সংস্কৃত এবং কোন্ শব্দ দেশজ হইবে, তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্থল বিশেষে দেশজ শব্দ গ্রহণ করায় কেবল শব্দ সঙ্কলনে সুবিধা, তাহা নহে; শব্দ প্রয়োগ কালেও সুবিধা। কিন্তু এরূপ শব্দ গ্রহণ করিবার সময় দেশের প্রচলিত শব্দ অন্বেষণ করা আবশ্যক। সেমোয়াবাসি, চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোকেরা নদী নালা সম্বন্ধীয় অনেক শব্দ নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকে। সেইরূপ, যাহারা পাহাড়ে দেশে বাস করে, তাহারা পাহাড় পর্ব্বত সম্বন্ধীয় বহু শব্দ অবগত আছে। ভারতের নানা স্থানে পরিষদের সভ্য আছেন। তাঁহারা উদ্যোগী হইলে পরিভাষা-সমিতির কার্য্য লাঘব হইবে, এবং পরিভাষাও অনেকটা ব্যবহারযোগ্য হইয়া চলিত হইতে পারিবে।

আর একটি কথা আছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষায় ভাল ভাল পরিভাষা হইয়াছে। যাহাতে পারিভাষিক শব্দ সর্ব্বত্র কতকটা এক হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। হিন্দি, বাঙ্গালা, ওড়িয়া ও আসামী ভাষার মধ্যে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। সংস্কৃতমূলক শব্দের ত কথাই নাই, অনেক প্রাকৃত বা দেশজ শব্দও ভাঙ্গিয়া চুরিয়া প্রায় একরূপ দাঁড়াইয়াছে। এই সকল ভাষার শব্দের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে পরিভাষা সঙ্কলনে যেমন সুবিধা, তেমনই অন্ততঃ পারিভাষিক শব্দের ঐক্য স্থাপন দ্বারা দেশের উপকার হইবে। দুই একটি দৃষ্টান্ত পরে দেওয়া যাইতেছে।

নির্ব্বাচিত কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে আমার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছি। সমুদয় শব্দ বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম না। বিচারের সুবিধার নিমিত্ত এক এক বিদ্যার শব্দসমূহ একত্র আলোচনা করিলাম।

Meteorology = ভূতত্ত্ববিদ্যা, air = বায়ু, wind = বাতাস, breeze = হাওয়া, ইত্যাদি। আমরা বাতাস ও হাওয়ার মধ্যে কি প্রভেদ করি? এখানে একটুও বাতাস নাই = এখানে একটুও হাওয়া নাই। আবার, climate অর্থে জল বায়ুও বলি, আর হাওয়াও বলি। যদি breeze = হাওয়া, তবে sea-breeze = সমুদ্র সমীর কেন হইল? "কটকে সমুদ্রসমীর

"[illegible] যায়," বলিলে পাণ্ডিত্য প্রকাশ হইতে পারে। কিন্তু সেখানকার [illegible] বাতাস সহজে বুঝিবে! যদি বাতাস শব্দটা একান্ত বর্জ্জনীয় হয়, তবে সমুদ্রবায়ু বলিতে পারি। বস্তুতঃ উড়িয়া চলিত ভাষার পবন শব্দটি আমাদের বাতাসের স্থান অধিকার করে। এতদ্ব্যতীত storm অর্থে উড়িয়া চলিত শব্দ 'ঝ'; 'ঝা' বাতাসের সংক্ষেপ। Typhoon [illegible] ঝড়ে ভাঙ্গিয়া 'তুফান' বলা ঠিক নহে। বাঙ্গালায় তুফান শব্দ চলিত আছে, cyclone অর্থে তুফান শব্দ ব্যবহৃত হয়। টংবাজী শব্দ ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালা করিবার সময় এরূপ [illegible] করা আবশ্যক। Typhoonকে টাইফুন বা তাইফুন লিখিয়া হিন্দী উচ্চারণ প্রকাশ করা যায়। তৈফুন করিলেও চলে।

Whirl-wind=ঘূর্ণী। কিসের ঘূর্ণী? 'জলের ঘূর্ণী' বিলক্ষণ চলিত আছে। এজন্য whirl wind='ঘূর্ণী বাতাস' বলা আবশ্যক এবং এই শব্দই চলিত। 'ভ্রমি' বা 'ভ্রমী' মতে ও এই কথা। বাঙ্গালায় বায়ু, বাতাস, ঝড়—এই তিনটি শব্দ দ্বারা air, wind, breeze, gale, storm, cyclone প্রভৃতি সমুদয় বুঝিয়া থাকি। অবশ্য ভাষা অসম্পূর্ণ। সংস্কৃত ঝঞ্ঝা, বাতচক্র, এই দুই শব্দ চলিত। ঝঞ্ঝা অর্থে storm বুঝি, বাতচক্রের অধিকন্তু হইতেছে cyclone। কিন্তু আধুনিক কালে চক্র শব্দটিতে আপত্তি আছে। তদ্ভিন্ন, বাতাবর্ত্ত শব্দটি প্রায় চলিত হইয়াছে। সংবাদপত্রের সম্পাদকেরাও যখন বাতাবর্ত্ত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন উহার চলন হইবার সম্ভাবনা আছে। Whirl-wind=ঘূর্ণী বাতাস, tornado=ঘূর্ণী ঝড় লিখিলে চলিত কথার সহিত ঐক্য থাকিবে। Monsoons=মৌশুমী বাতাস; তার trade-winds=বাণিজ্য বায়ু কেন? বাণিজ্য বাতাস বলিলে দোষ কি? Thunder-storm=ঝঞ্ঝা। কিন্তু ঝঞ্ঝা অর্থে ঝড়ের বা বৃষ্টির বা উভয়ের সঙ্গে। অতএব ঝঞ্ঝা বলিলে thunder-storm-এর দুইটি অঙ্গ lightning and thunder মনে আসে না। ঝঞ্ঝা-বাত=stormy-gale or squall। Cyclone এর একটি বিশেষ লক্ষণ বলা। কিন্তু thunder-storm=a [illegible]s of electrical discharges between cloud and cloud, or between clouds and the earth—সুতরাং ঝঞ্ঝা শব্দটি পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক।

Atmosphere=অন্তরীক্ষ মণ্ডল, অন্তরীক্ষ। কিন্তু অন্তরিক্ষ বলিলে বায়ুর অস্তিত্ব মাত্রই মনে হয় না। বস্তুতঃ অন্তরিক্ষ শব্দের অর্থ আকাশ, space বিশেষ। "দিব্য, আন্তরিক্ষ, ও ভৌম, এই ত্রিবিধ কেতু আছে"—অর্থ দিব্য স্থানে (যেখানে গ্রহনক্ষত্রাদি আছে), ভূমি বা পৃথিবীতে, এবং অন্তরিক্ষে অর্থাৎ দিব্য ও ভৌমস্থানের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে। [illegible] প্রদেশে এগারটি কারণ তেত্রিশটি বৈদিক দেবতা ছিলেন। Atmosphere অর্থে সংস্কৃত জ্যোতিষে ও পুরাণে ভূ-বায়ু ও আবহ শব্দের প্রয়োগ আছে। "আবহ সঞ্চারিণী atmosphere, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। লল্ল, শ্রীপতি, ভাস্কর প্রভৃতি প্রাচীন জ্যোতিষীরা আবহের উচ্চতা ১০।১২ যোজন অর্থাৎ প্রায় ৫০।৬০ মাইল নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, [illegible] উহাতেই মেঘ বিদ্যুৎ প্রভৃতি হইয়া থাকে। যথা শ্রীপতি,

নির্ঘাতোল্কাঘনস্তুরধনুর্বিদ্যুদস্তঃ কুবায়োঃ
সংদৃশ্যন্তে খনগরপরীবেষপূর্ব্বং তথাম্ভৎ।

লিঙ্গপুরাণ লিখিয়াছেন, যতদূর পর্য্যন্ত মেঘের সঞ্চার হয়, পৃথিবী হইতে ততদূর পর্য্যন্ত আবহ। কয়েক বৎসর হইতে আমি atmosphere=আবহ, আবহমণ্ডল এবং স্থান বিশেষে ভূ-বায়ু শব্দ লিখিয়া আসিতেছি। এপর্য্যন্ত কোন দোষ দেখিতে পাই নাই। Meteorology=আবহবিদ্যা, meteorologist=আবহবিৎ, ইত্যাদি।

Cloud=মেঘ, ইত্যাদি। আমাদের পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থে কয়েক প্রকার মেঘের নাম পাওয়া যায়। বাছিয়া পুনরুদ্ধারকালে সেই সকল শব্দ সজীব হইতে পারে। বৃহৎসংহিতা, বায়ু, মৎস্য ও লিঙ্গাদি পুরাণে কতকগুলি মেঘের বর্ণনা আছে। যথা, অভ্র—যে মেঘ হইতে বর্ষণ হয় না। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বায়ু ও লিঙ্গপুরাণ বলেন, চরাচর দগ্ধ হইলে পৃথিবীর ধূম স্বরূপ হইয়া যাহা বায়ু দ্বারা ঊর্দ্ধে নীত হয়, তাহাই অভ্র। এই মেঘের সহিত stratus মেঘের সাদৃশ্য দেখা যায়। "Stratus is a fine weather-cloud, and looks like a piece of lifted fog." তদ্ভিন্ন, অভ্র (mica) যেমন স্তরাকারে দেখা যায়, stratus-cloudকেও সেইরূপ দেখায়। জীমূত নামক মেঘ সম্বন্ধে লিঙ্গপুরাণ বলেন, "উহা জলের নিধান, ধরাপৃষ্ঠ হইতে অর্দ্ধক্রোশ মাত্র ঊর্দ্ধে থাকে।" বায়ুপুরাণ বলেন, জীমূত মেঘ বিদ্যুৎ-গুণবিহীন, জলধারাবিলম্বী, মূক, মহাকায়, ক্রোশমাত্রে বা ক্রোশার্দ্ধে বর্ষণ করে, পর্ব্বতাগ্র নিতম্বে বর্ষণ করে, এবং বলাকার গর্ভ প্রদান করে, ইত্যাদি। এই বর্ণনার সহিত nimbus cloud এর সাদৃশ্য আছে। অতএব জীমূত মেঘকে nimbus cloud বলিতে পারি। এই দুই প্রকার মেঘের বর্ণনা যেমন বিস্তৃত, পুষ্কর, আবর্ত্তক, সম্বর্ত্ত মেঘের বর্ণনা তেমন নহে। তবে দেখা যায়, পুষ্কর মেঘের সহিত যেন cumulus এর সাদৃশ্য আছে। আবর্ত্তকের পৃথক্ বর্ণনা পাইলাম না। কিন্তু আবর্ত্ত অর্থে ভ্রমি ও অলকা আছে। সুতরাং অলক-মেঘ নূতন নাম না করিয়া পুরাতন আবর্ত্তককে cirrus cloud অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে। আরও দেখা যায়,

আবর্ত্তো নির্জ্জলো মেঘঃ সম্বর্ত্তশ্চ বহূদকঃ।
পুষ্করো দুষ্করজলো দ্রোণঃ শস্যপ্রপূরকঃ॥

দ্রোণ ও জীমূত এক বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং এই সকল পুরাতন নাম গ্রহণ করিতে হয়ত সম্মত হইবেন না। অভ্র, জীমূত ও আবর্ত্তক, এই তিনটি নাম গ্রহণ করিলে বিশেষ দোষ হইবে না। Cumulus cloud এর বাঙ্গালা নাম স্তূপ মেঘ করা অপেক্ষা ঊর্ণমেঘ করিলে ভাল হয়। স্তূপ মেঘ বলিবার সময় ঐ নামের উৎপত্তি বুঝাইতে হইবে। বলিতে হইবে, স্তূপ অর্থাৎ তূল স্তূপ; তূল স্তূপের ন্যায় আকার বলিয়া নাম স্তূপমেঘ। Cumulus এর চলিত ইংরাজি নাম wool-pack cloud। তবে নামগুলি এই রূপ দাঁড়াইল,

stratus—অভ্র মেঘ

cumulus=পুঞ্জ বা ঊর্ণমেঘ

cumulo-stratus=ঊর্ণাভ্রমেঘ

nimbus=স্ত্রীগৃত মেঘ

cirrus=আবর্ত্তক মেঘ

cirro-stratus=আবর্ত্তকাভ্র মেঘ

cirro-cumulus=আবর্ত্তকোর্ণ মেঘ

climate—জলবায়ু। Weather অর্থে আমরা দিন শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। "আজ দিনটে খারাপ" "যে দুর্দ্দিন, তাতে কেনা বেচা ভার," ইত্যাদি। Bad weather=দুর্দ্দিন, good weather=সুদিন। বায়ু পুরাণে "শীতদুর্দ্দিনবাতা"।

Aurora=ঊষা। সকল স্থলে ইংরাজির অনুবাদ চলিবে না। Aurora অর্থে ঊষা, তেমনই dawn অর্থেও ঊষা। ইংরাজিতে দুটী শব্দ আছে, আমাদের সম্বল একটী। এজন্য কেহ কেহ মেরুজ্যোতিঃ, কেহবা আরও অধিক গিয়া কেন্দ্রীয় ঊষা করিয়াছেন। কোনটি ভাল বোধ হয় না। অপর কোন শব্দও স্থির করিতে পারি নাই। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের গন্ধর্ব্বনগর নামক ব্যাপার আলোচনা করিয়া এক একবার মনে হইয়াছে যেন তাহারা প্রাচীনেরা aurora বুঝিতেন। সকল স্থলে নহে। কোথাও গন্ধর্ব্বনগর দ্বারা "looming" বুঝিতেন, কোথাও বা যেন aurora। বস্তুতঃ গন্ধর্ব্বনগর (অন্য নাম খপুর) যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে তাহার সদৃশ ব্যাপার aurora প্রায় মনে আসে। আমার অনুমানের হেতু নির্দ্দেশ করিবার অবকাশ এখানে নাই। অনুমান মিথ্যা হইলেও ঐ শব্দটি aurora অর্থে গ্রহণ করিতে বলিতে পারি। গন্ধর্ব্ব নগরের বিবরণ বৃহৎ সংহিতায় দ্রষ্টব্য।

Astronomy—জ্যোতিষ, সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ বলাই শ্রেয়ঃ। Azimuth=আশাংশ। কেন? দিগংশ, দিগংশ বহু বহু চলিত। Geometry=জ্যামিতি। উচ্চারণ সাদৃশ্য আছে মাত্র, অন্য গুণ নাই, বরং দোষ আছে। ক্ষেত্রতত্ত্ব বলাই উচিত। Chord=জ্যা। ঠিক বটে, কিন্তু সংস্কৃত জ্যোতিষে জ্যা শব্দে sine of an angle বুঝায়। Sine=জ্যার্দ্ধ ছিল, অর্দ্ধটুকু লোপ পাইয়া কেবল জ্যাতে দাঁড়াইয়াছে, তেমনই কোজ্যার্দ্ধ, মাষার্দ্ধ ইত্যাদির অর্দ্ধ লোপ পাইয়া বিলক্ষণ গোলযোগ ঘটিয়াছে। Tangent অর্থে স্পর্শিনী শব্দ চলিত আছে। উহার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন দেখি না। বাঙ্গালা ত্রিকোণমিতিতে জ্যা (sine) অর্থে শিঞ্জিনী, কোটি জ্যা (cosine) অর্থে কোটি শিঞ্জিনী, এবং উহাদের সংক্ষেপে শিন্ ও কোশিন্ হইয়াছে। ইংরাজি শব্দের সহিত উচ্চারণ সাদৃশ্য রক্ষা নিমিত্ত দোষ হয়

---

* সিদ্ধান্তশিরোমণিতে

অর্দ্ধজ্যাগ্রে খেচরো মধ্যসূত্রাৎ তির্য্যক্‌সংস্থো ভাষতে যেন যেন।

অর্দ্ধজ্যাতিঃ কর্ম্মসর্ব্বং গ্রহাণামর্দ্ধজ্যেব জ্যাভিধানাত্র বেদ্যা।

জ্যা পরিবর্ত্তে শিঞ্জিনী গ্রহণ করা হইয়াছে। জ্যা ও শিঞ্জিনীর অর্থ এক এবং sine অর্থে শিঞ্জিনী শব্দেরও প্রয়োগ আছে। কিন্তু sine A = sine of A অনুকরণ করিতে গিয়া শিন্ অ লেখা বা বলা আমাদের ভাষার রীতির অনুযায়ী নহে। আমরা বলি, অ কোণের শিঞ্জিনী। সুতরাং 'শিন্ অ' না বলিয়া 'অ শিন্' বলা উচিত। এইরূপ সংস্কৃত জ্যোতিষে ত্রি রাশির জ্যা = ত্রিজ্যা শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাই।

Horizontal = ক্ষিতিজগামী। ভাল শুনায় না। ক্ষিতিজসম করিলে বোধ করি ভাল শুনায়। Horizontal অর্থে জলসম শব্দ পাইয়াছি। Make the surface horizontal = পৃষ্ঠভাগ জলসম কর। Level = লেবেল করিবার কারণ বুঝিলাম না। বোধ হয় জলসম শব্দটি level অর্থে রাখা যাইতে পারে।

Vertical = উল্লম্ব। ভাল বোধ হইতেছে না। Vertical diameter = ঊর্দ্ধ রেখা, transverse diameter = তির্য্যক্ রেখা, জ্যোতিষে আছে। এইরূপে, vertical line = ঊর্দ্ধ রেখা, vertical plane = ঊর্দ্ধাধঃ তল।

Day, solar = সৌর দিবস। সংস্কৃত জ্যোতিষে সৌর দিবসের পারিভাষিক অর্থ আছে। ৩৬০ সৌর দিবসে ঠিক এক সৌর বৎসর। কিন্তু প্রায় ৩৬৫।০ কু-দিনে (কু = পৃথিবী), পৃথিবীর দিনে (পৃথিবীর আবর্ত্তনজ দিনে) এক সৌর বৎসর। সুতরাং আমাদের কুদিবস ফলে ইংরাজি solar day। চলিত কথায় সৌরদিবসই বোধ হয় চলিবে।

Leapyear = পরিবৎসর। বৃদ্ধি বৎসর করিলে দোষ কি? বৃদ্ধি তিথি, বৃদ্ধি নক্ষত্র যেমন আছে, তেমনই বৃদ্ধি বৎসর বা বৃদ্ধবৎসর হইতে পারে। মনে রাখিতে হইবে, কেবল ইংরাজি অব্দ গণনার সময় বৃদ্ধি বৎসর শব্দটী আবশ্যক হইবে।

Meteor, detonating = নির্ঘাত। উল্কা সম্বন্ধীয় শব্দ সকল পূর্ব্বে আলোচনা করা গিয়াছে। এখানে বিস্তৃত আলোচনার স্থান নাই। ফলে নির্ঘাত detonating meteor নহে। উহা a sudden clap of thunder বলিয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছে। নির্ঘাত-সম্ভব সম্বন্ধে বৃহৎ সংহিতা—পবনঃ পবনাভিহতো গগনাদবনৌ যদা সমাপততি ভবতি তদা নির্ঘাতঃ।

নির্ঘাতের কেবল ভৈরব জর্জ্জর শব্দ স্মরণ করিলে চলিবে না।

Fire ball = বহ্নিগোলক। বাঙ্গালায় বহ্নি-গোলক পারিভাষিক হইতে পারিবে কি? এই শব্দের পরিবর্ত্তে পুরাতন শব্দ গ্রহণ করিলে চলে। গ্রহবর্ণার্থক বজ্রের দ্বিবিধ আকার বর্ণিত আছে। এক আকার বিষ্ণুর চক্রের ন্যায়। উহা globular lightning বা fireball মাত্র। অন্য আকার × এইরূপ। বজ্র = হীরক; হীরকের আকার এই প্রকার। ইন্দ্রের বজ্র অশ্মময় বা আয়স ছিল। তাহা lightning tubes or fulgurites বলিয়া বোধ হয়। আন্তরিক্ষ জ্যোতিঃ পদার্থের মধ্যে উল্কা একটি। উল্কা সামান্য নাম; বিষ্ফুলিঙ্গ, উল্কা, অশনি,

বিদ্যুৎ ও তারা,—উল্কার পাঁচ প্রকার। বৃহৎ সংহিতা পাঠ করিলে জানা যায় [illegible] Shooting stars। "তারা খসিয়া পড়িতেছে"—আমরা যেখানে বলিয়া থাকি [illegible] উল্কা meteors, কিন্তু উল্কা পড়িবার সময় শব্দ করে, বিস্ফোট করে না। [illegible] আচার্য্যেরা Detonating meteors or bolides বুঝিতেন। অশনি ও বিদ্যুৎ [illegible] অশনি অর্থে উৎপন্ন 'অন্তরীক্ষমুল্কাভেদো বা' বলিয়া সন্দেহ নিরাকৃত করিয়াছেন। [illegible] গুলি meteorites or aerolites বলিয়া বোধ হয়। "অশনি উল্কা মহাশব্দে [illegible] করে, মনুষ্য-গজ-অশ্ব-মৃগ-প্রস্তর-গৃহ-তরু-পশুর উপর পতিত হয়, অশনি উল্কার [illegible] করে।" অবশ্য অশনির আর এক অর্থ বজ্র আছে। উপরে তাহা বলা হইয়াছে। [illegible] সম্বন্ধে এবে এইরূপ দাঁড়াইল

Meteor=উল্কা

Meteorites=অশনি উল্কা

Shooting stars=তারা উল্কা

Detonating meteors=উল্কা

Fireball=বহ্নি গোলক

Nadir=অধঃস্বস্তিক। শব্দটি কিন্তু দীর্ঘ, তেমনই ঊর্দ্ধ স্বস্তিক। Zenith=ঊর্দ্ধ [illegible] আছে, কিন্তু অধোবিন্দুর এর তেমন ছোট শব্দ নাই। ঊর্দ্ধ বিন্দু, অধোবিন্দু করিলে [illegible]

Rotation=আবর্ত্তন। ঠিক। কিন্তু revolution=ভগণগতি, ভ্রমণ; [illegible] general হয়। Revolution=পরিবর্ত্ত শব্দটি কেবল জ্যোতিষে নহে, পুরাণে [illegible] তেমনই আর একটি শব্দ প্রদক্ষিণ করা। যথা, বায়ু পুরাণে (৩২ অঃ) আকাশগঙ্গা [illegible]

পরিবর্ত্ততেঽহরহো যথা সূর্য্যস্তথৈব সা।
বেগেন কুর্ব্বতী মেরুং সা প্রযাতা প্রদক্ষিণম্॥

Constellation=তারা প্রকোষ্ঠ। ইহার প্রতিশব্দ লইয়া পূর্ব্বে অনেক কথা [illegible] গিয়াছে। নক্ষত্র শব্দ ব্যবহার করিলে দোষ কি? বৈদিক সময়ে নক্ষত্র অর্থে ঠিক constellation ছিল। যেমন অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি চন্দ্র পথের সাতাশটি কাল্পনিক ভাগ বুঝাইতে [illegible] শব্দ ব্যবহার ঘটে। কিন্তু এখনও নক্ষত্র শব্দের অর্থে a group of stars বুঝায়। কেহ যদি নক্ষত্র বলিলে একটি তারা বুঝায় না। অবশ্য নক্ষত্র অর্থে ক্রমে তারাও বুঝাইতে [illegible] প্রায়ই কতকগুলি তারাসমষ্টি বুঝায়। Constellationও তাই। তবে, [illegible] নক্ষত্র বলা যায় না, তাহাদের পৃথক্ নাম রাশি আছে। সুতরাং সাবধানে নক্ষত্র [illegible] করিলে constellation বুঝাইতে পারা যায়। Star=তারা; star-cluster=নক্ষত্র [illegible] না করিয়া তারাপুঞ্জ বলা উচিত। আর একটি শব্দ পুরাণে দেখিতে পাই, মৎস্য ও বায়ু পুরাণে নক্ষত্রব্যূহ শব্দ ঠিক না থাকিলেও ব্যূহাকারে সংস্থিত একরূপ [illegible]

এত বিচারে প্রয়োজন নাই, তারাপুঞ্জ যথেষ্ট। নক্ষত্র শব্দের তিনটি অর্থ প্রচলিত আছে, সুতরাং ঐ শব্দটি ব্যবহার সময়ে অসাবধান হইলে বিভিন্ন অর্থ আসিতে পারে। যদি অন্য শব্দ একান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তারা গৃহ (তারামর্ব গৃহ) করিতে বলি; নক্ষত্র সমূহ দেবতার গৃহ, এই ভাব বৈদিক সাহিত্য হইতে পুরাণে পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছে। এই ভাব রক্ষা করিয়া তারাগৃহ বা নক্ষত্রগৃহ করা চলে।

Zodiacal light=ভচক্রভা। ইংরাজির অনুবাদ বটে, কিন্তু ভাল শুনায় না। Zodiacal light প্রাচীনেরা লক্ষ্য করিয়াছিলেন কি না এবং করিয়া থাকিলে কি নাম দিয়াছিলেন, এতদ্‌বিষয় আমি বহু অনুসন্ধান করিয়াছি। একটি শব্দ 'পরিঘ' পাইয়াছি। উহা ঠিক Zodiacal light কি না, তদ্‌বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। তবে, অন্য শব্দের অভাবে এবং অন্যান্য কতকগুলি কারণে এক একবার মনে হইয়াছে যেন পরিঘ অর্থে Zodiacal light। যাহাই হউক, উহাকে Zodiacal light এর প্রতিশব্দ স্বরূপ ব্যবহার করিলে কোন গোলযোগের সম্ভাবনা দেখি না। বৃহৎসংহিতায় উহার বর্ণনা আছে।

Geology=ভূবিদ্যা।

Archaean=আর্কিক। আদিম করিলে একটা অর্থ পাওয়া যায়। Carboniferous =অঙ্গারবহ। আঙ্গারিক করিলে কার্ম্বিক, ডিভনিক প্রভৃতির মত ইক ভাগান্ত হয়, অথচ অর্থবোধেও কষ্ট হয় না। ডিবনিক, না ডিভনিক? কেহ কেহ ভিক্টোরিয়া-ল লিখিয়া বিক্‌টোরিয়া লেখেন। কিন্তু বাঙ্গালা বা কি ইংরাজি v বর্ণের উচ্চারণ আনিয়া থাকে? পরিষদের শব্দবিৎ পণ্ডিতগণকে ইহার মীমাংসা করিতে অনুরোধ করি।

Moraine=গ্রাবরেখা। গ্রাবমালা ভাল বোধ হয়। কিন্তু রেখাই হউক, মালাই হউক, গ্রাবশব্দ যোগে পারিভাষিকত্ব আনা দুষ্কর।

Seismograph=স্পন্দনমান যন্ত্র। আধুনিক অধিকাংশ যন্ত্রের নামে graph, scope ও meter দৃষ্ট হয়। এই তিনটির বাঙ্গালা প্রতিশব্দ রচনা করিলে সুবিধা হইতে পারে। Graph=লেখ, scope=দর্শন বা বীক্ষণ; meter=মান করিলে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের আবশ্যক বাঙ্গালা নাম রচনা করিবার সময় সুবিধা হইতে পারে। যথা,

Seismograph=ভূস্পন্দলেখন (ভূ শব্দ যোগ করা আবশ্যক)

Sphygmograph=নাড়ীস্পন্দলেখন

Barograph=বায়ুচাপলেখন

Electroscope=তাদির্শ

Microscope=অণুদর্শন বা অণুবীক্ষণ

Laryngoscope=কণ্ঠবীক্ষণ

Electrometer=তাড়িতমান

Manometer=চাপমান

Thermometer = উষ্ণতামান ইত্যাদি।

Alluvium = পলল; silt, sediment = পলি।

পশ্চিম বঙ্গে পলি শব্দটা যত চলিত, পূর্ব্ববঙ্গে তত নহে। আমার প্রাকৃত ভূগোলে আমি পলি শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম। কিন্তু চট্টগ্রামের কোন পণ্ডিত মহাশয় আমাকে উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শেষে পলি শব্দের পর পলল শব্দ যোগ করিতে হয়। পূর্ব্ববঙ্গে নাকি পলি নামক পদার্থটি নাই, থাকিলেও কাদা বা পাঁক শব্দ দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইজন্য বোধ হয় পলল ও পলি পৃথক্ রাখা সহজ হইবে না। বস্তুতঃ এতদুভয়ের আবশ্যকতাও নাই। Mould = কর্দ্দম। কর্দ্দম বলিলে কাদা বুঝি, সুতরাং হয়ত ঠিক হয় না। তদ্ভিন্ন, clay, clayey আছে। আমার মতে mould = মাটি বা মৃত্তিকা বলিলে চলে। Vegetable mould = পাতা পচা মাটি, black mould = কাল মাটি বলিলে হয়। Coal = কয়লা নহে, বোধকরি পাথর বা পাথুরে কয়লা হইবে।

Fossil = জৈবাশ্ম। অনুবাদ ঠিক হইলেও আধুনিক বিস্তৃত অর্থসূচক ভাবে না লইয়া সঙ্কীর্ণ ভাবে গ্রহণ করিলে বরং অর্থ বক্রা হইতে পারে। Metamorphic = পরিবর্ত্তিত বিকৃত করিলে কেমন হয়? Plutonic = পাতালজ। পাতালিক বলা চলে না।

River = নদী। Affluent, tributary = শাখা। Branch এর বাঙ্গালা কি হইবে? একটি শব্দ, উপনদী, আছে। Cascade = নির্ঝর?

Physics = পদার্থবিজ্ঞান। নামটা চলিত হইয়া গিয়াছে, নচেৎ ভূতবিজ্ঞান বা শক্তিবিজ্ঞান বলিতাম।

Gas = অনিল। ভাল বোধ হইল না। পুরাতন অথচ প্রচলিত শব্দের পরিত্যাগ করিয়া অনিলের বহু বি Air is a gas—বায়ু এক প্রকার অনিল, বলিলে কি বুঝিব? Air = ভূ-বায়ু বলিলে বরং বলা চলে, ভূবায়ু এক প্রকার বায়ু। সে যাহা হউক, গ্যাস শব্দটাকে তাড়ান বড় সহজ হইবে না। গ্যাসের আলো হওয়া অবধি ঐ শব্দটি আমাদের পারিবারের অত্যন্ত হইয়াছে। কদর্য্য বস্তুও অভ্যাসগুণে প্রিয় হয়।

Liquid = তরল। তরল = fluid, দ্রব = liquid, এরূপ প্রয়োগ আছে। Mobile = সারিল, viscous = শ্যান। Mixture = করব। শব্দটি জানি না। চলিত ইংরাজি সম্বন্ধে, বিশেষতঃ ডাক্তারখানার একটা নিত্য ব্যবহার্য্য শব্দের, এরূপ অপচলিত প্রতিশব্দ চলিবে কি? এইরূপ, acid = শর্ট, ইত্যাদি শব্দগুলির চলন সম্ভাবনা দেখি না। বিশ্লেষণ শব্দটি analysis এর অর্থে এত চলিত হইয়াছে যে উহা দ্বারা dissociation বুঝাইতে চেষ্টা করা বৃথা। এইরূপ crystal = অর্ক করিয়া চলিত স্ফটিক ত্যাগ করা সহজ নহে। Amorphous অর্থে নিরাকার শব্দ সংস্কৃত আছে। রত্নপরীক্ষায় এই প্রকার অনেকগুলি শব্দ পাওয়া যায়। যথা,

Hard = অভেদ্য, কঠোর, নিষ্ঠুর

Soft = মৃদু

Even (surface) = সম
Uneven = বিষম
Perfect = অব্যঙ্গ
Flaw (in a gem) = ত্রাস
Striated = কেশযুক্ত
Specific gravity = গুরুত্ব
Density = ঘনত্ব
Transmitted colour = ছায়া
Transmission = গমন
Transparency = অচ্ছতা
Brilliancy = দীপ্তি, অচ্চিমত্তা
Opalescent = অঘনীপুট
Dichroic (?) = দ্বিচ্ছায়
Mineral = ধাতু
Symmetrical = অনুপূর্ব
Colourless = বিবর্ণ
Whiteness = বৈশদ্য
Beam of light = অংশুজাল
Luminous = অংশুমান্
Natural = সহজ, আকরজ
Angle (of a crystal) = কোটি, কোণ, অস্রি
Face = পার্শ্ব
Edge = ধারা
Apex = অগ্র ইত্যাদি

Colour = বর্ণ। Orange = অরুণ, কিন্তু অরুণ অর্থে অব্যক্তরাগ বা ঈষৎ লোহিত বর্ণ। Indigo = ইন্দীবর। কিন্তু ইন্দীবরের বর্ণ indigo নহে, blue। Violet = কাপোত। কাপোত শব্দ সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায়, অর্থ dirty white or grey।* কতপ্রকার বর্ণের সংস্কৃত নাম আছে, তাহা একবার অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। বহুবিধ বর্ণের নাম আছে, কিন্তু ঠিক violet বুঝায়, এরূপ একটি শব্দ পাই নাই। অমরকোষে অনেকগুলি বর্ণের নাম আছে। কিন্তু অধিকাংশ বর্ণ বৃক্ষাদির পত্র পুষ্প ও পক্ষ্যাদির পশুর বর্ণের সহিত উপমা

* রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে (১৪ সঃ) কপোতবর্ণ ও অরুণ বর্ণ এক বলা হইয়াছে। যথা, কপোতাঙ্গারুণো ঘনঃ—অর্থাৎ কপোতাঙ্গবৎ অরুণ—ধূসরবর্ণ ঘন।

দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। বর্ণস্থাপনের ইহাই প্রকৃষ্টবিধি। এক রক্তবর্ণ হরিদ্রাবর্ণ নীল, আলোকগুলুবর্ণ, দাড়িম্ববীজবর্ণ, নাক্ষাবর্ণ, গুঞ্জাবর্ণ, জবাবর্ণ, ইন্দ্রগোপবর্ণ ইত্যাদি। Red, orange = নারঙ্গবর্ণ করিলে দোষ কি? Indigo = নীলী বা নীলিমা। ইহা নীলের বা মহানীল। Violet অর্থে বোধ করি বক্তনীল করিতে হইবে। মুল, ধুম্র বা ধূম্র বা ধূম্র purple বর্ণও বুঝায়।

Spectrum = লেখা। বেশের চোখানি করিয়া বর্ণলেখা করা আবশ্যক; spectroscope = লেখাবীক্ষণ না করিয়া বর্ণবীক্ষণ বা বর্ণলেখাবীক্ষণ করিলে অর্থ স্পষ্ট হয়। Spectrum analysis = লৈখিক বিশ্লেষণ। বর্ণ বিশ্লেষণ বলিলে অর্থ স্পষ্ট হইতে পারে। তোমার বিদ্যা আছে।

Reflection = পরাবর্ত্তন। আমিও এই শব্দটির পক্ষপাতী। কিন্তু সংস্কৃত পণ্ডিতেরা ইহার পরিবর্ত্তে মূর্চ্ছা পাইয়াছি। Refraction এর সংস্কৃত প্রতিশব্দ নাই, বোধ হয় প্রাচীন কালে refraction এদেশে অজ্ঞাত ছিল। তবে, কিরণবিঘটন দ্বারা refraction অর্থ উক্ত হইয়াছে। যথা, জীপতি ইন্দ্রধনুর সম্ভব সম্বন্ধে

> সূর্য্যস্য বিবিধবর্ণাঃ পবনেন বিঘট্টিতাঃ করাঃ সান্দ্রে।
> বিয়তি ধনুঃসংস্থানা যে দৃশ্যন্তে তদিন্দ্রধনুঃ॥

পরিবেষ সম্বন্ধে,

> সংমূর্চ্ছিতা রবীন্দ্বোঃ কিরণাঃ পবনেন মণ্ডলীভূতাঃ।
> নানাবর্ণাকৃতয়স্তদ্ভবে ব্যোম্নি পরিবেষঃ॥

Dispersion = বিশ্লেষণ। ইহার পরিবর্ত্তে বিস্ফারণ করিলে এক বিশ্লেষ। বিশ্লেষ করা অর্থ করিতে হইবে না।

Magnetic meridian = চৌম্বক যাম্যোত্তর রেখা। বড় লম্বা হইল। Meridian = মধ্যরেখা আছে। চৌম্বক মধ্যরেখা করিলে শব্দটি ছোট হয়।

Magnetic declination = চুম্বকক্রান্তি। চুম্বক বলন (variation) নাম ব্যবহার করা যাইতে পারে।

Dip, inclination = চুম্বকাবনতি। চুম্বকনতি আরও ছোট।

Biology = জীব বিদ্যা।

Morphology = শরীর বিদ্যা। অর্থ বড় বিস্তৃত হইল। অঙ্গবিদ্যা?

Physiology = প্রাণবিদ্যা। উদ্ভিদের প্রাণ থাকিলে উদ্ভিদকে প্রাণী বলিতে হয়। প্রাণ হলে, জীবনবিদ্যা করা আবশ্যক।

Fauna = প্রাণিবর্গ, Flora = উদ্ভিদ্ বর্গ। শব্দ দুইটি গাবা ঠিক অর্থ প্রকাশ করে না।

Organ=অবয়ব, দেহ। বরং অবয়ব বলা যাইতে পারে, কিন্তু দেহ বলিতে পারা যায় না। The liver is an organ of our body,—ইহার অনুবাদ কি হইবে?

Cell=কোষাণু। বোধ হয়, শুধু কোষ বলিলে চলিতে পারে। কিন্তু কোষের ভাবটা ত্যাগ করিয়া a unit of living partoplasm এর ভাব আনিতে পারিলে শব্দটি ঠিক হয়।

Protoplasm=জৈবনিক, জীবপঙ্ক। বরং জৈবনিক ভাল, জীবপঙ্ক কেমন কেমন লাগে।

Structure=গঠন, গঠনপ্রণালী। এই শব্দ দ্বারা configuration বুঝিতে পারি; কিন্তু structure বুঝাইতে অন্য শব্দ আবশ্যক। রচনা কেমন? কিন্তু it is a structureless membrane, it exhibits no structure অনুবাদে কি হইবে?

Art=কারু শিল্প। Fine art=কলা।

শিল্প, শিল্প শাস্ত্র, কলা বিদ্যা, ললিত কলা প্রভৃতি শব্দগুলি আজকাল যথেচ্ছরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু সংস্কৃতে কারু, শিল্প প্রভৃতির অর্থ প্রায় স্পষ্ট আছে। কারু অর্থে artisan বুঝি, একজন ইঞ্জিনিয়ারকে কারিগর বলি না, তাহার কারিগরী দেখিলে তাহাকে কারিগর বলিতে পারি। তিনি স্থপতি, তক্ষক। আমাদের বিশ্বকর্মা কারু, শিল্পী, স্থপতি, তক্ষক ছিলেন। গৃহাদি নির্ম্মাণ বিদ্যাকে বাস্তু বিদ্যা বলে। ময় এবিদ্যার দক্ষ ছিলেন। এজন্য বাস্তু বিদ্যার অপর নাম ময়-মত আছে। তক্ষক অর্থে carpenter, স্থপতি অর্থে architect। কারখান বা কারখানা=workshop। স্থাপত্য বিদ্যা বলিলে mechanics বুঝি। শিল্প শাস্ত্র অর্থে manual, mechanical, and fine arts। শিল্প শাস্ত্র দুইভাগে বিভক্ত, বাহ্যকলা ও আভ্যন্তর কলা। গীত বাদ্য নৃত্য নাট্য প্রভৃতি ৬৪টি বাহ্যকলা দেখিলে শিল্প শাস্ত্রের অর্থ বুঝিতে পারা যায়। আভ্যন্তর কলা, রতিশাস্ত্রের অন্তর্গত। Practical sciences and arts বুঝাইতে অর্থ শাস্ত্র আছে। Fine art অর্থে সুকুমার বা ললিত কলা বলা আবশ্যক।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

প্রাচীন পুঁথির বিবরণ।

[চট্টগ্রাম হইতে সংগৃহীত প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের এই বিবরণ আমরা বিশেষ আদরের সহিত প্রকাশ করিলাম। বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ ও ভক্তির জন্য প্রবন্ধ-লেখক বিশেষ ধন্যবাদার্হ।—পত্রিকা-সম্পাদক]

বঙ্গভাষার প্রাচীন সাহিত্যের অনুসন্ধান করিতে করিতে ইহার প্রাচীন গৌরবের নিদর্শন পাইয়া আমরা কখনও বা আনন্দরসে আপ্লুত হই, কখনও বা ইহার শৈশব-স্বভাবসুলভ

[illegible] দেখিলে দুঃখিত হই। আমাদের এই হর্ষবিষাদ বাহ্য বুদ্ধির কার্য্য, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

বঙ্গভাষা কোন্ সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা স্থির নির্ণয় করা দুঃসাধ্য এবং কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের উহার উৎপত্তিকাল বলিয়া নিশ্চয় নির্ণীত করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। বহুযুগব্যাপী সাধনায়, বহুলোকের অরান্ত অধ্যবসায় ও চেষ্টায় একটী ভাষা হইতে [illegible] উন্নত হয়। জগতের যে যে ভাষা আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত বলিয়া [illegible] হইতেছে, তাহারাও এক দিনে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। বোধ হয় প্রকৃতি নিজেই অভিব্যক্তি সম্বন্ধিনী। প্রকৃতিরাজ্যের সর্ব্বত্রই এই নিয়মের [illegible] পরিলক্ষিত হইয়াছে।

আমাদের মাতৃভাষা বঙ্গভাষাও কিছু এক দিনে বা এক ব্যক্তি দ্বারা এই [illegible] হয় নাই। বহুলোকের বহুযুগব্যাপী পরিশ্রমের ফলে ইহার বর্ত্তমান আকার গঠিত হইয়াছে।

বঙ্গভাষা গঠিত হওয়ার প্রাক্কালে মুদ্রাযন্ত্রের অভাব ছিল বলিয়া আমাদের প্রাচীন [illegible] প্রায় সর্ব্বত্র সর্ব্বনাশ কালের কঠোরকুক্ষিগত হইয়া গিয়াছে। কালের সহিত অবিশ্রাম [illegible] করিয়া আজও যাহা কিছু আছে, নানা কারণে তাহাও অদ্যাবধি নিরাপদ অবস্থায় নীত হইতে পারে নাই। ইহার প্রাচীন সাহিত্যক্ষেত্র সম্যক্ কর্ষিত হইলে ইহার [illegible] সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত লেখা যাইতে পারে। ভাবী কোন মহাত্মাকে এই [illegible] সফলতার সম্ভাবনা করিয়া এখন বঙ্গের বহুতর মাতৃভাষানুরাগী মহাত্মা নানা [illegible] পরিশ্রমাদি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহা আনন্দ ও আশার কথা বটে। [illegible] লোকের পক্ষে কোন চেষ্টা একান্ত দুষ্টতার পরিচায়ক হইলেও [illegible] সহিত সমান অধিকার থাকায় অনেকে উহাকে উদ্ঘোষিত করার জন্য [illegible] করিবেন বলিয়া আত্মোৎসর্গ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় ও উদ্দেশ্যবিহীন বিবেচিত না হইতে পারে, এই আশায় বর্ত্তমান প্রস্তাবের অবতারণা।

এখন বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, [illegible] ও হিন্দুযের সুপ্রচার হয়। আমাদের মাতৃভাষার প্রাচীন সাহিত্যসম্বন্ধে [illegible] সাহিত্য-গৌরবী সাত্ত মাত্রেরই সাদৃষ্ট অনুধাবন করা একান্ত আবশ্যক। বিষয়ে [illegible] পক্ষে বিপত্তির বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। বৎসর বৎসর কীট ও হুতাশনাদিতে আমাদের [illegible] মূল্যবান জিনিষগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে।

এ পর্য্যন্ত প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধীয় যে যে কাব্য, চৌতিশা, পাচালী, [illegible] অন্যান্য সন্দর্ভ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, এই প্রবন্ধে তৎসমস্ত অতি সংক্ষিপ্তভাবে [illegible] হইবে। বলিয়া রাখা উচিত যে, লেখকগণ সম্বন্ধে কোন বৃত্তান্ত আমরা জানিতে পারি নাই।

আমাদের প্রাপ্ত সকল কাব্যাদিই উল্লেখ ও সমাদরযোগ্য নয়, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সাহিত্যের ক্রমিক অভিব্যক্তির নিদর্শন রাখিতে গেলে সেগুলি বাদ দিলে [illegible]

সাহিত্য-হিসাবে সকলগুলিই সাদরে আলোচিত হইবার যোগ্য। ভাষাতত্ত্বান্বেষীর নিকট হয়ত সেগুলি অমূল্য সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। বঙ্গভাষার প্রাক্‌চৈতন্যস্ফুরণের কালে যে সমস্ত কাব্যাদি বিরচিত হইয়াছে, সে গুলিতে বিশেষ কোন গুণপনা পরিলক্ষিত না হইলেও তাহা বাদ দিতে গেলে বঙ্গভাষার শৈশব-ইতিহাসের একাংশ আদৌ অসম্পূর্ণ থাকিবে। শিশুর অকপট, সরল, সংসারাসক্তিবিহীন হাসিতে যেমন একটা সৌন্দর্য্য নিহিত আছে, তেমনই বাঙ্গালার শৈশবকালের রচিত কাব্যগুলিতেও লেখকের অকপট, অনুকরণপ্রবৃত্তিরহিত, অনাড়ম্বর, স্বাভাবিক, অনাবিল হৃদয়ের প্রকাশ দেখিয়া কেমন একটা আনন্দ আসিয়া চিত্তক্ষেত্র অধিকার করিয়া ফেলে। তা'ছাড়া, কবির দেশকালপাত্রের কথা যখন মানসপটে চিত্রিত হয়, তখন তাঁহার ত্রুটী বা অক্ষমতা দেখিয়া রাগ বা বিরক্তি না জন্মিয়া এক প্রকার ভক্তিমিশ্রিত দয়ার উদ্রেক হয়। আর যখন মনে করি যে, কেবল আমাদেরই শুভার্থে তাঁহাদের ক্ষীণশক্তি প্রয়োগ করিয়া তাঁহারা হাস্যাস্পদ হওয়ার ভয় বা সঙ্কোচ করেন নাই, তখনই কৃতজ্ঞতার ডালি লইয়া তাঁহাদের চরণে প্রণত হইতে ইচ্ছা যায়।

১। লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়।

ইহা একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। ছাপাইলে ইহার আকার বটতলার কৃত্তিবাসী রামায়ণের আকার চেয়ে বড় কম হইবে, বোধ হয় না। ইহাতে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন,—এই ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের দিগ্বিজয়বার্ত্তা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। রচনা সরল ও বিশুদ্ধ হইলেও এত একঘেয়ে যে, পড়িতে পাঠকের ধৈর্য্য থাকিবার ত কথাই নয়, অধিকন্তু পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে হয়। পণ্ডিত ভবানীনাথ ইহার রচয়িতা। ইনি ব্রাহ্মণ। জয়ছন্দ নামক কোন রাজার আদেশে লোকহিতার্থে ইহা ব্যাসদেবের অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে অনূদিত হইয়াছে। রাজা জয়ছন্দ কে এবং গ্রন্থকারও কোথাকার লোক, গ্রন্থমধ্যে তৎসম্বন্ধে কোন বিবরণ পরিদৃষ্ট হয় না। সাহিত্য-ইতিহাসে আলোচনাযোগ্য অনেক সাহিত্য-বিভূতি এই গ্রন্থে বর্ত্তমান আছে। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে সময়ান্তরে আমরা এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব। ভাষা পর্য্যালোচনা দ্বারা ইহাকে পূর্ব্ববঙ্গের সম্পত্তি বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। পরে সে বিষয় আলোচিত হইবে বলিয়া অদ্য তাহা হইতে বিরত রহিলাম। গ্রন্থের ভণিতা এইরূপ :—

(ক) জয়ছন্দ নরপতি, রসিক সুজন যতি,
সভাসদ ভবানী ব্রাহ্মণ।
নৃপতি আদেশ পাইয়া, ব্যাসের সংহিতা চাইয়া,
সুরচিত কৈল পদবন্ধ।

(খ) জয় ছন্দ নরপতি-স্বদেশী ব্রাহ্মণ।
শ্লোক ভাঙ্গি পদবন্ধ করিল রচন।

(গ) মহারাজা জয়ছন্দ, ফরাইল পদবন্ধ,
ভরাইতে পাণ্ডবী সকল।
শ্রীরাম বন্দিয়া মাথে, রচিল ভবানীনাথে,
সুপদ করিয়া ইতিহাস।

গ্রন্থে ইহার রচনা কাল নির্দ্দেশক কোন সনাদির উল্লেখ নাই। হস্তলিপিখানি ১১৩ মগীর অর্থাৎ ১১১ বৎসর পূর্ব্বের লেখা।

২। মোহ-মুদ্গর।

'মোহ-মুদ্গর' নাম দেখিয়াই কেহ যেন মনে না করেন, ইহা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কৃত ভবভ্রান্তিবারণ মোহ-মুদ্গর বা তদনুবাদ। এ মোহ-মুদ্গর' মুদ্গর রাজা,—এক জন মানব—পৌরাণিক রাজা। ইনি শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন। ভারত যুদ্ধে অভিমন্যু নিহত হইলে অর্জ্জুন পুত্রশোকে একান্ত বিধুর হয়েন। তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদি-বিপ্রলম্ভা তরঙ্গের কথা পাড়েন। তাহাতে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি মুদ্গর রাজার ভক্তি পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে প্রকৃত ভক্ত দেখান। ইহা একখানি কুদ্র গ্রন্থ। গ্রন্থের এইরূপ :—

এক দিন শিব স্থানে গিয়া ভবানী। সেই সব কথা মোরে কহ ত্রিপুরারি।
কামের কথা কিছু কহ গোসাঞি। তোমার প্রসাদে আমি সুখের কথা পাই।
অভিমন্যু যুদ্ধে যবে হত হইল। এতেক শুনিয়া তবে দেব ত্রিলোচন।
যেন মতে অর্জ্জুনে কৃষ্ণে সান্ত্বাইল। সাধু সাধু কহিয়া যে পার্ব্বতীর বদন।

উপসংহার :—

শুনয়ি কৃষ্ণসখে অর্জ্জুন পণ্ডিত। পরার কহিল কিছু পুরুষোত্তম দাসে।
আপনি ঘাটকালি হরিনামে গেল। সেবা কহে সেবা শুনে কামমন বিত্তে।
শিবে যে কহিলা কথা পার্ব্বতীর তাল। মায়ামোহ বন্ধ তাতে ছোটে সর্ব্বজন।
ভক্তি ভাবে হই গেলী পড়িলা চরণে। কৃষ্ণপাদপদ্মে তবে হয় অতি মতি।
দেবী কহে শুনিলাঁ আশ্চর্য্য কথন। ভবসিন্ধু হরি যাইব কৃষ্ণপদে গতি।
কৃতার্থ করিল নাথ এ সব স্মরণ। এ গোলিয়া সর্ব্বজীব বোল হরি হরি।
শ্লোকবন্ধে সঙ্গিতা * যে আছএ বিশেষে। কৃষ্ণ পদে বন্ধু নাই ভবসিন্ধু তরি।

এই গ্রন্থে যে এক মাত্র ভণিতা আছে, তাহা এই :—

শ্লোকবন্ধে সঙ্গিতা যে আছএ বিশেষে।
পরার কহিল কিছু পুরুষোত্তম দাসে।

হস্তলিপির তারিখ ১১৮৪ মগী অর্থাৎ আজ ১০৮ বৎসর।

৩। ধ্রুব-চরিত্র।

ইহাও একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক। রচয়িতা আপনাকে কখনও লক্ষ্মীকান্ত কখনও বা হরি নারায়ণ নামে পরিচিত করিয়াছেন। 'নতুপাড়া' কি 'নওপাড়া' তাঁহার নিবাস বলিয়া উল্লিখিত আছে বটে, কিন্তু তাহা কোথায়, তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। চট্টগ্রামে 'নোয়া-

* সঙ্গিতা—সংহিতা।

পাড়া' নামক এক গ্রাম আছে। ইহাতে কয়েকটী সুন্দর ধুয়া আছে। দু একটী এখানে দেওয়া গেল। হস্তলিপিখানি ১২২১ মগীব লিখিত।

(১) মিছে মায়াতে ভুলে মনে মন।
এখন দিন গেল, কাল জল, করবে হরি সাধন।
গেড়ি আছে মায়া জাল, পিছে বনাইব কাল,
অন্তকাল যেন হয় নিবারণ।

(২) দুরাচার মন, কি রসে মজিলে এখন।
জান না শিবরে বসে সদা রয়েছে শমন।
শুকদন্ত তরুবর, সে ধন পরম ধন,
সে ধনে কর সাধন, হবে শমন নিবারণ।

(৩) হরিপদে হৈও না মন ভ্রান্ত।
রক্তিত দুত সবে, দেখে ধ'রে লয়ে যাবে,
কেমনে এড়াবে তবে শমন দুরন্ত।

(৪) মন রে কেমনে এড়াইবে শমনে।
এখন কেমনে তরিবি ভব তুফানে।
হরি পরম ধন, পরমার্থের সাধন,
এখন কি ছলে ভুলাইলে সে ধনে।

প্রারম্ভ :—

ব্রহ্মশাপে পরীক্ষিৎ আছে সপ্ত দিনে।
শ্রীমদ্ভাগবতকথা কহিব গোচরে।
শুকদেব গোস্বামী শিষ্যের বেশ।
পরীক্ষিৎ মুক্তি হেতু হয় প্রকাশ।

* * * *

পঞ্চ বৎসরের শিশু শুচি সে অজ্ঞান।
কিরপেতে হৈল সে কৃষ্ণপরায়ণ।

উপসংহার :—

এইরূপে হৈল ধ্রুব হরিপরায়ণ।
গাহে গাহমায় সেবা করাব ঘরণ।

অনায়াসে যায় সেই বৈকুণ্ঠ ভুবন।
রচিল পুস্তক দ্বিজ লক্ষ্মীনারায়ণ।

ভণিতা :—

(ক) বিপ্র বড় পাড়া ধাম, লক্ষ্মীনারায়ণ নাম,
দ্বিজবর করিল রচন।

(খ) দ্বিজ লালবিহারী সুত, সেহ বড় গুণান্বিত,
তার সুত লক্ষ্মীনারায়ণ।
কাতর হইয়া কহে, শুনী জনা পদতলে,
পিতা দুঃখ কর নিবারণ।

(গ) ধ্রুব কথা সুধারস অমৃতের ধার।
দ্বিজ লক্ষ্মীকান্ত কৈল পাঞ্চালী প্রচার।

(ঘ) গণেশ অনুজ হরি, তস্য ভ্রাতা লালবিহারী,
বিপ্র বড়ু তাতে নিবাস।
তাহার সুতের সুত, জ্ঞানশূন্য লক্ষ্মীকান্ত,
ধ্রুব কথা করিল প্রকাশ।

৪। বাণ-যুদ্ধ।

এ গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে তিন জনের ভণিতা দৃষ্ট হইতেছে। গ্রন্থে কোন রচনাকাল নির্দ্দিষ্ট নাই। হস্ত লিখিত পুঁথিখানি নিতান্ত আধুনিক—১২২৪ মগীব লিখিত। ভাষা সহজ ও আড়ম্বরবিহীন।

শুন শুন সর্ব্বলোক হৈয়া একচিত।
বাণরাজার যুদ্ধ শুন হৈয়া একচিত।
যথাতে পুত্রেক কন্যা দেবী বিষহরী।
অনিরুদ্ধ উষা কথা কহিব বিস্তারি।

* * * *
* * * *
মহারাজ চক্রবর্ত্তী বাণ মহামতি।
সহস্রেক ভুজ তান নাই অব্যাহতি।

ব্রহ্মশাপে বিপ্রবর হয়নুচের। মায়া করি সংহারিল সেব নারায়ণ।
বৈত্য হৈয়া জন্মিলেক সভার ভিতর। তার পুত্র প্রহ্লাদ যে হয় মহাধন্য।
হিরণ্যকশিপু পুত্র খ্যাত ত্রিভুবনে। মুক্তিপদ পাইলেক গোবিন্দ সদন।

শেষ :—

অনিরুদ্ধ উষা সেবা সুরের সঙ্গে। যার যেই পুরেতে চলিলা তৎক্ষণ।
কেহ নাচে কেহ গায় মনোহর বন্ধে। আনন্দে পূর্ণিত হৈয়া সকলের মন।
কৃষ্ণকাভদ্র গেল দ্বারিকা নগরী। এই পুস্তক যেবা লেখে আর গায়।
প্রণাম করিয়া রাজা গেল নিজপুরী। দুঃখ ছাড়ি সুখ বাড়ে কহে দয়াময়।

ভণিতা :—

(ক) শুন শুন চিত্ররেখা, না পাইলে তার দেখা, (খ) শ্রীনাথ দেবে কহে করুণা বচন।
আনলেতে ত্যজিমু জীবন। করুণা করিয়া উষা করয় ক্রন্দন।
গৌরীচরণ শুহে কর, না ভাবিও কিন্নর, (গ) এই পুস্তক যেবা লেখে আর গায়।
পাইবা পতি স্থির কর মন। দুঃখ ছাড়ি সুখ বাড়ে কহে দয়াময়।

৫। সত্যপীরের পাঞ্চালী।

এ ক্ষুদ্র পুস্তক খানির রচিয়তার নাম কি জানা যাইতেছে না। গ্রন্থ মধ্যে কয়েকটী আরব্য ও পারস্য শব্দ থাকিলেও ইহা মুসলমানের রচিত বলিয়া বোধ হয় না। মোল্লা মুসলমানের কোন প্রয়োজনও নাই। কাব্য প্রারম্ভেই "নমো গণেশায়" বাক্যে ইহাকে হিন্দু কবির রচিত বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। ইহার যে দুই খানি হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে, সে দুইখানিই আধুনিক; পঞ্চাশ বৎসরের কিছু কম।

প্রারম্ভ :—

প্রথমে প্রভুর নাম মনেতে ভাবিয়া। কলিযুগে সত্যপীর,আইল পৃথিবীত।
যার নাম লৈলে যায় শমন তরিয়া। দরিদ্র ব্রাহ্মণ হোতে হইল বিদিত।
প্রণমোহ সত্যপীর নিরত হাসিল। অতিপূর্ব্ব কালে এক ব্রাহ্মণ আছিল।
যাহার প্রতাপে পুনি ভরিছে অখিল। অন্ন বস্ত্র না মিলে ভিক্ষা মাগি খাইল।
সরস্বতীর পাদপদ্ম প্রণাম করিয়া। নিত্য নিত্য সেই বিপ্র করিয়া আনন্দ।
শুন পদ হরিষা আমার কণ্ঠে রৈয়া। আপনার স্ত্রীপুত্র করয় পালন।
ব্যাস বৃহস্পতি কদম্ শঙ্কর ভবানী। আর এক দিন বিপ্রা ভিক্ষারে যাইতে।
করিম প্রচার সত্যপীরের যে ছিন্নি। আচম্বিত সত্যপীর দেখিল গন্ধেতে।

শেষ :—

স্বর্গের মুদ্রা আজি ছিন্নি যে করিলা। সত্যপীরের ছিন্নি করএ যেইজনে।
আসিয়া পুছিয়া কথা ঘরে প্রবেশিলা। সম্পদ আসন হৈয়া বাড়ে দিনে দিনে।
সেই হতে সদাগরের সম্পদ অপার। পীরের পাঞ্চালী শুনএ যেই জনে।
সকল ভুবনে হৈল প্রশংসা তাহার। ঐশ্বর্য্য বাড়এ তার সঙ্কট,না মিলে।

৬। রাধার সংবাদ—ঋতুর বার মাস। শ্লোকসংখ্যা ৫৮।

আরম্ভ :—

কৈয় কৈব প্রাণ গত * রাধার সম্বাদ।
বিমায়া নিঠুর হৈয়া গেল প্রাণনাথ।
পউস মাসেতে ঘর্ত্ত পড়এ শিশির।
কৃষ্ণ বিনে চিত্ত মোর হইল চৌচির।
হেমন্তের গত বহে দীঘল যামিনী।
কৃষ্ণ বিনে কিরূপে রহিমু অভাগিনী।
মাঘ মাসেতে বড় নওল পড়ে হাড়। †
ছাড়ি গেল প্রাণকৃষ্ণ কি গতি আমার।

শেষ :—

মধু মিঠা লাগে মোর গরল সকল।
বহি যায় কর্ণাট রাগ জীবন বিফল।
বসুদেব মাসে রাধার না পুরিল আশ।
হীন কমরালী কহে এই ঋতুর বার মাস।
বারমাস পদবন্ধ করিলুম রচন।
অপরাধ পাইলে ক্ষমিবা গুণিগণ।
যেবা গায় যেবা শুনে ঋতুর বারমাস।
নর্ব্বদে কুশল তার আপদ বিনাশ।

৭। চৌত্রিশ অক্ষরের চৌতিশা। শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৪০।

আরম্ভ :—

কবে বোলে কত দিনে হইমু উদ্ধার।
কোন হেতু ভবের জঞ্জাল হৈব পার।।
কৃষ্ণ নাম মুখে তরি বোল বারে বার।
কৃষ্ণ বিনে নিস্তারিতে কেবা আছে আর।
খেণে খেণে উঠে মনে হরি রসবাণী।
খেণেকে গোবিন্দের নামে কাঁপয়ে পরাণি।

শেষ :—

হয়ে বোলে হরি হরি বোল সর্ব্বক্ষণ।
হাসিতে খেলিতে জন্ম যায় অকারণ।
হরি ভাবে হরি চিন্তা হবি কর সার।
হরি বিনে ভবেতে বন্ধু নাহি আর।

---

* গত—ঋতু।

† নওল—নবগুণ। হাড়—আড়া, শীত।

ক্ষয়ে বোলে ক্ষীণ হৈল সংসার আমলে।
বলতা করিয়া দশ সেরা অকালে॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা রসে নাহি না টেকিলায় পরিধান।
সেহোতে গোবিন্দের নাম মনে না লইলাম॥

ভণিতা :—

এসব বৃত্তান্ত জানি, ভজ কৃষ্ণ চূড়ামণি,
ভবের জঞ্জাল হৈবা পার।
দর্পনারায়ণ ঘোষে কয়, কৃষ্ণচন্দ্র দয়াময়,
অনন্তে যে অন্ত নাহি পায়॥

৮। সীতার দশমাস। শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫০।

আরম্ভ :—

বৈশাখ মাসের তিন নামা পুণ্যময়।
রাম হৈলেন নরপতি সর্ব্ব লোক কয়॥
তাহাতে পাবত বিধি দৈবের লিখন।
ভরতেরে দিবা রাজ্য রাম গেলেন বন॥
হায় প্রভু রামচন্দ্র ত্রিভুবন সার।
এই মাস গেল সীতা না কৈলা উদ্ধার॥

শেষ :—

উদ্ধারিয়া নিল সীতা রঘুবর নন্দন।
সবংশে রাবণ রাজা করিয়া নিধন॥
রাবণ বধিয়া সীতা করিল মোচন।
ভগ্ন সেনা লই রাজা হৈলা বিভীষণ॥
ভ্রাতৃসঙ্গে অযোধ্যাতে গেলেন রঘুমণি।
পাইলা পরমায়ু সীতা ঠাকুরাণী॥

ভণিতা :—

দশ মাসের দশ ঘোষা লওয়ে গণিয়া।
এই গীত জোড়াইসাকে শ্রীধর বানিয়া॥
শ্রীধর বানিয়া কয় মুরারি ওঝার নাতি।
রাবণ বধিয়া সীতা উদ্ধারিলা রঘুপতি॥

৯। সখীর বার মাস। শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫০।

আরম্ভ :—

শুন শুন প্রাণ সখি দুঃখের কাহিনী।
বিদেশে গেলা রে প্রভু ছাড়ি অভাগিনী॥

* * *

কৃপার সাগর প্রভু দয়ার ঠাকুর।
প্রথম কার্ত্তিক মাসে হইলা নিঠুর॥
গমন কালেতে প্রভুর কঠিন হিয়া প্রাণ।
এক তিল না দেখিলে না রহে পরাণ॥

শেষ :—

আশ্বিন কার্ত্তিক সখী পুরাইল বার মাস।
আসিব আসিব করি মনে ছিল আশ॥
আসিব আসিব করি মনে ছিল আশ।
না আসিল প্রাণনাথ হইলাম নিরাশ॥

ভণিতা :—

সেখ ফালালে কহে ভাবক ভাবিনী।
চিন্তা না করিও স্বামী আসিব আপনি॥

১০। নারায়ণ দেবের পাঞ্চালী।

প্রারম্ভ :—

জয় সদানারায়ণ, দয়া কর অনুক্ষণ,
মতি রহুক তুয়া পদতলে।
নিবেদিএ কায়মনে, রহে যেন অনুক্ষণে,
মধুকর যে হেন কমলে॥
সংসারের সার তুমি, কি বোলিতে পারি আমি,
তুমি চারি বেদের আধার।
তোমা সেবি প্রজাপতি, সৃষ্টি করে নিতি নিতি,
ত্রিভুবনে যার অধিকার॥

শেষ :—

শুভবার্ত্তা পাইয়া ঘরে, মাএ ঝিএ পূজা করে,
কন্যা হেতে হইল বিপাকে।
আমাদ্দা ডুবিল দেখি, কান্দে সাধু হৈয়া দুখী,
মামাতা বোলিয়া সাধু ডাকে॥
ডাকে দধা কৈন্যা ঘাটে, ভিজা ডুবা পুনঃ উঠে,
হরষিত হইল সদাগর।
পুরবাসী যত জন, সব আনন্দিত মন,
পূজার দ্রব্য করিল বিধান॥
ঘরে গিয়া মধুকর, পূজা দিলা সদা পর
সোনা প্রমাণে দ্রব্য আনি।

পুরোহিত দ্বিজবরে, আনিয়া তা সভারে,
সবে মিলি করিলা বোঝিয়ি।
ব্রাহ্মণের বেশ ধরি, নিজ মূর্ত্তি দেখা দিয়া,
দুঃখ ঘুচাইলেন নারায়ণ।
ভক্তবশ সদায় প্রভু, অন্য নাহি কভু,
এই কথা পুরাণ প্রমাণ॥

ভণিতা :—

ভাবি সত্যনারায়ণে দ্বিজ দীননামে ভণে,
ভাষা বাস মিত্রির পাঁচালী।
প্রভুর চরণে মন, রহুক অনুক্ষণ,
নিবেদিনু কবি পুটাঞ্জলি॥

১১। মঙ্গলচণ্ডিকার পাঁচালী।

প্রারম্ভ :—

প্রণমোঁহ পদে দেবতা আদ্যা দেবী।
ব্রহ্মা হরিহর যাকে যার পদ সেবি।
সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন তিন গুণে যুতা।
প্রসূতি পালন তুমি শিবশক্তিভূতা।
যার নামে স্মরণে তরিতে দুঃখ যায়।
মহাপদ পাই ভাঙ্গে ভবে নীলায়॥
তাহেলে চরিত্র কিছু রচিবারে আশা।
লোক পরি ভাষেরে কহিনু দেশী ভাষা॥
আছে অতি গম্ভির দেশ নর্ব্বর উজানি।
বিক্রম কেশরী তথা নৃপ শিরোমণি।

শেষ :—

সবে এবে পরিলেক রত্ন আভিষান।
বিক্রম কেশরী রাজা কৈলা অন্তর্দ্ধান॥
এই রাজা নামে দিলা জামাইয়ে কৌতুক
নিজ পুরে গেলে সাধু পাইলা যৌতুক॥
প্রাসাদে স্বর্ণ সব কাঞ্চনে নির্ম্মিল।
তার মধ্যে সুবর্ণ প্রতিমা স্থাপিল॥
বিধিমত অষ্টগুণ ষোড়শ উপচারে।
পূজিল মঙ্গলচণ্ডী মঙ্গল বাসরে॥
নানাবিধি বলিদান যতেক বিদিত।
পঞ্চশব্দে বাদ্য বাজে লোকে গায় গীত॥

ভণিতা :—

দুর্গার প্রসাদে সে জনে স্তবিব।
জন্মের সহস্র দুঃখ তখনে খণ্ডিব।

ইতি শ্রীযদন দত্ত রচিত মঙ্গলচণ্ডিকার পাঁচালী সমাপ্ত।

১২। রাধিকার চৌতিশা।

আরম্ভ :—

কহে সব গোপনারী উদ্ধব সংবাদি। খরশাণ বাণে মনমথ বহে তনু।
কোন অপরাধে ছাড়ি গেল গুণনিধি। গাইয়া গরল বিষ যদি না আইসে কানু।
কোথা হোতে আসিয়া যে দারুণ অকুর। গণ্ড তপ্তা কৈলুম মুই গোপনারী।
কৃষ্ণ হেন গুণনিধি নিল মধুপুর। গণপতি নাথ গেল আমা প্রেম ছাড়ি।

শেষ :—

বড় দুঃখ গণপতে জানাবি রহিনু। হিয়াত উথলে তাপ সতত অনঙ্গে।
সমুদ্র-উদ্ভব মুই খাইয়া মরিমু। হত অভাগিনী রাধা দৈবশর মাগে।
হরি পরে গতি নাই আমি অভাগিনী। ক্ষীণ তনু হৈল নিত্য কানুকে ভাবিয়া।
হতাশ কমল সেন সিদ্ধেশে দিনমণি। ক্ষমা দি রহিতে নারি বিদরয় হিয়া।

ভণিতা :—

ক্ষীণ দেবীদাসে কহে শুন গোপনারী। ক্ষিতি তলে মুক্ত হৈয়া ভনিলে শ্রীহরি।

১৩। কালকেতুর চৌতিশা।

আরম্ভ :—

কালে কালকেতু বাঁধে, কষ্ট পাইয়া কলেবরে, গোধারূপে পথ জুড়ি গড়াইয়া আছিলেন গৌরী,
কর্কশ বন্ধনে কারাগারে। জ্ঞান নাহি ছিল মোর মর্ম।
কৃপা কর রাঙ্গাপদে, কঙ্কণের অপরাধে, গলে দিয়া ওণচাসী, প্রাণীযে বাহিলুম আসি,
কলিঙ্গে কাটিব কালি মোরে। গৃহে দিলুম্ গৃহিণীর স্থানে।

শেষ :—

কন্ত ভোড়ে করম্ ভক্তি, হরিষ হইয়া মতি, দুহুমার মারি হানা, হত কর নৃপসেনা,
হিতকর হরের ঘরণী। হিমগিরি রাজার নন্দিনী।

ভণিতা :—

দেবদুর্গা খড়্গ ধরি, ক্ষয় কৈলা যত অরি, ক্ষণে ক্ষণে প্রণমিয়া, ক্ষিতি তলে লোটাইয়া,
ক্ষম দোষ অভয়া পার্ব্বতী। শ্রীচান্দ দাসের কাকুতি।

১৪। [illegible] চৌতিশা।

আরম্ভ :—

কৃষ্ণপ্রেমে ভরপুর [illegible] স্বরূপ।
[illegible] গণি লাঞ্ছন।
[illegible] করিল, ঢাকুর চরণে তোমার।
[illegible] কবি [illegible] অনুভব।

[illegible] খণ্ড করে আমি [illegible]
[illegible] পাপ [illegible]
[illegible] বসিয়া [illegible]
[illegible] পাপ [illegible]

শেষ :—

[illegible] কবি [illegible] আমারে।
[illegible] কহ, [illegible] ভাবিয়া।
[illegible] দুর্গতি।

[illegible] আপনা মোর [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] দুঃখ [illegible]

ভণিতা :—

[illegible] [illegible]

[illegible] সকল দুঃখ [illegible]

১৫। দময়ন্তীর চৌতিশা।

আরম্ভ :—

কহে [illegible] নিবেদন।
[illegible] নিবেদন।
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] বচন।
[illegible]
[illegible]
[illegible]

শেষ :—

[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

ভণিতা :—

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

১৬। ভূমিকাল গ্রহস্থি।

আরম্ভ :—

[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

শেষ :—

[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

ভণিতা :—

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

১৭। ভামাকু-চরিত্র।

আরম্ভ :—

এক দিন পরীক্ষিৎ বসিয়া নির্জ্জনে।
শুকে জিজ্ঞাসিলা শুক মুনি সেইখানে।
রাজা বোলে মহামুনি করি নিবেদন।
কহিবা আমাতে এক অপূর্ব্ব কথন।
সংক্ষেপে তামাকু কথা কহিবা তোমাত।
কেমনে তামাকু জন্ম হৈল পৃথিবীত।
দেবগণে মিলি যদি সমুদ্র মথিল।
বহু আদি নানা বস্তু তাতে জন্মিল।
যত দ্রব্য উপজিল যার যেই রুচি।
সহা বস্তু উপজিল তামাকুর বীচি।
লুকাইয়া রাখিল বীচি প্রভু গদাধরে।
পেলিল * তামাকুর বীচি পৃথিবী উপরে।
তামাকুর বীচি যদি ভূমিতে পড়িল।
জনম সফল হেন পৃথিবী মানিল।

শেষ :—

যতেক তামাকু খায় চাহেন জামাই।
বিলাপ মেলি নিঃশ্বাস ছাড়ে চিন্তাযুক্ত হই।
সানান্তে তামাকু খায় তারে বোলে ভাই।
হোক্কাটী দেও যদি এক টান খাই।
কহিলাম এই সব তামাকু চরিত্র।
তামাকুর জন্ম হৈতে ভুবন পবিত্র।

ভণিতা :—

বুলন্তে গড়াগড়ি যায় কান্দে কন্যা দীর্ঘ রায়,
রচিলেক সীতারাম করে।

অপমান দুঃখ মনে, সাধু ভাবে অন্ত মনে,
বোলে প্রিয় তামাকু-নল তোরে।

১৮। কৃষ্ণের একপদী চৌতিশা।

আরম্ভ :—

কদম্বের তলে কানু মুরলী বাজায়।
গলায় মুকুতা মালা করে রঙ্গ চঙ্গ।
খঞ্জন গমনী রাধে ফিরি ফিরি চায়।
ঘন ঘন নৃত্য করে মযূর করে বশ।

শেষ :—

বকুল কদম্ব মালা মালতী বিশোর।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হৈলা সেই ঠাই।
শতে শতে বৃন্দাবনে ওলরে ভ্রমর।
শতে শতে নাগরী নাগর ফিরাই।

ভণিতা :—

হরি হরি হরি হরি পরবন্ধ।
ক্ষণেকে বিশ্রামে বোলে বীর ভদ্রানন্দ।

১৯। কালিকাষ্টক শ্লোক।

আরম্ভ :—

জয় চণ্ডী বিঘ্নখণ্ডী চণ্ডমুণ্ডঘাতিনী।
তীক্ষ্ণ অসি রিপু নাশি দৈবারিমর্দ্দিনী।
শুম্ভ সুর দৈত্য দূর ভীমরূপে আপনি।
বন্দম্ শ্রীপাদপদ্মে শৈলরাজনন্দিনী।

শেষ :—

সবঃ অঙ্গ তিনি রঙ্গ অধর সুরঞ্জিণী।
শম্ভু ভাবে কৃপা আশে পদিলপদ্মে সুধা বামিনী।
ভুবন মোহন বেশ ভূত কামভঞ্জিনী।
বন্দম্ শ্রীপাদপদ্মে শৈলরাজনন্দিনী।

ভণিতা :—

শঙ্কু কহে হেম লয় দেখি রূপবিশ্ব।
বন্দম্ শ্রীপাদপদ্মে শৈলরাজনন্দিনী।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআবদুল করিম।

* পেলিল—ফেলিল।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

অতিরিক্ত সংখ্যা।

মহারাজ্ঞী ভারতেশ্বরীর তিরোভাব উপলক্ষে আহূত বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে সভাপতি কর্ত্তৃক পঠিত।

আজ আমরা আমাদের প্রজাবৎসলা পুণ্যবতী ভারতেশ্বরী বিক্টোরিয়ার পরলোক গমনে শোক প্রকাশের জন্য এই পরিষদে সম্মিলিত হয়েছি। এই সংসারে অনেক বিপ্লবিপত্তি আছে, দুঃখ যন্ত্রণা শোক তাপে আমরা পরিবৃত; তার মধ্যে এমন কতকগুলি অশুভ ঘটনা আছে, যার সংস্পর্শে শোকাবেগ উথলিত হয়ে হৃদয়কে প্লাবিত করে, কিন্তু তা মুখে ব্যক্ত করা যায় না, এও সেইরূপ দুর্ঘটনা। তেষট্টি বৎসর রাজত্বের পর মহারাণী পরলোকবাসিনী হলেন। এই দীর্ঘকালব্যাপী রাজত্বের মধ্যে কত সঙ্কট কত দুঃখক্লেশ অবনতমস্তক অটলহৃদয়ে বহন করে এইক্ষণে মৃত্যুর পরপারে শান্তিধামে উপনীত হয়েছেন। যে বিস্তৃত বিপুল পৃথিবীর শাসন ভার তাঁর হস্তে ন্যস্ত ছিল, তার মধ্য হতে সূর্য্য কখন অস্তমিত হয় না, এই বিশাল রাজ্যের গৌরবের কথা যেমন শ্রুতিমধুর, ইহার গুরুভার সেইরূপ দুর্ব্বহ। এই রাজ্যের স্থানে স্থানে যুদ্ধ বিগ্রহ রাজবিপ্লব দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপদ্রব অশেষ প্রকার অশান্তি নিরতই উত্থিত হচ্ছে। এই ত দেখতে দেখতে রুষ তুর্ক সমরানল ধূমকেতুর ন্যায় আমাদের সম্মুখে সমুদিত হল, তার সম্যক্ অবসান এখন পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। এই রুষের সমরের ভীষণ রক্তপাতে ভারতেশ্বরীর কোমল হৃদয় কতদূর আঘাত পেয়েছিল কে বলতে পারে? এই এক চিত্র; আর এক চিত্র অবলোকন করুন। এক দিকে ছায়া, অন্যদিকে আলোক। এক দিক অন্ধকার, অন্যদিক আলোকময়। এই উজ্জ্বল দৃশ্যে কাহার হৃদয় না উৎফুল্ল হয়? বিক্টোরিয়া যুগের যে অসীম রাজগৌরব, কোথায় তার তুলনা পাওয়া যায়? এই মহাযুগে কত মহাকবি, কত তত্ত্ববিদ্যাবিশারদ দূরদর্শী মুনি, কত বিজ্ঞানবিৎ মহাপণ্ডিত, কত নয়কুশল রাজনীতিজ্ঞ মহাব্যক্তি, কত প্রতিভাশালী মহাবীর জন্মগ্রহণ করে সমগ্র ভূমণ্ডলে জ্ঞান ধর্ম্ম সভ্যতা বিস্তারে সহায়তা করেছেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি, শিল্প, বাণিজ্য যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিক্ উজ্জ্বল সুন্দর রমণীয়; সেই দিকেই উন্নতির অজস্র ধারা লক্ষিত হয়। টেনিসন্ ব্রৌনিং স্বিনবর্ণ, — লাসল ফ্যারাডে হক্সলি টিণ্ডাল, ডারুবিন্ স্পেন্সর কেয়ারিন লিষ্টর, মিল বক্‌ল, মেকলে কার্লাইল, ব্রাইট, কবডেন, গ্লাডষ্টোন, বীকন্‌সফীল্ড, আর কত নাম বলব, যে

চিরস্মরণীয় নামাবলী কি এই যুগের মাহাত্ম্য সুস্পষ্টরূপে সপ্রমাণ করছে না? এই কালের মধ্যে ভারতও নিদ্রিত ছিল না; আমাদের মধ্যেও বড় বড় লোক উদয় হয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন: আমাদের জাতীয় জীবন বিকশিত হয়েছে, আমরা প্রবুদ্ধ হয়েছি; জ্ঞান-বিদ্যাবিস্তারও উৎকর্ষ লাভ করেছে; দেশের অবস্থা উন্নতির মুখে অনেকপদ অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু বিক্টোরিয়া দেবী এই অসীম গৌরবশালী বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী ব'লেই যে আমাদের প্রগাঢ় ভক্তি আকর্ষণ করেছিলেন তা নয়;—আমরা তাঁর নিজগুণেই মুগ্ধ। তাঁর অতুল্য প্রজাবাৎসল্য দয়া মায়া মমতা কে না অবগত আছেন? এই মহনীয় রাজধর্ম্মের মোহিনী শক্তিতে আমাদের চিত্ত বিশিষ্টরূপে আকৃষ্ট হয়েছিল। ব্রিটিশ রাজ্যের অন্যান্য ভাগের তুলনায় ভারতের উপর ভারতেশ্বরীর বিশেষ মমতা ছিল। সন্তানের প্রতি মায়ের যে স্নেহ-বাৎসল্য ভারতবাসীর প্রতি বিক্টোরিয়ার তাহাই ছিল। সিপাহি বিদ্রোহের অবসানে যখন দেশ লণ্ডভণ্ড, রাজপুরুষেরা রক্তের বদলে রক্তপাতের জন্য লালায়িত, প্রজাগণ ঘোর সঙ্কটে নিপতিত, সেই দুঃসময়ে তিনি স্বহস্তে রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ করিলেন এবং শান্তি বর্ষণ উদ্দেশে স্বহস্তে যে ঘোষণাপত্র প্রচার করলেন, তাহাই আমাদের মাগ্না চার্টা। মহারাজ্ঞী বিক্টোরিয়া এ দেশীয় রাজা প্রজার সহিত আলাপ পরিচয়ের সুবিধা বিবেচনায় এই বৃদ্ধ বয়সে কত পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক হিন্দুস্থানী ভাষা আরম্ভ করলেন। ভৃত্যবর্গের মধ্যে এতদ্দেশীয় ভৃত্য তাঁর বিশেষ আদরের পাত্র ছিল—এই সমস্ত অনুচরবর্গে পরিবৃত হয়ে থাকতে তিনি বড়ই ভালবাসতেন এবং তাঁহারই ইচ্ছানুসারে মৃত্যুর পরেও তাঁর দেহ রক্ষাবেক্ষণের জন্য এদেশীয় লোক নিযুক্ত হয়েছে। আমাদের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধিতে তিনি আহ্লাদিত হতেন—আমাদের দুঃখ কষ্টে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠত। সপ্ত সমুদ্র পারে তাঁর সেই প্রীতিপ্রবাহ এই দূর দেশে প্রবলবেগে প্রবাহিত হত, তার ভূরি ভূরি নিদর্শন আমরা সময়ে অসময়ে প্রাপ্ত হয়ে আমরাও আমাদের মাতৃভক্তি তাঁর চরণে প্রত্যুপহার দিয়াছি এবং এখন মাতৃহারা হয়ে রোদন করছি। আমাদের মাতৃস্বরূপা মহারাণী বিক্টোরিয়া এইক্ষণে তাঁর প্রজাবৃন্দকে শোকসাগরে ভাসাইয়া স্বর্গলোকে গমন করলেন, কিন্তু দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে অনেক জন্মের সুকৃতি বিনষ্ট হয় না। কালের করাল হস্ত রাজা প্রজা কেহই অতিক্রম করতে সক্ষম হয় না, কিন্তু এমন একটী জিনিস আছে যার উপর মৃত্যুরও অধিকার নাই—সে কি না সাধু জীবনের সাধু দৃষ্টান্ত। শ্রীমতী বিক্টোরিয়া দেবী আমাদের জন্য তাঁর বিমল চরিত্র বিশুদ্ধ জীবন রেখে গিয়েছেন, সেটী আমাদের অক্ষয় সম্পত্তি। তাঁর গার্হস্থ্য জীবন কি সুন্দর—কি পবিত্র! এমন পতিব্রতা সতী—এমন স্নেহময়ী জননী জগতে দুর্লভ। প্রিন্স আলবর্টের মৃত্যুর পরে তিনি বৈধব্যদশায় যে অচলা পতিভক্তির পরিচয় প্রদর্শন করে গিয়েছেন, তাতেই বিক্টোরিয়ার নাম সীতা সাবিত্রীর ন্যায় আমাদের দেশের রমণী-হৃদয়ে চিরমুদ্রিত থাকিবে। অনেক সম্রাট ইন্দ্র চন্দ্র সিংহ বীর বিক্রমাদি অনেক প্রকার উপাধি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু বিক্টোরিয়া নামের যথার্থ উপাধি 'সতী'। 'সতী'

আমাদের আদর্শ নারী—সতী বিক্টোরিয়া আমাদের চিরস্মরণীয় নাম। আমার সম্পূর্ণ আশা ও ধ্রুব বিশ্বাস এই যে, মহারাণীর অকলঙ্ক জীবনের সাধু দৃষ্টান্তে আমাদের নবীন সম্রাট [illegible] এডওয়ার্ড প্রজারঞ্জন ও প্রজাহিত ব্রতে বহুকাল রাজত্ব করিবেন এবং রাজমহিষী আলেকজান্দ্রা বিক্টোরিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে জনগণের প্রীতিভাজন হয়ে রাজসিংহাসন অনুবর্তন [illegible] রাজ্যশ্রী বর্দ্ধন করিবেন। এক্ষণে আমাদের জননীরূপিণী রাজ্ঞীর বিয়োগে সমুদায় ভারতের রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, নরনারী সকলেই সমানভাবে শোকে অভিভূত; এই বিস্তীর্ণ রাজ্যের চতুঃসীমা হইতে আমাদের মহারাণীর মৃত্যু সংবাদে হাহারব উত্থিত হচ্ছে; এই গভীর শোকোচ্ছ্বাসে যেন এক শরীরে একই নাড়ী দ্রুতবেগে সঞ্চালিত হচ্ছে, এবং আমাদের সকলেরই হৃদয়ের অন্তস্তল হতে একবাক্যে এই প্রার্থনা উঠছে—ঈশ্বর তাঁর অমৃত নিকেতনে তাঁর আত্মার চিরশান্তি বিধান করুন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

——)o(——

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

রাঙ্গামাটি বা কর্ণসুবর্ণ।

মুর্শিদাবাদ হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ ও বহরমপুর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে গঙ্গাস্রোতোধ্বস্ত একটী পল্লীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার রক্তবর্ণাভ পর্ব্বতাকার উচ্চ ভাগ শুষ্ক নদীগর্ভ হইতে যেন একটী বিস্তৃত দুর্গপ্রাকার বলিয়া বোধ হয়। এই পল্লীর সাধারণ নাম রাঙ্গামাটি। রাঙ্গামাটি পশ্চিম মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার ভূমিসংলগ্ন অসংখ্য ইষ্টকখণ্ড ও মৃৎপাত্রচূর্ণ তাহার প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ভাগীরথীতরঙ্গবিধৌত হওয়াতে যদিও ইহার উপরিভাগে পললময় মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়, তথাপি রাঙ্গামাটির স্বাভাবিক ভূমি যে রক্তবর্ণাভ, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার উপরিভাগে সামান্য মাত্র খনন করিলে কঠিন, রক্তবর্ণাভ ভূভাগ বহির্গত হয়, এবং যে স্থানে ইহার ভূমি ভাগীরথীগর্ভস্থ হইয়াছে, সেই খানেই তাহার প্রকৃত আকার আপনিই প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে। রাঙ্গামাটি পূর্ব্বে ভাগীরথীতীরবর্ত্তী একটী বিস্তৃত পল্লী ছিল, ক্রমে ভাগীরথী তাহাকে গর্ভস্থ করিতে আরম্ভ করিয়া শেষে আপনিই তাহার নীচে লুক্কায়িত পড়িয়াছেন। সেই জন্য রাঙ্গামাটির নিম্নে ভাগীরথীর প্রাচীন প্রবাহ, এক্ষণে একটী বৃহৎ বাঁওড়রূপে পরিণত হইয়াছে। ভাগীরথীর বর্ত্তমান প্রবাহ তথা হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে অবস্থিত, এবং উক্ত বাঁওড় ও ভাগীরথীর মধ্যে এক বিশাল চর মস্তকোত্তোলন করিয়া মহিমাসহকারে বিরাজ করিতেছে। বর্ষাকালে ভাগীরথীর সহিত উক্ত বাঁওড়ের যোগ হইয়া থাকে।

রাঙ্গামাটির প্রাচীনত্ব

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাঙ্গামাটি একটী প্রাচীন স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। বাস্তবিক ইহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিলে ইহাকে একটী বিস্তৃত নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া বোধ হয়। স্থানে স্থানে উচ্চ ডাঙ্গাভূমির ইষ্টকস্তূপ, পথে, ঘাটে, মাঠে, সর্ব্বত্রই ইষ্টক ও মৃৎপাত্রচূর্ণ এবং স্থানে স্থানে অট্টালিকাদির ভিত্তি দেখিয়া অনুমান হয় যেন পূর্ব্বে ইহা একটী সুবিশালিনী নগরীরূপে বিদ্যমান ছিল। ইহার নিকটস্থ তিন চারিখানি গ্রামে ঐ সমস্ত চিহ্ন যদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। রাঙ্গামাটির এমন স্থান নাই যেখানে দুই চারিখানি ইষ্টক বা মৃৎপাত্রচূর্ণ পড়িয়া নাই। আবার এই সমস্ত ইষ্টক ও মৃৎপাত্রচূর্ণের সহিত স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রা,

অঙ্গুরী ও অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্যাদিও মধ্যে মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যে সময়ে রাঙ্গামাটি ভাগীরথীপ্রবাহধ্বস্ত হইতেছিল, সেই সময়ে অনেক বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড, গৃহের ছাদ, খিলান, ভিত্তি, স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা, শঙ্খ এবং ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যাদি ভাগীরথীগর্ভস্থ হইতে দেখা গিয়াছে। যেখানে ইহার যমুনানারী প্রাচীন পুষ্করিণী ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই খানে অদ্যাপি বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড পতিত রহিয়াছে। এই সমস্ত চিহ্ন দর্শন করিয়া ইহাকে একটী প্রাচীন স্থান বলিয়া স্বতঃই মনে হইয়া থাকে। ইহা যে কোন প্রসিদ্ধ রাজার রাজধানী ছিল, প্রবাদ মুখে তাহাও শুনিতে পাওয়া যায়, এবং তাঁহার রাজপ্রাসাদের চিহ্ন আজিও সাধারণের নিকট সুপরিচিত রহিয়াছে। প্রবাদ ও ইতিহাসের সাহায্যে আমরা রাঙ্গামাটি সম্বন্ধে যতদূর বিবরণ অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাই প্রদান করিতে চেষ্টা করিতেছি।

রাঙ্গামাটি সম্বন্ধে প্রথম প্রবাদ এই যে, তাহা দাতাকর্ণ বা কর্ণসেনের রাজধানী ছিল; দাতাকর্ণ যে কুন্তীপুত্র ও যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ, তাহা সম্ভবতঃ সকলেই অবগত আছেন। কর্ণ স্বীয় পুত্র বৃষসেনের অন্নপ্রাশনের সময় লঙ্কাধিপতি বিভীষণকে রাঙ্গামাটির ভিন্ন ভিন্ন নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বিভীষণ তথায় উপস্থিত হইয়া স্বর্ণবৃষ্টি প্রবাদ করায় উক্ত স্থানের ভূমি রক্তবর্ণাভ হয়, সেই জন্য উহার নাম রাঙ্গামাটি হইয়াছে। কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, বিভীষণ কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইয়া ঐরূপ স্বর্ণবৃষ্টি করেন। আবার এরূপ প্রবাদও প্রচলিত আছে যে, ভূদেব নামে কোন ব্যক্তির তপস্যায় প্রীত হইয়া দেবগণ স্বর্ণবৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু দাতাকর্ণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া বিভীষণের আগমন ও তৎকর্ত্তৃক স্বর্ণবৃষ্টি হওয়ার প্রবাদই সমধিক প্রচলিত। এতদ্ভিন্ন আর একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, চাঁদসদাগর চম্পানগর হইতে আসিয়া রাঙ্গামাটিতে বাস করায় তাহার নিকটস্থ গ্রামের নাম চাঁদপাড়া হইয়াছে। চাঁদসদাগরের বিবরণ মনসার ভাসানে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি চম্পা বা চম্পকনগরে বাস করিতেন; উক্ত চম্পানগর সম্ভবতঃ ভাগলপুরের নিকটস্থ, ও প্রাচীন অঙ্গরাজ্যের রাজধানী।† এতদ্ভিন্ন আরও দুই

---

* রাঙ্গামাটি সাধারণতঃ কর্ণসেনের রাজধানী বলিয়া কথিত হয়, এবং দাতাকর্ণের পুত্রের অন্নপ্রাশনের সময় বিভীষণ কর্ত্তৃক স্বর্ণ বৃষ্টি হয়, এ প্রবাদও প্রচলিত, সুতরাং কর্ণসেন ও দাতাকর্ণ যে যুধিষ্ঠিরব্যক্তি তাহা প্রবাদের দ্বারাই বিরীদৃত হইতেছে। মহাভারতে লিখিত আছে যে, কর্ণের পূর্ব্ব নাম বসুষেন। ইন্দ্র অর্জ্জুনের মঙ্গলের জন্য ব্রাহ্মণবেশে বসুষেনের নিকট উপস্থিত হইয়া কবচ প্রার্থনা করিলে তিনি বীর গাত্র হইতে ছিন্ন করিয়া ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রকে উক্ত কবচ প্রদান করেন, সেইজন্য তিনি কর্ণ ও বৈকর্ত্তন নামে অভিহিত হন।

"প্রাগ্‌নাম তস্য কথিতং বসুষেণ ইতি ক্ষিতৌ।
কর্ণো বৈকর্ত্তনশ্চৈব কর্ত্তণাৎ তেন সোঽভবৎ॥"—মহা, আদি, ১১১ অ।

কর্ণের পুত্রের নাম বৃষসেন, সুতরাং বৃষসেনের পিতা বসুষেন, কর্ণসেন নামে যে অভিহিত হইবেন ইহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। মুর্শিদাবাদের ভূতপূর্ব্ব ইঙ্গিনিয়ার কাপ্তেন লেয়ার্ড সাহেব কর্ণসেনকে গৌড়ের রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গৌড়ে কর্ণসেন নামে কোন রাজা ছিলেন বলিয়া জানা যায় না। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেনের পিতা কর্ণসেনের উল্লেখ আছে, কিন্তু অজয়ের নিকট তাঁহার বাসস্থান ছিল।

† ভাগলপুরের নিকটস্থ চম্পানগর ব্যতীত আরও দুই একটী চম্পক নগরের উল্লেখ দেখা যায়। ত্রিপুরা জেলায় ও বর্দ্ধমানের পশ্চিমে চম্পক নামক গ্রাম আছে, কিন্তু রাঙ্গামাটির প্রবাদ অঙ্গরাজ্যের চম্পক নগরের সহিত সম্বন্ধিত।

একটী প্রবাদ রাঙ্গামাটিতে প্রচলিত আছে; সর্ব্বাপেক্ষা দাতাকর্ণেরই প্রবাদ বাঙ্গালার লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক রাঙ্গামাটি অঙ্গরাজ্যে কর্ণের রাজধানী ছিল কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ভাগলপুরের নিকটস্থ চম্পানগর যে তাঁহার রাজধানী ছিল এই সিদ্ধান্তই হইয়া থাকে, তবে রাঙ্গামাটি অঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তাহা তাঁহার সাময়িক বাসস্থান বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। * রাঙ্গামাটির নিকট গোকর্ণ নামক স্থানে কর্ণরাজার গোশালা ছিল বলিয়া কথিত হয়।

প্রবাদ পরিত্যাগ করিয়া রাঙ্গামাটির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে যাহা অবগত হওয়া যায়। উহা প্রাচীনকালে কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের রাজধানী ছিল, তাহাই অনুমান হয়। চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্গ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি ভারতের নানা স্থান পরিদর্শন করিয়া কী-লো-না-সু-ফা-লা-না বা কর্ণসুবর্ণ † রাজ্যে উপস্থিত হন। তাহার রাজধানীর নাম অনুসারে সমস্ত রাজ্যও কর্ণসুবর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। কর্ণসুবর্ণের স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ‡ কিন্তু পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া দেখিলে মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটিকেই উক্ত কর্ণসুবর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাঙ্গামাটির সহিত দাতাকর্ণের প্রবাদটী কিছু অধিক পরিমাণে বিজড়িত রহিয়াছে। বৃষকেতুর অন্নপ্রাশনের সময় বিভীষণ যে স্বর্ণ বৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে। কর্ণরাজার স্থানে সুবর্ণ বৃষ্টি হওয়ায়, আমরা তাহা হইতে কর্ণসুবর্ণ নামের উৎপত্তি বুঝিতে পারিতেছি। ¶ সেই কর্ণসুবর্ণ বঙ্গভাষায় ক্রমে কাণসোনা হইয়া উঠিয়াছে। দক্ষিণরাঢ়ীয় বারেন্দ্র কুলজী গ্রন্থে § দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাণসোনার রাজা প্রসিদ্ধ ছিলেন, এবং উক্ত কাণসোনা যে মুর্শিদাবাদের নিকটস্থ তাহাও কুলজী-গ্রন্থ হইতে বুঝিতে পারা যায়। রাঙ্গামাটি যে উক্ত কাণসোনা বলিয়া পূর্ব্বে অভিহিত হইত, তাহারও প্রমাণ আছে। অদ্যও অনেক সাধারণ লোকে তাহার কাণসোনা নামের বিষয় অবগত নহে,

---

* মেদিনীপুরের নিকট কর্ণগড় নামক স্থান দাতাকর্ণের রাজধানী ছিল বলিয়া কথিত হয়। সেই স্থানও অঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কর্ণগড়ও দাতাকর্ণের সাময়িক বাসস্থান হইতে পারে।

† চীন কী-লো-না-সু-ফা-লা-না সংস্কৃত কর্ণসুবর্ণের রূপান্তর মাত্র।

‡ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে সুবর্ণরেখা নদীতীরে কর্ণসুবর্ণ অবস্থিত ছিল, কাহারও কাহারও মতে বীরভূম, ও কাহারও কাহারও মতে সিংহভূমে কর্ণসুবর্ণ অবস্থিত ছিল বলিয়া কথিত হয়। তাম্রলিপ্তের ওয়াটসন সাহেব কাঞ্চন নগরকে কর্ণসুবর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; কিন্তু বহুতর প্রমাণদ্বারা মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটিই যে কর্ণসুবর্ণ ছিল ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। সেই সমস্ত প্রমাণ যথানুরূপ প্রদত্ত হইতেছে।

¶ হিউয়েন সিয়াঙ্গের আগমনের পূর্ব্ব হইতে কর্ণসুবর্ণ নাম যে প্রসিদ্ধ ছিল তাহা বুঝা যাইতেছে। কিন্তু কি প্রকারে উক্ত নামের সৃষ্টি হয় তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তবে দাতাকর্ণের স্থানে সুবর্ণ বৃষ্টি হওয়ার উক্ত প্রবাদে বিশ্বাস স্থাপন করিলে কর্ণ ও সুবর্ণ যোগে কর্ণসুবর্ণের উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে। যেখানে কর্ণ নিমন্ত্রণে বিভীষণ সুবর্ণবৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার নাম কর্ণসুবর্ণ হইয়াছে।

§ "শুন সবে দেব বংশ করি নিবেদন।
কাণসোনায় দেব হইল বারেন্দ্র পান।"—বারেন্দ্রকুলজী।

তথাপি অর্দ্ধ শতাব্দ পূর্ব্বে রাঙ্গামাটির অপর নাম যে কাণসোনা ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় মুর্শিদাবাদের ভূতপূর্ব্ব ইঞ্জিনিয়ার কাপ্তেন লোয়ার্ড সাহেব রাঙ্গামাটির বিবরণ প্রসঙ্গে তাহাকে রাঙ্গামাটি বা কাণসোনাপুরী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সময় পর্য্যন্ত রাঙ্গামাটি যে কাণসোনা নামে অভিহিত হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কাণসোনা সংস্কৃত কর্ণসুবর্ণের অপভ্রংশ, উক্ত বিষয়েরও প্রমাণের অভাব নাই। স্বর্গীয় রাধাকান্ত দেব বাহাদুর তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ অভিধান শব্দকল্পদ্রুমে আপনাদিগের বংশ বর্ণনোপলক্ষে এইরূপ লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের আদিপুরুষ শ্রীহরিদেব মুর্শিদাবাদ নগরের নিকট কর্ণস্বর্ণ সমাজে * বাস করিতেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলজীগ্রন্থানুযায়ী দেব বংশের সমাজ কাণসোনা যে উক্ত কর্ণস্বর্ণ হইতে অভিন্ন তাহাও বেশ বুঝা যাইতেছে। সুতরাং সংস্কৃত কর্ণসুবর্ণ বা কর্ণস্বর্ণ ক্রমে ক্রমে যে বাঙ্গালায় কাণসোনা হইয়া উঠিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই: এই রাঙ্গামাটি বা কাণসোনা যে হিউয়েন-সিয়াঙ্গ বর্ণিত কর্ণসুবর্ণ তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। হিউয়েন সিয়াঙ্গের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সিওকী গ্রন্থে † লিখিত আছে যে, তিনি কর্ণসুবর্ণ রাজধানীর নিকট লো-তো-বী-চী বা রক্তভিত্তি নামে সঙ্ঘারাম দর্শন করিয়াছিলেন। হিউয়েন-সিয়াঙ্গের জীবন বৃত্তান্তে উক্ত লো-তো-বী-চী কী-তো-মো-চী বা রক্তমৃত্তি নামে অভিহিত হইয়াছে। জুলিয়ান, বিল প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও লো-তো-বী-চী=কী-তো-মো-চীর রক্তমৃত্তি ‡ অর্থ করিয়া থাকেন। রাঙ্গামাটি যে উক্ত রক্তমৃত্তির অপভ্রংশ তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। সুতরাং কাণসোনা বা কর্ণসুবর্ণের সহিত রক্তমৃত্তি বা রাঙ্গামাটির যেরূপ সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটি যে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের রাজধানী ছিল সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতেই পারে না। হিউয়েন সিয়াঙ্গের বিবরণ হইতে কর্ণসুবর্ণের অবস্থান সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়া দেখিলে রাঙ্গামাটিকে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়। সিওকী ও হিউয়েন সিয়াঙ্গের জীবন-বৃত্তান্তে তাঁহার কর্ণসুবর্ণে উপস্থিতি সম্বন্ধে কিছু কিছু অনৈক্য আছে বলিয়া প্রথমতঃ বোধ হইয়া থাকে; কিন্তু বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে কর্ণসুবর্ণের সম্বন্ধে কোন অনৈক্যের উপলব্ধি হয় না। সিওকীতে লিখিত আছে যে,

---

* "আসীৎ শ্রীহরিদেবাখ্যঃ শ্রীহরেরংশরূপকঃ।
কায়স্থানাং কুলে দেববংশস্যৈবহেতুকঃ।
মুরশিদাবাদনগরগ্রামমধ্যে স্বজনপালকঃ।
কর্ণস্বর্ণনামধেয়সমাজে বাসকারকঃ।"

† হিউয়েন সিয়াঙ্গ সম্বন্ধে দুই খানি গ্রন্থ প্রচলিত আছে; একখানির নাম সিওকী বা পশ্চিম দেশের বৃত্তান্ত; উক্ত গ্রন্থ হিউয়েন সিয়াঙ্গের প্রকৃত উপাদান লইয়া পীলকী রচনা করেন। জুলিয়ান অনুমান করেন যে, হিউয়েন সিয়াঙ্গ বহুদিন বিদেশে বাস করায় চীন ভাষার পরিপাটী বিস্মৃত হওয়ায় নিজে গ্রন্থ লিখিতে সাহসী হন নাই। দ্বিতীয় গ্রন্থখানি হিউলী ও ইবেন সাঙ্গ লিখিত হিউয়েন সিয়াঙ্গের জীবনবৃত্তান্ত।

‡ Red mud (Buddhist Records of the Western World Vol. II p. 202 and Life of Hiuen-Tsiang by S. Beal p. 131.).

হিউয়েন সিয়াঙ্গ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে কামরূপে গমন করেন, তথা হইতে সমতট অতিক্রম করিয়া তাম্রলিপ্তি প্রদেশে উপস্থিত হন। তাম্রলিপ্তি হইতে ৭০০ লী * উত্তর পশ্চিমে কর্ণসুবর্ণ রাজ্যে আগমন করেন। বর্ত্তমান মালদহ প্রদেশ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া কথিত হয়, এবং তাম্রলিপ্তি বর্ত্তমান তমলুকের প্রাচীন নাম মাত্র। রাঙ্গামাটি বা কাণসোনা তাম্রলিপ্তি হইতে ঠিক উত্তর পশ্চিমে না হইলেও তাম্রলিপ্তি প্রদেশ হইতে কর্ণসুবর্ণ রাজ্য যে উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত তিনি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং হিউয়েন-সিয়াঙ্গ তাম্রলিপ্তি প্রদেশ হইতে কর্ণসুবর্ণ রাজ্যে উপস্থিত হওয়ার কথাই লিখিয়াছেন। বিশেষতঃ কর্ণসুবর্ণ হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে উড়িষ্যা প্রদেশে গমন করা যায়। রাঙ্গামাটির কর্ণসুবর্ণের রাজধানী হওয়ার পক্ষে কোন গোলযোগেরই সম্ভাবনা নাই। আবার জীবন-বৃত্তান্তে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে, হিউয়েন-সিয়াঙ্গ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতেই কর্ণসুবর্ণে গমন করিয়াছিলেন। মালদহ প্রদেশ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইলে তাহার নিকটস্থ কর্ণসুবর্ণের রাজধানী রাঙ্গামাটি হওয়াই অধিকতর সম্ভব, সুতরাং সিওকী ও জীবন-বৃত্তান্তে হিউয়েন-সিয়াঙ্গের কর্ণসুবর্ণে উপস্থিতি সম্বন্ধে কিছু কিছু অনৈক্য থাকিলেও কর্ণসুবর্ণের স্থান সম্বন্ধে যে কোনই অনৈক্য নাই, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। উক্ত উভয় গ্রন্থ হইতে রাঙ্গামাটির অবস্থানানুসারে তাহাকে কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের রাজধানী বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে।

হিউয়েন-সিয়াঙ্গের কথিত কর্ণসুবর্ণের বিবরণ।

এক্ষণে হিউয়েন-সিয়াঙ্গ কর্ণসুবর্ণ সম্বন্ধে যেরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে। সিওকীতে লিখিত আছে যে, কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের পরিধি প্রায় ১৫০ ক্রোশ, ও রাজধানী প্রায় ২ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। ইহাতে অনেক লোক বাস করিত। গৃহস্থেরা ধনশালী ও সচ্ছন্দচিত্ত ছিল। ভূমি নিম্ন ও চিক্কণ, এবং তাহা রীতিমত কর্ষিত হইয়া নানাপ্রকার শস্য উৎপাদন করিত। জল বায়ু স্বাস্থ্যকর, ও লোকের আচার ব্যবহার বিনয়পূর্ণ ও ভদ্রজনোচিত ছিল। অধিবাসীরা বিদ্যার যথেষ্ট সমাদর করিত, ও আগ্রহ সহকারে তাহাতে অভিনিবিষ্ট হইত। তাহারা হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মাবলম্বী। কর্ণসুবর্ণ রাজ্যে ১০টী সঙ্ঘারাম ও ২০০০ আচার্য্য ছিল। তাহারা সম্মতীয় মতাবলম্বী। উক্ত রাজ্যে ৫০টী দেবমন্দির দৃষ্ট হইত এবং অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। এতদ্ব্যতীত আরও ৩টী সঙ্ঘারাম ছিল। † উক্ত সঙ্ঘারামের লোকেরা দেবদত্তের ‡ মতানুসারে নবনীত ব্যবহার করিত না। রাজধানীর পার্শ্বে লো-তো-বী-চী § বা রক্ত ভিত্তি নামে সঙ্ঘারাম। তাহার গৃহগুলি প্রশস্ত ও অত্যন্ত সুন্দর, চূড়া অত্যন্ত উচ্চ। এই মঠে রাজ্যের সাবতীয় বিখ্যাত পণ্ডিত ও সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ একত্রিত

---

* লী=১/৩ মাইল।

† জীবন-বৃত্তান্তে ৩০০ সঙ্ঘারামের কথা আছে। (Beal's Life of Hiuen Tsiang p. 131.)

‡ দেবদত্ত বুদ্ধের আত্মীয় ও শিষ্য ছিলেন, পরে তাঁহার শত্রু হইয়া উঠেন। তিনি একদা সঙ্ঘ ভেদ করেন। বুদ্ধের মতের সহিত দেবদত্তের মতের অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

§ জীবন বৃত্তান্তে লো-তো-বী-চী স্থলে কী-তো-কা-শি-লো রক্ত বৃত্তি লিখিত আছে। (Beal's Life of Hiuen Tsiang p. 131)

হইত এবং তাঁহারা পরস্পরের জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেন। পূর্ব্বে তথায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল না। এক সময়ে দাক্ষিণাত্য হইতে একজন হিন্দু পণ্ডিত কর্ণসুবর্ণ রাজ্যে উপস্থিত হন। উদর তাম্রপত্রে মণ্ডিত করিয়া ও মস্তকে এক প্রজ্বলিত মশাল লইয়া দণ্ডহস্তে সগর্ব্ব পাদবিক্ষেপে তিনি কর্ণসুবর্ণে প্রবেশ করেন, ও আপনার সহিত বিচার করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে সকলকে আহ্বান করিয়া একজন প্রতিপক্ষের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। লোকে তাঁহার অদ্ভুত সজ্জার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এইরূপ উত্তর করিতেন যে, অত্যধিক বিদ্যার প্রভাবে তাঁহার উদর বিদীর্ণ হওয়ার আশঙ্কায় তিনি তাহাকে তাম্রপত্রাবৃত করিয়াছেন, ও অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকদিগের দুঃখে কাতর হইয়া মস্তকে আলোক ধারণ করিয়াছেন। দশদিন পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার সহিত বিচারে অবতীর্ণ হয় নাই। রাজ্যের বিদ্বান্ ও পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহই তর্কযুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহস করেন নাই। রাজা ইহাতে দুঃখিত হইয়া এইরূপ প্রকাশ করেন যে, রাজ্য মধ্যে কি এতদূর অজ্ঞতা বিস্তৃত হইয়াছে যে, কেহই এই ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হইতেছে না? ইহা রাজ্যের পক্ষে বড়ই দুর্নামের কথা। রাজ্যের নির্জ্জন প্রদেশ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। ইহার পর এক ব্যক্তি রাজার নিকট প্রকাশ করে যে, বনমধ্যে একটী অদ্ভুত লোক বাস করেন। তিনি আপনাকে শ্রমণ বলিয়া পরিচয় দেন। শ্রমণ অত্যন্ত বিদ্বান্, এক্ষণে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য নির্জ্জনে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি এই অধার্ম্মিক লোকের নিকট সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মমত স্থাপন করিতে পারিবেন। রাজা এই কথা শুনিয়া নিজেই তাঁহাকে আহ্বান করেন। শ্রমণ উত্তর দেন যে, আমি একজন দাক্ষিণাত্য, দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া এখানে পথিকের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছি। আমার ক্ষমতা যৎসামান্য, তথাপি আমি আপনার ইচ্ছানুসারে যাইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু কিরূপ ভাবে বিচার হইবে আমি তাহার কিছুই অবগত নহি। যদি আমি পরাজিত না হই, তাহা হইলে আমার অনুরোধ ক্রমে আপনাকে একটী সঙ্ঘারাম স্থাপন করিতে হইবে, এবং উক্ত সঙ্ঘারামে বৌদ্ধ নীতির গৌরব ঘোষণার জন্য বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত জনগণ আহূত হইবেন। রাজা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে শ্রমণ রাজার আহ্বান অনুসারে বিচার-ক্ষেত্রে উপস্থিত হন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তাঁহার সম্প্রদায়ের ত্রিশ সহস্র কথা উচ্চারণ করেন। তাঁহার গম্ভীর যুক্তি ও রাশি রাশি দৃষ্টান্ত সমস্ত বিচার পদ্ধতিকে হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছিল। শ্রমণ তাঁহার কথা শুনিয়া একেবারে সমস্তই হৃদয়ঙ্গম করেন, ও কয়েক শত কথায় সকল আপত্তির উত্তর দেন। পরে তিনি উক্ত পণ্ডিতকে তাঁহাদিগের সাম্প্রদায়িক মতের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহার উত্তর সকল বিক্ষিপ্ত ও যুক্তি বলহীন হইয়া পড়ে, এবং ক্রমে মুখরোধ উপস্থিত হওয়ায়, উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া প্রস্থান করিতে বাধ্য হন। রাজা শ্রমণকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া রক্ত মৃত্তি সঙ্ঘারাম স্থাপন করেন। * তদবধি

* কেহ কেহ হিউয়েন-সিয়াঙ্গকে উক্ত শ্রমণ বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন, কিন্তু হিউয়েন-সিয়াঙ্গের বর্ণনার পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে তাহা বোধ হয় না।

নিজে ভগিনীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। বিন্ধ্যারণ্যে দিবাকর মিত্র নামে গ্রহবর্ম্মার পরিচিত এক বৌদ্ধ যতির নিকট রাজ্যশ্রীর সংবাদ পাইয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করেন, এবং যতির আশ্রমে রাখিয়া গঙ্গাতীরে নিজ সৈন্যের সহিত মিলিত হন। হর্ষচরিতে রাজা হর্ষের বিবরণ এই পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে; কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, তিনি তৎপরে গৌড়াধিপতিকে পরাজিত করিয়া কান্যকুব্জের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। ভারতের পঞ্চ প্রদেশ + তাঁহার করায়ত্ত হয়। উক্ত পঞ্চ প্রদেশের মধ্যে গৌড় অন্যতম। হিউয়েন সিয়াঙ্গ এই গৌড়ের অধিপতিকে কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হিউয়েন সিয়াঙ্গ কান্যকুব্জরাজ হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্যের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কান্যকুব্জ প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিত আছে যে, কান্যকুব্জের তদানীন্তন রাজা জাতিতে বৈশ্য ছিলেন। † তাঁহার নাম হর্ষবর্দ্ধন। হর্ষবর্দ্ধনের পিতার নাম প্রভাকরবর্দ্ধন ও ভ্রাতার নাম রাজ্যবর্দ্ধন। প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর রাজ্যবর্দ্ধন সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। রাজ্যবর্দ্ধন অত্যন্ত ধার্ম্মিক রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই সময়ে পূর্ব্ব ভারতের কর্ণসুবর্ণরাজ্যে শশাঙ্কনামে নরপতি রাজত্ব করিতেন। তিনি অমাত্যবর্গকে আহ্বান করিয়া বলিতেন যে প্রত্যন্ত প্রদেশে ধার্ম্মিক রাজা থাকিলে অত্যন্ত অসুখের বিষয় হয়। পরে অমাত্যগণের পরামর্শক্রমে শশাঙ্ক রাজ্যবর্দ্ধনকে নিহত করেন। রাজ্যবর্দ্ধনের অমাত্যবর্গ হর্ষবর্দ্ধনকে রাজত্ব করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি গঙ্গাতীরস্থ অবলোকিতেশ্বর নামে বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তির নিকট উপস্থিত হইয়া রাজত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, বোধিসত্ত্ব এইরূপ উত্তর প্রদান করেন যে, পূর্ব্বজন্মে তুমি এই বনের একজন সন্ন্যাসী ছিলে, তপস্যাপ্রভাবে পুণ্যসঞ্চয় করিয়া তুমি রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। কর্ণসুবর্ণের রাজা বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে, তুমি রাজত্ব লাভ করিলে তাহার অনেক উন্নতি সাধন করিতে পারিবে; যদি তুমি বিপন্নের সহায় হও, তাহা হইলে পঞ্চ ভারত তোমার করায়ত্ত হইবে। আমার উপদেশানুসারে চলিলে আমার গুপ্ত ক্ষমতাবলে তোমার প্রতিবেশী রাজন্যবর্গ তোমার উপর বিজয় লাভ করিতে পারিবে না। তুমি কখনও সিংহাসনে উপবেশন ও আপনাকে মহারাজ বলিয়া ঘোষণা করিও না। বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে হর্ষবর্দ্ধন রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হন। তিনি আপনাকে কুমার বলিয়া পরিচয় দিতেন। শীলাদিত্য তাঁহার উপাধি ছিল। হর্ষবর্দ্ধন পাঁচ সহস্র হস্তী দুই সহস্র অশ্বারোহী ও পঞ্চাশ সহস্র পদাতিক সেনার সহিত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন, ও ক্রমে ক্রমে পঞ্চভারত আপনার করায়ত্ত করেন। কর্ণসুবর্ণ উক্ত পঞ্চ ভারতের অন্যতম। হিউয়েন সিয়াঙ্গের সময় রাজা হর্ষবর্দ্ধনের ষাট সহস্র রণ হস্তী ও লক্ষ অশ্বারোহী সেনা ছিল। বহু বৎসর হইতে তাঁহার রাজ্যে যুদ্ধ বিগ্রহের নাম মাত্র ছিল না। হিউয়েন সিয়াঙ্গ হর্ষবর্দ্ধনকে বৌদ্ধ নরপতি

---

* হিউয়েন-সিয়াঙ্গ Five Indies বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। Five Indies সম্ভবতঃ পঞ্চগৌড় হইবে।

† বীলসাহেব বৈশ্যকে রাজপুতজাতির বাইশসম্প্রদায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হিউয়েন-সিয়াঙ্গ সম্ভবতঃ ক্ষত্রিয় স্থলে বৈশ্য লিখিয়াছেন, তাঁহার এই প্রকারের ভ্রম আরও দুই এক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়।

বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, এবং তাহার বর্ণনায় হর্ষবর্দ্ধনের নির্ম্মিত অনেক স্তূপ ও সঙ্ঘারামের কথা উল্লিখিত হইয়াছে: কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের প্রতি তাঁহার অনুরাগের কথা উল্লেখ করিতে হিউয়েন সিয়াঙ্গ বিস্মৃত হন নাই। হর্ষবর্দ্ধনের শিলালিপি হইতে তাঁহাকে 'পরম মাহেশ্বর', রাজ্যবর্দ্ধনকে 'পরমসৌগত' ও প্রভাকরবর্দ্ধনকে 'সৌর' বলিয়া জানিতে পারা যায়। হর্ষচরিত হইতেও হর্ষবর্দ্ধনকে হিন্দু বলিয়া অনুমান হয়; এবং দিবাকর মিত্রের সংসর্গ হইতে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগের প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ শেষ জীবনে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগের বৃদ্ধি হইয়াছিল। রাজা হর্ষবর্দ্ধন যে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রাজা হর্ষবর্দ্ধনের বিবরণ হইতে কর্ণসুবর্ণ বা গৌড়াধিপ শশাঙ্কের বিষয় জানিতে পারা যায়, কিন্তু তিনি কোন্ বংশসম্ভূত ছিলেন তাহা স্থির করিতে হইলে বিশেষরূপ আলোচনা আবশ্যক হইয়া উঠে। নানারূপ প্রমাণের দ্বারা স্থির হয় যে, রাঙ্গামাটি বা কর্ণসুবর্ণ গুপ্তবংশের কোন একটী শাখার রাজধানী ছিল, এবং শশাঙ্ক উক্ত গুপ্তবংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শশাঙ্ক তাঁহার উপাধি ছিল, কিন্তু শশাঙ্কের প্রকৃত নাম কি তাহা বুঝিবার উপায় নাই। রাঙ্গামাটি যে গুপ্ত বংশের রাজধানী ছিল, মুদ্রাদির আবিষ্কার দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমরা ঐ স্থানের দুইটী মুদ্রার আবিষ্কার করিয়াছি। উক্ত মুদ্রাদ্বয়ের একদিকে কমলাত্মিকা মূর্ত্তি ও অপর দিকে নরমূর্দ্ধর রাজমূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের একটীতে "রবি গুপ্ত" ও অপরটীতে "জয় মহারাজ" লিখিত আছে। শেষোক্তটীর সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয় নাই।

শশাঙ্ক গুপ্তবংশের।

---

* উক্ত দুইটী মুদ্রার মধ্যে একটী রাঙ্গামাটির নিকটস্থ রাজপুর গ্রামের জনৈক কুলকামীর নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। রাজপুরের নিকটস্থ রাজবাড়ীর ভাঙ্গা ভূমি কর্ষণ কালে উক্ত মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রাজবাড়ী ভাঙ্গা দাতাকর্ণের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। মুদ্রাটীর একদিকে রাজমূর্ত্তি, তাঁহার বাম হস্তে ধনুক ও দক্ষিণ হস্তে তীর; রাজার মুকুট স্পষ্ট, অবশিষ্ট দুই পার্শ্বে লম্বমান, তাঁহার উপর বাম দিকে [illegible] তীরের পার্শ্বে দক্ষিণ ভাগের পেটীর লম্বমান অংশের সহিত "র" অক্ষর, বাম হস্তের নিম্ন দিকে, তীরের [illegible] দেশে 'গু', উভয় পদের অন্তর্বর্ত্তী স্থানে 'প' এবং ধনুকের নিম্নে 'ত' ইহাদের 'রবিগুপ্ত' এই পাঠ হইয়াছে। বিশ্বকোষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এই পাঠোদ্ধার করিয়াছেন ও সাহিত্য-পরিষদের পূর্ণ [illegible] এই মুদ্রা প্রদর্শিত হইয়াছে। গুপ্ত বংশের যতগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কোনটীতে রবিগুপ্ত নাম দৃষ্ট হয় না, সুতরাং প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট উহা যে অজ্ঞাত-পূর্ব্ব পদার্থ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। [illegible] রাজা রবিগুপ্তকে কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া অনুমান করেন। আমাদের সিদ্ধান্তও অনুমান অসঙ্গত নহে। দ্বিতীয় মুদ্রাটী রাঙ্গামাটির নিকটস্থ শ্রীপুরনিবাসী ঘোষের পুত্রের নিকট হইতে [illegible] যায়। উক্ত মুদ্রাটী ঘোষ হস্তান্তর করেন নাই, মুদ্রাটী প্রাপ্তির পর হইতে তাঁহাদের বাটীতে আছে। উহাতে [illegible] উক্ত মুদ্রা হস্তান্তর করিতে অনিচ্ছুক। আমরা উক্ত মুদ্রার ছাপ ও ফটো লইয়াছি, উক্ত মুদ্রাদ্বয় এক [illegible] ধনুর্দ্ধর রাজমূর্ত্তি ও অপর দিকে কমলা মূর্ত্তি, তাহাতে জয় মহারাজ এই কয়টী অক্ষর স্পষ্ট দেখা যায়। [illegible] কমলাত্মিকার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, কোনও গুপ্ত মুদ্রায় তাহা দৃষ্ট হয় না। [illegible] পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ এই মুদ্রার গুপ্ত মুদ্রার দেবীকে কেবল লক্ষ্মী মূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু [illegible] প্রকারে তাহা কমলাত্মিকা মূর্ত্তি। কোনও কোনও গুপ্ত মুদ্রায় সিংহবাহিনী মূর্ত্তিও দৃষ্ট হয়। [illegible] বুঝা যায় যে, গুপ্ত রাজগণ শক্তি উপাসক ছিলেন। প্রথম মুদ্রাটী ওজনে ৮৮০ গ্রেন বা ১৭৬ রতি। [illegible] স্বর্ণের ভাগ সমাজে পরিমাণ আছে। দ্বিতীয়টীর ওজন ৮১০ গ্রেন, তাহা বৌপানির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়।

অনুসন্ধানে অবগত হওয়া যায় যে, রাঙ্গামাটি হইতে ঐ জাতীয় অনেক স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং উহা যে গুপ্তবংশীয়গণের একটী প্রধান স্থান ছিল, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। প্রথমে পাটলিপুত্র গুপ্তসম্রাট্‌গণের রাজধানী ছিল; ক্রমে গুপ্তবংশীয়গণ বহুশাখায় বিভক্ত হইয়া ভারতের নানা স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। রাঙ্গামাটি ঐরূপে তাঁহাদের কোন একটী শাখার রাজধানী হইয়া উঠে, এবং উক্ত শাখা হইতেই শশাঙ্ক উদ্ভূত হন বলিয়া অনুমান হয়। হিউয়ান সিয়াঙ্গের ভারতবর্ষে আগমন করার সময়ে গুপ্তবংশীয়গণ যে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজত্ব করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মালবরাজপুত্র কুমার গুপ্ত ও মাধব গুপ্ত রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধনের অনুচর ছিলেন। স্কন্দ গুপ্ত ও ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহাদিগের প্রধান অমাত্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। হর্ষবর্দ্ধনের শিলালিপিতে দৃষ্ট হয় যে, রাজ্যবর্দ্ধন দেবগুপ্ত প্রভৃতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। * গৌড়াধিপতি বা কর্ণসুবর্ণরাজ যে উক্ত গুপ্তবংশীয় ছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। হর্ষচরিতে লিখিত আছে যে, মালবরাজ কর্ত্তৃক কান্যকুব্জাধিপ নিহত ও রাজ্যশ্রী কারারুদ্ধ হইলে রাজ্যবর্দ্ধন মালবরাজকে নিহত করেন; অবশেষে তিনিও গৌড়াধিপ কর্ত্তৃক নিহত হন; তৎপরে কান্যকুব্জ গৌড়াধিপতি গুপ্ত কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। † রাজ্যশ্রী কান্যকুব্জ হইতে গৌড়ে আনীত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। পরে গুপ্ত নামক কুলপুত্রের অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি বিন্ধ্যাটবী প্রবেশ করেন। ‡ গৌড়াধিপ গুপ্ত কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ গৃহীত হওয়ায়, এবং কুলপুত্র গুপ্ত কর্ত্তৃক রাজ্যশ্রী মুক্তিলাভ করায় গৌড়ের তদানীন্তন অধিপতি যে গুপ্তবংশজ ছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে, এবং উক্ত গৌড়াধিপ যে কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক তাহাও পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ শশাঙ্ককে নরেন্দ্র গুপ্ত বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন। নরেন্দ্র গুপ্তের মুদ্রা দ্বারা তাঁহার যে সময় স্থির হয়, হিউয়েন সিয়াঙ্গের আগমন ও শশাঙ্কের রাজত্ব তাঁহাদের মতে সেই সময়ে হওয়ায় তাঁহারা উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। অন্য কোন বিশেষ প্রমাণ না পাওয়ায় আমরা নরেন্দ্র গুপ্তকে শশাঙ্ক বলিয়া স্থির করিতে সাহসী হইতে পারি না; এবং হিউয়েন সিয়াঙ্গ ও শশাঙ্কের সময় সম্বন্ধেও আমরা তাঁহাদের

---

* "রাজানো বহবো দুষ্টবাজিনঃ ইব শ্রীদেবগুপ্তাদয়ঃ।
কৃত্বা যেন কথাপ্রসঙ্গবিমুখাঃ সর্ব্বে সমং সংযতাঃ।"

† দেবভূয়ং গতে দেবে রাজ্যবর্দ্ধনে গুপ্তনাম্না চ গৃহীতে কুশস্থলে দেবী রাজ্যশ্রীঃ পরিব্রাজ্য বন্ধনাৎ বিন্ধ্যাটবীং সপরিজনা প্রবিষ্টেতি লোকতো বার্ত্তামশৃণবম্। (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদিত হর্ষচরিত ৭ম উচ্ছ্বাস)

দেবভূয়ং গতে রাজ্যবর্দ্ধনে গৌড়েবগৃহীতে চ কুশস্থলে দেবী রাজ্যশ্রীঃ পরিব্রাট্‌ বন্ধনাবিন্ধ্যাটবীং সপরিজনা প্রবিষ্টেতি লোকমুতো বার্ত্তামশৃণবম্। (জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত হর্ষচরিত ৭ম উচ্ছ্বাস)

কুশস্থল কান্যকুব্জের নামান্তর। উপরোক্ত পাঠদ্বয় হইতে 'গুপ্তনাম' ও 'গৌড়ের' একার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, সুতরাং গৌড়াধিপতি যে গুপ্তনামা ছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

‡ ভুক্তেবাশ্চ বন্ধনাৎ প্রভৃতি বিস্তরতঃ শ্রুত্বা কান্যকুব্জাৎ গৌড়সম্ভ্রমং শ্রুতিতো গুপ্তনাম্ন কুলপুত্রেন নিষ্কাসনং (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদিত হর্ষচরিত ৮ম উচ্ছ্বাস)

এখানেও গৌড় রাজবংশীয় গুপ্তনামা কুলপুত্রের উল্লেখ আছে।

পূর্ণবর্ম্মা অবশেষে [illegible] চব্বিশ ফুট উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া ফেলেন। হিউয়েন সিয়াঙ্গ উক্ত প্রাচীরের [illegible] উচ্চ দেখিয়াছিলেন। বোধিদ্রুম ধ্বংসের পর শশাঙ্ক রাজা তাঁহার নিকট [illegible] স্থানে এক মহেশ্বর মূর্ত্তি স্থাপনের জন্য তাঁহার [illegible] কর্ম্মচারীকে [illegible] উক্ত কর্ম্মচারী বৌদ্ধ হওয়ায় বুদ্ধমূর্ত্তি অপসারণে [illegible] অবশেষে চুনের [illegible] ইষ্টকের [illegible] নির্ম্মাণ করাইয়া বুদ্ধমূর্ত্তিকে [illegible] করিয়া [illegible] এবং তাহার বাহিরে এক মহেশ্বর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া রাজাকে তাহার সংবাদ প্রেরণ [illegible] সংবাদ পাইয়া [illegible] হন, তাঁহার সমস্ত অঙ্গ ব্রণ-পরিপূর্ণ হইয়া [illegible] মাংস পচিয়া [illegible] অবশেষে তিনি মৃত্যুমুখে নিপতিত [illegible] তাঁহার [illegible] চেষ্টায় [illegible] করিয়া [illegible] করেন। হিউ-[illegible] করিয়া [illegible] করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে কদাপি [illegible] নরপতিরাজ পূর্ণবর্ম্মার [illegible] হইতেন। [illegible] তিব্বতীয় গ্রন্থে পূর্ণবর্ম্মা অশোক বংশের [illegible] ; [illegible] হইতেন বহুবর্ষ পূর্ব্বে [illegible] পূর্ণবর্ম্মার জন্মের [illegible] বা ১১৩০ বৎসর [illegible] পূর্ণবর্ম্মার ২৮৩ বৎসর [illegible] বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম ধ্বংস করেন, [illegible] অন্ধ্র বংশ [illegible] রাজত্ব করেন। [illegible] সম্রাট গুপ্তবংশের অধীশ্বর হইয়া ভারতের [illegible] সাম্রাজ্যের [illegible] করেন। [illegible] গুপ্ত [illegible] রাজত্ব সময়েই [illegible] হয়, এবং [illegible] খৃষ্টীয় [illegible] নষ্যভাগ তাঁহার উপাধি [illegible] সমর্থ হইয়াছিল বলিয়া থাকেন। সুতরাং পূর্ণবর্ম্মা [illegible] বংশের শেষ রাজা হইতে [illegible] কর্ণসুবর্ণের শশাঙ্ক হইতে পারেন না, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। তবে যদি হিউয়েন সিয়াঙ্গ পূর্ণবর্ম্মাকে অশোকবংশীয় বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐতিহাসিকগণের সিদ্ধান্ত লইয়া কিছু আলোচনা চলিতে পারে। কিন্তু পূর্ণবর্ম্মা কোন্ বংশীয় রাজা, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ না পাইলে তাঁহার নাম লইয়া আলোচনা করা কঠিন হইয়া উঠে; এবং হিউয়েন সিয়াঙ্গের বর্ণনা হইতে তাহার আগমনের অল্পকাল পূর্ব্বেই যে বোধিদ্রুম বিনষ্ট হইয়াছিল তাহাও বুঝা যায়। † বোধিদ্রুমশত্রু শশাঙ্ক কর্ণ-সুবর্ণরাজ হইলে রাজা হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যে [illegible] যে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা তিনি কদাপি বোধিদ্রুম বিনাশ করিতে

---

* বিষ্ণুপুরাণের মতে খৃষ্টের প্রায় ৩১৫০ বৎসর পূর্ব্বে এবং বায়ু ও মৎস্য পুরাণের মতে খৃষ্টের ১১৩০ বৎসর পূর্ব্বে মৌর্য্যবংশের রাজত্ব শেষ হয়।

† R. C. Dutt's Ancient India, Book IV. P. 190

‡ বেভারিজ সাহেব লিখিতেছেন যে "It it seems clear that Sasanka had done this long before and in the time of Siladitya's predecessor"

সাহসী হইতেন না।* কিন্তু হর্ষবর্দ্ধনের [illegible] কর্ণসুবর্ণরাজের স্বাধীনতা [illegible] করা দূরে থাকুক, তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। [illegible] জানা যায় যে, হর্ষবর্দ্ধন ভগিনীকে [illegible] বিন্ধ্যাটবীর অনুসন্ধানে গমন করেন। [illegible] তাঁহাকে [illegible] ফিরিয়া আসিতে হয়। ইহার পর তিনি যে গৌড় [illegible] করিয়াছিলেন, তাহার [illegible] নাই। হিউয়েন সিয়াঙ্গের মতেও হর্ষবর্দ্ধন [illegible] উপাধি [illegible] করিয়াছিলেন, এবং প্রথমেই যে [illegible] করিয়াছিলেন, ইহাও [illegible]

[illegible] হর্ষবর্দ্ধন [illegible] জীবিত রাখিয়াছিলেন। [illegible] করিয়া তাঁহার [illegible] করিয়াছিলেন, ইহা [illegible] জীবিত [illegible] যে [illegible] করিয়াছিল। [illegible] তাহার [illegible] করিয়াছিল না। সুতরাং [illegible] কর্ণসুবর্দ্ধনের রাজত্বকালে কদাপি [illegible] সাহসী হইতেন না। এবং শশাঙ্ক যে বিজিত [illegible] করিয়াছিলেন, তাহাও বলা যায় না। কারণ বোধিদ্রুম [illegible] তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। [illegible] তিনি যে তাহার প্রতিকারে যত্নবান্ হইবেন, [illegible] তিনি যে বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী ছিলেন এবং [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] বোধিদ্রুম ছেদন সম্বন্ধে তাঁহার যত্ন যে [illegible] হইত, তাহা [illegible] পৌর্ণমাসীক্রমধ্বংসরূপ এই প্রসিদ্ধ ঘটনার সহিত হর্ষবর্দ্ধনের [illegible] থাকায় তাঁহার সময়ে যে বোধিদ্রুম বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহা [illegible] এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে [illegible] শশাঙ্ক ও কর্ণসুবর্ণরাজ [illegible] ব্যক্তি নহেন, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। হিউয়েন সিয়াঙ্গের বর্ণিত [illegible] বোধিদ্রুমের কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিলে, বোধিদ্রুমবিনাশক শশাঙ্ক [illegible] বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন, এইরূপ স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু [illegible] শশাঙ্ককে আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের শত্রু বলিয়া স্বীকার করি না। একমাত্র [illegible] পরিমূর্ত্তির কথা ব্যতীত অন্য কোথায়ও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরঞ্চ হিউয়েন সিয়াঙ্গের কর্ণসুবর্ণের বিবরণ হইতে তাহার বিপরীত প্রমাণই দৃষ্ট হইয়া থাকে। [illegible] বর্ণনায় লিখিত আছে যে, তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের অবমাননা ও সঙ্ঘারামাদি বিনাশ

* I reason holds that Sasanka must have retained his independence [illegible] Siladitya's reign, or otherwise he never would have ventured to cut down [illegible] tree. (Beveridge)

সাধন করিয়া বোধিদ্রুম উৎপাটনে প্রবৃত্ত হন। কর্ণসুবর্ণের বিবরণে কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিউয়েন সিয়াঙ্গ উক্ত রাজ্যে আসিয়া রক্তমৃত্তি সঙ্ঘারাম দর্শন করিয়াছিলেন। উক্ত সঙ্ঘারাম যে শশাঙ্কের বহুপূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। এতদ্ভিন্ন তিনি আরও দশটী সঙ্ঘারাম ও অশোকের নির্ম্মিত স্তূপ ও বিহারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্ম্মের শত্রু হইলে নিজ রাজ্যে এই সমস্ত বৌদ্ধ চিহ্ন অক্ষত রাখিয়া রাজ্যান্তরে সঙ্ঘারামাদির বিনাশের জন্য যে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, ইহা কদাপি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। গুপ্তবংশীয়েরা হিন্দু ও শক্তি-উপাসক হওয়ায় শশাঙ্ককে যদি বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের [illegible] রচনা করা কর্ত্তব্য। কারণ কর্ণসুবর্ণরাজেরা [illegible] তাঁহারা হিউয়েন সিয়াঙ্গের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা। [illegible] অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের কথা কত [illegible] বুদ্ধবিদ্বেষী বলিয়া মনে হয় না, সুতরাং কারণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, যে বো [illegible] তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। এই সমস্ত ব্যক্তি নহেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া [illegible] বোধিদ্রুমশত্রু শশাঙ্ক ও কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক কদাপি এক উপাধি মাত্র। সম্ভবতঃ বোধিদ্রুমবি [illegible] ছি যে শশাঙ্ক কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, উহা গৌড়বোগের সৃষ্টি হইয়াছে। [illegible] শকের শশাঙ্ক উপাধি কর্ণসুবর্ণরাজ গ্রহণ করায় এইরূপ ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। [illegible] বোধিদ্রুমবিনাশক শশাঙ্ক বিহার প্রদেশের কোনও রাজা রোটাসের শিলালিপিতে যে শশাঙ্কের নাম পাওয়া যায়, তিনি সম্ভবতঃ বো [illegible] শশাঙ্ক হইবেন এবং তাঁহার মোহরাদিরও আবিষ্কার হইয়াছে। উক্ত দুই [illegible] বও কোন কোন গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। বগুড়াতে শশাঙ্ক নরেন্দ্র [illegible] বোধিদ্রুমবিনাশক নহে; কেহ কেহ তাহাকে কোনও শশাঙ্কের প্রতিষ্ঠিত [illegible] শশাঙ্ক ব্যতীত অন্য শশাঙ্ক নামে ক্ষেতুরী বংশীয় এক রাজা ১৫০২ খৃষ্টাব্দে [illegible] একটী পুষ্করিণী খনন করেন বলিয়া মনে করেন (৯১০ ফসলীতে)। বেভারিজ সাহেব আদিশূর বংশীয় শূরবরকে কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কের [illegible] বলিয়া সন্দেহ করিয়া, তাঁহার সময় নির্দ্দেশের চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু আদিশূর হিউয়েন সিয়াঙ্গের যে বহুকাল পরে আবির্ভূত হন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। শূরবর আদিশূর হইতে নবম পুরুষ; সুতরাং তিনি যে বহুকাল পূর্ব্বের লোক নহেন তাহাও বুঝা যাইতেছে। উক্ত শূরবরের প্রকৃত নাম শূরবর কি সৃষ্টিধর অথবা অন্য কিছু, তাহাও বুঝিবার উপায় নাই।

এখানে আমরা হিউয়েন সিয়াঙ্গের ও কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কের সময় নির্দ্দেশের চেষ্টা করিতেছি। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, হিউয়েন সিয়াঙ্গ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে আগমন করেন; কিন্তু দেশীয় গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে তাহার বহুপূর্ব্বে হিউয়েন সিয়াঙ্গের আগমন হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। হিউয়েন সিয়াঙ্গের মালবের বিবরণে দৃষ্ট হয় যে, তাঁহার মালবে উপস্থিতির ষাটি বৎসর পূর্ব্বে শীলাদিত্য রাজা মালবে

হিউয়েন সিয়াঙ্গ ও শশাঙ্কের সময়।

রাজত্ব করিতেন এবং তিনি বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। রাজতরঙ্গিণী পাঠে জানা যায় যে, উক্ত শীলাদিত্য সুবিখ্যাত শকারি বিক্রমাদিত্যের পুত্র; তাঁহার অপর নাম প্রতাপশীল। তিনি কাশ্মীররাজ দ্বিতীয় প্রবরসেনের সমসাময়িক। রাজতরঙ্গিণীকারের মতে দ্বিতীয় প্রবর সেন ৪৭ শকাব্দ হইতে ১০৭ শকাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহা হইলে রাজতরঙ্গিণীর মতে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে হিউয়েন সিয়াঙ্গের ভারতবর্ষে আগমন স্থির হয়। † হিউয়েন সিয়াঙ্গের নেপালের বর্ণনায় রাজা অংশুবর্ম্মার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অংশুবর্ম্মা হিউয়েন সিয়াঙ্গের আগমনের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। নেপালের বৌদ্ধ পার্ব্বতীয় বংশাবলী নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে,—ঠাকুরী বংশীয় প্রথম রাজা অংশুবর্ম্মার পূর্ব্বে সূর্য্য অগ্নীশ বংশীয় শেষ রাজা তাঁহার শ্বশুর বিশ্বদেববর্ম্মা, রাজত্ব করিতেন; উক্ত বিশ্বদেববর্ম্মার রাজত্ব সময়ে নেপালে বিক্রমাদিত্যের সংবৎ প্রচলিত হয়। ‡ অংশুবর্ম্মা খৃষ্টপূর্ব্ব ১০১ অব্দে রাজা হন। § অংশুবর্ম্মার সময়ের শিলালিপি হইতেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে অংশুবর্ম্মা ৩ হাজার কলিযুগে বা খৃষ্টপূর্ব্ব ১০১ অব্দে রাজা হন।

---

* বৈরিনির্ব্বাসিতং পিত্র্যে বিক্রমাদিত্যজং সুতং।
রাজ্যে প্রতাপশীলং স শীলাদিত্যাপরাভিধম্।—(রাজতরঙ্গিণী ৩য় তরঙ্গ)

† প্রবরসেন ৬০ বৎসর রাজত্ব করেন, শীলাদিত্য ৫০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। শীলাদিত্যের রাজত্ব ১০০ শকাব্দ পর্য্যন্ত ধরিলে হিউয়েন সিয়াঙ্গ ১৫০ শকাব্দ বা ২২৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

‡ সংবৎ প্রতিষ্ঠাতা বিক্রমাদিত্য ও শকাব্দ প্রতিষ্ঠাতা বিক্রমাদিত্য দুইজন বিভিন্ন ব্যক্তি। শেষোক্ত বিক্রমাদিত্যই ভারতীয় বিদ্যোৎসাহী রাজা। সংবৎ প্রতিষ্ঠাতা বিক্রমাদিত্য তাঁহার পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

§ অংশুবর্ম্মার সময়ের চারিখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, ১ম খানিতে ৩৪, ২য় খানিতে ৩৫, ৩ খানিতে ৪৮ সংবৎ লিখিত আছে (Indian Antiquary Vol I X,) এই সংবৎকে ইংরেজীয় পণ্ডিতগণ শ্রীহর্ষ সংবৎ ধরিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু তাহা সমীচীন নহে। কারণ হিউয়েন সিয়াঙ্গ যে সময়ে নেপালে উপস্থিত হন তাঁহার বহুপূর্ব্বে অংশুবর্ম্মার মৃত্যু হয় এবং রাজা হর্ষবর্দ্ধন সেই সময়ে ভারতখণ্ডে রাজত্ব করিতেছিলেন। সুতরাং রাজা হর্ষবর্দ্ধনের প্রচলিত শ্রীহর্ষাব্দের কথা অংশুবর্ম্মার শিলালিপিতে থাকিতে পারে না। আমাদের মতে শ্রীহর্ষাব্দের কথা লিখিয়াছেন তাহা বিক্রম সংবৎ হইতে ৫০০ বৎসরের প্রাচীন। সুতরাং উক্ত শ্রীহর্ষাব্দের কথা একেবারে অসম্ভব। বেণ্ডাল সাহেব নেপাল হইতে শিবদেব বর্ম্মা ও অংশুবর্ম্মার যে শিলালিপি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে ৩১৮ সংবৎ পড়িয়াছেন। উহাকে তিনি ৬৪৪ বঙ্গাব্দ বলিতে চান, কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ এই অংশুবর্ম্মা যে চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সিয়াঙ্গের বর্ণিত অংশুবর্ম্মা নহেন, তাহার কতকটা অনুমান হইয়া থাকে। বৌদ্ধ পার্ব্বতীয় বংশাবলীতে যে অংশুবর্ম্মার উল্লেখ আছে, তিনিই যে হিউয়েন সিয়াঙ্গের কথিত অংশুবর্ম্মা ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। উক্ত প্রসিদ্ধ অংশুবর্ম্মা নেপালের ঠাকুর বংশের পরিচয়। তিনি সূর্য্যবংশীয় বংশীয় শেষ রাজা, বিক্রমদেব বর্ম্মার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহের পর হইতে নেপালে বিক্রম সংবৎ প্রচলিত হইয়াছিল। বেণ্ডাল সাহেবের উল্লিখিত শিবদেব বর্ম্মা, উক্ত সূর্য্যবংশীয় শেষ রাজা তিনি অংশুবর্ম্মার শ্বশুর বিক্রমদেব বর্ম্মার বৃদ্ধ প্রপিতামহ হইবেন। সুতরাং তাঁহার সময়ে অংশুবর্ম্মা জীবিত থাকা ও স্বাধীন রাজারূপে রাজত্ব করা অসম্ভব। উক্ত অংশুবর্ম্মা প্রসিদ্ধ অংশুবর্ম্মা হইতে পৃথক্ থাকা হইবেন। তিনি শিবদেবের মহাসামন্ত বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। উক্ত ৩১৮ সংবৎ সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম নহি। শ্রীযুক্ত বিদ্যাবাচস্পতি সম্পাদক মহাশয় অংশুবর্ম্মার নামযুক্ত শিলালিপির অক্ষরগুলিকে গুপ্ত সংবৎ ও বেণ্ডাল সাহেবের ৩১৮ সংবৎকে শকাব্দ বলিতে চাহেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি না। গুপ্তকাল সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা বিবেচনা করি না, ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতের ভিন্ন ভিন্ন

অংশুবর্ম্মার সময়ের শিলালিপি হইতেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাহার পূর্ব্বে নেপালে বিক্রম সংবৎ প্রচলিত হইয়াছিল, সুতরাং অংশুবর্ম্মার পর হিউয়ন সিয়াঙ্গের আগমন হইলে দেশীয় গ্রন্থাদির পর্য্যালোচনায় খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে তাঁহার ভারতবর্ষে উপস্থিতি স্থির হয়।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে হিউয়েন সিয়াঙ্গের আগমন স্থির হইলে, কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সিয়াঙ্গের আগমনকালে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে শশাঙ্কের সময় স্থির করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে শশাঙ্ক গুপ্তবংশীয় রাজা। গুপ্ত বংশের রাজত্ব লইয়া ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে; গুপ্ত বংশের প্রকৃত সময় অদ্যাপি স্থির হয় নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তবে গুপ্তরাজগণ খৃষ্ট জন্মের প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় কয়েক শতাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা অনুমান করিয়া থাকি।

রাজা শশাঙ্কের বিবরণের পর আমরা কর্ণ সুবর্ণ বা রাঙ্গামাটির বিশেষ কোনও ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবগত নহি। কতদিন পর্য্যন্ত রাঙ্গামাটিতে গুপ্তবংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। গুপ্তবংশের পর আর কোন বংশ রাঙ্গামাটিতে রাজত্ব করিয়াছিলেন কি না তাহাও জানা যায় না। গুপ্তবংশের পর গৌড় বা বাঙ্গালায় শূরবংশ রাজত্ব করেন। সাধারণতঃ গৌড় তাঁহাদের রাজধানী ছিল। আদিশূরের পুত্র ভূশূর, মগধাধিপ ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া রাঢ়দেশে আসিয়া বাস করেন। কিন্তু তিনি তথায় পুণ্ড্র* নামে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, সুতরাং রাঢ়ের প্রসিদ্ধ নগর রাঙ্গামাটির সহিত শূরবংশের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না তাহা জানা যায় না। পালবংশ যৎকালে উত্তর রাঢ়ে আপনাদিগের প্রভুত্ব বিস্তার করেন, সে সময়ে মহীপাল তাঁহাদের রাজধানী হইবা উঠে। সেনবংশের সময় গৌড় ও নবদ্বীপ প্রভৃতি রাজধানীর কথা অবগত হওয়া যায়। গুপ্তবংশের পরবর্ত্তী এই সমস্ত রাজবংশের সহিত রাঙ্গামাটির কোন সম্বন্ধ ছিল কি না তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই, তবে রাঙ্গামাটি অনেক দিন পর্য্যন্ত রাঢ় প্রদেশের যে একটি প্রসিদ্ধ নগর ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিরূপে রাঙ্গামাটির গৌরব হ্রাস বা তাহার ধ্বংস হয় তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া

রাঙ্গামাটি ধ্বংসের প্রমাণ।

সত্ত দেখিয়া গুপ্তকাল সম্বন্ধে আমাদের মনে নানারূপ তর্ক উপস্থিত হয়। বৌদ্ধ পার্ব্বতীয় বংশাবলী হইতে বলম অংশুবর্ম্মার সময় ও বিক্রম সম্বৎ প্রচলনের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, তখন অংশুবর্ম্মার সময়ের শিলালিপির সম্বৎগুলিকে বিক্রম সম্বৎ বলা যাইতে পারে। বেণ্ডাল সাহেবের সংগৃহীত শিলালিপিও নেপালের পূর্ব্ব প্রচলিত অন্য কোনও সম্বৎ হইতে পারে। এই কালের শিলালিপিতে ৫০৫ সালে পুলকেশীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই পুলকেশী হিউয়েন সিয়াঙ্গের কথিত পুলকেশী বলিয়া স্থির হইয়া থাকে, যদি বাস্তবিক তাহাই হয়, তাহা হইলে খৃঃ ৭ম শতাব্দীতে হিউয়েন সিয়াঙ্গের আগমন হয়।

* এই পুণ্ড্রকে কেহ কেহ হুগলী জেলায় বর্ত্তমান পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো বলিয়া অনুমান করেন।

যায় না। উইলফোর্ড সাহেব রাঙ্গামাটি ধ্বংসের একটী প্রবাদের উল্লেখ করিয়া থাকেন। যবদ্বীপ বা অন্য কোন সিংহলের রাজা কতকগুলি রণতরী লইয়া বাঙ্গলা আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি রাঙ্গামাটি পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। তৎকালে রাঙ্গামাটি বাঙ্গলার একটী প্রসিদ্ধ স্থান ছিল ও তাহা কুসুমপুরী নামে অভিহিত হইত। বাঙ্গলার রাজা প্রায়ই তথায় বাস করিতেন। আক্রমণকারীরা দেশ লুণ্ঠন করিয়া নগরের ধ্বংস সম্পাদন করে। উইলফোর্ড সাহেবের মতে তাহা বক্তিয়ার খিলিজী কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের বহু পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল। * বেভারিজ সাহেব বঙ্গবিজয়ের অল্প পূর্ব্বেই রাঙ্গামাটি ধ্বংসের অনুমান করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার মতে সিংহলের রাজা পরাক্রমবাহুর সময়ে রাঙ্গামাটি আক্রান্ত হয়। পরাক্রমবাহু ১১৫৩ খৃষ্টাব্দে সিংহলের সিংহাসনে উপবেশন করেন; এবং ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দিগ্বিজয় আরম্ভ হয়। তাঁহার কয়েকখানি জাহাজ আরামা বা রামাবার কুসুমী বন্দরে উপস্থিত হইয়াছিল। উইলফোর্ড সাহেবের মতে রাঙ্গামাটির নাম কুসুমপুরী হওয়ায়, এবং কুসুমী বন্দরের সহিত তাহার নামের কথঞ্চিৎ ঐক্য দেখিয়া, বেভারিজ সাহেব ঐরূপ অনুমান করিয়া থাকেন, কিন্তু রামাবার অবস্থান সম্বন্ধে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায় ও তাহার প্রাকৃতিক অবস্থার যেরূপ বিবরণ দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাহাকে কদাচ রাঙ্গামাটি প্রদেশ বলিয়া স্থির করা যায় না। † সুতরাং বেভারিজ-সাহেবের মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। লঙ্কার রাজা কর্ত্তৃক রাঙ্গামাটি ধ্বংসের প্রবাদ অনেক দিন প্রচলিত ছিল, লেবার্ড সাহেবও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শ্রুত প্রবাদ উইলফোর্ড সাহেবের প্রবাদ হইতে বিভিন্ন। এক্ষণে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, রাঙ্গামাটির শেষ রাজা তাহার নিকটস্থ চৌটার সিলে সপরিবারে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। এই প্রবাদের কোনও মূল আছে কি না বলা যায় না এবং সত্যাসত্য নির্ণয়ের কোনও বিশেষ উপায় নাই। রাঙ্গামাটি ধ্বংসের কোন রাজনৈতিক কারণ নির্দ্দেশ করা বলিতে পারা যায় না। তবে প্রাকৃতিক কারণে যে উহা অনিষ্ট হইয়াছে ইহা বেশ বুঝা যায়। যে কারণে ওপ্তবংশীয়দের প্রধান রাজধানী পাটলিপুত্র ধ্বংস হইয়াছিল, সেই জলপ্লাবনে তাঁহাদের অন্যতম রাজধানী রাঙ্গামাটির ধ্বংস হয় বলিয়া অনুমান হইয়া থাকে।

রাঙ্গামাটির প্রাচীন বিবরণ সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করা হইয়াছে, এক্ষণে তথায় এখন যে সমস্ত চিহ্ন বিদ্যমান আছে, তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। উইলফোর্ড সাহেব লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বে রাঙ্গামাটির প্রাচীর চিহ্ন

---

* Asiatic Researches Vol IX p. 39.

† Wijesinha রামাবাকে আরাকান ও শ্যামদেশের মধ্যবর্ত্তী বলেন। Cassiday's Guide to Ceylon তাঁহার পূর্ব্বে ছিপ্পীর নিকট রামাবা নামক স্থানে উল্লেখ করিয়াছে। কিন্তু কোনটীর অবস্থান সম্বন্ধে কোন বিবরণের সহিত মিলে না। আবার রামাবা যেরূপ নারিকেল বৃক্ষের উল্লেখ করা হইয়াছে, রাঙ্গামাটিতে নারিকেল বৃক্ষ অধিক পরিমাণে জন্মে না। কারণ রাঢ় প্রদেশের মৃত্তিকায় নারিকেল বৃক্ষ ভাল জন্মে। সুতরাং রামাবার অবস্থান ও তাহার প্রাকৃতিক বিবরণ দেখিয়া তাহাকে রাঙ্গামাটি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়।

একটি স্থান মহাদেবের পূজার জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, এবং অনেক ভূভাগ তাঁহার সেবার জন্য অর্পিত হয়। উক্ত উৎসর্গীকৃত ভূখণ্ডকে হরার্পণভূমি বলিত। তাহা গঙ্গাগর্ভে লীন হইলে আর একটী স্থান পূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়; কিন্তু এক্ষণে তাহার প্রতি লোকের আর তাদৃশ যত্ন নাই, এবং শিবলিঙ্গও স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই শিবমন্দির কোন্ স্থানে ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই, কারণ রাঙ্গামাটির অধিকাংশই এক্ষণে ভাগীরথীগর্ভস্থ। ঠাকুরবাড়ী ডাঙ্গা নামে একটী উচ্চ স্থান আছে, তথায়, কিংবা যমুনা নাম্নী তাহার প্রাচীন পুষ্করিণীর নিকটস্থ কোন স্থানে উক্ত শিবমন্দির ছিল তাহা বুঝা যায় না। যমুনা পুষ্করিণী হইতে কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড দেখিয়া বোধ হয় যে, তাহার নিকটে একটী দেব মন্দির ছিল. কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শিব মন্দির তথায় কিম্বা ঠাকুরবাড়ী ডাঙ্গায় ছিল তাহা অবগত হওয়া কঠিন। মুর্শিদাবাদের ভূতপূর্ব্ব ইঞ্জিনিয়ার কাপ্তেন লেয়ার্ড সাহেব ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে রাঙ্গামাটিতে যে সমস্ত প্রাচীন চিহ্ন দর্শন করিয়াছিলেন, এক্ষণেও প্রায় সে সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার উল্লিখিত রাক্ষসীডাঙ্গা ও রাজবাড়ী ডাঙ্গা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই রাক্ষসী ডাঙ্গা একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের ন্যায় উচ্চ ও অসংখ্য ইষ্টকখণ্ডে পরিপূর্ণ। তাঁহার নীচে একটি বটবৃক্ষ। বৃক্ষের তলে পীর তুর্কান সাহেব নামে এক জন মুসলমান ফকীরের সমাধি। রাক্ষসী ডাঙ্গা সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, লঙ্কা হইতে একটী রাক্ষসী আসিয়া তথায় বাস করে; রাজা প্রতিদিন তাহার সহিত তর্ক করিবার জন্য একজন করিয়া পণ্ডিত পাঠাইতেন; পণ্ডিতেরা তর্কে পরাজিত হইলে রাক্ষসী তাহাদিগকে ভক্ষণ করিত। পীর তুর্কান সাহেব রাক্ষসীকে পরাজয় ও বধ করিয়া ঐ স্থানে অবস্থিতি করেন; অবশেষে তাঁহার মৃত্যু হইলে তথায় তাঁহার সমাধি হয়। তাঁহার সমাধিতে ইষ্টক সংযোগের আদেশ নাই; সেই জন্য তাহা একটি খড়ের চালার মধ্যে অবস্থিত। সমাধির নিকটে অসম্পূর্ণ ইষ্টকপ্রাচীরবেষ্টিত একটী ভিত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ তথায় একটী মসজীদ্ নির্ম্মিত হইতেছিল। রাক্ষসী ডাঙ্গার উত্তরে পীর পুকুর নামে একটী পুষ্করিণী আছে। এই রাক্ষসী ডাঙ্গাকে একটী বৌদ্ধস্তূপ বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ ইহা হিউয়েন সিয়াঙ্গ বর্ণিত অশোক রাজার স্তূপ হইবে। বৌদ্ধস্তূপ তে কার্য্যে নানারূপ অস্বাভাবিক মূর্ত্তি থাকায়, এবং পূর্ব্বে উক্ত স্থানে সেই প্রকারের মূর্ত্তি দৃষ্ট হওয়ায়, তাহার নাম রাক্ষসীডাঙ্গা হইয়া থাকিবে। এই রাক্ষসী ডাঙ্গার নিকটেই রাজবাড়ী ডাঙ্গা; তাহাও একটী অনতুচ্চ ভূভাগ ও অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সেই স্থানে রাজা কর্ণসেনের প্রাসাদ ছিল বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত। প্রাসাদের চারিদিক গভীর পরিখাবেষ্টিত ছিল। পরিখার চিহ্ন তিন দিকে সুস্পষ্ট বিদ্যমান আছে। চতুর্থ দিকের চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না; তাহার অধিকাংশ ভাগীরথীগর্ভস্থ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। পরিখা এক্ষণে কর্ষিত হইয়া

* মহীপাল দেবের রাজধানী মুর্শিদাবাদের মহীপাল গ্রামে একখণ্ড প্রস্তরে শৃঙ্গযুক্ত হস্তীর ন্যায় জন্তুবিশেষের মূর্ত্তি আছে, লোকে তাহাকে রাক্ষসের দেহ বলে। রাঙ্গামাটির রেশম কুঠীর প্রাঙ্গণস্থিত প্রস্তর খণ্ডকেও লোকে রাক্ষসের দেহ বলিয়া থাকে। এই সমস্ত প্রস্তরের অবস্থানের জন্য বৌদ্ধস্তূপ রাক্ষসী ডাঙ্গা নামে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

শস্যোৎপাদক ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এই রাজবাড়ী-ডাঙ্গাকে লোকে অন্দর ও সদর দুই ভাগে বিভক্ত করে। কাজলা নামে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী রাজবাড়ী ডাঙ্গার অবস্থিত। তাহার নিকটে সৈনিকদিগের স্বাস্থ্যাবাস করার প্রস্তাব সময়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একটী বৃহৎ কূপ খনিত হইয়াছে। রাজবাড়ীর পূর্ব্বে একটী সুবৃহৎ তোরণ দ্বারের চিহ্ন অনেক দিন পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল; লোকে তাহাকে বুরুজ বলিত। কয়েক বৎসর হইল তাহা ভাগীরথী গর্ভস্থ হইয়াছে। ইহার নিকটে যদুপুর গ্রামে বিল্বপুষ্করিণী নামে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে; তাহার উপর রাজা কর্ণসেনের বিচারালয় ছিল বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত। রাজবাড়ী ডাঙ্গার দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে কিছু দূরে ঠাকুরবাড়ী ডাঙ্গা; উহার অধিকাংশই এক্ষণে ভাগীরথী গর্ভস্থ। এইখানে রাজবংশের ঠাকুর বাড়ী ছিল বলিয়া লোকমুখে শুনা যায়। ঠাকুরবাড়ী ডাঙ্গার ভূমি ভাগীরথীগর্ভস্থ হওয়ার সময় একখানি স্বর্ণপ্রতিমা একজন লোকের হস্তগত হয়। অনেকে তাহাকে লক্ষ্মী মূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করিয়াছিল। * এতদ্ভিন্ন অনেক শঙ্খ ও বহু পরিমাণে সিন্দুর ভাগীরথী গর্ভে পতিত হইয়াছিল। রাজবাড়ী ডাঙ্গার পূর্ব্বদিকে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে প্রাচীন গঙ্গাতীরে একটী অত্যুচ্চ ভূভাগ আছে, রাঙ্গামাটির বেশম কুঠীর নিকটবর্ত্তী ডাঙ্গা ব্যতীত উক্ত ভূভাগের ন্যায় উচ্চ ডাঙ্গা আর দ্বিতীয় নাই। ইহার নাম সন্ন্যাসী ডাঙ্গা। এই সন্ন্যাসী ডাঙ্গার দাঁড়াইলে সমস্ত রাঙ্গামাটির দৃশ্য নয়নগোচর হইয়া থাকে। ইহার উপরে ও নিম্নে ভাগনের মুখে বাবলা নিম্ব ও তাল প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সন্ন্যাসীডাঙ্গার উচ্চতা, তাহার নাম ও অবস্থান প্রভৃতি দেখিয়া ইহাকে রক্তমৃত্তি সঙ্ঘারামের স্থান বলিয়া অনুমান হয়। সঙ্ঘারাম বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের সম্মিলন স্থান হওয়ায় তাহার নাম সন্ন্যাসীডাঙ্গা হওয়া অসম্ভব নহে। রাজবাড়ী ডাঙ্গার দক্ষিণ ও বর্ত্তমান রেশম কুঠীর পশ্চিম প্রাচীন গঙ্গা বা বাঘুড়ের উপর একটী পুষ্করিণীর গর্ভ দৃষ্ট হয়। তাহার গভীরতা প্রায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এই পুষ্করিণীর নাম যমুনা পুষ্করিণী। লেয়ার্ড সাহেব এইখানে পূর্ব্বে পাথরগড় ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কয়েকখানি পাথর ব্যতীত পাথরগড়ের কোন চিহ্ন এক্ষণে আর বিদ্যমান নাই। যমুনা পুষ্করিণীর গর্ভ ও তাহার নিকটস্থ স্থান হইতে কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড উত্তোলিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে কোনও কোনও প্রস্তরখণ্ডে দেব দেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখা যায়। একখানি বৃহৎ অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি। † উক্ত মূর্ত্তি যমুনা পুষ্করিণীর গর্ভ হইতে আনীত হইয়া রাঙ্গামাটীর রেশম কুঠীর বিশাল বটবৃক্ষ তলে স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত মূর্ত্তির কোনও কোনও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভগ্ন হওয়ায় তাহাকে সহসা কোন দেবীর মূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করা কঠিন হয়। মূর্ত্তিখানি কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত;

---

* গুপ্তবংশের অনেক মুদ্রায় কমলাসিকা মূর্ত্তি দৃষ্ট হওয়ায়, উক্ত প্রতিমাকে লক্ষ্মীমূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হয় না।

† লেয়ার্ড সাহেব তাহাকে ষড়ভুজ মূর্ত্তি বলিয়াছেন, ও তাহাকে কালীমূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি। তন্ত্রসারোক্ত মহিষমর্দ্দিনীর ধ্যানের সহিত ইহার অনেক ঐক্য আছে।

উচ্চে দুই হস্তেরও অধিক হইবে। অষ্টভুজের দুই একটী ভুজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহাদের চিহ্ন বিদ্যমান আছে। বামদিকের উপরের হস্তে ও নিম্নহস্তে ধনুক, দক্ষিণদিকের উপরের হস্তে শঙ্খ বা খড়্গের কিয়দংশ ও নিম্ন হস্তে একটী সর্প আছে বলিয়া বোধ হয়। অন্যান্য হস্তের কোন কোন অংশ ভগ্ন হওয়ায় আর কি কি অস্ত্র ছিল বুঝা যায় না। কটিবন্ধ ও কোন কোন হস্তে অলঙ্কার দৃষ্ট হয়; পায়ে নূপুর বিদ্যমান; দেবীর মুখের সম্মুখভাগ ভগ্ন হওয়ায় মুখমণ্ডলের কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না; দেবীর পদতলস্থ মহিষটী পূর্ণদেহে বিদ্যমান আছে। তাহার চক্ষু ও শৃঙ্গ সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফলতঃ গাত্রে মহিষমর্দ্দিনীর যেরূপ ধ্যান লিখিত আছে, এই মূর্ত্তির সহিত তাহার প্রায়ই ঐক্য হয়। প্রায় ১৫ ইঞ্চ উচ্চ আর একখণ্ড প্রস্তর যমুনা পুষ্করিণীর গর্ভে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে একটী শিবমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। শিবমূর্ত্তির মুখের কতকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার মস্তকস্থ জটা ও লম্বিতোদর দেখিয়া শিবমূর্ত্তি বলিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এই শিবমূর্ত্তির উপরে আর একটী কি মূর্ত্তি আছে তাহা বুঝা যায় না। উক্ত প্রস্তরখণ্ড পূর্ব্বে কোন মন্দিরসংলগ্ন ছিল বলিয়া বোধ হয়। আর একখানি ঐরূপ মন্দিরসংলগ্ন বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড উক্ত যমুনা পুষ্করিণী হইতে উত্তোলিত হইয়াছে। তাহা দীর্ঘে ২ হাত ও প্রস্থে ১০ ইঞ্চ হইবে এবং তাহার বেধও ১০ ইঞ্চ। উক্ত প্রস্তরখণ্ডের মধ্যস্থলে একটী মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে; সহসা তাহাকে বুদ্ধ বা শিবমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা কোন দেবমূর্ত্তি কিনা সন্দেহ। মূর্ত্তির দুই পার্শ্ব কারুকার্য্যভূষিত। শিল্পকার্য্যমণ্ডিত আরও কয়েকখানি প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গিয়াছে। তদ্ব্যতীত আরও দুই চারিখানি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড যমুনাগর্ভ হইতে উত্তোলিত হইয়াছে। এক্ষণেও কয়েকখণ্ড তথায় পড়িয়া আছে। রাঙ্গামাটির নিকট সংস্কার নামক গ্রামে একটী নিম্নভূমির মধ্যে একটী বাটীর চিহ্ন দেখা যায়। এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, তথায় পূর্ব্বে এক প্রকাণ্ড দীঘি ছিল, সেই দীঘির মধ্যে রাজার ভাগিনেয় বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন। রাজবাড়ী ডাঙ্গার অর্দ্ধ মাইল উত্তর পশ্চিম আমলাবাড়ী পুষ্করিণীর চারি পার্শ্বে রাজার কর্ম্মচারীদিগের আবাসস্থান ছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। রাঙ্গামাটি হইতে তিন ক্রোশ পশ্চিমে গোকর্ণ গ্রামে রাজা কর্ণের গোশালা ছিল বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। কেদার রায় নামে একজন সিদ্ধপুরুষ বহুক্রোশব্যাপী এক জাঙ্গাল ও একটী দীঘি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। * উক্ত জাঙ্গাল ও দীঘি এক্ষণে নাহার নামে প্রসিদ্ধ। এই সমস্ত চিহ্ন দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রাঙ্গামাটি প্রাচীনকাল হইতে একটী সমৃদ্ধিশালিনী নগরী রূপে বিদ্যমান ছিল। রাঙ্গামাটির নিকট পূর্ব্বে হরিনগর নামে এক প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম ছিল. তথায় বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্যান্য জাতি বাস করিত।

* এইরূপ প্রবাদ আছে যে, কেদার রায় প্রত্যহ রাত্রিতে সেই বহুদূরব্যাপী জাঙ্গাল দিয়া যাতায়াত করিতেন, সেইজন্য লোকে বলিয়া থাকে,

"বাপের ঠাকুর কেদার রায়,
রেতে আসে রেতে যায়।"

ভাগীরথী প্লাবনে উক্ত গ্রামের ধ্বংস হওয়ায়, তাহার অধিবাসীরা নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে. কতক অধিবাসী রাঙ্গামাটির নিকটস্থ মহিপুর প্রভৃতি গ্রামে আসিয়া বাস করে। মুসলমান রাজত্ব সময়েও রাঙ্গামাটি একটী প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া কথিত হইত। কেহ কেহ ইহাকে ফৌজদারী রাঙ্গামাটি বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে; উক্ত ফৌজদারী রাঙ্গামাটি আসামের অন্তর্গত। বঙ্গদেশে অনেকগুলি রাঙ্গামাটি আছে, তন্মধ্যে মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটিই প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। কর্ণেল রেভার্টি তাঁহার তবকত নাসিরির অনুবাদে এক পশ্চিম ও পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ বিস্তৃত প্রদেশদ্বয়ে রাঙ্গামাটি ও ঢাকা নামে যে নগরীদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহার উল্লিখিত রাঙ্গামাটি মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটি বলিয়া বোধ হয়। সম্রাটের দ্বিতীয় ওলন্দাজ গভর্ণর মাথিউ ভাণ্ডেনব্রুক তাঁহার ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে রাঙ্গামাটিকে রাঢ় প্রদেশের একটী প্রসিদ্ধ নগররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। রেনেলের কাশীমবাজার দীপের চিত্রেও রাঙ্গামাটিকে একটী প্রসিদ্ধ নগর রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। পলাসী যুদ্ধের পর রাঙ্গামাটিতে সৈন্যাবাস করার প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রাঙ্গামাটির বাঙ্গলায় সৈনিকদিগের একটী স্বাস্থ্য নিবাস করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও কার্য্যে ঘটিয়া উঠে নাই। রাঙ্গামাটি মুর্শিদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ পরগণা ফতেসিংহের অন্তর্গত। ফতেসিংহ এক্ষণে মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর ও জেমোর রাজগণের জমিদারী। রাঙ্গামাটির রেশমকুঠী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য বিস্তারের সময় স্থাপিত হয়। বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানী এক্ষণে উহার অধিকারী। রাঙ্গামাটির দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে উক্ত রেশমকুঠী অবস্থিত, কুঠীর প্রাঙ্গণে চারিটী সমাধিস্তম্ভ আছে। তন্মধ্যে একটীতে এডওয়ার্ড গ্রেস ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ২৯ আগষ্ট তারিখে একটী বন্যমহিষ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। এই রেশম কুঠীতে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া আপনার প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

মুর্শিদাবাদ জেলা, কান্দি মহকুমা, গোকর্ণ থানার মধ্যে, ফতেসিংহ পরগণার উত্তর সীমায় রাঙ্গামাটি গ্রাম অবস্থিত। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রাজা মানসিংহের জনৈক সৈনিক পুরুষ গোত্রজ পশ্চিমদেশীয় ব্রাহ্মণ সবিতাচাঁদ দীক্ষিত রণনৈপুণ্যের পুরস্কার স্বরূপ ফতেসিংহের জমিদারী প্রাপ্ত হয়েন। তদবধি ফতেসিংহ পরগণা সবিতাচাঁদের বংশধরগণের অধিকারে আছে। ফতেসিংহের অর্দ্ধাংশ জেমোর রাজবংশের ও অপরার্দ্ধ ধারেন্দা বাজবংশের সম্পত্তি। ধারেন্দার অর্দ্ধাংশ সম্প্রতি হস্তান্তরিত হইয়া মুর্শিদাবাদের মহামান্য নবাব বাহাদুরের অধিকারে আসিয়াছে।

রাঙ্গামাটি অতি প্রাচীনকালে কোন সমৃদ্ধ রাজ্যের রাজধানী ছিল, তাহা রাঙ্গামাটির

সম্বন্ধে স্থানীয় প্রবাদ হইতেই বুঝা যায়। রাঙ্গামাটির নৈসর্গিক অবস্থান প্রকৃতই একটা রাজধানীর উপযুক্ত। পূর্ব্বে ভাগীরথী ও পশ্চিমে একটা বহুক্রোশ বিস্তৃত নিম্ন জলাভূমি বা বিল এই গ্রামকে একটা নৈসর্গিক দুর্গে পরিণত করিয়াছে। ঐ বিলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত বাঁকি নদী ও দ্বারকা নদী পরিখার আকারে রাঙ্গামাটি ও সন্নিহিত গ্রামগুলিকে উত্তর ও পশ্চিম দিক্ হইতে দুর্গম করিয়া রাখিয়াছে। রাঙ্গামাটি অতি উন্নত রক্তবর্ণ মৃত্তিকার উপর অবস্থিত; এই রক্তবর্ণ মৃত্তিকাকে ছোট নাগপুর ও বীরভূম প্রদেশের রক্তমৃত্তিকার পূর্ব্ব সীমা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

রাঙ্গামাটিই যে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের রাজধানী, সে বিষয়ে সন্দিহান হইবার আর সম্যক্ কারণ নাই। এই সম্বন্ধে প্রমাণপরম্পরা একত্র স্থাপিত করিয়া প্রবন্ধলেখক মহাশয় কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু লেখককৃত কালনির্ণয় ঐতিহাসিক সঙ্গত হইবে কি না সন্দেহ। কর্ণসেনের সহিত কর্ণসুবর্ণের নাম কিরূপে জড়িত হইল বলা যায় না। সম্ভবতঃ কর্ণসুবর্ণ নাম হইতেই কর্ণসেনের প্রবাদ উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। চাঁদপাড়া ব্যতীত নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানের সহিত চাঁদ সদাগরের প্রবাদ জড়িত আছে। দ্বারকা নদীর তীরবর্ত্তী পাটনের বিল বাহিয়া মবুরাক্ষী পার্শ্বস্থ নবদুর্গা গোলাহাট গ্রামের পার্শ্ব দিয়া চাঁদ সদাগরের নৌকা গিয়াছিল, এরূপ কিংবদন্তী আছে। কান্দির অন্তর্গত বাঘডাঙ্গা গ্রামের নীচে যেখানে চাঁদ সদাগরের নৌকা বাঁধা হইয়াছিল, এখনও লোকে সে স্থান দেখায়।

দীঘাপতিয়া রাজবংশধর কুমার শরৎকুমার রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত একখানি পদ্যে রচিত বাঙ্গালা হিতোপদেশ আমার নিকট আছে। সংস্কৃত হিতোপদেশে যে সকল উপাখ্যান আছে, তদ্ব্যতীত অনেকগুলি লেখকের স্বরচিত অথবা সংগৃহীত নূতন উপাখ্যান এই বাঙ্গালা হিতোপদেশের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। পুঁথি খানি ১৫৯ পত্রে সম্পূর্ণ, ১৫০ হইতে ১৫২ পত্র মধ্যে একটি রাজনীতিঘটিত উপাখ্যান আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৫১ পাতাটা না থাকায় উপাখ্যানটি সমস্ত পাওয়া গেল না। গল্পটির প্রথম ও শেষ ভাগ, যাহা পাওয়া গেল, তাহা এইরূপ :—

মদন পাল গেল রণে হইল হড় বড়।
বেড়িয়া লইল বলে কর্ণসিংহের গড়।
করিল অনেক বহু যুদ্ধ অতিশয়।
কদাচ তাহার গড় নহে পরাজয়।
করিল অনেক সৈন্য না হইল কাজ।
তাহা দেখি মদন পাল মনে পায় লাজ।
চাঁপাকর্ণ নামে পাত্র কহিল তাহায়।
কিরূপে লইব গড় চিন্তহ উপায়।
যদি এহি রাজ্য তুমি পাও লইবার।
সর্ব্বথা তোমাকে আমি দিব অধিকার।

* * * * *

(এই স্থানে পুঁথি খণ্ডিত)

আপনার লস্কর দিয়া কহে পাত্র স্থানে।
যে কার্য্য করিবা তাহা করিবা যতনে॥
এহি কথা শুনি তবে রাম মদন পাল।
হরষিত হয়া অতি কুকে মারে তাল॥
শীঘ্রগতি সাজে রণে যইয়া দলবল।
চারিদিকে গড়খান বেড়িল সকল॥
পরল তক্ষণে সব কাতর বদন।
মদন পাল রণ জয় করিল তখন॥
আলাবন্দ দাসে কহে জানিবা নিশ্চয়।
পাত্র বোলে সেহি কাক সেহি জানি হয়॥

কানসোনা গড় ক্রমে কর্ণসেনের গড় ও কর্ণ সিংহের গড়ে পরিণত হইয়াছে কি? ... পাল কি প্রসিদ্ধ পালবংশীয় রাজা? রাজা মদন পাল বিষ প্রয়োগে অধিবাসীদিগকে হীনবল করিয়া কর্ণসিংহের গড় বা কানসোনা গড় অধিকার করিয়াছিলেন, এইরূপ কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি অবলম্বনে কি উক্ত উপাখ্যান রচিত হইয়াছে?

পত্রিকা-সম্পাদক।

জগন্নাথ-বিজয় ও কবি মুকুন্দ।

এই প্রবন্ধে আলোচ্য গ্রন্থখানির নাম জগন্নাথ-বিজয়। প্রণেতা মুকুন্দ। কিরূপে উড়িষ্যা দেশে জগন্নাথ প্রতিষ্ঠিত হইলেন, জগন্নাথের মাহাত্ম্য কি, তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থের পত্র সংখ্যা ২৩। লেখকের নাম বা সন তারিখ কিছুই নাই কিন্তু পত্রগুলির অবস্থা দেখিয়া বোধ হয়, গ্রন্থখানি শত বৎসরের অধিকবয়স্ক।

কবি মুকুন্দ গ্রন্থমধ্যে আপনার কোন পরিচয় দেন নাই। সুতরাং এই গ্রন্থপাঠে তিনি কি জাতি, কোথায় তাঁহার নিবাস ছিল, তাহা সুনিশ্চিত ভাবে জানিবার উপায় নাই। গ্রন্থমধ্যে তিনি নিম্নলিখিত রূপে স্বীয় নামের ভণিতা দিয়াছেন :—

১। ভারতী মুকুন্দ ভণে মুকের চরণে।
জগন্নাথবিজয় নর শুনে সাবধানে॥
২। কান্দিতে কান্দিতে রাজা ফিরি চলিল ঘর।
ভারতী মুকুন্দ ভণে গোবিন্দচরণ॥
৩। হেন কালে ব্রহ্মার পুরী থাকিলা নরপতি।
ভারতী মুকুন্দে ভণে জগন্নাথ স্থিতি॥

৪। জগন্নাথ বিজয় নর শুনে এক চিত্তে।
ভারতী মুকুন্দে ভণে বন্দিয়া জগন্নাথে॥
৪। ভারতী মুকুন্দে ভণে শ্রীহরির চরণে।
সালাবর্ত্তার জন্মনে দয়া হৈল নারায়ণে॥

এই সকল কবিতা হইতে মুকুন্দ নাম ব্যতীত অধিক আর কিছু জানা যায় না। বঙ্গবাসিগণ মুকুন্দ নামক এক কবির বিষয় বহুদিন হইতে অবগত আছেন। তিনি মুকুন্দরাম মিশ্র বা চক্রবর্ত্তী—উপাধি কবিকঙ্কণ। কিন্তু সে মুকুন্দ, এ মুকুন্দ নহেন। মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গলে আপনার যে ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে চণ্ডীমঙ্গল রচনার পূর্ব্বে যে তিনি কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এমন কথা নাই। চণ্ডীমঙ্গলই তাঁহার প্রথম রচনা। তৎপূর্ব্বে দামুন্যার চাষ চষিয়াই কাল কাটাইতেন। চণ্ডীমঙ্গল রচনার পর জগন্নাথ-বিজয় রচিত হওয়া একবারেই অসম্ভব। জগন্নাথবিজয়ের ভাষা ও রচনাপ্রণালী চণ্ডীমঙ্গলের ভাষা ও রচনাপ্রণালী হইতে এত প্রাচীন যে, যে লেখনীতে চণ্ডীমঙ্গল রচিত হইয়াছে, সেই লেখনীতেই জগন্নাথ-বিজয় রচিত হইতে পারে না। উভয় গ্রন্থের ভাষাও এক প্রকার নহে। বঙ্গদেশের ভিন্ন অংশে এখনও যেমন ভাষার বিভিন্নতা দেখা যায়, সে কালেও সেইরূপ ছিল। আমরা কবি রূপনারায়ণের দুর্গামঙ্গলে যেরূপ ভাষা দেখিয়াছি, জগন্নাথ-বিজয়ের ভাষা ঠিক সেইরূপ। ইহাতেও যে স্থলে কর্ত্তার উত্তম পুরুষ, সেই স্থলের ক্রিয়ার নাম পুরুষ; সপ্তমীর 'তে' স্থলে 'ত'; দ্বিতীয়ার 'কে' স্থলে 'ক'; তৃতীয়ার 'কর্ত্তৃক' স্থলে 'তে', সম্ভ্রমার্থে ক্রিয়াপদে 'আ' যোগ, অতীতকালে 'ইলাম' স্থলে 'নু' প্রভৃতি দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা 'জগন্নাথ বিজয়' হইতে সপ্রমাণ শব্দগুলি উদ্ধৃত করিতেছি:—

১। কর্ত্তা উত্তমপুরুষ, ক্রিয়া প্রথম পুরুষ।
মাগে (মাগি) .. ... মহা মহা কবিগণের আগে নামে পরিহার।
রচিল (রচিলাম) ... ... রচিল কৃষ্ণের কথা দাক অবতার।
২। কর্ত্তা প্রথম পুরুষ, ক্রিয়া উত্তম পুরুষ।
হৈবা (হইলে) .. ... মহাপ্রলয় হৈল সে বৃক্ষ না চলিব।
৩। ভবিষ্যৎ অর্থে অতীতকালের বিভক্তি।
রহিল (রহিবে) ... ... যুগে যুগে সেই কীর্ত্তি রহিব ঘোষণ।
কহিল (কহিবে) ... ... তা সবার গুণ কহিব কাহার শকতি।
রচিল (রচিব) ... ... রচিল কৃষ্ণের কথা দারু অবতার।
৪। সম্ভ্রম স্থলে তুচ্ছার্থক 'ইল' প্রয়োগ।
নিরমিল (নিরমিলেন) ... কৌতুকে শ্রীহরি এক কুণ্ড।
৫। ব্রজভাষার ক্রিয়াপদের ব্যবহার।
কৈলুঁ (করিলাম) ... ... কোন কার্য্য কৈলুঁ মুঞি ব্রহ্মার পুরী গিয়া।

পাইনু (পাইলাম) ... ... "বৃক্ষ হৈতে মুঞি পাইনু উদ্দেশ।"
না পাও (না পাই) .. ... "কোন খানে মোর পুরী না পাও উদ্দেশ।"

৬। দ্বিতীয়া বিভক্তির 'কে' স্থলে 'ক' প্রয়োগ।

বংশেক (বংশকে) ... "সূর্য্যবংশেক দিল রাজা উচ্ছন্ন নগর।"
কুক্ষেক (কুক্ষকে) ... "বড় কর্ম্ম করিল ভায়া কুক্ষেক পাইতে ঈশ্বর।"

৭। সপ্তমীর 'তে' স্থলে 'ত' প্রয়োগ।

তপেত (তপেতে) ... "তপেত তপস্বী রাজা বুদ্ধির বৃহস্পতি

৮। দ্বিতীয়া স্থলে প্রথমা প্রয়োগ।

রাজা (রাজাকে) ... "রাজা খুইয়া পক্ষী গেলা কুর্ম্মরা গোচর।"

৯। 'ইলেন' স্থলে ইলোঁ।

গেলোঁ (গেলেন) ... "জন্মান্তরি গেলোঁ রাজা আপনার দেশ।"

১০। সপ্তমী স্থলে প্রথমা।

দরশন (দরশনে) ... "দারিদ্র্য দুর্গতি খণ্ডে যাহার দরশন।"

১১। সপ্তমী স্থলে ষষ্ঠী প্রয়োগ।

তাহার (তাহাতে) ... "তাহার স্নান পিণ্ডদান আর নহে নহে।"
বুদ্ধির (বুদ্ধিতে) ... "তপেত তপস্বী রাজা বুদ্ধির বৃহস্পতি।"

১২। অকারান্ত শব্দের উত্তর সপ্তমীর 'য়' প্রয়োগ।

মণ্ডলর (মণ্ডলে) ... "সাগর সমান রাজা নাহি মহীমণ্ডলয়।"

১৩। মধ্যম পুরুষীয় 'উন' স্থলে 'উকা' প্রয়োগ।

থাকুকা (থাকুন) ... "নিরন্তর থাকুকা কৃষ্ণ তাহার সংহতি।"

কবি রূপনারায়ণের গ্রন্থে আমরা বর্ত্তমান কালের অপ্রচলিত যে সকল শব্দ দেখিতে পাই, জগন্নাথ বিজয়েও সেই সকল শব্দ দৃষ্ট হয়:—

নি (আপনি), আছিল (ছিল), এহি (এই), অঙ্গন (শরীর), এতেক (এই), মোকে (আমার প্রতি), বৈসে (বাস করে), ইত্যাদি।

এরূপ ভাষাসাদৃশ্য দর্শনে কবি মুকুন্দকে রূপনারায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু কবি মুকুন্দের জগন্নাথ-বিজয়ে এমন কতকগুলি শব্দ প্রয়োগ দেখা যায়, যাহা টাঙ্গাইল মহকুমা ব্যতীত অন্যত্র সচরাচর প্রচলিত নাই। এই শব্দগুলির কবি মুকুন্দের বাসস্থাননির্ণয়ের আমাদের অনুমানকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়। যেমন—

অরঙ্গ (বহু ২ ... "খনিল পৃথিবী যৈল অরঙ্গ নরয়" (ক)

(ক) খনিয়া পৃথিবী যৈল অরঙ্গ নরয়। ২।১৭।

অলঙ্গ শব্দ সংস্কৃত অলঙ্ঘ্য শব্দের বিকৃতি। আটীয়া পরগণার চলিত কথায় এবং জমিদারী চিঠায় এই অলঙ্গ শব্দের বহু ব্যবহার দেখা যায়। জমিদারী চিঠায় 'অলঙ্গ তপ' বলিলে 'তাহার অনেক পশ্চিম' এই অর্থ বুঝায়। ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের সহিত শিক্ষিত সমাজ হইতে অলঙ্গ শব্দের ব্যবহার উঠিয়া গেলেও প্রাচীন সম্প্রদায় ও অশিক্ষিত শ্রেণী অনেক বুঝাইতে অলঙ্গ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এ প্রদেশে অনেক স্ত্রীলোকের নামও 'অলঙ্গসুন্দরী' দেখা যায়।

(২) তরাতরি (শীঘ্র) .. "তরাতরি গেলা রাজা আপনার দেশ।"

'ত্বরা' এই সংস্কৃত শব্দ হইতে 'তরাতরি' শব্দ উৎপন্ন। আটীয়া পরগণায় 'তরাতরি' শব্দের খুব প্রচলন।

(৩) নবলেশ বা লবলেশ (চিহ্নমাত্র) " পুরী দেউল কিছু নাহি লব লেশ। (খ)

'কিছুমাত্র' বা 'চিহ্নমাত্র' বুঝাইতে ভদ্র মহিলা ও ইতর শ্রেণীর স্ত্রী পুরুষদিগের মধ্যে এই শব্দ বহু প্রচলিত, ভদ্র পুরুষদিগের মধ্যে প্রচলন কম।

(৪) গমাগম (গমনাগমন) "মনুষের গমাগম দেখে কতো দূরে। (গ)

আটীয়া পরগণার স্ত্রীলোকদের ইতর শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে এই শব্দ বড়ই প্রচলিত।

(৫) উদ্দেশ (ঠিকানা) "উদ্দেশ না জানি মোরা কাহার দ্বারা যানি। (ঘ)

অনুসন্ধান, ঠিকানা, চিহ্ন, প্রভৃতি বুঝাইতে উদ্দেশ বা উদ্দিশ ব্যবহার হয়।

(৬) সাকুল (সকল) "তোমা দরশনে মোর সাফল জীবন।

প্রাচীনেরা ও নিম্নশ্রেণীর লোকে 'সফল' শব্দের স্থলে 'সাফল' ব্যবহার করেন।

(৭) আছিল (ছিল) "মোর পিতৃলোক আছিল এহি স্থানে।

এ প্রদেশে সকলেই 'আছিল' প্রয়োগ করেন। কিন্তু ঢাকা শিক্ষিতদিগের মধ্যে 'আছিল' প্রয়োগ বড় দেখা যায় না। তাঁহারা 'ছিল' ব্যবহার করেন।

(৮) গহিন (গভীর) "অলঙ্গ তাহার জল গহিন গম্ভীর। (ঙ)

ইতর শ্রেণীর লোকের মধ্যে 'গহিন' শব্দ খুব প্রচলিত।

(৯) মাঠ (অতীক্ষ্ণ, কম) "বিষকরীর সঙ্গ অল্প হইলে পরিহার।

এই শব্দের অকারান্ত উচ্চারণ। হসন্ত উচ্চারণে ক্ষেত্র বা প্রান্তর বুঝায়।

(১০) বিচ্ছেদ (বিলাপ অর্থে) "এত শুনি ব্রহ্মা বলেন না কর বিচ্ছেদ।"

বিলাপ অর্থে বিচ্ছেদ শব্দ আটীয়া পরগণার স্ত্রীলোক ও ইতর শ্রেণীতে খুব। নমঃশূদ্র জাতীয়েরা বিচ্ছেদকে বিকৃত করিয়া বিচ্ছাদ উচ্চারণ করে।

(খ) দেউল দেহরা পুরী কিছু নাহি লেশ। ৪।১।৮
(গ) মনুষ্যের গমাগম দেখি কত দূরে। ৪।২।৬
(ঘ) এ রাজ্যের কোন রাস্তা একুই না জানি। ৪।১।৯
(ঙ) যেত গভা নাম তার অতি বড় গভীর। ৬।১।৬

(১১) ব্যথে (কষ্ট হয়) "নিদারুণ নৃপতি খানিক নাহি ব্যথে।"

ব্যথে সর্ব্বশ্রেণীতে ব্যবহৃত হয়।

(১২) ক্ষেমুকা (ক্ষমা করুন) "যত অপরাধ কৈলুঁ ক্ষেমুকা আমারে।"

'ক্ষমা' কে 'ক্ষেমা' বলিয়া এ অঞ্চলের লোকে উচ্চারণ করে। সম্ভ্রমার্থে 'উন' স্থানে উকান্ ব্যবহার করে। যেমন করুকান (করুন) যাউকান্ (যাউন)। শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে 'উন বা উকান' ব্যবহার না করিয়া 'উকা' ব্যবহার করিয়া থাকে। বোধ হয় বহু পূর্ব্বে এ দেশেও 'উকা' বলাই রীতি ছিল, ক্রমে 'উকান' হইয়াছে। এখন আবার উকানের পরিবর্ত্তে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে 'উন' প্রচলিত হইতেছে।

(১৩) পৈরণ (পরিধান) কঙ্কণ বলয়া হাতে পৈরণ পীতবাস।

পৈরণ শব্দ নিম্ন শ্রেণীতে খুব প্রচলিত।

(১৪) থুইয়া (রাখিয়া) "রাজা থুইয়া ব্রহ্মা আইলা সন্ধ্যা করিতে নদঃ।"

সর্ব্ব শ্রেণীতে 'থুইয়া' শব্দ প্রচলিত।

(১৫) অখন (এখন)। অখনে দেখিয়া আইস পুরী আপনার। (চ)

পূর্ব্বোল্লিখিত ভাষা ও প্রাদেশিক বিশিষ্ট শব্দগুলি দর্শনে আমরা কবিকে টাচোইল মহকুমার অন্তর্গত আটীয়া পরগণার অধিবাসী বলিয়া অবধারণ করিতেছি। কবি মুকুন্দরচিত জগন্নাথবিজয় গ্রন্থ আটীয়া পরগণায় প্রাপ্ত হওয়াও তাঁহার আটীয়া পরগণার অধিবাসী অনুমান করিবার এক কারণ। জগন্নাথ বিজয় ব্যতীত মুকুন্দ রচিত অন্য কোন গ্রন্থ আমরা পাই নাই; পাইলে মুকুন্দের নিবাস আটীয়া পরগণার কোন গ্রামে ছিল, তিনি কি জাতি ছিলেন, তাহা জানিবার সম্ভব ছিল। জগন্নাথ বিজয়ের এক স্থলে "রাম রাম প্রভু রাম জগত জীবন" এই ধুয়াটি আছে। আটীয়া পরগণায় 'সীতার বারমাস্যা' নামে একটি অতি প্রাচীন 'বারমাস্যা' বহুকাল যাবৎ কুলকসমাজে চলিত আছে। ঐ বারমাস্যা "রাম রাম প্রভু রাম জগত জীবন" বলিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয় এই বারমাস্যা মুকুন্দ রচিত। এই বারমাস্যাতেও কবির কোন পরিচয় নাই। কিন্তু বারমাস্যা আটীয়া পরগণায় প্রচলিত থাকায় কবির নিবাস যে আটীয়া পরগণায় ছিল, তাহা সপ্রমাণ হইতেছে।

কবি মুকুন্দের জগন্নাথ বিজয়, এবং রূপনারায়ণ ঘোষের দুর্গামঙ্গল, এই উভয় গ্রন্থ পাঠ করিলে পূর্ব্বোক্তকে বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। দুর্গামঙ্গলের রচনা বিবিধ অলঙ্কার ছন্দ ও রস বিশিষ্ট; উহাতে মিত্রাক্ষর ও মিত্রাক্ষরতার বিন্দুমাত্রও শিথিলতা দৃষ্ট হয় না। জগন্নাথ বিজয় দুইটী ছন্দে রচিত—পয়ার ও ত্রিপদী। কবি মুকুন্দ স্বীয় গ্রন্থে পয়ারকে কোথাও পর্ব্ব ছন্দ, কোথাও নাচাড়ী নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ত্রিপদী দুই স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে - একস্থলে উহা মালিনী ছন্দ, অন্যত্র নাচাড়ী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। পয়ার ও ত্রিপদী নাম কোথায়ও নাই। বোধ হয় পয়ার ও ত্রিপদী নাম তৎকালে প্রচলিত হয় নাই। জগন্নাথ বিজয়ে ত্রিপদী ছন্দ প্রযুক্ত হইলেও মোটামুটী পয়ার ছন্দেই প্রায় সমস্ত গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে।

(চ) আপনে দেখিয়া আইস পুরী আপনার। ৪।১।৬

কিন্তু পয়ারের চতুর্দ্দশাক্ষরের নিয়ম ইহাতে রক্ষিত হয় নাই। মুকুন্দ কবির পয়ার বা খর্ব্ব ছন্দের এক এক চরণ ১২ হইতে ২০ অক্ষরে রচিত। পাঠকগণের অবগতির জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করিলাম।—

(১) চণ্ডিকাচরণ মুঞি বন্দো শিরে। ১২
যাহার মায়ায় স্থির নহে ব্রহ্মা হরি হরে। ১৩

(২) ব্যাস আদি মুনি বন্দো যথা তথা স্থিতি। ১৪
মহা মহা কবিগণের আগে মোর প্রণতি। ১৫

(৩) ব্রহ্মপুরাণের কথা শুনি তা শ্রবণে। ১৪
পাঁচালী প্রবন্ধে বিষ্ণুর গুণ রচিল বিধানে। ১৭

(৪) রোহিণী নক্ষত্রে তাহাতে যেবা প্রাণ ত্যজে। ১৫
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি তথাই হএ দিব্য সাজে। ১৫।

(৫) তপেত তপস্বী বুদ্ধির বৃহস্পতি। ১৩
ধর্ম্মপথ ছাড়িয়া তাহার আন নাহি গতি। ১৬

(৬) যত কর্ম্ম করিলা তারা কুকেক পাইতে দরশন। ১৯
না দেখিয়া কৃষ্ণমূর্ত্তি ভাজিল জীবন। ১৪

(৭) ঝালা থুইয়া ব্রহ্মা আইলা সন্ধ্যা করিতে সত্বর। ১৮
ব্রহ্মার মুহূর্ত্তেক বাটি সহস্র বৎসর। ১৫

(৮) হস্তী ঘোড়া নানা রৌপ্য-কৈল দান। ১২
বিপ্রগণে আশীর্ব্বাদ করে হাতেত লইয়া দুর্ব্বা ধান। ২০

এই দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে আমাদিগকে বিশেষ কোন অনুসন্ধান করিতে হয় নাই। গ্রন্থের যে পত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই পত্রেরই ছত্রে ছত্রে অক্ষরের এইরূপ হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। রূপনারায়ণ ও মুকুন্দ একদেশবাসী, সুতরাং এই অবস্থায় উভয়ের রচনার এই প্রভেদ অল্পদিন ব্যবধানে হইতে পারে না। মুকুন্দের বিংশতি অক্ষরের পয়ার ও নিরলঙ্কার রচনা প্রণালী রূপনারায়ণের সুমার্জ্জিত চতুর্দ্দশাক্ষর পয়ার রসালঙ্কারযুক্ত রচনাতে পরিণত হইতে বহু কাল লাগিয়াছিল। মুকুন্দের মালিনী বা নাচাড়ী ছন্দ ও ত্রিপদী তদীয় খর্ব্ব ছন্দের মতই আক্ষরিক বৈষম্যে পরিপূর্ণ। রচনা দেখিয়া বোধ হয় মুকুন্দের সময় পাঁচালী রচনা করিবার প্রথা আরম্ভ হইতেছিল। রাগিণী ও তালের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কবি পদ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। অক্ষরের হ্রাস বৃদ্ধির দিকে তাঁহার দৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হয় নাই। স্বরের হ্রস্বতা ও দীর্ঘতায় আক্ষরিক বৈষম্য দূর হইয়াছে। বাঙ্গালা পদ্য রচনার এই আদিম ভাব মুকুন্দের গ্রন্থে অতি উজ্জ্বল ভাবে দৃষ্ট হয়। এইজন্য আমরা তাঁহাকে রূপনারায়ণ হইতে বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে করি। কবি রূপনারায়ণ প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। * সুতরাং কবি মুকুন্দ তিন শত বৎসরেরও বহু পূর্ব্বে জগন্নাথবিজয় রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া বুঝা যাইতেছে।

* 'দুর্গামঙ্গল' প্রবন্ধ দেখ।

গতি' প্রতি' জানিয়া, শ্রীকৃষ্ণ চরণে
গণ চৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার
বাস করিয়া তথায়ই লীলা সংগোপন
পরিণত হইয়াছে। চৈতন্যে
তাহাতে দেব বন্দনার মূলে
ইমাগতি, গরুড়ী, গুরুদেব
প্রভৃতির বন্দনা করিয়াছেন, তাঁহা
ধ হয় মুকুন্দ চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই রচনা
মূলপই বটে। চৈতন্যের তিরোধানের অল্পকাল পরে
পরম ভাগবত বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবত রচনা করেন। চৈতন্য ভাগবতের ভাষার সহিত
তুলনা করিলে, মুকুন্দের ভাষা ও রচনাপদ্ধতি অনেক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। এইজন্য
আমরা কবি মুকুন্দকে চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বুঝিতেছি।

চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। বঙ্গদেশে চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি চণ্ডীদাস ঠাকুর। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের মতে চণ্ডীদাস চৈতন্যের এক শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া জানা যায়। "বিধুর নিকটে নেত্রে পক্ষ পঞ্চবাণ" হইতে চণ্ডীদাস ১৩২৫ শকে গীত রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অবধারণ করা যায়। এই মত উপেন্দ্র মহাশয়ের মতের অধিক বিরোধীও নহে। চণ্ডীদাসকে বঙ্গের আদি কবি বলিয়া অনেকের বিশ্বাস আছে। কিন্তু তাঁহার সুরুচিত মাধুর্য্যপরিমিত কবিতা গুলি পাঠ করিলে স্বতই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে প্রথমেই কোন ভাষায় এমন সুন্দর কবিতা রচিত হইতে পারে না। মুকুন্দের ভাষার সহিত চণ্ডীদাসের কবিতার তুলনা করিলে মুকুন্দকে চণ্ডীদাসের পাঠ্যবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। এই জন্য চণ্ডীদাসের আবির্ভাব কাল ১৩২৫ শক ধরিয়া মুকুন্দের আবির্ভাব কাল ১২২৫ শক বা ১৩০৩ খৃষ্টাব্দ নির্ণয় করিতেছি, সুতরাং বর্ত্তমান সময়ের প্রায় ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে কবি মুকুন্দ জগন্নাথবিজয় রচনা করিয়াছিলেন।

কবি মুকুন্দ বিবাহের বেশভূষণ বর্ণনার এক স্থলে লিখিয়াছেন—"গুয়া নারিকেল সারি সারি।" মঙ্গলচণ্ডীর ঘটে কদলী বৃক্ষ রোপণ প্রথা আজিও বঙ্গে প্রচলিত আছে। কিন্তু গুয়া নারিকেল রোপণ প্রথা যে বঙ্গদেশে কোন কালে ছিল, তাহা কোন গ্রন্থে বা লোক মুখে জানা যায় না। বোধ হয় অতি পূর্ব্বে ওলাক ও নারিকেল বৃক্ষ মঙ্গলার্থে রোপিত হইত। ক্রমে সে প্রথা লোপ পাইয়াছে; এই গুয়া ও নারিকেল রোপণ বর্ণনা হইতেই মুকুন্দ যে অতি প্রাচীন তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

যত দূর জানা গিয়াছে তাহাতে কবি মুকুন্দকেই বঙ্গের প্রাচীনতম কবি বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু মুকুন্দের পূর্ব্বেও চণ্ডী ও মনসা বিষয়ক কোন গান প্রচারিত থাকা অসম্ভব নহে। মুকুন্দের আবির্ভাবকালে চণ্ডী বিশেষভাবে সর্ব্বত্র এবং বিষহরী দেবী কচিৎ পূজিতা

হইতেছিলেন। তাহা মুকুন্দের রচনাতে
লিখিয়াছেন ;—

চণ্ডিকাচরণ মুক্তি বন্দে
যাঁহার মায়ায়
সমুহ
হে,

বন্দনায় এত কথা মুকুন্দ আর
অধিক লেখাতে তৎকালে চণ্ডীর প্রভাব সহজে
বন্দনা নাই। কিন্তু জগন্নাথের বিবাহ সভায় দেব-
অষ্ট নাগে চড়াইয়া সর্ব্বশেষে আনিয়াছেন :—

সিদ্ধ মুনি ঋষিগণ আইলা যে তত্ক্ষণ
অষ্টনাগে আইলা বিষহরী।

ইহাতেই বোধ হয় কবি মুকুন্দের সময় বিষহরীর তেমন প্রতিপত্তি হয় নাই। তিনি দেবতা পদ কেবল পাইয়াছেন মাত্র। চণ্ডীরই তখন পূর্ণ অধিকার। পরবর্ত্তী মনসার গীত কাব্যগুলিতে দেখা যায় বঙ্গদেশে প্রথমে চণ্ডীর পূজাই প্রচলিত ছিল। চণ্ডীর সহিত বিবাদ করিয়া বহুকষ্টে বিষহরীকে আপন মহিমা প্রচার করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক বন্দনা প্রভৃতি পাঠ করিয়া ইহা বুঝা যাইতেছে যে, বঙ্গদেশে যখন চণ্ডীর পূজা সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল, বিষহরীর পূজা তেমন প্রচলিত হয় নাই, সেই সুপ্রাচীন সময়ে কবি মুকুন্দ স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন। চণ্ডীদাসের জীবনীতে দেখা যায়, তাহার সময়ে বিষহরী বঙ্গদেশে একরূপ প্রধান দেবতারূপে পরিণত হইয়াছেন। বিষহরী গীত গাহিয়া সর্প ব্যবসায়ীরা সাপ 'খাঁপাইত'। সুতরাং এই বিষহরীর বৃত্তান্ত হইতেও মুকুন্দ যে চণ্ডীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা বুঝা যায়। *

কবি মুকুন্দ সংস্কৃত জানিতেন না। তিনি ব্রহ্মপুরাণের কথা লোকমুখে শুনিয়া জগন্নাথ-বিজয় রচনা করিয়াছিলেন :—

ব্রহ্মপুরাণের কথা শুনিয়া শ্রবণে।
পাঁচালী প্রবন্ধে বিষ্ণুর গুণ রচিল বিধানে।

কবি স্বীয় গ্রন্থকে পাঁচালী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে শ্রীরাগ, মল্লার, পঠমঞ্জরী, ধানশী, সুহি, সিন্ধুরা, বড়ারি, প্রভৃতি রাগ রাগিণী অনুসারে পদ রচিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে রচিত পাঁচালী গ্রন্থ সমূহেও আমরা এই সকল রাগ রাগিণীর ব্যবহার দেখিতে পাই। পয়ার ছন্দকে মুকুন্দ খর্ব্ব ছন্দ বলিয়া লিখিয়াছেন। ত্রিপদী এক স্থলে

* চৈতন্যের আবির্ভাবের সময় বিষহরীর পাঁচালী গানের খুব প্রচলন ছিল।

নী নামে অভিহিত হইয়াছে। কবি মুকুন্দ পরবর্ত্তী কালে রচিত বাংলার দীর্ঘ ছন্দ ভাবতে আমরা পয়ারকে খর্ব্বছন্দ ও ত্রিপদীকে দীর্ঘ ছন্দ বলিয়া উল্লেখ করিতে দেখিয়াছি। কবিকঙ্কণের খর্ব্ব ছন্দ নাম বহু প্রাচীন অবস্থায় নীলাচলে। ত্রিপদীর মালিনী নাম আর কোথাও করণ জগ না। মালিনী নরুবগণের নিকট প্রবাদতম তাহে জগন্নাথবিজয়ে ত্রিপদী ও পয়ারকে আবির্ভাবের পর মুকুন্দ জগন্নাথবিজয় রচনা করিলে অবশ্যই তাহা প্রাচীন ধারাবাহিক গ্রন্থের চৈতন্যের বন্দনা থাকিত কিন্তু মুকুন্দ [illegible] বর্ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, তিন রসের উদ্দীপনা বা বর্ণনার লক্ষ্মী, গণেশ, চণ্ডিকা, ব্যাসদেব, অন্নদা জননী, জন্মভূমি দৃষ্ট হইয়া থাকে। পাঁচালী কীর্ত্তনে গ্রন্থে চৈতন্যের প্রসঙ্গও নাই। ইহাতে ঘোর সন্দে সন্দে বোধ হয় নাচা হইত।

জয় বচনা করেন। তাঁহার ভাষা তদ্

[illegible] যা গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন :—

সরস্বতী গুরুদেবের বন্দিব চরণ।
জগন্নাথ মাহাত্ম্য কথা রচিব বচন।
প্রণমোহ নারায়ণ প্রথম কারণ।
যাহার প্রসাদে সৃষ্টি হয় পূর্ণ।
জল স্থল নাহি ছিল না রহে কারণ।
স্বরূপ আকার প্রভু দেবনারায়ণ।
দিগ বিদিগ নাহি তএ পরিত্রাণ।
হেন কালে নারায়ণ স্বভাব ভেজিল।
কেবল প্রকৃতি হৈতে সৃষ্টি মন দেল।
প্রথমে জন্মিল ব্রহ্মা বিষ্ণু পঞ্চানন।
তিন হেতু তিন জন করিল নিয়োজন।
ব্রহ্মা সৃজে বিষ্ণু পালেন সংসার।
যে কালে মহাদেব করেন সংহার।
প্রণমোহো ব্রহ্মা বিষ্ণু উমাপতি।

* * * *

সরস্বতী চরণে মন মজুক মোর মতি।
গুরুর চরণ বন্দো করিয়া ভকতি।
বন্দো আর প্রণমায়ং লক্ষ্মীর চরণ।
দারিদ্র দুর্গতি খণ্ডে যাহার দরশন।
[illegible] * মোর যার আর।
গণপতি প্রণমোহ বিঘ্ন অন্ধকার।
চণ্ডিকা চরণ মুক্তি বন্দোঁ শিরে।
যাহার মায়ায় স্থির রহে ব্রহ্মা হরি হরে।
অষ্ট মাহিয়া বৈসা দেবের অধ্যাহতি।
[illegible] দেবীর চরণে মোর থাকুক ভকতি।

ব্যাস আদি মুনি বন্দে যথা তথা স্থিতি।
বন্দো মহা কবিগণের অগ্রে মোর প্রণতি।
গুরুর চরণ বন্দো চরণে প্রণতি।
অন্ধ চক্ষুদাতা গুরু সে সন্ততি (?)।
জন্ম হৈলা যাতা পিতা যার যেহি কর্ম্ম।
পুনরপি গুরু হইতে হয় আর জন্ম।
জনক জননী বন্দো বন্দো জন্মস্থান।
যাহার প্রসাদে হৈল আমার নির্ম্মাণ।
মহামহা কবি গণের আগে মাগে পরিহার।
রচিল কুকের কথা যাহ অবতার।

অতঃপর গ্রন্থে যাহা বর্ণিত হইবে, কবি সংক্ষেপে তাহার কথা বলিয়াছেন—

উড়ন্তা পুরীর কিছু বলিব বাখান। *
যেমতে সৃজন হৈল যেমতে নির্ম্মাণ।
জগন্নাথ মহাপ্রভু জগতের সার।
যেরূপে উড়ন্তা পুরী হৈল অবতার।

কবি উড়ন্তা পুরী (শ্রীক্ষেত্র) নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

নীলমাধব নামে পূর্ব্বে দেব নারায়ণ।
নীল পর্ব্বতে মধ্যে সে অতি সুশোভন।
পৃথিবীর অন্ত তল সমুদ্রের পাশে।
পুরী নির্ম্মাণ হইল যেন মনের হরিষে।
পুরী নির্ম্মাণ করি উড়ন্তা নাম ধরি।
ক্ষিতিতলে ব্যক্ত-রূপে বৈকুণ্ঠপুরী।
অক্ষয় নামেতে বট পাতালেতে বৈসে।
উঠিল পৃথিবী ভেদি কুকের আদেশে।
তিন ভালে তিন তীর্থ তথাতে সকারি।
গয়া প্রয়াগ মহাতীর্থ উড়ন্তা পুরী।

ভগবান নীলমাধব উড়ন্যা পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় নরেন্দ্র সরোবর প্রভৃতি তীর্থ প্রতিষ্ঠা করিলেন। অনন্তর সূর্য্যবংশীয় কোন ব্যক্তির তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে উড়ন্যার অধিকার দিলেন। কালে তাঁহার বংশে ইন্দ্রদ্যুম্নের জন্ম হইল।

ইন্দ্রদ্যুম্ন আপনার ভোগে সুখে রাজ্য চিরদিন।
নানা গুণে অনুপম সে মহন্ত প্রবীণ।
তপেত তপস্বী বুদ্ধির বৃহস্পতি।
ধর্ম্মপথ ছাড়িয়া তাহার আন নাহি গতি।

* কবি মুকুন্দ উড়িষ্যা না লিখিয়া সর্ব্বত্রই উড়ন্তা লিখিয়াছেন। বোধ হয় প্রাচীন কালে উড়ন্তা লেখাই প্রচলিত ছিল।

ইন্দ্রদ্যুম্ন এক সুবর্ণ দেউল গঠন করিয়া তাহাতে কমললোচন মূর্ত্তি স্থাপন করিবেন স্থির করিলেন। সুবর্ণমন্দির নির্ম্মিত হইল। রাজা মূর্ত্তি আনিবার জন্য ব্রহ্মার নিকট গেলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, রাজা তুমি এই স্থানে অপেক্ষা কর, আমি সন্ধ্যা করিয়া আসিয়া উত্তর দিব। এই বলিয়া ব্রহ্মা চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যা করিতে ব্রহ্মার এক মুহূর্ত্ত সময় গত হইল। ব্রহ্মার মুহূর্ত্তে মনুষ্যের ষাটি হাজার বৎসর। ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মলোকে ছিলেন, ষাটি হাজার বৎসর যে গত হইল তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। এ দিকে পুরীতে ইন্দ্রদ্যুম্নের পুত্র পৌত্রাদি বহুবর্ষ রাজত্ব করিয়া স্বর্গারোহণ করিল। তৎপর প্রলয় উপস্থিত হইয়া সমস্ত রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল, সমুদ্রের বালুকায় সুবর্ণ দেউল সহ ইন্দ্রদ্যুম্নের পুরী আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। তার পর ব্রহ্মা পুনরায় নূতন সৃষ্টি করিলেন।

তৎপর ইন্দ্রদ্যুম্ন নিজ রাজ্যে আসিলেন। কিন্তু আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার সেই রাজ্য, সেই দেউল সমস্ত বালুকায় ও বনে পরিণত হইয়াছে। কান্দিতে কান্দিতে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বিশ্বকসেন নামে এক মুনি তথায় আসিলেন। মুনি রাজাকে কহিলেন :——

বচনেক বলি তোরে শুন মহাশয়।
অক্ষয় বট বৃক্ষ আছে যেথাইল আলয়।
চারি যুগের তত্ত্বসব বিদিত ভুবনে।
পূর্ব্ব বৃত্তান্ত যত অক্ষয় বট জানে।

এই কথা শুনিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন বৃক্ষের নিকটে গমন করিলেন।

বৃক্ষ কহিল—

ইন্দ্রদ্যুম্ন নাম রাজা আছিল প্রধান।
সোণার দেউল দিয়া গেল ব্রহ্মার বিদ্যমান।
পুনর্ব্বার না আইল রাজা আপনার দেশে।
রাজ্য ছিল সৈন্য তার অনেক পুরুষে।
সকল বৃত্ত আমি জানি ভাল মতে।
কহিব সকল কথা উলুক তোমাতে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন উলুকের নিকট গেলেন। স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া উলুক তাঁহাকে চিরজীবী কূর্ম্মের নিকট লইয়া গেলেন।

কূর্ম্ম রাজাকে দেখিয়াই চিনিল; চিনিয়া মমতার সহিত ভর্ৎসনা করিতে করিতে কহিল—

তোমা হেন রাজা নাহি সংসারে।
রাজ্য মাশ বংশ মাশ কইলা একবারে।
দেউল দিয়া গেলা তুমি ব্রহ্মার গোচর।
ব্রহ্মার মুহূর্ত্তেক ষাটি সহস্র বৎসর।
পুত্র পৌত্র তোমার অনেক পুরুষে।
চিরকাল রাজ্য ভুঞি গেল স্বর্গবাসে।

তবে সে তোমার রাজ্যে প্রলয় হইল।
সমুদ্রের বালি আসি পুরী আচ্ছাদিল।
পুনরপি প্রজাপতি রাজ্য করিলা সৃজন।
রাজা নাশ এত দিনে তোমার গমন।

রাজা কূর্ম্মের কথা শুনিয়া স্ত্রী পুত্র ও রাজত্বের জন্য বহু আক্ষেপ করিলেন। রাজার ক্রন্দনে কূর্ম্ম ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে সেই দেশের রাজ্য গ্রহণ করিতে বলিল।

কূর্ম্মের উপদেশে রাজা রাজ্য স্থাপন করিলেন। কিছুদিন পরে কৌমার্য্য নৃপতির কন্যা মালাবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। বিবাহের পর রাজা সস্ত্রীক যজ্ঞগৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন যজ্ঞস্থলে ব্রহ্মা মূর্ত্তিমান্ হইয়া রাজাকে বর দিলেন———

তোমার কারণে গোসাঞি দিতেতে অবতার।
কৃষ্ণ দৈত্য মারি কৈল পৃথিবী উদ্ধার।
ব্রহ্ম শাপ লক্ষ্য করি ছাড়িব সংসার।
ব্রহ্ম অগ্নি পুড়িবেন কৃষ্ণ দেহ আপনার। *
যেহি নিম্ব বৃক্ষ হরি ছাড়িব জীবন।
সেহি নিম্ব দারু তাহিয়া পাড়িব ততক্ষণ।
বিষ্ণুপত্নীর সহে অক্ষয় শরীরে।
পাইবা বাঞ্ছিত ফল মিলিব সত্বরে।
পূর্ব্বে তপ করিলে তুমি সেই সে কারণে।
দারু হইআ ভোগ ভুঞ্জিব ভুবনে।
বিষ্ণু পত্নীর সহিত মিলিব শ্রীহরি।
প্রবত করিয়া তবে আনিবা তরাতরি।
সুবর্ণের দেউল আছিল যথাতে।
তাহার উপর দেউল তুমি করহ রচিতে।
তাহার মধ্যে লইয়া দারু পুজিহ বিধানে।
দ্বার দিয়া ফিরিয়া চাহিহ পঞ্চদশ দিনে।
পঞ্চদশ দিন গেলে করিহ নিরক্ষণ।
শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান হৈয়া দিব দরশন।
বলভদ্র নারায়ণ সুভদ্রা গোসাঞি।
তিন মূর্ত্তি হইব তথা ত্রিভুবন জিনি।
সেহি তিন মূর্ত্তি যেহি দেখিব নয়নে।
মনুষ্য শরীরে যাইব বৈকুণ্ঠ ভুবনে।

---

* জগন্নন্দের চৈতন্যমঙ্গলে পাঠ—
ভাদাবতরণে কৃষ্ণ ক্ষিতি অবতার।
কৃষ্ণ দৈত্য মারি খণ্ডাইল ক্ষিতিভারে।
ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য করি শরীর ছাড়িব।
ব্রহ্ম অগ্নি নিজ দেহ সফল পুড়িব।—শ্রীনঃ নাঃ বঙ্গ।

ব্রহ্মার বর পাইয়া রাজা মালাবতীর সহিত স্বীয় রাজধানীতে আগমন করিলেন। ইহার তাঁহার চতুর্দ্দশ পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল। কন্যার নাম সত্যবতী।

ব্রহ্মার উপদেশে পূর্ব্বগঠিত সুবর্ণ দেউলের উপর ইন্দ্রদ্যুম্ন নূতন দেউল নির্ম্মাণ করিলেন। দেউল নির্ম্মিত হইল, কিন্তু দারু মিলিল না। রাজা বিষ্ণুপঞ্জর সহ দারু কবে আসিবে তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একদিন ভাসিতে ভাসিতে দারু আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা সমুদ্র হইতে দারু উঠাইয়া মন্দিরে স্থাপন করিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন। ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্ম্মা মন্দিরে আসিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি দেবতা আজ্ঞা করিলেন। হঠাৎ বিশ্বকর্ম্মার সমুদয় অস্ত্রের ধার কমিয়া গেল। বিশ্বকর্ম্মা অস্ত্র শানিতে স্বর্গে গেলেন। মন্দিরের মধ্যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণের শব্দ থামিয়া গেল। শব্দ না শুনিয়া রাজার মনে হইল বুঝি মূর্ত্তিনির্ম্মাণ শেষ হইয়াছে। অমনি দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন। পঞ্চদশ দিন দ্বার বন্ধ রাখিতে হইবে সে কথা ভুলিয়া গেলেন। দ্বার খুলিয়া দেখিলেন—

আকার হইতে আছে কাষ্ঠের নির্ম্মাণ।
যত পদ চক্ষু নাহি নাহিক সমান। *

তখন রাজার পঞ্চদশ দিনের কথা মনে হইল। অমনি আপনাকে বহু তিরস্কার করিয়া পুনরায় দ্বার বন্ধ করিলেন। কিন্তু নিয়ম ভঙ্গ হওয়াতে বিশ্বকর্ম্মা আর মূর্ত্তিনির্ম্মাণ করিতে আসিলেন না। পঞ্চদশ দিন পরে দ্বার খুলিয়া পূর্ব্ববৎ অসম্পূর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া রাজা বড় বিষণ্ণ হইলেন।

সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া জগন্নাথ ইন্দ্রদ্যুম্নকে বর দিতে চাহিলেন; ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন, তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ কর; আমি এই বর চাই। জগন্নাথ সম্মত হইলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন বিবাহের আয়োজন করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে জগন্নাথ রথ আরোহণ করিয়া বলরাম ও সুভদ্রাকে সঙ্গে লইয়া ইন্দ্রদ্যুম্নের আলয়ে গমন করিলেন। কাষ্ঠে মানুষে বিবাহ হইবে, এই অদ্ভুত সংবাদ শুনিয়া চারিদিকের অসংখ্য লোক বিবাহ সভায় উপস্থিত হইল। দেবতারাও আসিতে ছাড়িলেন না। ব্রহ্মা, শিব, দুর্গা, গণেশ, প্রভৃতি আসিয়া সমবেত হইলেন। সিদ্ধ, ঋষি, মুনিগণ আসিলেন। শেষে অষ্ট নাগে চড়িয়া বিষহরীও আসিলেন। সত্যবতী বৈবাহিক বেশে সজ্জিত হইলেন। কবি রাজকন্যা সত্যবতীর বেশভূষার এই বর্ণনা করিয়াছেন:—

বাহু মৃণাল বলয়া দুই করে।
কনকের বলয়া মাণিক্য নিশালে।
সুবর্ণের নূপুর পায়ে ঝুনুঝুনায়।
প্রবাল মুকুতা গলে শশিময় হার।

---

* আকার হইতেছিল মূর্ত্তির নির্ম্মাণে।
চক্ষু মুখ হস্তপদ নাহি হয় সমান।—প্রেমদাস।

মধ্যদেহ ভাগু তার কেশরী গর্জিত।
কনক কিঙ্কিণী খোভে দেখিতে বিরচিত।
মেঘ কুন্তল জিনি চামর কেশ।
তাহা দেখি চামর * * প্রবেশ।
হেন কেশ উর্দ্ধ করি বান্ধয়ে কবরী।
বিচিত্র পাটের খোপ বান্ধে সারি সারি।
বিচিত্র কাঁচলি পরে নামে গঙ্গাজল।
দেখি বিদ্যুৎ জিনি করে ঝলমল।
দিব্যবস্ত্র পরে তার নাহিক যাথার্থ।
প্রচিব কিরণ যেন দেখি বিদ্যমান।
সুচারু বদন দেখি কোটী চান্দ নিন্দিত।
খঞ্জন যুগল আখি কাজরে রঞ্জিত।
সর্ব্বাঙ্গে লেপিত গন্ধ চন্দন কস্তুরি।
গজেন্দ্র গমনে যায় চরণে নূপুরি।

সত্যবতীর রূপ দেখিয়া সভাসদ্‌গণ দুঃখিত হইল :—

সত্যবতী দেখিয়া লোকে করে হাহাকার।
রাজা নহে দেখি এহত অবুধ গোঁয়ার।
পরম সুন্দরী বালা লক্ষ্মীর সমান।
হেন রূপবতী কন্যা কাষ্ঠে করে দান। *

সত্যবতীর মাতা মালাবতী জামাতাকে বরণ করিতে আসিয়া জামাতার অপূর্ব্ব কাষ্ঠ মূর্ত্তি দর্শনে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মালাবতীর ক্রন্দনে জগন্নাথ কাষ্ঠ মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া চতুর্ভুজ মদনমোহন মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। মালাবতী সন্তুষ্ট হইলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন যথাশাস্ত্র কন্যাদান করিয়া রাজপুরী সহিত প্রচুর বাজ্য নারায়ণকে যৌতুক দান করিলেন। সত্যবতী নারায়ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। নারায়ণ সত্যবতীর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে সত্যবতী প্রার্থনা করিলেন :—

যদি মোরে তুষ্ট হৈলা প্রভু গদাধরে।
বৎসর বৎসর অন্তরে বিবাহ করিবা আমারে।
এহি পুরী থাকিব আমি শুন নারায়ণ।
সত্যরূপে আমার গৃহে করিবা গমন।

নারায়ণ সত্যবতীর প্রার্থনায় সম্মত হইয়া কহিলেন—

তোমার অধিক প্রিয়া নাহিক আমার মনে।
সত্য এহ বাণী আমি তোমার বিদ্যমানে।

---

* পরম সুন্দরী কন্যা বিভা দেই কাষ্ঠে।
হেন নির্দ্দয় রাজা প্রাণ নাহি ফাটে।—জয়ানন্দ।

কোন কালে না হইব তোমাক বিস্মরণ।
সত্যরূপে তোমার গৃহে করিব গমন।
বিবাহ করিব প্রতি বৎসর অন্তরে।
লৌকিক বিধান হেতু পীরিতি তোমারে।

নারায়ণ সত্যবতীকে বর দিয়া নিজ পুরীতে গমন করিলেন, কিন্তু পুরীতে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। বিবাহের সংবাদ শুনিয়া লক্ষ্মী দ্বারে কপাট আটকাইলেন। লক্ষ্মীর রোষ দেখিয়া জগন্নাথ অত্যন্ত ভয় পাইলেন। পুরীতে প্রবেশ করিতে তাঁহার সাহস হইল না। বলরামের বহু অনুনয় বিনয়ে শেষে লক্ষ্মী দ্বার ছাড়িয়া দিলেন।

অতঃপর নারায়ণ প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে সত্যবতীকে বিবাহ করিবার জন্য ইন্দ্রদ্যুম্নের বাটীতে যাইতে লাগিলেন। ইহাই জগন্নাথের রথযাত্রা।

সত্যবতীর বিবাহের পর ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা অন্নজল পরিত্যাগ করিয়া জগন্নাথের স্তব করিতে লাগিলেন। তবে তুষ্ট হইয়া জগন্নাথ বর দিতে চাহিলেন, ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রার্থনা করিলেন—

চতুর্দ্দশ পুত্র মোর অতি পরতর।
সকল বিনাশ করহ প্রভু গদাধর।
* * * *
এক বোল শুন চক্রপাণি।
পুত্র সবে বলিবে হে দুষ্কর বাণী।
আমার পিতা বড় কৈল সংসার ভিতরে।
নিজপুরী সহে রাজা দিল গদাধরে।
হেন দুষ্কর বাণী প্রাণে নাহি সয়।
তথির কারণে পুত্র করিব প্রলয়।

নারায়ণ রাজার ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া রাজপুত্রদিগকে বিনাশ করিলেন। অনন্তর ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি জন্য অনেক বর দিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্নের অনন্তকালস্থায়ী কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। অবশেষে———

দিব্য দৃষ্টি ইন্দ্রদ্যুম্নের হইল তখনে।
হাত যোড় করি থাকে গোসাঞির যেথানে।
জ্যোতিস্বরূপে রাজা হইল বাহির।
প্রবেশ করিল জ্যোতি গোসাঞির শরীর। *

এইরূপে ইন্দ্রদ্যুম্নের জগন্নাথপ্রাপ্তির সহিত কবি গ্রন্থের উপাখ্যান শেষ করিয়াছেন।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু, কেদারপুর,—চাঁদপুর।

---

* দিব্যদেহ ইন্দ্রদ্যুম্ন হইলা পাষাণ।
যোড় হস্তে রহে জগন্নাথের বিদ্যমান।
জ্যোতি স্বরূপ আত্মা হইল বাহির।
প্রবেশিলা জ্যোতি জগন্নাথের শরীর।—জয়ানন্দ।

১। আমাদের আলোচ্য কবি মুকুন্দ ও মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ একব্যক্তি কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে বটে, কিন্তু প্রবন্ধ-লেখক যে লিখিয়াছেন, "কবি চণ্ডীমঙ্গল রচনার পূর্ব্বে কোন গ্রন্থ-রচনা করেন নাই। চণ্ডীমঙ্গল তাঁহার প্রথম রচনা" এ কথা ঠিক নহে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গল রচনার পূর্ব্বে শিবকীর্ত্তন রচনা করেন।

২। প্রবন্ধলেখক তাঁহার সংগৃহীত কবি মুকুন্দের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত প্রাদেশিক ভাষার আলোচনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমার বিশেষ বক্তব্য আছে। এখনও যেমন কলিকাতা ও ঢাকা-অঞ্চলের কথিত ভাষায় প্রভেদ আছে, পূর্ব্বকালেও এইরূপ ছিল। যে কোন গ্রন্থকার যে কোন জেলার লোক হউন না কেন, তাঁহার গ্রন্থ ভিন্ন জেলার লোক-দ্বারা পরবর্ত্তীকালে লিখিত হইবার সময় সেই স্থানের প্রচলিত ভাষানুসারে একটু রূপান্তরিত হইয়াছে, ইহার অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। প্রায় দুই শত বর্ষের পূর্ব্বের হাতের লেখা দুই খানি শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পুঁথি দেখিয়াছি; তাহার একখানি বর্দ্ধমান অঞ্চলের লোকের লেখা, অপরখানিতে ত্রিপুরাবাসীর হস্তাক্ষর। গ্রন্থখানি এক ব্যক্তির রচনা হইলেও বর্দ্ধমানের পুথিতে রাঢ়ের ভাষার রূপ, আর ত্রিপুরার পুথিতে তদ্দেশপ্রচলিত ভাষার রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের আলোচ্য কবি মুকুন্দের জগন্নাথ-বিজয় সম্বন্ধে সেইরূপ ঘটিয়াছে। রসিক বাবু ময়মনসিংহ জেলাস্থ আটীয়া পরগণার পুথিতে তৎস্থানীয় লৌকিক ভাষার প্রয়োগ দেখিয়া কবি মুকুন্দকে আটীয়া পরগণার লোক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু এসিয়াটিক সোসাইটীর ও আমার নিজের সংগৃহীত কবি মুকুন্দের দুইখানি পুথিতে ঐরূপ প্রাদেশিক (অর্থাৎ ময়মনসিংহ অঞ্চলের) ভাষার আদৌ প্রয়োগ নাই। এই পুথি দুইখানি দক্ষিণ রাঢ়ের ভাষায় লিখিত। ইহাও জানান উচিত যে রসিক বাবুর পুথি ও সোসাইটীর পুথি প্রায় এক সময়ে লেখা। এরূপ স্থলে, রসিক বাবু আটীয়ার পুথি দেখিয়া কবি মুকুন্দকে যেমন ময়মনসিংহের লোক বলিতেছেন, আমরাও সেইরূপ অন্য দুইখানি দেখিয়া তাঁহাকে দক্ষিণ রাঢ়ের লোক বলিতে পারি। এই জন্য আমার মত এই যে, গ্রন্থকারের স্বহস্তের লেখা গ্রন্থ-ভিন্ন অপরের লেখা গ্রন্থের ভাষা ধরিয়া গ্রন্থকারের জন্মভূমি নির্দ্দেশ করা সহজ নহে।

৩। এক স্থলে রসিক বাবু বলিয়াছেন,—কবি মুকুন্দের জগন্নাথ-বিজয় ও কপনারায়ণ ঘোষের দুর্গামঙ্গল পাঠ করিলে, জগন্নাথ-বিজয় দুর্গামঙ্গলের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার এই "বোধ" হইবার কারণ—(১) জগন্নাথ-বিজয়ে তেমন রচনা-পরিপাট্য বা ছন্দাড়ম্বর নাই; কবি কেবল রাগ ও তালের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পদ রচনা করিয়াছেন।—(২) তাঁহার গ্রন্থে অপরাপর দেবদেবীর বন্দনা থাকিলেও চৈতন্য দেবের বন্দনা নাই। চৈতন্য দেব শেষাবস্থায় নীলাচলে ছিলেন অথচ জগন্নাথ ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য লিখিলেও যখন কবি চৈতন্যের নাম উল্লেখ করেন নাই, তখন তিনি চৈতন্য দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী। রসিক বাবুই এক স্থলে লিখিয়াছেন, "মুকুন্দের ভাষায় সরল ভাব চণ্ডীদাসেও নাই"; সুতরাং তাঁহার মতে মুকুন্দ চণ্ডীদাসেরও পূর্ব্ববর্ত্তী; অতএব তিনি স্থির করিলেন কবি মুকুন্দ ছয় শত বর্ষ পূর্ব্বে বর্ত্তমান

দিলেন। বাস্তবিক কবি মুকুন্দ যদি ছয় শত বর্ষেরই হইতেন তাহা হইলে আমরা রসিক বাবুকে ধন্যবাদ করিতাম এবং তিনি ছয় শত বর্ষের এক প্রাচীন বাঙ্গালী কবির গ্রন্থ উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজ তাঁহার নিকট চিরঋণে আবদ্ধ থাকিত। কিন্তু তাহা নহে। রসিক বাবু যে সকল প্রমাণ দিতেছেন, তাহাতে আমরা কবি মুকুন্দকে চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে পারি না। ভাষার সমালোচনায় তিনি আর এক স্থলে বলিয়াছেন,—"কবি রূপনারায়ণের ভাষা যেরূপ দেখিয়াছি,—জগন্নাথ-বিজয়ের ভাষা ঠিক সেইরূপ।" রসিক বাবুই সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রমাণ করিয়াছেন, আড়াই শত বর্ষ পূর্ব্বে কবি রূপনারায়ণ বিদ্যমান ছিলেন। এরূপ স্থলে কবি মুকুন্দ ছয় শত বর্ষের কবি হন কিরূপে? কেবল ছন্দোবন্ধের দোষ ও ভাষার সরলতা দেখিয়া কবি মুকুন্দকে প্রাচীনতর বলিয়া স্বীকার করা যায় না। রসিক বাবু আরও বলিয়াছেন "দেড় শত দুই শত বর্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থেও এরূপ ভাষার অভাব নাই।" এরূপ স্থলে রসিক বাবুই আবার কবি মুকুন্দকে ছয় শত বর্ষ পূর্ব্বে লইয়া যান কেন? তবে একটা কথা কবি মুকুন্দ চৈতন্যের পরবর্ত্তী হইলে অবশ্যই বন্দনামধ্যে তাঁহার নামটা করা সম্ভব হইত, কিন্তু তিনি যদি চৈতন্যসম্প্রদায়ভুক্ত না হন, তবে তাঁহার নাম করিবেন কেন? জগন্নাথ দেবের মাহাত্ম্য বর্ণনাই কবির উদ্দেশ্য, তন্মধ্যে চৈতন্যবন্দনার তত বেশী প্রয়োজন দেখা যায় না; সুতরাং কবি মুকুন্দ তাহা যদি না করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই যে তাঁহার প্রাচীনত্ব কল্পনা করিতে হইবে, এমন কি কথা আছে? উৎকল ভাষায় অনেকগুলি জগন্নাথ মাহাত্ম্য আছে, তাহার অনেকগুলির গ্রন্থকার চৈতন্যের পরবর্ত্তী, কিন্তু কেহই ত চৈতন্যের নাম করেন নাই।

৪। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মুকুন্দের জগন্নাথ মাহাত্ম্যের আর দুই খানি পুঁথি আমরা পাইয়াছি, সে দুখানি হইতে কোন ক্রমে তাঁহাকে ময়মনসিংহ জেলার লোক বলা যায় না। বোধ হয় ময়মনসিংহের কোন লোক স্বদেশে জগন্নাথ-মাহাত্ম্য গান করিবার জন্য পুঁথি নকল করিয়া লয় এবং নকল করিবার সময় স্বদেশের লোকের বুঝিবার সুবিধা করিবার জন্য তাহাতে স্বদেশের চলিত শব্দ সকল বসাইয়া কার্য্যোপযোগী করিয়া লইয়াছিল। আমাদের কবি অপর দুইখানি পুথির লিপিকারকের সে প্রয়োজন হয় নাই; সুতরাং তাহাতে ময়মনসিংহের ভাষার আভাসও নাই। যাঁহারা হস্তলিখিত পুথি লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহারাই জানেন যে একই গ্রন্থ যত পরবর্ত্তী লেখকের হস্তে লিখিত হইয়াছে, ততই তাহাতে উদ্বোধক মার্জ্জিত ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। জগন্নাথমাহাত্ম্য গ্রন্থও যে সেইরূপ মার্জ্জিত হইয়াছে তাহার প্রমাণ পাইয়াছি।

৫। রসিক বাবু কবি মুকুন্দের জাতি নির্ণয় করিতে পারেন নাই, কিন্তু আমাদের দ্বিতীয় পুথিতে "দ্বিজ মুকুন্দ কহে বন্দিয়া শ্রীহরি" ভণিতা থাকায় কবি যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা জানা যায়।

৬। আর একটি গোল আছে,—রসিক বাবুর পুথিতে গ্রন্থের নাম আছে জগন্নাথ বিজয়,

আর আমার পুথিতে গ্রন্থের নাম আছে জগন্নাথমঙ্গল। এসিয়াটিক সোসাইটির পুথির নামও জগন্নাথ-বিজয়;—কিন্তু তিনখানি পুথিরই বর্ণনীয় বিষয় এক, কবির নামও এক। দুই একটি পাঠান্তর ব্যতীত এবং রসিক বাবুর পুথির প্রাদেশিক শব্দগুলি ব্যতীত পুথি তিন খানিতে ছত্রে ছত্রে মিল আছে। এক ব্যক্তির রচিত একই গ্রন্থের বিবিধ নাম কেন? আমার বোধ হয়, প্রথমতঃ জগন্নাথ-মঙ্গলই নাম ছিল, পরে জগন্নাথ-বিজয় নাম হইয়াছে। এ অনুমানের কারণ আছে। এখনকার জগন্নাথ-বিজয়ের পুথিতে গ্রন্থারম্ভে নারায়ণ, ব্রহ্মা, শিব, সরস্বতী, গণেশ, চণ্ডিকা ও ব্যাসের বন্দনা আছে, কিন্তু জগন্নাথ-মঙ্গলে এক নারায়ণ ব্যতীত আর কাহারও বন্দনা নাই। জগন্নাথমঙ্গলে কেবল "দ্বিজ মুকুন্দ কহে" এইরূপ ভণিতা আছে, কিন্তু জগন্নাথ-বিজয়ে "ভারতী-মুকুন্দ ভণে" এই "ভারতী" উপাধিযুক্ত ভণিতা পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন সত্যবতীর রূপ বর্ণনার অংশ জগন্নাথমঙ্গলে নাই, জগন্নাথ-বিজয়ে আছে। ইহা হইতে বোধ হয় যখন কবি ভারতী উপাধি লাভ করেন নাই, তখন "মঙ্গল" নামে স্বীয় গ্রন্থ প্রচার করেন, তৎপরে উপাধি পাইয়া গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়া "বিজয়" নাম দিয়া থাকিবেন।

৭। জগন্নাথ-বিজয়ে আছে,—

"ব্রহ্ম পুরাণের কথা শুনিয়া শ্রবণে।
পাঁচালী প্রবন্ধে বিষ্ণুর গুণ রচিল বিধানে॥"

এ কবিতা কবির প্রথম রচনা জগন্নাথ-মঙ্গলে নাই। এ কবিতাটি দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে কবি বাস্তবিক ব্রহ্মপুরাণ দেখিয়া আপনার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে জগন্নাথ সম্বন্ধে যে সকল কথা আছে, তাহা উৎকলের প্রবাদ অনুসারে লিখিত। ব্রহ্মপুরাণে জগন্নাথমাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত থাকিলেও তদনুসারে যে জগন্নাথ-বিজয় রচিত হয় নাই তাহা মিলাইয়া দেখিয়াছি। ব্রহ্মপুরাণে জগন্নাথের কথা আছে শুনিয়া কবি তাঁহার গ্রন্থের মৌলিকতা রক্ষা করিবার জন্য, পরবর্ত্তীকালে যখন জগন্নাথ-বিজয় নামে গ্রন্থের সংবর্দ্ধিত আকার প্রচারিত করেন, সেই সময় ঐ কবিতাটি যোজনা করিয়া থাকিবেন। তাঁহার গ্রন্থ যে মৌলিক নহে তাহার অন্য প্রমাণও আছে। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ইতিপূর্ব্বে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই চৈতন্যমঙ্গলে জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যের মুখে জগন্নাথ দেবের যে মাহাত্ম্য বর্ণনা করাইয়াছেন, তাহার সহিত কবি মুকুন্দের বর্ণনার সর্ব্বাংশে ঐক্য আছে। কেবল ঐক্য নহে, পদে পদে ছত্রে ছত্রে কবিতার মিল আছে। মূল প্রবন্ধের টিপ্পনীতে দুই একটা উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে। উভয় গ্রন্থ দেখিলেই সহজে বোধ হয় যেন এক ব্যক্তি অপরের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, কেবল মধ্যে মধ্যে যেন মাজিয়া ঘষিয়া লওয়া হইয়াছে। এখন কথা হইতেছে, জয়ানন্দ ও মুকুন্দ উভয়ের মধ্যে কে কাহার অনুসরণ করিয়াছেন? জয়ানন্দের রচনার ভাষার তুলনায় মুকুন্দের ভাষা যে অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন তাহা পড়িলেই বুঝা যায়। জয়ানন্দ নিঃসঙ্কোচে আপনার

পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকার ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদির উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কবি মুকুন্দের নাই। বিনীত বৈষ্ণব কবি স্বীয় পূর্ব্ববর্ত্তী বহুতর কবির নামোল্লেখে কাতর হন নাই। মুকুন্দ যদি জয়ানন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেন, আর তাঁহার কোন গ্রন্থ যদি জয়ানন্দের দৃষ্টিতে পতিত, তবে এরূপ বিনীত কবি তাঁহার নামোল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। ইহা দ্বারাও বুঝা যায় মুকুন্দ জয়ানন্দের পরবর্ত্তী; মুকুন্দ স্বগ্রন্থে এরূপ কাহারও উল্লেখ করেন নাই; সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে ইহার সাক্ষ্য পাওয়া যায় না; সুতরাং মুকুন্দ জয়ানন্দের নাম করেন নাই, অতএব তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী, এ কথা তাহার প্রতি খাটে না। এখন একমাত্র ভাষার তুলনা ভিন্ন আর কিছুরই প্রমাণ বিশিষ্ট প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। আমরা সংগৃহীত পুঁথি দুই খানির ভাষাই জয়ানন্দের ভাষা অপেক্ষা অনেকটা অপ্রাচীন, ইহা যে কেহ মিলাইয়া দেখিতে পারেন। জয়ানন্দ প্রায় তিন শত পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে চৈতন্য-মঙ্গল রচনা করেন। কবি মুকুন্দ তাঁহার পরবর্ত্তী। আমরা কবি মুকুন্দরামের যে শিবসঙ্কীর্ত্তন দেখিয়াছি, তাহাতেও স্থানে স্থানে "দ্বিজ মুকুন্দ" এইরূপ ভণিতা আছে কাহার কাহার মতে শিবসঙ্কীর্ত্তন মুকুন্দরামের বাল্যকালের রচনা। তাঁহার চণ্ডীমঙ্গলের ভাষার মত শিবসঙ্কীর্ত্তনের ভাষা সরল হইলেও ততটা ওজস্বিতা বা মাধুর্য্যপূর্ণ নহে। শিব সঙ্কীর্ত্তনের ভাষা অনেকটা জগন্নাথমঙ্গলের মত। ভাষার সাদৃশ্য থাকিলেও দুই মুকুন্দ এক কি না, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

কাশীদাসাগ্রজ কৃষ্ণদাস।

বঙ্গভাষায় প্রসিদ্ধ মহাভারতপ্রণেতা কাশীদাসের আর দুই সহোদর ছিলেন [redacted] কৃষ্ণদাস, মধ্যম স্বয়ং কাশীদাস, কনিষ্ঠ গদাধর দাস। কাশীদাস স্বীয় মহাভারতে আর দুই ভ্রাতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন——

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে তথা বৈসে ভাগীরথী।
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গি গ্রাম।
প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নাম।
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠভ্রাতা।
কাশীদাস কহে সাধুজনের চরণে।
হইবে নির্ম্মল জ্ঞান শুন একমনে।

অন্যান্য পুস্তকে———

তব পাদাম্বুজ, কৃষ্ণদাসাম্বুজ, কাশীদাস ধ্যায় ধ্যানে।

পুনশ্চ———

মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কাশীদাস কহে গদাধরদাসাগ্রজ।

কৃষ্ণদাস, কাশীদাস ও গদাধর দাস, তিনজনেই পরম ধার্ম্মিক, পরম বৈষ্ণব ও গ্রন্থকর্ত্তা ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সহোদরও যে গ্রন্থকর্ত্তা ছিলেন তাহা কাশীদাস স্বকৃত মহাভারতে কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। কোনরূপ আভাস পর্য্যন্তও দেন নাই। অন্য সহোদরকে গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া পরিচয় দিলে নিজের গৌরব বা প্রতিপত্তি কম হইতে পারে কাশীদাস এরূপ আশঙ্কায় ঈর্ষ্যাপ্রযুক্ত হইয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করেন নাই এরূপ হইতে পারে না।

কাশীদাস মধ্যম হইলেও জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সহোদরের পুস্তক লিখিবার পূর্ব্বে মহাভারত রচনা করেন। ১৩০৭ সালের ২য় সংখ্যার পরিষৎ-পত্রিকায় পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয়, বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ মধ্যে কাশীদাসী বিরাটপর্ব্বের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়,

যে জন শ্রবণ করে তারে কর দয়া।
উদ্ধার করহ প্রভু-দিয়া পদছায়া॥
চন্দ্র বাণ পক্ষ ঋতু শক সুনিশ্চয়।
বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয়।

এই পয়ারে লিখিত ১৫২৬ শককে বাঙ্গালা ১০১১ সাল করা হইয়াছে। অতএব ১০১১ সালের কিছু পূর্ব্ব হইতে মহাভারত আরম্ভ করিয়া ঐ ১০১১ সালে বিরাট পর্ব্ব শেষ করেন। তাহার পর অন্য অন্য পর্ব্ব রচিত হইলেও গদাধরদাস রচিত জগন্নাথমঙ্গলের অনেক পূর্ব্বে তাঁহার মহাভারত শেষ হইয়াছিল। সুতরাং কাশীদাস মহাভারতে গদাধরকে গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া পরিচিত করিতে পারেন নাই।

কৃষ্ণদাস গোপালদাস নামক এক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর নিকট দীক্ষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর এই আখ্যা প্রাপ্ত হন ও তাঁহার কৃপাতেই কৃষ্ণবিলাস নামে এক পুস্তক প্রণয়ন করেন।

ব্রাহ্মণ কুমার গুরু অতি দয়াবান।
কর্ণে মন্ত্র দিয়া মোর কৈল পরিত্রাণ॥
সেই ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর নাম খুঞা।
আজ্ঞা কৈল শ্রীনন্দনন্দন ভজ গিঞা॥
সে গুরুকৃপাতে মুঞি করি মহদন্ত।
অনুভবি হরিকথা করিল আরম্ভ॥
শ্রীকৃষ্ণবিলাস নাম শুদ্ধ ভক্তিযোগ।
শ্রবণ করিলে ঘুচে মনের বিয়োগ॥

কৃষ্ণদাস যে সময় গ্রন্থরচনা করেন, সে সময় তাঁহার পূর্ব্ব নাম গিয়াছে। কৃষ্ণদাস নাম আর নাই, তিনি গুরুদত্ত শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর এই নামেই সাধারণ লোকের নিকট অভিহিত হইয়াছেন ও নিজেও শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর বলিয়াই সর্ব্বত্র পরিচয় দিয়াছেন। মহাভারতের পূর্ব্বে যদি কৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর হইতেন ও কৃষ্ণবিলাস গ্রন্থ রচনা করিতেন, তবে কাশীদাসও গদাধর দাসের ন্যায় আপন গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণদাসকে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর বলিয়া কোন ভণিতায় নিশ্চয় উল্লেখ করিতেন।

কনিষ্ঠ গদাধর দাস দুই সহোদরের এই আদি রচনার পর স্বয়ং জগন্নাথমঙ্গল নামক এক পুস্তক প্রণয়ন করেন। সুতরাং তিনি অন্য দুই সহোদরের পূর্ব্ব নাম ও প্রচলিত আখ্যা ও রচিত গ্রন্থাদির পরিচয় স্বকৃত জগন্নাথমঙ্গলে বিশেষরূপে প্রদান করিয়াছেন। যথা—

তথাকার মধ্যম যে এ তিন প্রকার।
সুমিত্রা তনয়াকাণ্ড তিন কুমার।
প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।
রচিল কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর।
দ্বিতীয় শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবান।
রচিলা পাঁচালী ছন্দে ভারত পুরাণ।
গোপীনাথ কথা কহিল প্রকাশ।
তৃতীয় কহিব যাঁর অগাধের দাস।

গদাধর দাস যদি গ্রন্থে এই কৃষ্ণদাসের নাম শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ও রচিত গ্রন্থের আভাস না দিতেন, তাহা হইলে, কাশীদাসাগ্রজ কৃষ্ণদাস, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর নামে অভিহিত হইয়া এখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা আমরা কিছুই জানিতে পারিতাম না।

কমলাকান্তের পুত্র শ্রীকৃষ্ণদাস; দ্বিতীয় কাশীদাস পাঁচালিচ্ছন্দে মহাভারত রচনা করেন, তৃতীয় গদাধরদাস জগন্নাথমঙ্গল লেখেন। মহাভারত পুনঃ পুনঃ মুদ্রিত হইয়াছে। জগন্নাথমঙ্গলও সংগৃহীত হইয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের কোন পুস্তকাদি কোনদিন হইতে অনুসন্ধান করিয়াও পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণবিলাস নামক একখানি পুস্তকের সংগ্রহ হইয়াছে। এই গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর কাশীদাসাগ্রজ, তাহা গদাধরের জগন্নাথমঙ্গলের—

প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।
রচিল কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর।

এই ভণিতায় প্রমাণিত হইতেছে।

কৃষ্ণদাস কৃত কৃষ্ণবিলাসে নিজের বা পিতা মাতার ও ভ্রাতাদির কোন পরিচয় নাই। পিতা মাতা সম্বন্ধে এইমাত্র বলিয়াছেন,—

সাধনে যদি পিতা মাতা মোহাকারে।
তাহার প্রসাদে জন্ম লভিলাম সংসারে।

আত্মপরিচয় স্থলে গ্রন্থকর্ত্তা আপনার প্রকৃত নাম যে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর নহে, কেবল ইহাই বলিয়াছেন এবং এইরূপ শেষ বাক্যে নিজপরিচয়ে—

পুনরপি শ্রীগুরু চরণে পরণাম।
যার গুণে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর হইলাম॥
যার গুণে মনের তিমির হইল নাশ।
যার গুণে শ্রীকৃষ্ণবিলাস পরকাশ॥
গোবিন্দের গুণে গুরু করিলা আদেশ।
শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর বলি করিল আদেশ॥

এতদ্ব্যতীত আর কোন বিশেষ পরিচয় দেন নাই। সুতরাং চিনিবার জন্য তাঁহারই সহোদর গদাধর দাসের আশ্রয় লইতে হইতেছে। গদাধর দাস তাঁহার জগন্নাথমঙ্গলে আত্ম-পরিচয়স্থলে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন, অগ্রজ কৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর মনোহর হরিগুণপূর্ণ একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের নাম কি তাহা বলেন নাই, কিন্তু বিষয় বলিয়াছেন। আমাদের আলোচ্য এই গ্রন্থখানি মনোহর হরিগুণ গানে পরিপূর্ণ এবং ইহার গ্রন্থকর্ত্তা কৃষ্ণকিঙ্করও হইতেছেন; সুতরাং ইহাকে কাশীদাসের অগ্রজ শ্রীকৃষ্ণদাস বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

কৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর যে গুরুর কৃপায় এই মনোহর হরিলীলাপূর্ণ কৃষ্ণবিলাস গ্রন্থ প্রণয়নে সমর্থ হইয়াছেন, পিতা, মাতা, সহোদর প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়াও সেই গুরুর একটু পরিচয় না দিয়া থাকিতে পারেন নাই।

বিপ্রকুলে জন্ম নাম শ্রীগোপাল দাস।
আজন্ম ভরিয়া কৈল গুরুতে বিশ্বাস॥
অনুমান ব্রহ্মে দেহ করিয়া শোধন।
অন্তে সুরধুনী মধ্যে পাইল নির্ব্বাণ॥

গুরুর নাম গোপাল দাস। গোপাল দাস ব্রাহ্মণ গুরুভক্ত ও ব্রহ্মচারী। অন্তিমে ভাগীরথীতে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কাশীদাস ও গদাধর দাস উভয়েই নিজ নিজ গ্রন্থে পিতা, মাতা, ভ্রাতাদির পরিচয় দিয়াছেন। কৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর তাঁহাদের পরিচয়ের কোন কথাই বলিলেন না। শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ব্রহ্মচারীর শিষ্য ও সংসারাসক্তিহীন হওয়াতে আপনার পরিচয় দেন নাই। অনেক পুস্তকে দেখা যায়, শেষভাগে গ্রন্থ সমাপ্তির পর গ্রন্থকর্ত্তার বিশেষ পরিচয় থাকিলেও, পরবর্ত্তী লেখকবৃন্দ, অনাবশ্যক বোধে গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়টি পরিত্যাগ করিয়া মূল গ্রন্থের সমাপ্তি বাক্য লিখিয়াই সন-তারিখ দিয়া ক্ষান্ত হন। তাঁহারা বুঝিতেন না যে এই সামান্য অংশটুকু পরিত্যাগ করিয়া সাহিত্যপাদপের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন। অপর এক জন কৃষ্ণদাস কৃত নারদসংবাদ নামক গ্রন্থ তিন চারি খানি দেখিয়াছি, কিন্তু কোন পুস্তকেই গ্রন্থকর্ত্তার

পরিচয় পাই নাই। সম্প্রতি এক খানি নারদসংবাদ সংগৃহীত হইয়াছে। তাহাতে গ্রন্থকার ও পুস্তকলেখকের বিশেষ পরিচয় ও গ্রন্থ রচনার সন তারিখ পর্য্যন্ত আছে। সুতরাং এক্ষণে স্থলে লেখকের আলস্য ও দুর্ম্মতি ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না। যদি এই সকল লোকেও এইরূপ হইয়া থাকে, আশা করা যায় অন্য অন্য পুস্তক সংগ্রহ হইলে, কৃষ্ণবিজয়ের নিজ দত্ত পরিচয়াদি পাওয়া যাইতে পারিবে।

কৃষ্ণবিলাস গ্রন্থখানি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সরল ভাবে ও সংক্ষেপে হরিলীলার বর্ণনায় পূর্ণ। ইহা কোন গ্রন্থের অনুবাদ নহে। গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বিষয়ের শাস্ত্রীয় মতামত লেখা নহে। যেহেতু গ্রন্থকার স্বয়ং বলিয়াছেন—

সে সব কৃপাতে পূর্ণ করি মনস্ত।
অনুভবি হরি কথা করিল আরম্ভ।
শ্রীকৃষ্ণবিলাস নাম শুদ্ধ ভক্তিযোগ।
শ্রবণ করিলে খণ্ডে মনের বিয়োগ।
শেষভাগে।— সর্ব্ব কবিগণে আমি করি পরিহার।
আপনার গুণে দোষ না লবে আমার।
কহিতে গোবিন্দগুণ কি মোর শকতি।
তবে যে কহি লক্ষ্য শাস্ত্র অনুমতি।
অশেষ গোবিন্দ-লীলা মহিমা অসংখ্য।
ইহা নিরূপণ বেদ করি লক্ষ লক্ষ।
মুঞি অতি দীনমতি হৃদয় পাষাণ।
অল্প বুদ্ধে কি করিব সে গুণ বাখান।
অনন্ত সহস্র মুখে না পাইল অন্ত।
যার নাম স্মরি হৈল বিধাতা বিজ্ঞাত।
চারি মুখে ব্রহ্মা বেদ বেদের বাখান।
তবু পরিমাণ না পারিলা জানিবারে।
হেন শুণ মহিমা একত মুখে শুনি।
নিরূপণ বেদ কৈল শাস্ত্র পর খানি।
পূর্ব্বে ব্যাসদেব বেদ বেদের বিচার।
তাহাতে রচিল শাস্ত্র ভক্ত পরকার।
প্রকৃতি তাহাতে সর্ব্ব লোকের গোচর।
পুস্তক প্রচুর হৈল শ্রীভাগবতের।

কৃষ্ণবিলাসে বিষয় সূতের নিকট শৌনকাদির প্রশ্ন। কশ্যপ ও অদিতির তপস্যা ভগবানের দ্বাবিংশতি অবতার। বামনোপাখ্যান। কৃষ্ণাবতার। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকার লীলা। উদ্ধবপ্রশ্ন। উদ্ধবের প্রতি ভগবানের তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ। [illegible] বিষয়। ধ্রুবচরিত্র। ভগীরথের উপাখ্যান। পুরূরবা ও উর্ব্বশী তুলসী উপাখ্যান। [illegible]

চরিত্র। পরে শুকভক্তি প্রশংসা, হরি ভজনা প্রশংসা ও স্বকৃত গ্রন্থের শ্রবণ অধ্যয়ন ফলাদি কহিয়া উপসংহার করিয়াছেন। ভাগবত মতে একবিংশতি অবতার; উনবিংশে রাম কৃষ্ণ, বিংশে বুদ্ধ, একবিংশে কল্কি। শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর উনবিংশে বলরাম, বিংশে শ্রীকৃষ্ণ, একবিংশে বুদ্ধ, দ্বাবিংশে কল্কি, এইরূপে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে পৃথক্ অবতার বলিয়া এক সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন। এইরূপ তাঁহার কৃষ্ণবিলাসে বর্ণিত উপাখ্যান সকলে ভাগবতের সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও ইহা ঠিক ভাগবত পুরাণানুসারে রচিত নহে। অনুভব, শ্রবণ ও অনুমানে লেখা, ইহা কবি পূর্ব্বে বলিয়াছেন। সুতরাং গ্রন্থের শাস্ত্রীয় বিষয় বিচার্য্য নহে।

কৃষ্ণদাস পরম বৈষ্ণব হইলেও দেবতান্তরে ভক্তিবিহীন বা চৈতন্যসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভে গৌরচন্দ্রিকা নাই; প্রথমেই ব্যাসদেব ও শুকদেবকে নমস্কার করিয়াই বলিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণ ভজনে যার আছে এ বাসনা।
আগে সে করিহ শিব দুর্গার অর্চ্চনা।

তিনি তৎপরে বৈষ্ণবগণ, বলি, বিভীষণ, নারদ, প্রহ্লাদ, নিমি, ভৃগু, ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জ্জুন, উদ্ধব ও জনক রাজা প্রভৃতিকে বন্দনা করিয়াছেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর বা পরবর্ত্তী শিষ্য-বৃন্দের নমস্কার বন্দনা, বা কোনরূপ তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। ভগবানের একবিংশতি অবতারকে দ্বাবিংশতিতে পরিণত করিয়াও চৈতন্য প্রভুকে কোন অবতার মধ্যে স্থান দেন নাই। মহাপ্রভুর নাম একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই; শেষভাগে হরি ভজনা প্রশংসা প্রকরণে শুদ্ধ মহাপ্রভুর নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে একজন ভক্তের মধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন।

সবার অধিক হরিনামের মহিমা।
এ তিন ভুবনে যার দিতে নারি সীমা।
হরিনাম লঞা স্বর্গে রাজা পুরন্দর।
হরিনাম লঞা যোগী হইল মহেশ্বর।
কুব্জা অপ্সরা হরিভজন কারণ।
হরিদোষ করি নষ্ট হৈল দুর্য্যোধন।
হরি ভজি নৃপতি ভরত জাতিস্মর।
হরিবোল বোলাইয়া চৈতন্য অবতার।
ঘরে ঘরে সঙ্কীর্ত্তন হরির অর্চ্চনা।
কলিযুগে কে আর হইবে হেন জনা।

এক্ষণে কৃষ্ণবিলাসের উপাখ্যানের সরল ও সহজ কবিত্বের সারল্য ও ভাষার প্রাঞ্জলতা কিঞ্চিৎ দেখাইয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

পঞ্চমে উত্তানপাদ আছে বড় রাজা।
পুত্রকে অধিক করি পালএ প্রজা।

সুরুচি সুনীতি দুই রাজার বনিতা।
দানে ধর্ম্মে সতীত্বে সাক্ষাৎ যেন সীতা॥
সুরুচি সুভগা যাহে উত্তম কুমার।
দুর্ভগার পুত্র ধ্রুব বিষ্ণু অবতার॥
নারদের হৈতে যার হৈল সংস্কার।
সে কথা কহিব পিছে করিঞা বিস্তার॥
একদিন নৃপাসনে সুরুচি সুন্দরী।
রাজা সঙ্গে বসিঞা আছে পুত্র কোলে করি॥
স্বর্গ বিদ্যাধরী কিবা অপ্সরী কিন্নর।
শচী সঙ্গে বিরাজিত যেন পুরন্দর॥
হেনকালে তথা গেল ধ্রুব মহাশয়।
দেখিল রাজার কোলে সুরুচি তনয়॥
বিমাতা দেখিঞা ধ্রুবে অভিমান হৈল।
আজা বিনু রত্নাসনে উঠিতে চাহিল॥
তা দেখিঞা সম্ভ্রমে কহিছে রাজরাণী।
শুন দুর্ভগার পুত্র আমার কাহিনী॥
যখন সুনীতি রাজসেবা নাহি জানে।
কিমতে পাইবে স্থান সে মায়ের গুণে॥
ধ্রুবে তিরস্কার বড় কৈল রাজরাণী।
তা দেখিঞা ব্যথিত নহিল নৃপমণি॥
পিতার বিরূপ দেখি শিশু মহাশয়।
সম্ভ্রমে চলিঞা গেলা মায়ের নিলয়॥
সকল কহিল কথা মাতৃ বিদ্যমানে।
অপমানে কান্দিতে লাগিলা দুইজনে॥
ক্ষণেক রোদন করি সচেতন হইঞা।
কহিতে লাগিলা ধ্রুবে তত্ত্ব বুঝাইঞা॥
সুনীতি বলেন বৎস কর অবধান।
বিনা তপস্যাতে না পাইএ ভগবান॥
সুরুচি উত্তম পূর্ব্বে বহু তপ কৈল।
তেকারণে রাজা সঙ্গে পালঙ্কে বসিল॥
সকল সংসারে তোর বাপ নৃপমণি।
তাহার বনিতা আমি জনমদুখিনী॥
সংসারের সুখ আমি কিছু না পাইল।
স্বামি দরশন মোর সন্দেহ হইল॥
নারীর প্রধান ধর্ম্ম স্বামীর সেবন।
ইহা না করিলে সর্ব্ব ধর্ম্ম অকারণ॥

পরম দুর্ভগা আমি বিদিত সংসারে।
সবে এক ভার্য্যা আমি ধরাছি উদরে।
একে একে শুনি ধ্রুব মাএর বচন।
নিজ অপমানাধিক বাড়িল বেদন।
ধরণী লোটাঞা কান্দে ধ্রুব শিশুমতি।
ঘন ঘন বলে কিসে হব অব্যাহতি।
ধ্রুব দুখ দেখি রাণী বলে সকরুণে।
পাইবে সকল তত্ত্ব শ্রীনন্দনন্দনে।
হরি না ভজিলে না পাইবে দিব্যস্থান।
সকল পাইবে মাত্র ভজ ভগবান্।

ধ্রুবকে অরণ্য হইতে আনিয়ন করিতে পিতা, মাতা, বিমাতা ও অন্যান্য পুরজন সকল গমন করিলে ধ্রুব বিমাতার ও সৈমাত্রেয় ভ্রাতার সহিত কিরূপ কথোপকথন ও ব্যবহার করেন, কবি দেখাইতেছেন ——

সে দূতের সঙ্গে সভে চলিলা ধাইঞা।
যেখানে আছিলা ধ্রুব অরণ্যে বসিঞা।
আনন্দে আকুল হঞা আইলা সুনীতি।
উত্তম সুরুচি আইলা পাঞা অপীরিতি।
নব লক্ষ দলে আইলা উত্তম লোডর।
উড়িছে ধবল ছত্র মাথার উপর।
পিতা মাতা বিমাতা দেখিঞা শিশুমতি।
একে একে সভাকারে করিল প্রণতি।
সর্ব্বপুরজন মেলি করিল কল্যাণে।
হেন বোল কহে ধ্রুব বিমাতার স্থানে।
শুনগো বিমাতা মোর এই নিবেদন।
তোমার প্রসাদে আমি প্রবেশিল বন।
তোমার প্রসাদে দেখা হইল মুনি সনে।
তোমার প্রসাদে মুনি মন্ত্র দিল কাণে।
তোমার প্রসাদে তপ যমুনার কূলে।
তোমার প্রসাদে হরি আসি কৈল কোলে।
তোমার প্রসাদে আমি দেখিল [illegible]
তোমার প্রসাদে মোর এ সুখ সম্পদ।
বিমাতার কাছে ছিল উত্তম কুমার।
নানারত্নে বিভূষিত সর্ব্ব কলেবর।
তা দেখিঞা বলে ধ্রুব শুন যুবরাজ।
সহিএ তোমারে সর্ব্ব পরিজন মাঝ।

তোমার বিভবে মোর হৈল অভিমান।
তে কারণে পাইল আমি প্রভু ভগবান।
শুনহ উত্তম অভিমান বড় দুখ।
হাড়িঞা কুমার আমি দেখিল শ্রীমুখ।
হের আইস তোমায় সনে করি আলিঙ্গন।
বৈরাগ্য পরম পর তোমার কারণ।

দৈত্যাধিপতি হিরণ্যকশিপুর প্রশ্নের উত্তরে প্রহ্লাদের উক্তি কবি দেখাইতেছেন।

একদিন দৈত্যপতি সভাতে বসিঞা।
গুরু গৃহ হইতে শিশু আনিল ডাকিঞা।
পুত্রে জিজ্ঞাসিল রাজা সরস বদনে।
কি পড়িলে কহ পুত্র মোর বিদ্যমানে।
রাজার বচন শুনি শিশু মহাশয়।
নিজ অধ্যয়ন কহে হইঞা নির্ভয়।
শুন শুন দৈত্যরাজ করিএ বিনতি।
যে কিছু পড়িল তাহা কর অবগতি।
আদি অন্ত জন্ম মৃত্যু কিছু নাহি।
কেনু বিদ্যা পড়ি আমি শুনহ গোসাঞি।
ব্রহ্মা আদি করিঞা সকল দেবগণ।
বিদ্যাতত্ত্ব ভয়ে যারে অনন্ত শরণ।
ঋক সাম যজুরথর্ব্ব চারি বেদ গাথা।
নারিল করিতে অন্ত যার গুণ গাথা।
অচঞ্চল মানসে যত যোগিগণ।
পরম ধেয়ানে দেখে সেই নিরঞ্জন।
পঞ্চ মুখে শ্রীহর যাহার গুণ গায়।
সেই অধ্যয়ন মোর শুন দৈত্য রায়।

সংগৃহীত কৃষ্ণবিলাস গ্রন্থের লিপিকাল ১১৩২ সাল; দুই এক স্থানে কীট দষ্ট, পত্রসংখ্যা ১৭৬; প্রতি পৃষ্ঠে ১১ ছত্র। শ্লোক সংখ্যা প্রায় ১,২৫,০০০।

শ্রীরাখালদাস কাব্যতীর্থ।

প্রাচীন পুঁথির বিবরণ।

২০। একাদশীর ব্রতকথা।

প্রারম্ভ—

দেব নিরঞ্জন বন্দম্ সংসারের সার।
করিতে না পারে যার মহিমা অপার।
কিছু কহিব আমি পুণ্যের কাহিনী
দেব গুরু বন্দম্ আর যত ঋষি মুনি।

ব্রহ্মা আদি দেব করয় যাহা গোচরাল।
যাহার প্রসাদে লোকে করে ঠাকুরাণ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে যতেক দেবগণ।
সংক্ষেপে বলিব আমি তা সবার চরণ।

একাদশীর ব্রত কথা শুন সর্ব্ব জনে।
শ্রীকৃষ্ণ কহেন যে যুধিষ্ঠির স্থানে।
একাদশী তীর্থরূপে আপনি ভগবান।
যুধিষ্ঠিরে জিজ্ঞাসেন পুরাণ-কথন।

শেষ—

একাদশী ব্রত যেবা করে ভক্তিমতি।
সর্ব্বপাপ হয় তার বিষ্ণুলোকে গতি।
পাপী নিস্তারিতে বিষ্ণু সৃজে একাদশী।
রোগ ব্যাধি হরে তার করিলে একাদশী।

সঙ্গে কেহ যায় আর পুত্র পরিজন।
একাদশী করে হয় পরলোকে ধন।
একাদশী তুল্য ব্রত ত্রিভুবনে নাই।
পাপী নিস্তারিতে কৃষ্ণ আসিলা এথাই।

ভণিতা—

একাদশী পাঞ্চালী রচে বুড় শ্রীধরে।

যেই জন শুনে তার সর্ব্ব পাপ হরে।

২১। শ্রীলক্ষ্মীব্রত পঞ্চালী।

পদসংখ্যা ১০৮।

আরম্ভ—

প্রণমোহ নারায়ণ যত চরাচর।
যাহার স্মরণ হয় যত দেবগণ।
সরস্বতী প্রণমোহ তাহান বনিতা।
যাহার প্রসাদে হয় সরস সঙ্গীতা।
দেব ঋষি মুনিগণ করয় বন্দন।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা বন্দয় তিন জন।
মাতা পিতা গুরুপদে করিয়া পিয়ালি (?)।

লক্ষ্মীচন্দ্র ব্রত কথা রচিব পাঞ্চালী।
একদিন নারায়ণ করিবা ভ্রমণ।
যুধিষ্ঠির আশ্রমেতে হৈলা উপাসন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বলে বিনয় বচন।
করযোড়ে স্তুতি করি বৈল নারায়ণ।
করযোড়ে জিজ্ঞাসবে গোবিন্দচরণে।
লক্ষ্মীচন্দ্র ব্রত গোসাঞি করিতে নয় মনে।

শেষ—

ধনে ধান্যে পুত্র পৌত্রে ঐশ্বর্য্য হইল।
লক্ষ্মীচন্দ্র ঘরে দ্বিজ সুখে নির্ব্বহিল।
নবরত্ন গাভী দুগ্ধ বৃক্ষ যোগায় ধন।
সন্তোষ হইয়া দ্বিজ করয় বন্ধন।
যেই জনে একমনে করয়ে শ্রবণ।

তাহারে প্রসন্ন হব লক্ষ্মী নারায়ণ।
যেই জনে অবজ্ঞা করয়ে কদাচিৎ।
বহু দুঃখ পায় সেই পুরাণ লিখিত।
কত দিন সুখে বিপ্র করিবা বসতি।
রথে চড়ি অন্তকালে বৈল স্বর্গপতি।

ভণিতা—

ভবিষ্যপুরাণ কথা অমৃত সমান।

দ্বিজ বিদ্যা অভিরাম পাঞ্চালী বাখান।

২২। জ্ঞান বারমাস।

পদসংখ্যা ২৬।

আরম্ভ—

বৈশাখে বসন্তের যাও তরু মেলে পাত।
দুই ডালে ভরু ভরে ত্রিজগতের নাথ।
নানা পুষ্প ফল ধরে বহু করে গতি।
মহা সুখে কেলি করে ত্রিজগতের পতি।

* * *
* * *

ত্রিবেণীর ঘাট দেখে দেখিতে সুন্দর।
কনক কমল মধ্যে গুঞ্জয়ে ভ্রমর

শেষ—

চৈত্রে সফল হয় ব্রহ্মা নারায়ণ। যম না বোলিও তারে যেবর যেবদাল।
মন্দাকিনী যেবে স্নান করে দেবগণ। যদুনাথে গায় গীত শুকর সমাজ।
শুনা স্বর্গদ্বার জলে হারর মন্দির। যেই গায় যেই শুনে জান বার মাস।
অবশিষ্ট হৈল আসে নিদারুণ যম। পাপ চাড়ে পুণ্য বাড়ে অন্তে স্বর্গবাস।

২৩। বিদ্যাসুন্দর।

ইহাকে অন্যান্য বিদ্যাসুন্দর কাব্যের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা যাইতে পারে। বোধ হয় কবি বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের সারাংশ লইয়াই ইহা রচনা করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম ও শেষাংশ পাওয়া যায় নাই; মধ্য ভাগের যেটুকু আছে, তাহাতে কবির রচনা-নৈপুণ্য কি কবিত্বের একটা বিকাশ পরিলক্ষিত হয় না। কবি তেমন উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। গ্রন্থের এক স্থলে এইরূপ একটা ভণিতা আছে:—

শুক রামচন্দ্র পদ ধরিয়া মাথায়।
রসময় বন্দন করি নিধিরাম গায়।

এবং অন্য এক স্থলে "শ্রীনিধিরাম গায়" এই ভণিতাও দৃষ্ট হয়। "নিধিরাম" কবিরত্নোপাধিক, তাহাতে সন্দেহ করিবার বিশেষ কিছু নাই। "বিদ্যার গর্ভ সংবাদ শ্রবণে রাজার তিরস্কার" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

শুনিয়া রাজের কথা সে চন্দ্রবদনী। সমূর্ণ শরীর হৈছে পীলাইর * আকার
মাহলে কপট বুদ্ধি তাঁড়ায় জননী। শিও হস্তে আছে কুচে কাজল বরণ,
শুন মা ও তোমার বাক্যে মনে লাগে দুখ। সপ্ত অষ্ট দিনাবধি গীত বেয়াগ্রাম।
শরীর ভিতরে মোর আছে তিন রোগ। সদাস অজীর্ণ ভাব বড় দুঃখ পাই।
সর্ব্ব অঙ্গেত বায়ু দুঃখ পাই আমি। সদৌভুমে ধরা কৈলুন পতি।
সর্ব্বক্ষণে সে কারণে উঠে মোর যামি। সেই সে কারণে বুঝি উঠে নিদ্রা নাই।

আরও একটু দেখুন—

"সোমযাজ্ঞো মুনগোত্রে হে সহস্রগোভূষণকিঙ্করাণাম্।
নাদেন গোভূস্থিখরেষু মত্তা নদন্তি গোকর্ণ-শরীনভক্ষাঃ।"

এই শ্লোকের কবি এই অনুবাদ করিয়াছেন:—

কাশ্যপ (১) সোমযাজী মুনি শুন বৃগ আঁখি। মত্ত হৈয়া গোকর্ণভক্ষে গাছ চরে।
সহস্র সমান ধরে কিঙ্করের দেখি। সর্প যে ভক্ষণ করে তার নাম শিখী।
বসন্তবাধব সে যে তাহার গর্ভেতে। পর্ব্বত তাহার নাম শুন চন্দ্রমুখী।

---

* পীলাই—প্লীহা।

২৪। শ্রীসূর্য্যব্রত পাঁচালী।

প্রারম্ভ—

প্রণমোহ সরস্বতী চরণ যুগল।
একে একে বন্দম্ দুই দেবতা সকল।
ইষ্টদেব প্রণমোহ মনের যে রঙ্গে।
আনন্দে জনক বন্দম্ জননীর সঙ্গে।
* * *
যেই গুরু শিখাইল জ্ঞান ভাল মন্দ।
তাহার চরণ বন্দম্ হইয়া আনন্দ।
আর বহু প্রণমিয়া ষোলম্ বারে বার।
এবে মুই প্রণাম করম্ দিবাকর।
রচিবারে চাহি কিছু তাহার চরিত্র।
এক চিত্তে শুন ব্রতী হইয়া পবিত্র।
* * *
পূর্ব্বে এক গ্রামে ছিল দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
দুই কন্যা নারী সহ পোষে চারি জন।
ভিক্ষা মাগি খায় দিন আজন্ম অবধি।
দুঃখিত করিয়া তাকে সৃজিয়াছে বিধি।

শেষ—

তবে রাজা করিলেক সূর্য্যের পূজন।
বরা মাতা পিতা রাজা দেখিল তখন।
যুবরাজ পুত্রের রাজ্য সমর্পিয়া।
সূর্য্যপুরে গেল রাজা মা বাপ লইয়া।
এইমতে সূর্য্য পূজা করে যেই জন।
সর্ব্ব স্থানে রক্ষা তারে করয়ে তপন।
ধনে পুত্রে বাড়বে যে ঐশ্বর্য্য অপার।
বিঘ্ননাশ হব তার আপদ নিস্তার।
আদিত্যের পূজা যেই করে এক মতি।
অন্তিম কালেতে তার হব সুসদ্গতি।

ভণিতা—

অল্প বয়স মোর দ্বিজকুলে জাত।
পণ্ডিত না হন্ মুই কহিনুম তোমাত।
মনেতে ভাবিয়া মাত্র দ্বাদশ আদিত্য।
কবিতা কহিতে মোর প্রশংশিল চিত্ত।
শুভক্ষণে আদেশিল গরম সন্তোষে।
ব্রাহ্মণ সজ্জন তথা বৈসব বিশেষে।
গ্রামাধিপ মহারাজা ধর্ম্মেতে তৎপর।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে সভা আছে নিরন্তর।
সেই গ্রামে নিবসতি শ্রীবামজীবন। *
সূর্য্যের চরিত্র মাত্র করিব রচন।

রচনাকাল—

ইন্দু রাম ঋতু বিধু শক নিরোজিত।
শ্রীবামজীবনে ভণে আদিত্যচরিত।

২৫। সীতাহরণ যাত্রা।

এই গ্রন্থখানি ঊনবিংশ শতাব্দীর রচনা; ইহা দেশবিখ্যাত যাত্রাদলের অধিকারী ৺শ্যামাচরণ খাস্তগিরীর লেখনীপ্রসূত। ইনি যাত্রাদল করিয়াই সর্ব্বত্র "শ্যামাচরণ বাবু" নামে পরিচিত হইয়া গিয়াছেন। ডাক্তার ৺অন্নদাচরণ খাস্তগিরী ও সবজজ ৺বাবু উমাচরণ খাস্তগিরী ইহাঁর ভ্রাতা। সম্ভবতঃ শ্যামাচরণ বাবু ইহা স্বীয় দলে অভিনীত করিবার জন্যই রচনা করিয়াছিলেন। ইহার আদ্যন্ত পদ্যময় নহে, মাঝে মাঝে সেকেলে গদ্যও আছে। কিন্তু অধুনা পদ্য লিখিবার যে সকল অদ্ভুত রীতি প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে এ গ্রন্থের

* এখানে একটী পদ পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হইতেছে। লেখক যে গ্রামের কথা বলিতেছেন, তাহার নাম কোথায় গেল?

গদ্যকেও এক শ্রেণীর পদ্য বলা যাইতে পারে। ইহার ভাষা ও রচনা প্রণালী কিরূপ, নিম্নোদ্ধৃত চারিটী সঙ্গীত হইতে তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

(১) তাল যৎ।

রক্ষ বিপত্তি সময়ে ভবদারা। কিঞ্চিৎ করুণা কর দুর্গে সারাৎসারা।
কে রাখিবে বিপৎকালে বিনে তোমরা তারা। চঞ্চল জীর্ণ তরণী ঘটাপে হের ত্রাণী
সঙ্কটে পড়েছি বড়, হয় হয় ক্লেশ হয়, হের মা হরভবনী বহুদুঃখ হরা।

(২) তাল একতালা।

ধনী কেন একাকিনী কেনে। নাম ধাম কিবা, ভাব মূলবালা,
নির্জ্জন কাননে কামিনী কি মনে, বলহ সরলা, শুনিয়ে শ্রবণে।
আলয় বিহনে, থাকগো কেমনে। তড়িত জড়িত গরিত-বরণী, ক্ষীণ কটি তথি স্থূলনিতম্বিনী।
রাজবালা কিবা দেববালা, অপাঙ্গে অনঙ্গ মোহ পায় ধনী.
রাক্ষসী মানুষী গন্ধর্ব্ব অবলা, কলঙ্কবর্জ্জিত সুধাংশুবদনে।

(৩) তাল কাওয়ালি।

তিনি চঞ্চল দামিনী সৌদামিনী, বস্তে কি লাবণ্যে কার ভঙ্গে,
মুখ কলঙ্কবর্জ্জিত শত সুধাকর জিনি, এ অরণ্যে, কিবা বস্তে, অসামান্য রূপে ধনী,
বল কাহার কামিনী, বনে কেন একাকিনী, ক্ষীণ কটি দেখি সিংহ অভিমানী,
থাক নির্জ্জনে কুটীরে বল কি সাহসে ধনী। মৃগনেত্র দৃষ্টি মাত্র বন ত্যজিল হরিণী।

(৪) তাল একতালা।

হায় স্বর্ণমৃগ আশা মন্তে এ দুরদশা, সে আশা নৈরাশা হইল।
সর্ব্বসুখ আশা শেষ হই। পঞ্চবটী মূলে কুলনাশা বাসা,
মৃগতৃষ্ণা প্রায় কাল মৃগ আশা মম সর্ব্বনাশ করিল। কি আশা আমি করিলেম ;
সুখেরি আশায়, কৈলেম্ মৃগ আশা, পূর্ণ হইত এই দুঃখিনীর সর্ব্ব আশা,
সে আশায় মম ঘটিল এ দশা ; এ সময় যদি হৈত রামের আসা ;
শুনে কটু ভাষা, শূন্য করে বাসা, নাথের আসার আশা, দুরেতে পিপাসা,
দেবর লক্ষ্মণ কোথায় রহিল, আশা মাত্র আসা না হইল।
বহু আশা ছিল শেষ হবে সুখ,

শ্যামাচরণ বাবুর জন্মস্থান চট্টগ্রাম সহরের অন্তঃপাতী সুচক্রদণ্ডী গ্রাম। পরে তাহা জীবনী সংগ্রহের চেষ্টা করিব।

২৬। সুবচনীর ব্রতকথা।

পদসংখ্যা ৭০।

প্রারম্ভ—

বন্দনু মাগো সুবচনী * প্রণাম করিয়া। চন্দনে চর্চ্চিত তনু করেতে কঙ্কণ।
সুবচনী ব্রত কথা কহিনু রচিয়া। শ্রবণে কুণ্ডল শোভে সুচারু বদন।
ত্রিদশের দেবী মাগো জগতের মাতা। হেন মাগো সুবচনী প্রণমোহ মাথে।
ভবনাশ দুঃখনাশ কর সামন্বিতা। সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি হয় চলি যাব রথে।

* সুবচনী—শুভচণ্ডীর সংক্ষিপ্ত অপভ্রষ্ট নাম মাত্র।

শেষ—

রাজা মৈল পাটেতে বসিব কোন্ জন। * * *
হস্তীর ঘরেতে আসি করিল পয়ান।
বড়ুয়ে পৃষ্ঠেতে মৈল বসাইল পাটে।
পাত্র পঞ্চ জন বৈসে তারা পঞ্চ খাটে।
সুবচনীর ব্রত করে প্রতি শুক্রবার।

বাসি মুখে বাসি হাতে যে করে স্মরণ।
আপদে না লভে তারে যাবত জীবন।
যেবা পঢ়ে যেবা শুনে কহন না যায়।
আপদে না লভে তারে ঠাকুরালী পায়।

২৭। জয়গুণের বারমাস।

পদসংখ্যা ৩৭।

প্রারম্ভ—

মাধবী মাসেত মন্মথ মহীরাজ।
মহোৎপল দণ্ড মুচি মধু সেনা সাজ।
মধুব্রত কুল মধুমত্ত তমোনাথ।

মধুরস কুটীর পরভৃত কুহুনাদ।
মনোরম বনস্পতি প্রফুল্ল মুকুল।
মানিনী বিভঙ্গ মনে বিরহে আকুল।

শেষ—

মধুমাসে মধু প্রভু মধুরি মধুর।
মাধবী মালতী মল্লী বিতাপে প্রচুর।
মলয়া পবন বহয় অতি মন্দ।

মধুকর ঝঙ্কারে পীরয়ে মকরন্দ।
মর্ম্মভেদু মদনে পীড়িত সর্ব্ব দেশ।
মরিমু গরল ভক্ষি বৎসরের শেষ।

ভণিতা—

মরণ বিকল সতী যদি তনু মিলে।

অচিরে মিলিব প্রভু হারি পণ্ডিত বোলে।

এই মহম্মদ হারি পণ্ডিতের নিবাস চট্টগ্রাম আনোয়ারার অন্তঃপাতী ভিজরোল গ্রাম। ইনি ন্যূনাধিক দেড়শত বৎসরের লোক।

২৮। রসরঙ্গের বারমাস।

পদসংখ্যা ৫১।

প্রারম্ভ—

খেলয়ে প্রেমের খেলা রসের কামিনী।
খেলে হেলে দিন গেলে আর পাবে নি। ধুয়া।
কহি সবানের পাশ, রসরঙ্গের বারমাস,
যে মাসে যদরস জানী।
বৃন্দাবনে রৎগালহে, বসিয়া প্রাণপ্রিয় সঙ্গে,

প্রেমানন্দে বঞ্চ কমলিনী।
প্রথমে আশ্বিন মাসে, শরতের ঋতু বৈসে,
সাগরে নির্ম্মল হৈল পানি।
নির্ম্মল নক্ষত্র শশী, প্রকাশ ধবল নিশি,
জলে শোভে পদ্ম কুমুদিনী।

শেষ—

দেখ বন পাখিগণ, যার কাল বেইক্ষণ,
প্রেমানন্দে নাচে গুণজানী।
জন্মিয়া মনুষ্য কুলে, কালে কার্য্য না করিলে,

অনুশোচে ত্যজিবা পরাণি।
ভাদ্রেত বৎসর সাঙ্গ, যে করিল শ্রিয়ারঙ্গ,
সে হইল স্বামীর সোহাগিনী।

ভণিতা—

কহে মতিওরা হীনে, যে রহিল বন্ধু বিনে,
সে হইল দুঃকুল অনাথিনী।
সেখ খান মোহম্মদ, প্রণামি তাহান পদ,

ভান সুতে কহে রসখানী।
অর্থ ভাব রস ছন্দ, যদি হয় তান মন্দ,
বিচারি শোধিও মোহাজনী।

২৯। নিমাইচাঁদের বারমাস।

পদসংখ্যা ২৮।

প্রারম্ভ—

হায় পুত্র নিমাইচাঁদ দুঃখের যাদুমণি।
কিরূপে ধরাইমু চিত্ত শচী অভাগিনী।
মাঘল মাসেতে নিমাই ব্যাকুল হইল।
কেশব ভারতী গুরু কি না মন্ত্র দিল।
কি না মন্ত্র পাইয়া নিমাই হইলা উদাস।
বিষ্ণুপ্রিয়া ঘরে পুইয়া নিমাই গায় সন্ন্যাস।

শেষ—

পৌষ মাসেতে রে নিমাই তুষেরি রাজন।
আগে মোরে দিয়া মাত্র কহাইলে ভোজন।
মাতা চরণে মাত্র তুলিলে কাঞ্চন।
তুমি যাদু না দেখিলে স্যামুল জীবন।
কান্দিতে কান্দিতে মাত্র করিল শয়ন।
স্বপন জাগন হৈতে হারাইলুম স্বপনি।
নিমাইতে আসিয়া পুত্র দেখাইলা স্বপন।
এথে সে আসিনু পুত্র বধিয়া জীবন॥

এই বারমাসে লেখকের নাম পাওয়া যাইতেছে না।

৩০। লায়লি মজনু।

এই সুন্দর প্রাচীন পুঁথিখানি বর্ণজ্ঞানবিহীন মুসলমান লিপিকরের হস্তে পড়িয়া কেমন ভ্রমজালে বিজড়িত হইয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ইহাকে উদ্ধার করা একরূপ দুঃসাধ্যই বলিতে হয়। লিপিকর এত অনবহিত ছিলেন যে, তিনি কোথাও একই চরণ দুইবার লিখিতে বিরত হন নাই, কিন্তু কোথাও বা পদের এক চরণ লিখিয়া অপর চরণ লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। তাহা ছাড়া গ্রন্থখানি এতই ভ্রান্তিসঙ্কুল যে, ইহার সুনর দীর্ঘ ঋতুবর্ণনাটী একরূপ অবোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহার রচয়িতা একজন শিক্ষিত সুন্দর কবিত্ব-শক্তি-সম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থে আপন বৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া চট্টগ্রামে রাজশক্তির অভ্যুদয়ে যে বিবরণ নিবদ্ধ করিয়াছেন, ইতিহাস তাহার সমর্থন না করিতে পারে, কিন্তু তাঁহার স্বকীয় বংশবিবরণ অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। দুঃখের বিষয় এই যে, এই গ্রন্থের উক্ত বিবরণ স্থল হইতে একটী পাতা হারাইয়া যাওয়ায় ইহার সম্যক্ পরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। অন্য একখানি নকল না পাওয়া গেলে ইহা একরূপই থাকিবে। ইহার হস্তলিপিখানি ১১৯১ মগীতে অর্থাৎ ৭১ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হয়। গ্রন্থের প্রারম্ভ এইরূপ :—

দোসমোহ আদ্যা মহম্মদ নাম সার।
সে করে করতা প্রভু বেই সবে সার।
সেসর বর্জ্জিত প্রভু এক করতার।
সজীবকে মৃত করে মৃতকে জীয়ায়।
করিম করপাসিন্ধু রহিম দয়াল।
রাজাকে সজায় দীন মাজাপাই ফেরি
রজ্জাক্ আহারদাতা পালক সভার।
ভিক্ষুকের প্রতি করে রাজ্য অধিকারী।
* * *
নির্ধিতে বা হয় রঙ্ক বর্ধিতে রাজা।
* * *
কহিতে কথন নহে শুনিতে বচন।
চতুর্দ্দশ ভুবন প্রভু সৃজিলা অধিকারে।
পড়িতে পুস্তক নহে লেখিতে অক্ষর।
সপ্তস্বর্গ সপ্তপুরি সৃজিলা বিনু স্তম্ভে।
বুঝিতে মরম তান অধিক দুষ্কর।

গ্রন্থকারের নিজ পরিচয় বর্ণন প্রসঙ্গে যে অদ্ভুত ঐতিহাসিক তত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে, সেই অসম্পূর্ণ বিষয়টী এখানে সমগ্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

তাহান নন্দন নাম, সব গুণ অনুপাম.
পীর সাহা মুহম্মদ সুমতি।
ধর্ম্মবন্ত কলেবর, পাপ তাপ দুঃখহর,
দয়াশীল আন নাহি গতি।
তান সুত গুণসিন্ধু, দরিদ্র দুঃখিত বন্ধু,
মহম্মদ সৈয়দ সুজন।
অবিরত যত শত, ধর্ম্মমতি সাদরত,
প্রভু বিনে আন নাহি মন।
পীর খিব বীর মতি, বীর বলবন্ত অতি,
মহম্মদ সৈয়দ তনয়।
হিন্দিক সমান জ্ঞান, হাতিম সমান দান,
আহাওদ্দিন দয়াল।
বঙ্গদেশ মনোহর, তার মধ্যে শোভাকর,
নগর বত্তেয়াবাদ নাম।
আহাওদ্দিন পীর, নির্ম্মল শরীর ধীর,
তথাতে বসতি অনুপাম।
* * *
মুই পাপী দীনমতি, তুমি বিনে নাহি গতি,
এ ভবসাগরে কর পার।
সর্ব্বলোক নরপতি, ভুবন বিখ্যাত অতি,
আছিল হোছন সাহা বর।
তান রম্য সিংহাসন, অতি মায়া বিলক্ষণ,
গৌড়েত শোভিত মনোহর।
প্রধান উজীর তান, মহম্মদ খান নাম,
তাহান গুণের নাহি অন্ত।
অন্য স্থলে স্থানে স্থানে, মহজ্জিদ সুনির্ম্মাণে,
পুষ্করণী দিল ঠাঁই ঠাঁই।
প্রতি দিন মহামতি, পিপীলা মক্ষিকা প্রতি,
সর্ব্ব রাত্রি দিলেন খাইবার।
কাক পিক পক্ষী আদি, শিব শিবা চতুষ্পদী,
পাঠাইলা সভান আহার।
অকল আতুড়ি যত, পালিলেন্ত অবিরত,
দান ধর্ম্ম করিলা বিশেষ।
* * *
প্রশংসা হইল সর্ব্বদেশ।
শুনিয়া দানের ধ্বনি, ক্রোধ হৈল নৃপমণি,
যত ধন লুটয়ে সদায়।
কেমন ধার্ম্মিক সার, এক অন্ধ বারে বার,
তাহাকে বুঝিমু পরীক্ষিয়া।
প্রথম কোপে বাঘের জালে, ফেলিলা দেখিলা ভালে,
ব্যাঘ্র দেখি লামাইল মাথা।
দ্বিতীয়ে বান্ধিয়া শিলা, সাগরেতে পরীক্ষিলা,
নমাজ পড়িলা সুখে তথা।
তৃতীয়ে বান্ধিয়া রাগে, দিলেন্ত হস্তীর আগে,
গজে দেখি হালাম করিলা।
চতুর্থে লোহের ঘরে, রাখিলা হামিদ খাঁরে,
আনলে দহিয়া পরীক্ষিলা।
পঞ্চমে খড়্গের ঘাতে, পরীক্ষিলা নরনাথে,
খড়্গ ভাঙ্গি হৈল খান খান।
ষষ্ঠমে হানিয়া শর, পরীক্ষিলা নৃপবর,
অঙ্গে না লাগিল এক বাণ।
সপ্তমে গরল দিলা, মহারাজ পরীক্ষিলা,
করিলেন্ত প্রশংসা অধিক।
দেখিয়া অন্যায় সুখ, * *
প্রসাদ করিলা + ‡।
নগর ফতেয়াবাদ, † দেখিতে পুরয়ে সাধ,
চাটিগ্রাম সুনাম প্রকাশ।
মনোহর মনোরম, অমর নগরসম,
শতে শতে অনেক নিবাস।
* * কর্ণফুলী নদীতট,
শুভপুরী অতি দিব্য স্থান।
চৌদিকে * * উচল বিস্তর সব,
তাহে সাহা বদর পয়ান।
আদেশিলা গৌড়েশ্বরে, উজীর হামিদ খাঁরে
অধিকারী হৈল চাটিগ্রাম।
আদ্যরূপ দান ধর্ম্ম, করিলা পুণ্যের কর্ম্ম,
আনন্দে রহিলা সেই ঠাম।

† চট্টগ্রামের নাম কি কখনও ফতেয়াবাদ ছিল?

অনুক্রমে বংশ কত, গণিলেক এই মত,
গৌড়ের কুদিন হৈল দূর।
গৌড়গ্রাম অধিপতি, নানামত মহামতি,
নৃপতি নেজাম সাহা সুর।
একশত ছত্রধারী সভানের অধিকারী,
ধবল অরুণ গজেশ্বর।
যখনী সময় হৈলে, মাণিক্য প্রদীপ জ্বলে,
অপরূপ পুরীর অন্তর।
ওই যে হামিদ খান, আদ্যের উজীর তান
তাহান বংশেত উৎপত্তি।
মোবারক খান নাম, রূপে গুণে অনুপাম,
সদা ধর্ম্মে কর্ম্মে তান মতি।
তান প্রতি মহীপাল, বিতাগ অধিক ভাল,
স্থাপিলেন্ত গৌলত উজীর।
সাধু সৎলোক সঙ্গে, অনন্ত বহিলা রঙ্গে,
ধর্ম্মরূপে তাহিনা শরীর।
তান সুত মুচ সম, নাম মোর বহরাম
মহারাজা গৌরব অন্তরে।
পিতাহীন শিশু জানি, দয়া ধর্ম্ম অনুমানি,
বাপের খিতাপ দিল মোরে।
আছাওদ্দিন বন্ধু, তান পথ হোন সিন্ধু,
* * *
পুস্তক পথার সার, যেন মুকুতার হার,
রচিলেন্ত গৌলত উজীর।

উদ্ধৃত অংশে যে যে স্থানে বাদ দিয়া গিয়াছি, তাহার অনেক স্থলেই অর্থহীন পংক্তি বা শব্দ দুইবার লেখা; কোথাও বা সেই সেই স্থলে কিছুই লেখা নাই।

এই গ্রন্থের ভাষার নমুনা স্বরূপ আপেক্ষা ইহা নির্ভুল মজমু বিলাপ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। সমগ্র গ্রন্থের ভাষাই এরূপ কোমল, ললিত ও সরস ছিল, কিন্তু মূর্খ লিপিকরের প্রমাদে এখন তাহা একরূপ অবোধ্য, কিম্ভূতকিমাকার ধারণ করিয়াছে। প্রাচীন বঙ্গীয় ক ব্যস্বরূপে এ গ্রন্থ রক্ষিত হওয়ার একান্ত যোগ্য।

সগতে তোলয় তোমা সুধাকর নাম।
তোমার শীতল তা অতি অনুপাম।
তোর প্রতি যেন তুমি কাল সমান।
অনল সদৃশ মোর দগধ পরাণ।
তোমার সমান মোর ঈশ্বরী বদন।
তোমারে দেখিতে অন্ধা ইহার কারণ।
মোর প্রতি নাহি কিক তোমার শিরীভ।
অমৃত গরল হৈল একি বিপরীত।
বিপদ সময়ে বৈরী হয় বন্ধুগণ।
শুভদশা হৈলে হয় অমিল মিলন।
বিরহী জনের প্রতি পক্ষি দয়াহীন।
এই পাপে প্রতি মাসে এক পক্ষ ক্ষীণ।
বিরহী জনের তনু দগধে কারণ।
প্রতি মাসে একবার বন্ধুর শরণ।
বিরহী জনের মন হৃদয় নিঃসঙ্গ।
তে কারণে রহিলেক ইন্দুর কলঙ্ক।
* * *
* * *
দুঃখের বারতা সনে রহুর এহনে।
দুঃখিত জনের প্রতি [illegible] দেনে।
যদি দুই লক্ষ দিয়া হতে যান চন্দ্র।
লাফাই আকাশ হতে সায়রে ডুবায়।
নিরঞ্জন আরাধন করি যোড় হস্ত।
অবিলম্বে চন্দ্র যাউক অস্ত।
পশধর হেরিতে বাড়য়ে দুখ।
নক্ষত্র দেখিতে মোর বিদরয়ে বুক।
গণিতে তারকা মেলে পুনি হৈ [illegible]
অবহে দারুণ নিশি নহে অবশেষ।

ইহার দীর্ঘ ঋতুবর্ণনাটী সাহিত্যামোদীর আদর পাইবার সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল, কিন্তু লিপিকরের দোষে আমরা তদাস্বাদে বঞ্চিত হইয়াছি। ইহার ভাষা বৈষ্ণবকোবিদকুল

কুহরিত দূরাগত নৈশানিলসঞ্চালিত সঙ্গীতধ্বনিবৎ সুমিষ্ট সেই ব্রজবুলি,—প্রেমপ্রবণ বঙ্গ হৃদয়ের সেই প্রেমের ভাষা। 'নিদাঘ ঋতুর' কিয়দংশ মাত্র এই দেখুন :—

চাতক পীউ পীউ নাদ শুনি,
বিরহিণী চিত্ত চমকিত,
বরিষতি বারিদ অগত ভরি,
রজনী ভীম আন্ধিয়ারি।
শুনহে যে ধনী বিরহিণী,
যুগল নয়ানে বহে বারি।

সকলেই জানেন, লায়লী মজনু বিয়োগান্ত কাব্য। মজনু ও লায়লীর জন্য বড় দুঃখ হয়। বাস্তবিক বাঙ্গালীর কোমল হৃদয়ে বিয়োগের মর্ম্মভেদী তীব্র-যন্ত্রণা অসহ্য। তাই এই গ্রন্থের—

লায়লী লায়লী বলি হইল নৈরাশ।
মজনু ঘরেতে রৈল ছাড়িয়া নিঃশ্বাস।

এই শেষ দুই ছত্র পড়িবা আমাদের কোমল হৃদয় নৈরাশ্যের শুষ্কভাবে আপনিই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। কবি দৌলত উজীর বহ্‌রামের পীরের নাম আছাওদ্দিন সাহা, পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। কবি সর্ব্বত্রই এই মহাত্মার পবিত্র চরণ ধ্যান করিয়া এইরূপে বক্ষ্যমাণ প্রস্তাব সমাপ্ত করিয়াছেন :—

আছাওদ্দিন সাহা কল্পতরু সম।
উজীর দৌলতে কহে পুস্তক উত্তম।

৩১। রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ।

এই পুঁথি খানি কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের শেষভাগে সংযোজিত আছে। ঐরূপ একখানি উত্তরকাণ্ড আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ভবানীদাস নামক এক ব্যক্তি এই পুঁথিখানির প্রণেতা। ইহার হস্তলিপিটী ১১৫১ মগীতে অর্থাৎ ১১১ বৎসর পূর্ব্বের লিখিত। ইহা সম্ভবতঃ লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়প্রণেতা ভবানীদাসের রচিত। ইহার শেষ কয় পাতা পাওয়া যায় নাই।

প্রারম্ভ—নমো রামচন্দ্রায়।

সমুদ্রের জল বদি কলসীতে ভরি।
তথাপি শ্রীরাম গুণ কহিতে না পারি।
বুদ্ধি অনুরূপে আমি করিব রচন।
উত্তরার শেষে শ্রীরামের স্বর্গ আরোহণ।
সীতা-পাতালে গেল লোক চমৎকার।
অযোধ্যার লোক সবে করে হাহাকার।
রাজ্য করে প্রভু রাম মনেত কৌতুক।
পাত্র মিত্র সকলের মনে ভারি দুঃখ।

ভণিতা—

সর্ব্বলোকে বোলে শুন রাঘবের চরিত।
উত্তরার শেষে ভবানী দাসের রচিত।

ইহাকে লক্ষ্মণদিগ্বিজয়প্রণেতা ভবানীদাসের রচিত বলিয়া অনুমান করার কারণ এই যে ইহা ও লক্ষ্মণদিগ্বিজয় একই হাতের লেখা ও একই পুঁথির অন্তর্নিবিষ্ট। লক্ষ্মণদিগ্বিজয়ের শেষে যে উত্তর কাণ্ডটা যোজিত আছে, তাহার পরেই এই স্বর্গারোহণ খানিও রহিয়াছে।

৩২। শনিপূজার পুঁথি।

আরম্ভ—

সরস্বতী পাদপদ্ম করিয়া বন্দন। মূষিক বাহনে বন্দি দেব গজানন।
অমিশ্র হৈবা বন্দি শ্রীকৃষ্ণচরণ। * * *
বৃষভ বাহনে বন্দি উমা মহেশ্বর। * * *
গরুড় বাহনে বন্দি গোলোক ঈশ্বর। শনৈশ্চর মাহাত্ম্য স্কন্দ পুরাণের মত।
হংসবাহনে বন্দি দেব পদ্মাসন। পয়ার প্রবন্ধে আমি রচিব ভারত।

ভণিতা—

ধন লোভে লোভী হৈবা, দ্বিজবর মুগ্ধ হৈবা বদুনাথ কহে রাজা, শনৈশ্চর বর দিল,
সর্ব্বনাশ করিল আমার। পাবে রাজা তনয় তোমার।

শেষ—

শনি প্রতি হরিষেতে করহ প্রণাম। স্কন্দ পুরাণের মত করিবা ধারণ।
সঙ্কটে নিস্তার করে গ্রহগণধাম। শনির পাঞ্চালী কথা হৈল বিরচন।
* * * দণ্ডবৎ প্রণমোহ ভূমিতলে পড়ি।
* * * পাঞ্চালী সমাপ্ত হৈল বল হরি হরি।

৩৩। জয়মঙ্গল চণ্ডীর ব্রত পাঞ্চালী।

আরম্ভ—

প্রণমোহ নারায়ণী দেবী ত্রিনয়নী। যে কারণে ব্রতী সবে পুজেন ভবানী।
যার পদ ধ্যান করে যত মহামুনি। শিরেতে বন্দম্ মাতা উমা মহেশ্বরী।
এক দিন ব্যাস আইল হস্তিনা রাজ্যএ। যাহার নামেতে যায় ভবসিন্ধু তরি।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তারে পূজে জনমেজয়। * * *
যোড় হস্ত করিয়া বলেন ব্যাসমুনি। * * *
জয়মঙ্গল চণ্ডীর ব্রত কহ শুনি। এক দিন মহাদেবে সঙ্গে নিয়া গৌরী।
মুনি বলে জনমেজয় শুনহ কাহিনী। নানা রঙ্গে পুষ্প তোলে বনাবলি করি।

শেষ—

সেই বর চায় রম্ভা সেই বর পায়। জনমেজয়-প্রকাশিলা তাহার বাক্যেতে।
ধনে জনে পুত্র বর দিলা মহামায়। এই সকল প্রচার যে হইল নগরে।
প্রকাশ হইল ইহা মুনির মুখ হোতে। জয়মঙ্গল চণ্ডীর ব্রত সকলেই করে।

এই পাঁচালীতে লেখকের নাম প্রকাশ পায় নাই। এবং হস্তলিপিরও কোন তারিখ নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীআবদুল করিম।

——)০(——

বাঙ্গালা ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণনাসূচক বিশেষ এক শ্রেণীর শব্দ বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহারা অভিধানের মধ্যে স্থান পায় নাই, অথচ সে সকল শব্দ ভাষা হইতে বাদ দিলে বঙ্গভাষার বর্ণনাশক্তি নিতান্তই পঙ্গু হইয়া পড়ে। প্রথমে তাহার একটি তালিকা দিতেছি; পরে তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিব। তালিকাটি যে সম্পূর্ণ হইয়াছে এরূপ আশা করিতে পারি না; ইহা পূরণ করিয়া দিবার জন্য পাঠকগণের সহায়তা প্রার্থনা করি।

আই চাই, আঁকু বাঁকু, আনচান, আমতা আমতা॥

ইলিবিলি॥

উসখুস॥

কচ, কচাৎ, কচুকচ, কচাকচ, কচর কচর, কচমচ, কচর মচর, কট, কটাৎ, কটাস, কট-কট, কটাকট, কট মট, কটর মটর, কড়কড়, কড়াৎ, কড়মড়, কড়র মড়র, কনকন, কপ, কপাৎ, কপকপ, কপাকপ, করকর, কলকল, কসকস, কিচকিচ, কিচমিচ, কিচির মিচির, কিটকিট, কিড়মিড়, কিরকির, কিলকিল, কিলবিল, কুচ, কুচকুচ, কুট, কুটকুট, কুটুর কুটুর, কুটুস, কুপ, কুপকুপ, কুপকাপ, কুলকুল, কুরকুর, কুইকুই, কেইমেই, কেঁউমেউ, কোঁ, কোঁকা, কোঁকোঁ, কোঁৎকোঁৎ, ক্যাচ, ক্যাচক্যাচ, ক্যাচরক্যাচর, ক্যাটক্যাট। কচকচে, কটমটে, কুড়কুড়ে, করকনে, করকরে, কিটকিটে (তেল কিটকিটে), কিরকিরে, কলবিলে, কুচকুচে, কুটকুটে, ক্যাটকেটে।

খক, খকখক, খচখচ, খচাখচ, খচমচ, খট, খটখট, খটাখট, খটাস, খটাৎ, খটরখটর, খটমট, খটরমটর, খড়খড়, খড়মড়, খন, খনখন, খপ, খপাৎ, খপাস, খরখর, খলখল, খসখস, খাঁখাঁ, খিক, খিকখিক, খিটখিট, খিটমিট, খিটিমিটি, খিলখিল, খিসখিস, খুক, খুকখুক, খুটখুট, খুটুরখুটুর, খুটুসখুটুস, খুটখাট, খুৎখুৎ, খুঁৎমুৎ, খুরখুর, খুসখুস, খেইখেই, খ্যাক, খ্যাক-খ্যাক, খ্যাচখ্যাচ, খ্যাচাখেঁচি, খ্যাৎখ্যাৎ, খ্যানখ্যান। খটখটে, খড়খড়ে, খরখরে, খসখসে, খিটখিটে, খিটমিটে, খুঁৎখুঁতে, খুঁৎমুতে, খুসখুসে (কাশি), খ্যানখেনে॥

গজগজ, গজরগজর, গট, গটগট, গড়গড়, গদগদ, গনগন, গপগপ, গবগব, গবাগব, গম-গম, গরগর, গলগল, গসগস, গাঁগাঁ, গাঁইগুঁই, গাঁকগাঁক, গিজগিজ, গিসগিস, গুটগুট, গুড়-গুড়, গুনগুন, গুপগুপ, গুবগাব, গুম, গুমগুম, গুরগুর, গেঁইগেঁই, গোঁগোঁ, গোঁৎগোঁৎ। গনগনে (আগুন), গমগমে, গুড়গুড়ে॥

ঘটঘট, ঘটর ঘটর, ঘড়ঘড়, ঘসঘস, ঘিনঘিন, ঘিসঘিস, ঘুটঘুট, ঘুটমুট, ঘুরঘুর, ঘুসঘুস, ঘেউঘেউ, ঘোঁৎঘোঁৎ, ঘেঁচ, ঘেঁচঘেঁচ, ঘ্যাচঘ্যাচর, ঘ্যানঘ্যান, ঘ্যানরঘ্যানর। ঘুরঘুরে, ঘুসঘুসে (জ্বর), ঘ্যানঘেনে॥

চকচক, চকরচকর (পশুর জলপান শব্দ), চকমক, চট, চটাস, চটচট, চটাচট, চটপট,

চটাপট, চচ্চড, চড়াৎ, চড়াস, চড়াচ্চড়, চন, চনচন, চপচপ, চপাচপ, চিঁচি, চিকচিক, চিক-মিক, চিটচিট, চিচ্চিড়, চিড়িক, চিড়িকচিড়িক, চিড়বিড়, চিন, চিনচিন, চুকচুক, চুকচুকুনি, চুস্‌চুস, চেঁইভেঁই, চেঁইমেঁই, চোঁ, চোঁচো, চোভোঁ, চোঁচাঁ, চ্যাচ্যা, চ্যাভ্যা, । চকচকে, চটচটে, চটপটে, চনচনে, চিকচিকে, চিটচিটে, চিনচিনে, চুকচুকে, চুচ্চুবে ॥

ছটফট, ছপছপ, ছপাছপ, ছপাৎ, ছপাস, ছমছম, ছলছল, ছোঁ, ছোঁছোঁ, ছ্যাক, ছ্যাক-ছ্যাক। ছটফটে, ছলছলে, ছলোছলো, ছ্যাকছেঁকে, ছিপছিপে ॥

জবজব, জ্যাবজ্যাব, জ্যালজ্যাল। জবজবে, ঝিবজিবে, জ্যালজেলে, জিলাজিলে ॥

ঝকঝক, ঝকমক, ঝটপট, ঝড়াৎ, ঝন, ঝনঝন, ঝপ, ঝপঝপ, ঝপাঝপ, ঝমঝম, ঝমাৎ, ঝমাস, ঝমরঝমর, ঝমাঝম, ঝরঝর, ঝাঁ, ঝাঁঝাঁ, ঝিকঝিক, ঝিকমিক, ঝিকিমিকি, ঝিনঝিন, ঝিনঝিন, ঝিরঝির, ঝুনঝুন, ঝুপঝুপ, ঝুমঝুম। ঝকঝকে, ঝরঝরে, ঝিকঝিকে।

টক, টকটক, টকাটক, টংটং, টন, টনটন, টপ, টপটপ, টপাটপ, টুলটুল, টলমল, টস, টসটস, টিকিস টিকিস, টিংটিং, টিপটিপ, টিনটিন, টুকটুক, টুকুসটুকুস, টুংটুং, টুংটাং, টুনটুন, টুপ, টুপটুপ, টুপুস টুপুস, টপটাপ, টুসটুস, টোটো, ট্যাঁট্যাঁ, ট্যাঁসট্যাঁস, ট্যাঁস-ট্যাঁস। টকটকে, টনটনে, টলটলে, টসটসে, টিংচিঙে, টিপটিপে, টিমটিমে, টুকটুকে, টুপটুপে, টুসটুসে, ট্যাঁদটুসে, ট্যাসটেসে ॥

ঠক, ঠকঠক, ঠকমঠকর, ঠংঠং, ঠনঠন, ঠুক, ঠুকঠুক, ঠুকুরঠুকুর, ঠকাঠক, ঠকাস, ঠুকুসঠুকুস, ঠুকঠাক, ঠুংঠুং, ঠুনঠুন, ঠ্যাংঠ্যাং, ঠ্যালঠ্যাস। ঠনঠনে, ঠ্যাংঠেঙে ॥

ডগডগে (লাল), ডিগডিগে ॥

চক, চকচক, চকাচক, চকাস, চবাৎ, চবচব, চলচল, চুকচুক, চুলচুল, চ্যাচচ্যাচ। চকচকে, চলচলে, চুলচুলে, চুলুচুলু, চবচবে ॥

তকতক, তড়তড়, তড়াতড়, তড়াক, তড়াক তড়াক, তবতব, তলতল, তুলতুল, তিড়িং তিড়িং তিড়িং, তড়াং, তড়াং তড়াং। তকতকে, তলতলে, তুলতুলে, তিড়িংখিঁ নেচে ॥

থকথক, থপ, থপাৎ, থপাস, থপথপ, থমথম, থরথর, থলথল, থসথস, থৈথৈ নাচ। থকথকে, থপথপে, থমথমে, থলথলে, থসথসে, থুড়থুড়ে, থ্যাসথেসে ॥

দগদগ, দপদপ, দবদব, দমদম, দমাদ্দম, দরদর, দড়াদ্দড়, দড়াম, দাউদাউ, দুড়ুম, দুপ-দুপ, দুপদাপ, দুমদুম, দুমদাম। দগদগে (রক্তবর্ণ বা অগ্নি) ॥

ধক, ধকধক, ধড়ধড়, ধড়াস, ধড়াসধড়াস, ধড়াদ্ধড়, ধড়মড়, ধপ, ধপাস, ধপাধপ, ধমাস, ধরধর, ধম, ধমধম, ধমাদ্ধম, ধস, ধসধস, ধাঁ, ধাঁধাঁ, ধিকি, ধিকিধিকি, ধিনধিন, ধুকধুক, ধুন, ধুনধুম, ধুমধাম, ধুমাধুম, ধুপধাপ, ধুধু, ধেইধেই। ধড়কড়ে, ধপধপে, ধরধরে, ধসধসে ॥

নড়নড, নড়বড়, নড়রবড়র, নিশপিশ, নিড়বিড়। নড়বড়ে, নড়বড়ে, নিশপিশে, নিড়বিড়ে।

পট, পটপট, পটাপট, পটাৎ, পটাস, পটাসপটাস, পচপচ, পড়পড় (ছেঁড়া), পনাস,

পড়াৎ, পড়াং, পড়াংপড়াং, পড়িংপড়িং, পিটপিট, পিলপিল, পিঁপিঁ, পুট্, পুটপুট, পোঁপোঁ, প্যাকপ্যাক, প্যাচপ্যাচ, প্যানপ্যান, প্যাটপ্যাট, পটাং, পটাংপটাং। পিটপিটে, পুলপুসে, প্যাচপেঁচে, প্যানপেনে॥

ফটফট, ফটাফট, ফড়ফড়, ফড়বফড়র, ফটাৎ, ফটাস, ফড়াৎ, ফড়াস, ফনফন, ফরফর, ফস, ফসফস, ফসাফস, ফিক, ফিকফিক, ফিটফাট, ফিনফিন, ফুটফুট, ফুটকাট, ফুরফুর, ফুড়ুৎ, ফুড়ুৎফুড়ুৎ, ফুস, ফুসফুস, ফুসকাস, ফোঁকা, ফোঁকো, ফোঁৎফোঁৎ, ফোঁচফোঁচ, ফোঁস, ফোঁসফোঁস, ফ্যাফ্যা, ফ্যাকফ্যাক, ফ্যাঁচ, ফ্যাঁচফ্যাঁচ, ফ্যাঁচরফ্যাঁচর, ফ্যাটফ্যাট, ফ্যালফ্যাল। ফুরফুরে, ফিনফিনে, ফুটফুটে, ফ্যাটফেটে, ফ্যালফেলে॥

বকবক, বকরবকর, বজ্রবজ্জর, বনবন, বড়বড়, বড়রবড়র, বিজবিজ, বিজিরবিজির, বিড়বিড়, বিড়র বিড়ির, বুগবুগ, বোঁ, বোঁবোঁ, ব্যাজব্যাজ॥

ভকভক, ভড়ভড়, ভনভন, ভুকভুক, ভুটভাট, ভুরভুর, ভুড়ুকভুড়ুক, ভোঁ, ভোঁভোঁ, ভ্যাঁ, ভ্যাঁভ্যাঁ, ভ্যানভ্যান। ভ্যানভেনে॥

মচ, মচমচ, মট, মটমট, মড়মড়, মড়াৎ, মসমস, মিটমিট, মিটিমিটি, মিনমিন, মুচ, মুচমুচে, ম্যাড়ম্যাড়, ম্যাজম্যাজ। মড়মড়ে, মিটমিটে, মিনমিনে, মিসমিসে, মুচমুচে, ম্যাড়মেড়ে, ম্যাজমেজে॥

রীরী, রিমঝিম, রিনিঝিনি, রুমুঝুমু, রৈরৈ। রগরগে॥

লকলক, লটপট, লিকলিক। লকলকে, লিকলিকে, লিংলিঙে॥

সট, সটসট, সনসন, সড়সড়, সপসপ, সপাসপ, সুরসুর, সিরসির, সাঁ, সাঁসাঁ, সাঁইসাঁই, সুট, সুটসুট, সুড়সুড়, সুড়ুৎ, সোঁসোঁ, স্যাঁৎস্যাঁৎ। স্যাঁৎসেতে॥

হট, হটহট, হটবহটর, হড়হড়, হড়াৎ, হুড়বড়, হড়রহড়র, হুনহুন, হলহল, হড়রবড়র, হাউমাউ, হাহা, হাউহাউ, হাউমাউ, হাঁহাঁ, হাসফাস, হিহি, হিড়হিড়, হুহু, হুটহাট, হুড়হুড়, হুড়মুড়, হুড়ুৎ, হুপহাপ, হুস, হুসহুস, হুসহাস, হোহো, হোহা, হ্যাঁহ্যাঁ (বুকুর), হ্যাটহ্যাট, হ্যাতহ্যাত, হাপুস, হুপুস, হাপুসহুপুস, হুড়োমুড়ি॥

ধ্বনির অনুকরণে ধ্বনির বর্ণনা ইংরাজী ভাষাতেও আছে যথা bang, thud, ding-dong, hiss ইত্যাদি—কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার সহিত তুলনায় তাহা যৎসামান্য। পূর্ব্বোদ্ধৃত তালিকা দেখিলে তাহা প্রমাণ হইবে।

কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার একটী অদ্ভুত বিশেষত্ব আছে, তৎপ্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।

যে সকল অনুভূতি শ্রুতিগ্রাহ্য নহে, আমরা তাহাকেও ধ্বনিরূপে বর্ণনা করিয়া থাকি।

এরূপ ভিন্নজাতীয় অনুভূতি সম্বন্ধে ভাষাবিপর্য্যয়ের উদাহরণ কেবল বাঙ্গালায় নহে, সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। "মিষ্ট" বিশেষণ শব্দ গোড়ায় স্বাদ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়া ক্রমে, মিষ্ট মুখ,

মিষ্ট কথা, মিষ্ট গন্ধ প্রভৃতি নানা স্বতন্ত্র জাতীয় ইন্দ্রিয়বোধ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইংরাজীতে loud শব্দ ধ্বনির বিশেষণ হইলেও বর্ণের বিশ্লেষণরূপে প্রয়োগ হইয়া থাকে যথা loud colour। কিন্তু এরূপ উদাহরণ বিশ্লেষণ করিলে অধিকাংশ স্থলেই দেখা যাইবে, এই শব্দগুলির আদিম ব্যবহার যতই সঙ্কীর্ণ থাক, ক্রমেই তাহার অর্থের ব্যাপ্তি হইয়াছে। "মিষ্ট" শব্দ মুখ্যতঃ স্বাদকে বুঝাইলে এক্ষণে তাহার গৌণ অর্থ মনোহর দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু আমাদের তালিকাধৃত শব্দগুলি সে শ্রেণীর নহে। তাহাদিগকে অর্থবদ্ধ শব্দ বলা অপেক্ষা ধ্বনি বলাই উচিত। সৈন্যদলের পশ্চাতে যেমন একদল আনুষাঙ্গিক থাকে তাহারা রীতিমত সৈন্য নহে, অথচ সৈন্যদের নানাবিধ প্রয়োজন সরবরাহ করে, ইহারাও বাঙ্গালা ভাষার পশ্চাতে সেইরূপ ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরিয়া সহস্র কর্ম্ম করিয়া থাকে, অথচ রীতিমত শব্দশ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া অভিধানকারের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হয় নাই। ইহারা অত্যাবশ্যক, অথচ অখ্যাত অবজ্ঞাত। ইহারা না থাকিলে বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণনার পদে পদে উঠাইয়া দিতে হয়।

পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি, বাঙ্গলাভাষায় সকল প্রকার ইন্দ্রিয়বোধই অধিকার করে, কিন্তু শ্রাব্যধ্বনির আকারে ব্যক্ত হইয়া থাকে।

গতির দ্রুততা প্রধানতঃ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়—কিন্তু আমরা বলি ধাঁ করিয়া, সাঁ করিয়া, ভোঁ করিয়া, অথবা ভোঁ করিয়া চলিয়া গেল; তীর প্রভৃতি দ্রুতগামী পদার্থ বাতাসে উচ্চকণ ধ্বনি করে, সেই ধ্বনি আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালা ভাষা চকিতের মধ্যে তীরের উপমা আনয়ন করে। "তীরবেগে চলিয়া গেল" বলিলে প্রথমে অর্থবোধ ও পরে কল্পনা উদ্রেক করিতে সময় লাগে;—'সাঁ' শব্দে অর্থের বালাই নাই, সেইজন্য কল্পনাকে সে অব্যবহিত ঠেলা দিয়া চেতাইয়া তোলে।

ইহার আর এক সুবিধা এই যে, ধ্বনিবৈচিত্র্যে এত সহজে এত বর্ণনাবৈচিত্র্য আর কিছুতে করিতে পারে যে, তাহা অর্থবদ্ধ শব্দদ্বারা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। 'সাঁ করিয়া গেল' এবং 'সাঁট করিয়া গেল,' উভয়েই দ্রুতগতি প্রকাশ করিতেছে, অথচ উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা অন্য উপায়ে প্রকাশ করিতে গেলে হতাশ হইতে হয়।

এক কাটা সম্বন্ধে কত বিচিত্র বর্ণনা আছে। কচ করিয়া, কচাৎ করিয়া, কচ্‌কচ করিয়া, কাটা, কচাকচ কাটিয়া যাওয়া, কুচ করিয়া, কট করিয়া, কটাৎ করিয়া, কটাস করিয়া, খাঁচ করিয়া, খাঁচ খাঁচ করিয়া, ঝড়াৎ করিয়া,—এই সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগে কাটা সম্বন্ধে যত প্রকার বিচিত্র ভাবের উদ্রেক করে, তাহার সূক্ষ্ম প্রভেদ ভাষান্তরে বিদেশীর নিকট ব্যক্ত করা অসম্ভব।

ইংরাজিতে গমন ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন ছবির জন্য বিচিত্র শব্দ আছে; creep, crawl, sweep, flutter, waddle ইত্যাদি। বাঙ্গালার আভিধানিক শব্দে চলার বিচিত্র ছবি পাওয়া যায় না—তাহা খুঁজিতে হইলে আমাদের অভিধান তিরস্কৃত শব্দগুলি খাঁটিয়া দেখিতে হয়। ঘটনাটি

করিয়া, ঘটঘট করিয়া, খুটখুট করিয়া, খুবখুর করিয়া, খুটুসখুটুস করিয়া, গুটগুট করিয়া, ঘটর ঘটর করিয়া, ট্যাঙস ট্যাঙস করিয়া, থপ থপ করিয়া, থপাস থপাস করিয়া, ধড়ড় করিয়া, ধাঁ ধাঁ করিয়া, সন সন করিয়া, সুড় সুড় করিয়া, সুট সুট করিয়া, সুড়ুৎ করিয়া, হন হন করিয়া, হুড়মুড় করিয়া, চলার এত বিচিত্র অথচ সুস্পষ্ট ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে?

চলা, কাটা প্রভৃতি ক্রিয়ার সহিত ধ্বনির সম্বন্ধ থাকা আশ্চর্য্য নহে—কারণ গতি হইতে শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল ছবি ধ্বনির সহিত দূরসম্পর্কবিশিষ্ট, তাহাও বাঙ্গালা ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দে ব্যক্ত হয়। যেমন পাতলা জিনিষকে 'ফিন ফিন', 'ফুরফুর', ধ্বনির দ্বারা ব্যক্ত করা। পাতলা ফিনফিন করচে, বলিলে এ কথা কেহ বোঝে না যে, পাতলা বস্তু বাস্তবিক কোন শব্দ করিতেছে, অথচ তদ্দ্বারা তনু পদার্থের তনুত্ব সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ছিপছিপে কথাটাও ঐরূপ—সরু বেতই বাতাসে আহত হইয়া ছিপছিপ শব্দ করে, মোটা লাঠি করে না, এই জন্য ছিপছিপে লোক বস্তুতঃ কোন শব্দ না করিলেও ছিপছিপে শব্দ দ্বারা তাহার দেহের বিরলতা সহজেই মনে আসে। লকলকে, লিকলিকে, লিংলিঙে শব্দও এই শ্রেণীর।

কিন্তু ধ্বনির সহিত যে সকল ভাবের দূর সম্বন্ধও নাই, তাহাও বাঙ্গালায় ধ্বনির দ্বারা ব্যক্ত হয়। যেমন কনকনে শীত;—কনকন ধ্বনির সহিত শীতের কোন সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শীতে শরীরে যে বেদনা বোধ হয়, আমাদের কল্পনার কোন অদ্ভুত বিশেষত্ববশতঃ আমরা তাহাকে কনকন ধ্বনির সহিত তুলনা করি—অর্থাৎ আমরা মনে করি, সেই বেদনা যদি শ্রুতিগম্য হইত, তবে তাহা কনকন শব্দরূপে প্রকাশ পাইত।

আমরা শরীরের প্রায় সর্ব্বপ্রকার বেদনাকেই বিশেষ বিশেষ ধ্বনির ভাষায় ব্যক্ত করি—যথা কটকট, কনকন, কন্‌কন (চোখের বালি), কুটকুট, গা-ম্যান ঘ্যান, গা-চচ্চড়, চিনচিন, গা-ছমছম, ঝিনঝিন, দবদব, ধকধক, বুক-দুদ্দুড়, ম্যাজ ম্যাজ, সুড়সুড়, সড়সড়, রীরী। ইংরাজিতে এইরূপ শারীরিক বেদনা সকলকে, throbbing, gnawing, boring, crawling, cutting, bearing, bursting প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করা হয়। আমরাও ছিঁড়ে পড়া, কেটে যাওয়া, কামড়ান প্রভৃতি বিশেষণ আবশ্যকমত ব্যবহার করি, কিন্তু উল্লিখিত ধ্বন্যাত্মক শব্দে যাহা যে ভাবে ব্যক্ত হয়, তাহা আর কিছুতে হইবার যো নাই। ঐ সকল ধ্বনির সহিত ঐ সকল বেদনার সম্বন্ধ যে কাল্পনিক, এক্ষণে আমাদের পক্ষে তাহা মনে করাই কঠিন। বাস্তবিক অনুভূতি সম্বন্ধে কিরূপ বিসদৃশ উপমা আমাদের মনে উদিত হয়, "গা মাটি মাটি করা" বাক্যটি তাহার উদাহরণস্থল। মাটির সহিত শারীরিক অবস্থাবিশেষের যে কি তুলনা হইতে পারে তাহা বুঝা যায় না, অথচ "গা মাটিমাটি করা" কথাটা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট ভাববহ।

সর্ব্বপ্রকার শূন্যতা, স্তব্ধতা, এমন কি, নিঃশব্দতাকেও আমরা ধ্বনির দ্বারা ব্যক্ত করি। আমাদের ভাষায় শূন্য ঘর খাঁ খাঁ করে, মধ্যাহ্ন রৌদ্রের স্তব্ধতা ঝাঁ ঝাঁ করে, শূন্য মাঠ

ঘূর্ণ করে, বৃহৎ জলাশয় থৈ থৈ করে, পোড়ো বাড়ী হাঁ হাঁ করে, শূন্য হৃদয় হু হু করে, কোথাও কেহ না থাকিলে ভোঁ ভোঁ করিতে থাকে—এই সকল নিঃশব্দতার ধ্বনি অন্যভাষী-দের নিকট কিরূপ জানি না, আমাদের কাছে নিরতিশয় স্পষ্ট ভাববহ;—ইংরাজি ভাষায় desolate প্রভৃতি অর্থাত্মক শব্দ, অন্ততঃ আমাদের নিকট এত সুস্পষ্ট নহে।

বর্ণকে ধ্বনিরূপে বর্ণনা করা, সেও আশ্চর্য্য। টকটকে, টুকটুকে, ডগডগে, রগদগে, রগবগে লাল; ফুটফুটে, ফ্যাটফেটে, স্যাকেকে, ধবধবে শাদা; মিসমিসে, কুচকুচে কালো।

টকটক শব্দ কাঠের ন্যায় কঠিন পদার্থের শব্দ। যে লাল অত্যন্ত কড়া লাল, সে যখন চক্ষুতে আঘাত করে, তখন সেই আঘাত ক্রিয়ার সহিত টকটক শব্দ আমাদের মনে উহ্য থাকিয়া যায়। কবির কর্ণে যেমন "silent spheres" অর্থাৎ নিঃশব্দ জ্যোতিষ্কলোকের একটি সঙ্গীত উহ্যভাবে ধ্বনিত হইতে থাকে, এও সেইরূপ। ঘোর লাল আমাদের ইন্দ্রিয়-দ্বারে যে আঘাত করে, তাহার যদি কোন শব্দ থাকিত, তবে তাহা আমাদের মতে টকটক শব্দ। আবার সেই রক্তবর্ণ যখন মৃদুতর হইয়া আঘাত করে, তখন তাহার টকটক শব্দ টুকটুক শব্দে পরিণত হয়।

কিন্তু ধবধব শব্দ সম্ভবতঃ গোড়ায় ধবল শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং সংসর্গ বশতঃ নিজের অর্থ সম্পত্তি হারাইয়া ধ্বনিদলে ভিড়িয়া গিয়াছে। জলজল শব্দ তাহার অন্যতম উদাহরণ;—জলন শব্দ তাহার পিতৃপুরুষ হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় সে কুলত্যাগী—সেই কারণে আমরা কোন জিনিষকে "জলজল হইতেছে" বলি না—'জলজল করিতেছে' বলি—এই "করিতেছে" ক্রিয়ার পূর্ব্বে "ধ্বনি" শব্দ উহ্য। বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ প্রয়োগই প্রসিদ্ধ। নদী কুল কুল করে, জুতা মচমচ করে, মাছি ভনভন করে, এরূপ স্থলে "শব্দ" করে বলা বাহুল্য;—শাদা ধব ধব করে বলিলেও বুঝায়, শ্বেত পদার্থ আমাদের কল্পনাকর্ণে এক প্রকার অপঙ্কিত শব্দ করে। কোন বর্ণ যখন তাহার উজ্জ্বলতা পরিত্যাগ করে, তখন বলি ম্যাড়মেড় করিতেছে। কেন বলি তাহার কৈফিয়ৎ দেওয়া আমার কর্ম্ম নহে, কিন্তু যেখানে ম্যাড়মেড়ে বলা আবশ্যক, সেখানে 'মলিন, ম্লান' প্রভৃতি আর কিছু বলিয়া কুলায় না।

"চিকচিক" গোড়ায় চিক্কণ শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে কি না, সে প্রসঙ্গ এস্থলে আমি অনাবশ্যক বোধ করি। চকচক চিকচিক ঝিকঝিক এক্ষণে বিশুদ্ধ ধ্বনি মাত্র। চিকচিকে পদার্থের চঞ্চল জ্যোতি আমাদের চক্ষে একপ্রকার অশব্দ ধ্বনি করিতে থাকে তাহাকে আমরা চিক্‌চিক্ বলি—আবার সেই চিক্কণতা যদি তৈলাভিষিক্ত হয়, তবে তাহা নীরবে চুক্‌চুক্ শব্দ করে, আমরা বলি তেল-চুক্‌চুকে। চিক্কণ পদার্থ যদি চঞ্চল হয়, যদি গতিবশতঃ তাহার জ্যোতি একবার একদিক হইতে একবার অন্যদিক হইতে আঘাত করে, তখন সেই জ্যোতি চিকচিক্ ঝিক্‌ঝিক্ বা ঝলঝল্ না করিয়া চিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্ ঝলমল করিতে থাকে অর্থাৎ তখন সে একটা শব্দ না করিয়া দুইটা শব্দ করে। কটমট করিয়া চাহিলে সেই দৃষ্টি যেন একদিক হইতে কট এবং আর একদিক হইতে মট করিয়া আসিয়া মারিতে থাকে, এবং ধ্বনির বৈচিত্র্য দ্বারা দৃষ্টির ঐক্য যেন আরো পরিস্ফুট হয়।

অবস্থাবিশেষে শব্দের হ্রস্বদীর্ঘতা আছে;—ধপ্ করিয়া যে লোক পড়ে, তাহা অপেক্ষা স্থূলকায় লোক ধপাস্ করিয়া পড়ে। পাতলা জিনিষ কচ করিয়া কাটা যায়, কিন্তু মোটা জিনিষ কচাৎ করিয়া কাটে।

আলোচ্য বিষয় আরো অনেক আছে। দেখা আবশ্যক এই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির সীমা কোথায় অর্থাৎ কোন্ কোন্ বিশেষ জাতীয় ছবি ও ভাব প্রকাশের জন্য ইহারা নিযুক্ত। প্রথমতঃ ইহাদিগকে স্থাবর এবং জঙ্গমে একটা মোটা বিভাগ করা যায়—অর্থাৎ স্থিতিবাচক এবং গতিবাচক শব্দগুলিকে স্বতন্ত্র করা যাইতে পারে। তাহা হইলে দেখা যাইবে স্থিতিবাচক শব্দ অতি অল্প। কেবল শূন্যতাপ্রকাশক শব্দগুলিকে ঐ দলে ধরা যাইতে পারে। যথা, মাঠ ধূধূ করিতেছে, অথবা রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। এই ধূধূ এবং ঝাঁ ঝাঁ ভাবের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম স্পন্দনের ভাব আছে বলিয়াই তাহারা এই ধ্বন্যাত্মক শব্দের দলে মিশিতে পারিয়াছে। আমাদের এই শব্দগুলি সচলধর্ম্মী। চক্‌চকে জিনিষ স্থির থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার জ্যোতি চঞ্চল। যাহা পরিষ্কার তক্‌তক্ করে, তাহার আভাও স্থির নহে। বর্ণ জল-জলে হউক বা ম্যাড়মেড়ে হউক্, তাহার আভা আছে।

বাঙ্গালা ভাষায় স্থিরত্ব বর্ণনার উপাদান কি, তাহা আলোচনা করিলেই আমার কথা স্পষ্ট হইবে।

গট্ হইয়া বসা, গুম্ হইয়া থাকা, ভোঁ হইয়া থাকা, চুপ্ হইয়া যাওয়া। গট্, গুম্ এবং ভোঁ ধ্বন্যাত্মক বটে, কিন্তু আর পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। ইহার মধ্যেও গুম্‌ভাবে একটি আবদ্ধ আবেগ আছে;—যেন গতি স্তব্ধ হইয়া আছে, এবং ভোঁ ভাবের মধ্যেও একটি আবেগের বিহ্বলতা প্রকাশ পায়। ইহারা একান্ত স্থিতিবোধক নহে, স্থিতির মধ্যে গতির আভাস-বোধক। যাহাই হউক এরূপ উদাহরণ আরো যদি পাওয়া যায়, তবে তাহা অত্যল্প।

স্থিতিবাচক শব্দ অধিকাংশই অর্থাত্মক। স্থিতি বুঝিতে মনের সত্বরতা আবশ্যক হয় না। স্থিতির গুরুত্ব, বিস্তার এবং স্থায়িত্ব, সময় লইয়া ওজন করিয়া পরিমাপ করিয়া বুঝিলে ক্ষতি নাই। অর্থাত্মক শব্দে সেই পরিমাপ কার্য্যের সাহায্য করে। কিন্তু গতিবোধ এবং বেদনাবোধ স্থিতিবোধ অপেক্ষা অধিকতর অনির্ব্বচনীয়। তাহা বুঝিতে হইলে বর্ণনা ছাড়িয়া সঙ্কেতের সাহায্য লইতে হয়। ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি সঙ্কেত।

গদ্য ও পদ্যের প্রভেদও এই কারণমূলক। গদ্য জ্ঞান লইয়া এবং পদ্য অনুভাব লইয়া। বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্থের সাহায্যে পরিস্ফুট হয়; কিন্তু অনুভাব কেবলমাত্র অর্থের দ্বারা ব্যক্ত হয় না, তাহার জন্য ছন্দের ধ্বনি চাই; সেই ধ্বনি অনির্ব্বচনীয়কে সঙ্কেতে প্রকাশ করে।

আমাদের বর্ণনায় যে অংশ অপেক্ষাকৃত অনির্ব্বচনীয়তর, সেইগুলিকে ব্যক্ত করিবার জন্য বাঙ্গালা ভাষায় এই সকল অভিধানের আশ্রয়চ্যুত অব্যক্ত ধ্বনি কাজ করে। যাহা চঞ্চল, যাহার বিশেষত্ব অতি সূক্ষ্ম, যাহার অনুভূতি সহজে সুস্পষ্ট হইবার নহে, তাহাদের জন্য এই ধ্বনিগুলি সঙ্কেতের কাজ করিতেছে।

আমার তালিকা অকারাদি বর্ণানুক্রমে শ্রেণিবদ্ধ করিয়াছি। সময়াভাববশতঃ সেই সহজ পথ লইয়াছি। উচিত ছিল চলন, কর্ত্তন, পতন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়ে শব্দগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা। তাহা হইলে সহজে বুঝা যাইত। কোন্ কোন্ শ্রেণীর বর্ণনায় এই শব্দগুলির ব্যবহার হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়ের মধ্যে ধ্বনির ঐক্য আছে কিনা। ঐক্য থাকারই সম্ভব। ছেদনবোধক শব্দগুলি চকারান্ত অথবা টকারান্ত ;—কচ এবং কট—তীক্ষ্ণ পাত্রে ছেদন কচ এবং স্থূল অস্ত্রে কট। এই পর্য্যায়ের সকল শব্দই ক-বর্গের মধ্যে সমাপ্ত ঃ—কাট, কাঁটা, গাঁজ, কাঁচি।

পাঠকগণ চেষ্টা করিয়া এইরূপ পর্য্যায়বিভাগে সহায়তা করিলে বাধিত হইব।

জাবড়া, ধ্যাবড়া, খ্যাবড়া, হিলিবিজি, হাবজা গোবজা, হোমরা চোমরা, হেঁজিপেজি, ঝাপ্‌সা, ভাবলা, ঝুপ্‌সি, চ্যাপ্‌সা, ছোঁৎকা, গোম্‌সা, ধুম্‌সো, ঘুপসি, মটকা মারা, মিটকি মারা, গুঁড়ি মারা, উঁকি মারা, টেবো, ট্যাবলা, ভেবড়ে যাওয়া, ঘুবড়ে যাওয়া প্রভৃতি বর্ণানুলক খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের শ্রেণীবদ্ধ তালিকাসঙ্কলনে পাঠকদিগকে একান্ত অনুরোধ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ।

শঙ্কর ও শাক্যমুনি ।

(সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত)

"শঙ্কর" এই নাম শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ যেন মনে না করেন, পঠ্যমান প্রবন্ধে কোন আধুনিক শঙ্করের অথবা দেবতা শঙ্করের প্রসঙ্গ হইবে। নিম্নলিখিত শ্লোকে পূর্ব্বতন কাল হইতে যে শঙ্করের উল্লেখ চলিয়া আসিতেছে, সেই শঙ্কর এতৎ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। শঙ্করোল্লেখী শ্লোকটী এই ;—

"নারায়ণং পদ্মভবং বশিষ্ঠং শক্তিঞ্চ তৎপুত্রপরাশরঞ্চ
ব্যাসং শুকং গৌড়পদং মহান্তং গোবিন্দযোগীন্দ্রমথাস্য শিষ্যম্
শ্রীশঙ্করাচার্য্যমথাস্য পদ্ম-পাদঞ্চ হস্তামলকঞ্চ শিষ্যম্
তং তোটকং বার্ত্তিককারমস্মান্ সদ্গুরূন্ সন্ততমানতোঽস্মি ।"

শ্লোকটী বেদান্তীদিগের মধ্যে প্রণতি-পদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার ভাবানুবাদ এই যে, ভগবান্ নারায়ণ, তদ্ব্যতিরিক্তাদ্বয় ব্রহ্ম, তৎপুত্র বশিষ্ঠ, তৎপুত্র শক্তি, তৎপুত্র পরাশর, তৎপুত্র ব্যাস, তৎপুত্র শুক, শুকের শিষ্য বা প্রশিষ্য গৌড়পদ, গৌড়পদের শিষ্য যোগী-গোবিন্দনাথ, গোবিন্দনাথের শিষ্য শঙ্করাচার্য্য, শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য পদ্মপাদ, হস্তামলক তোটকাচার্য্য এবং বার্ত্তিক-গ্রন্থকার সুরেশ্বরাচার্য্য, ইহাঁদিগকে এবং অন্যান্য তাদৃশ গুরুদিগকে আমি নমস্কার করি।

উল্লিখিত প্রণতি-পদ্যোক্ত শঙ্কর বেদান্তদর্শনের, বিশেষতঃ অদ্বয়-ব্রহ্ম-বাদের প্রধান প্রচারক। এই মহাপুরুষের জন্ম, মরণ, শাস্ত্রাভ্যাস, তত্ত্বোপদেশ, পুস্তকপ্রণয়ন, সমস্তই বিস্ময়াবহ। সেইজন্য তিনি এদেশে অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। এদেশের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরাও "শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ম্" এইরূপ উক্তি করিয়া থাকেন। এতাদৃশ গুণশালী শঙ্করের রচিত যে সকল পুস্তক ভারতবর্ষে প্রচরূপ আছে, সে সকল পুস্তকের দোষগুণ বিচার অস্মদাদির অসাধ্য। আমরা এই মাত্র দেখিতে পাই যে, যেমন পাণিনীয় ব্যাকরণের আবির্ভাবে তৎপূর্ব্বতন ব্যাকরণ-নিচয় লুপ্তকল্প হইয়া

গিয়াছে, তেমনি শঙ্করের সূত্রভাষ্যাদি গ্রন্থের প্রচারে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রবৃত্তি প্রভৃতি গ্রন্থ লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। শঙ্করের পরে অনেক মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য; তাঁহারাও পুস্তক লিখিয়া ও শঙ্করের মত খণ্ডন করিয়া তদীয় কীর্ত্তি বিলোপ করার চেষ্টা করিয়াছিলেন সত্য; পরন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

"শঙ্করের সূত্রভাষ্য"—এতৎ প্রসঙ্গে একটি অনেক দিনের কথা মনে পড়িল। কোন এক সময়ে অনেক খ্যাতনামা প্রত্নবিৎ পণ্ডিত আমাকে বলেন, বুদ্ধের পূর্ব্বের কিছুই নাই। তিনি সুব্যক্ত কথায় না বলুন, প্রকারান্তরে এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মসূত্রও বুদ্ধের পরে বিরচিত। আমি তাঁহার ঐ কথায় সন্দিহান হইয়া প্রমাণপরম্পরা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। তাহাতে জানা হইয়াছে, ব্রহ্মসূত্র এই বুদ্ধের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী। একটা প্রমাণ এই যে, উপবর্ষাচার্য্য ঐ সূত্রের ব্যাখ্যাকার। বোধায়ন ও উপবর্ষ মুনি যে গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, সে গ্রন্থ কিরূপে বুদ্ধপরবর্ত্তী হইবে? যদিও আমরা বোধায়নের খ্রিষ্টজন্মের দ্বিসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে প্রমাণারূঢ় করিতে না পারি, তথাপি প্রমাণসহকারে বলিতে পারি, উপবর্ষ শাক্যসিংহ বুদ্ধের বহু পূর্ব্বের ব্যক্তি। এই উপবর্ষ ব্যাকরণপ্রণেতা পাণিনি মুনির অধ্যাপক। পাণিনি ও উপবর্ষ যে সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, সে সময়ে শাক্যসিংহ কপিলবাস্তু নগরে জন্ম গ্রহণও করেন নাই। ইয়ুয়ান চোয়াঙ ও বাদালী উত্তম শ্রেণীর পুরাবিৎ পণ্ডিতেরা পাণিনি মুনির নন্দরাণোহবাচি ইত্যাদি সূত্র পর্য্যালোচনার দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, পাণিনি মুনি শাক্যসিংহ জন্মের পূর্ব্বে ব্যাকরণসূত্র রচনা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের উপর উপবর্ষাচার্য্যের যে কোনরূপ ব্যাখ্যা পুস্তক আছে, অথবা ছিল, তাহা আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের "যদাহ স ভগবানুপবর্ষঃ" "কোটি ইত্যাহ" ইত্যাদি উল্লেখে উদ্ধৃত তদীয় ব্যাখ্যাংশ ও মত দ্বারা জানিতে পারি। তাই আমরা ব্রহ্মসূত্রের বুদ্ধ অপেক্ষা প্রাচীনতায় নিঃসন্দেহ এবং পূর্ব্বোক্ত "নন্ অ্যাক্টি বুদ্ধ চিটীক" কথায় শ্রদ্ধা বর্জ্জিতা হইয়া ব্রহ্মসূত্র রহে, সমুদায় স্মৃতি ও অনেকগুলি পুরাণ বুদ্ধ অপেক্ষা প্রাচীন। এ অংশে বুদ্ধের কথাই প্রমাণ।

বুদ্ধ বোধিদ্রুমতলে উপবিষ্ট হইয়া তাৎকালিক লোকমতি পর্য্যালোচনা করতঃ আক্ষেপ সহকারে বলিতেছেন, "অহো! আমি এই পূর্ণ পাপকালে (কলিকালে) জম্বুদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছি। এই কালের লোকেরা মোহবশতঃ অনুপযুক্ত কৃচ্ছ্র সাধনদ্বারা বৃথা শুদ্ধি ইচ্ছা করিতেছে। যথার্থ বস্তু কি, প্রকৃত শুদ্ধি কি, গন্তব্য পথ কি, তপস্যাই বা কি, তাহা জানিতেছে না। কেহ মন্ত্রবিচার, কেহ মৎস্য মাংস ত্যাগ, কেহ ফল পত্র ভক্ষণ, কেহ অযাচিতাহার, কেহ ভিক্ষান্ন ভোজন, কেহ কুশশয়ন, কেহ স্থণ্ডিলশয়ন, কেহ পঞ্চাগ্ন্যুপাসন, কেহ মৌনব্রত, কেহ ঔষধাহার, কেহ অনাহার, কেহ দ্বাদশাহসাধ্য ব্রত, কেহ পঞ্চদশাহসাধ্য ব্রত, কেহ চান্দ্রায়ণ ব্রত, কেহ কুশাসন, বল্কলাসন, কম্বলাসন ও চর্ম্মাসন, কেহ কৌপীন, কেহ তীর্থস্নান, কেহ কেশ ধারণ, কেহ জটাধারণ, কেহ ভস্ম ভক্ষণ, কেহ

মেখলা ধারণ, কেহ কমণ্ডলু (কমণ্ডলু) ধারণ, কেহ বা ত্রিদণ্ড ধারণ দ্বারা শুদ্ধি হয়, পাপক্ষয় হয়, মনে করিতেছে। কেহ এক পদে, কেহ ঊর্দ্ধপদ ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তপঃসঞ্চয় করিতেছে, তুষাগ্নিসেবন, কুম্ভকদ্বারা মরণ, ভৃগুপতন, অগ্নি-প্রবেশ, অনশনে মরণ ও তীর্থসেবনদ্বারা অভীষ্ট লাভের আশা করিতেছে। প্রণব জপ, যজ্ঞ, হোম, শ্রাদ্ধ ও তর্পণদ্বারা নিষ্পাপ হইবার চেষ্টা করিতেছে। কেহ স্তুতি-নমস্কারাদিদ্বারা, কেহ মন্ত্রজপদ্বারা, কেহ দেবার্চ্চনাদ্বারা, কেহ বেদাধ্যয়ন দ্বারা এবং কেহ বা নির্ম্মাল্যধারণ দ্বারা পবিত্র হইবার ইচ্ছা করিতেছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, যম, হুতাশন, কুবের, বরুণ, অশ্বিনীকুমার, মাতৃগণ, কাত্যায়নী, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, রাক্ষস, মহাসর্প, ভূত, প্রেত ও পিশাচ প্রভৃতিকে নমস্কার করিতেছে। পুণ্যলাভ প্রত্যাশায় গিরি, নদী, উৎস, সরোবর, হ্রদ, তড়াগ, সাগর, পল্বল ও যূপ প্রভৃতি আশ্রয় করিতেছে। দধি, ঘৃত, ভস্ম, সর্ষপ, যব, দূর্ব্বা, ধান্য, মণি, সুবর্ণ ও রজত প্রভৃতিকে মাঙ্গল্য মনে করিতেছে। এই ঘোর পাপ-কালে অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবেরা সংসার-ভয়ে ভীত হইয়া পরিত্রাণ কামনায় ঐ সকল অবলম্বন করিতেছে। কিন্তু হায়! ইহারা জানিতেছে না যে, ঐ সকলের দ্বারা সংসারভয় নিবারিত হয় না। কেহ মনে করিতেছে, পুত্রদ্বারা স্বর্গ ও অপবর্গ হইবে। অহো! কি কষ্ট! বর্ত্তমান কালের প্রায় সমুদয় জীবই ঐরূপ মিথ্যাপথে ভ্রমণ করতঃ অশরণে শরণ, অমঙ্গলে মঙ্গল ও অশুচিতে শুদ্ধি জ্ঞান করিয়া বিনষ্ট হইতেছে। এই সময়ে ইহাদিগকে আমি মঙ্গল কি, শুদ্ধি কি, পথ কি, যথার্থ তপস্যাই বা কি, তাহা শিখাইব। ধ্যান কাহাকে বলে, যথার্থ যোগ কি, তাহাও জানাইয়া দিব।

এই সকল কথা যদি সত্য সত্যই ব্রহ্মমুখ-বিনিঃসৃত হয়, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই অকপটে বলিতে পারি, বুদ্ধের পূর্ব্বে বেদ, স্মৃতি ও কতকগুলি পুরাণ বিদ্যমান ছিল। কেননা ঐ সমস্ত কথাই বেদের, স্মৃতির ও পুরাণের কথা, বুদ্ধের বা অন্য শাক্যমুনির নহে। মান্য গণ্য বুদ্ধ-পুরাতন ও দর্শন-শিরোমণি বলিয়া পূজিত এই সূত্রের উপর উহার [illegible] রচনা করিয়া মহাবুদ্ধিমান শঙ্কর ইহলোকে কল্পান্তস্থায়িনী কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এতদীয় শারীরক-নামধেয় ভাষ্য অধ্যাপক-সমাজে এত আদৃত এবং তাহার উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠতা এত অধিক যে, শারীরক-ভাষ্য না পড়িলে যেন বেদান্ত পড়া সিদ্ধই হয় না। ছাত্রেরা যতই ভাষ্য পড়ুন না কেন, একমাত্র শারীরক পাঠের অভাবে সমস্তই নিষ্ফল হইয়া যায়। ভিন্ন-সম্প্রদায়ের বেদান্ত হয় ত মানুষকে ভক্ত করিতে পারে, সাধক করিতেও পারে; কিন্তু পণ্ডিত করিতে পারেনা। কারণ এই যে, শঙ্কর-সম্প্রদায়ের বেদান্ত ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের বেদান্তে জ্ঞানতত্ত্বের ও ব্রহ্মতত্ত্বের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা নাই।

এক সময়ে ভারতবর্ষীয় জনগণের ধর্ম্মগত, সমাজগত ও আচারগত অবস্থা, ঘোর রোগের ন্যায় শোচনীয় হইয়াছিল। বেদান্তভাষ্য-প্রণেতা শঙ্কর সেই সময়ে জন্ম গ্রহণ

---

* বৌদ্ধদিগের ললিতবিস্তর ও মহাবস্তু অবদান প্রভৃতি গ্রন্থ দেখ।

কবায় আমরা "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" ইত্যাদি ঋষিবচনের প্রতি আস্থা বা শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারি না। এক দিকে বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃত অবস্থা ও পতনোন্মুখতা, অপর-দিকে কর্ম্মপ্রধান বৈদিক ধর্ম্মের পুনরাবির্ভাব এই দুএর সন্ধি-সময়ে বা সংঘর্ষ-সময়ে মহাপুরুষ শঙ্কর যেন মাধ্যস্থ অবলম্বন করিয়া দাক্ষিণাত্য প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি যে অব্দে, যে গ্রামে, যাহার ঔরসে ও যাহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যত কাল জীবিত ছিলেন এবং জীবিত থাকিয়া যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, সে সমস্তই তদীয় শিষ্য-প্রশিষ্যের লিখিত "শঙ্করচরিত" "শঙ্কর-বিজয়" ও "শঙ্কর-মন্দার-সৌরভ" প্রভৃতি গ্রন্থদ্বারা জানা যায়। তাঁহার জীবনের সমুদায় বৃত্তান্ত এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে পর্য্যাপ্ত হইবার নহে; কার্য্যেই অদ্য এই সভায় আমি তদীয় জীবনের কতিপয় প্রধান অংশ মাত্র সংক্ষেপে বর্ণন করিতে সমর্থবান্ হইয়াছি। এক্ষণে সভ্যবৃন্দের মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে আমি কৃতার্থন্য অনুভব করিব ও সুখী হইব।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ বিভাগে কেরল নামে এক প্রসিদ্ধ জনপদ আছে। তাহার বর্ত্তমান নাম মালবার। মহাত্মা শঙ্কর তীর্থ কেরলের কালপি নামক গ্রামে শিবগুরু নামক জনৈক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম ভদ্রা বা সুভদ্রা। শঙ্কর-সম্ভার-সৌরভ নামক গ্রন্থের রচয়িতা নীলকণ্ঠ ভট্ট শঙ্করের জন্মাব্দ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই ;—

প্রাপ্তে তিষ্যশতদ্বয়ামতিযাতসত্যাং একাদশাধিকশতোনচতুঃসহস্র্যাম্।
মাধবশুক্লদশমীদিবসে কুমারং শ্রীশঙ্করং কলিকলুষবিনাশয়ক্ষম্।

তিষ্য শব্দের অর্থ কলি। কলিদেবের একাদশাধিক শত ন্যূন চতুঃসহস্র বৎসর অতীত হইলে অর্থাৎ তিন হাজার আট শত উন-নব্বই বৎসর গত হইলে, বৈশাখ শুক্লপক্ষীয় দশমী তিথিতে শিবগুরুপত্নী ভদ্রা, কলিকলুষনাশন শঙ্করকে প্রসব করিলেন। এখন সাড়ে পাঁচ হাজার এক। এতদনুসারে বলিতে পারি, শঙ্কর যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে আজ আমরা তাঁহাকে ১১১২ বৎসরের বৃদ্ধ দেখিয়া চমৎকৃত হইতাম।

যাঁহারা শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য-প্রশিষ্য, তাঁহাদের মধ্যেও শঙ্করের আবির্ভাব-কাল-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোক প্রচলিতরূপ আছে। যথা—

"বিধিনাগেভবক্ত্রাব্দে বিগতে মাসি মাধবে।
শুক্লে তিথৌ দশম্যাঞ্চ শঙ্করার্য্যোদয়ঃ স্মৃতঃ।"

ইহাতেও পাওয়া যাইতেছে যে, শঙ্কর কলিযুগের ৩৮৮৯ বৎসর গত হইলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রবন্ধচিন্তামণি-গ্রন্থকার মেরুতুঙ্গাচার্য্য লিখিয়াছেন, ১১৫০ সম্বৎ অব্দে গুর্জ্জরাধিপতি জয়সিংহ জীবিত ছিলেন। ঐ সময়ে শ্রীপত্তনে দেবসূরি নামক জনৈক পণ্ডিত বাস করিতেন। তাঁহার ছাত্র মাণিক্য পণ্ডিত। এই মাণিক্য পণ্ডিতকে স্বরচিত সংকেতনাম্নী কাব্য-প্রকাশ টীকায় প্রসঙ্গবশতঃ কুমারিল ভট্টের নামোল্লেখ করিতে দেখা যায়। এই

শুভলগ্নজাত উক্ত শিশুর শরীরে অনেকগুলি সামুদ্রিকজ্যোতিষোক্ত অনন্যসাধারণ চি ছিল। মস্তকে ছিত্রাংশুচিহ্ন, ললাটে নেত্ররেখা, স্কন্ধোপরি ত্রিশূলাঙ্ক, চরণে চামরচিহ্ন, করতলে চক্র, গদা, ধনু ও ডমরু চিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ সকল চিহ্ন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন ও কান্তি পুরাণাদিশাস্ত্রের বর্ণিত শিবমূর্ত্তির অনুরূপ দৃষ্ট করিয়া তাৎকালিক পণ্ডিতগণ ও জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ শিবগুরুর এই নবকুমারকে শিবাবতার বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন। তৎশ্রবণে শিবগুরু ও তৎপত্নী ভদ্রার আর আনন্দের সীমা রহিল না। ভাগ্যধর শিবগুরু অতি আনন্দের ও উৎসাহের সহিত পুত্রের জাতকর্ম্ম-সংস্কার নির্ব্বাহ করিলেন, পরে "শঙ্কর" এই নামে নামকরণ-সংস্কার সম্পন্ন করিলেন। তৃতীয় বর্ষ আগতে চৌল-সংস্কার সমাপ্ত করিয়া শিবগুরু মনে মনে আশা করিতেছেন, পুত্র পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলে স্বয়ং তাহাকে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করিবেন, কিন্তু দুরন্ত কাল তাঁহাকে তাহা করিতে দেয় নাই। শিবগুরুর আশা পূর্ণ হইল না, তিনি সেই অনুচিত সময়ে সেই শিশু পুত্রকে ও সহধর্ম্মিণীকে নাথহীন করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। শিবগুরু সপ্ততি বৎসর বয়সে পুত্রবত্ত লাভ করেন এবং দ্বিসপ্ততি বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। শঙ্করকে শিশু ও তদীয় জননীকে যার পর নাই শোকাতুর দেখিয়া শিবগুরুর জ্ঞাতিগণ শিবগুরুর দাহাদি অন্ত্যেষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। দেখিতে দেখিতে এক বর্ষ অতীত হইল, শঙ্করের মহাগুরু-নিপাত-জনিত দেহাশুদ্ধি অর্থাৎ কালাশৌচ সমাপ্ত হইল এবং তাঁহার পঞ্চম বর্ষ বয়সের প্রথম দিনও সমাগত হইল। দুঃখিনী শঙ্কর-মাতা আজ পরলোকগত স্বামীর জীবদ্দশায় ইচ্ছা স্মরণ করিয়া শঙ্করকে উপনীত করিবার জন্য নিতান্ত চঞ্চলমতি হইলেন এবং জ্ঞাতিগণ ও সুহৃদ্‌ [illegible] আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। প্রতিবাসী-গণ শঙ্করের অদ্ভুত প্রতিভা, আশ্চর্য্য [illegible] ব্রাহ্মণকুলের প্রথা, শাস্ত্রের শাসন এবং পরলোকগত শিবগুরুর জীবিতাবস্থার ইচ্ছা, এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া শঙ্কর জননীর ইচ্ছার প্রতিবোধ করিলেন না; প্রত্যুত সহায়তাই করিলেন। অচিরকাল পরেই শঙ্করের শঙ্করতুল্যবপু যজ্ঞোপবীত-শোভায় সুশোভিত হইল। তিনি শাস্ত্রানুসারে কুলকুলে বাস করতঃ গুরুসেবা, বেদাভ্যাস, ভিক্ষান্ন-ভোজন, অগ্নিপরিচর্য্যা, সত্যনিষ্ঠতা, শৌচ ও সন্তোষ প্রভৃতি নৈষ্ঠিকী বৃত্তি প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যে ভাগ্যধর দ্বিজ শঙ্করের আচার্য্য-গুরু হইয়াছিলেন, তিনি বোধ হয় তত বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন না, তাই শঙ্করচরিত্র লেখকেরা তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই। তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন, অদ্ভুত শিশু-শঙ্কর নাকি এক বৎসর বয়সে মাতৃভাষায় অভ্যস্ত, দ্বিবর্ষ বয়সে লিপিকার্য্যে সুশিক্ষিত ও ত্রিবর্ষ বয়সে নাকি পুরাণ-পাঠ শুনিয়া তাহার অর্থবোধগম্য করিতে পারগ হইয়াছিলেন। পঞ্চমবর্ষে তিনি উপনীত হন, তদবধি আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গুরুগৃহে বাস করেন। ঐ তিন বৎসরের মধ্যে তিনি নাকি সমুদায় সাঙ্গ বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। পরে অষ্টম বর্ষে অধ্যয়ন-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া স্বালয়ে আগমন করেন।

শঙ্কর গুরু-সকাশে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সমাবর্ত্তন অর্থাৎ অধ্যয়ন-ব্রত উদ্‌যাপন করতঃ স্বাগমে আগমন পূর্ব্বক মাতৃসেবা, বেদাভ্যাস, অগ্নিপরিচর্য্যা, ও সূর্য্যোপাসনা প্রভৃতি গার্হস্থ্যোচিত সৎকর্ম্মে রত হইলেন। তাহাতে তাঁহার বহিঃকান্তি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বিনী ও আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ যৎপরোনাস্তি উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইল। ক্রমে তাঁহার অলৌকিকী প্রতিভা, সচ্চরিত্রতা, ও বিদ্যাখ্যাতি দেশব্যাপিনী হইয়া উঠিল। দেশ-দেশান্তর হইতে অনেক বিদ্যার্থী বিদ্যাশিক্ষার্থ তাঁহার আলয়ে আগমন করিতে লাগিল। কিছুকাল উক্ত প্রকারে অতিবাহিত হইল বটে, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার চিত্ত অন্য এক দুর্গম পথে সবেগে ধাবমান হইল। বৈরাগ্য তাঁহার চিত্ত আক্রমণ করিয়াছে, তিনি আর গৃহে থাকিতে ইচ্ছা করেন না, গার্হস্থ্য-সংসর্গ ভাল বাসেন না, গৃহত্যাগই তাঁহার শান্তিদাতা পরম সহায় হইয়া উঠিল। কিন্তু কি করেন, জননীর অনুমতি ব্যতীত তিনি আপনার অভীপ্সিত পথে অগ্রসর হইতে পারেন না।

একদা তাঁহার ভবনে কতিপয় পর্য্যটক অতিথি আগমন করিলে, তপস্বিনী শঙ্কর-জননী তাঁহাদের নিকট প্রিয়তম পুত্রের ভাবি শুভ বিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপিত করিলেন। তদুত্তরে তাঁহারা বলিলেন, ভদ্রে! তোমার এই পুত্র, গুণে শিবতুল্য; কিন্তু স্বল্পায়ু। "পুত্র স্বল্পায়ু" এই বজ্রতুল্য দুঃসহ শব্দ শ্রবণে তিনি মুহূর্ত্তেকের জন্য চেতনাশূন্য, নিশ্চল ও নিষ্পন্দ হইয়া রহিলেন, পরে চেতনা-প্রাপ্ত হইয়া ভয়ে ও শোকে পুনঃ পুনঃ কাতরা হইতে লাগিলেন। শোকনাশন শঙ্কর নানা প্রকার বচনরচনার দ্বারা জননীর ভয় ও শোক নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে দিন ঐরূপে অতিবাহিত হইল। পরদিন শঙ্কর জননী-সকাশে আপন অভীষ্ট ব্যক্ত করিবার উদ্যোগ করিয়াও উপযুক্ত অবসর অভাবে করিতে পারেন নাই। ঐরূপে তিন চারি দিন কাটিয়া গেল, আর থাকিতে পারিলেন না। পঞ্চম দিবস আসিলে তিনি জননীর সমীপবর্ত্তী হইয়া অতি বিনীত ও বিনম্র ভাবে অঞ্জলি বদ্ধ করতঃ বলিতে লাগিলেন, জননি! যাহারা অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া নিয়তই সংসার পথে পরিভ্রমণ করে, তাহাদের দুঃখের সীমা ও ইয়ত্তা নাই। সেই কারণে আমি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া ঐ পথের অবসান ইচ্ছা করিয়াছি। আপনি প্রসন্না হইয়া অনুমতি প্রদান করুন। শুনিবামাত্রই তাঁহার ভয় ও শোক ও উদ্বেগ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল, তিনি ক্ষণকাল মৃতপ্রায়া হইয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, বৎস! তুমি যে চতুর্থাশ্রমের ইচ্ছা করিতেছ, তাহা পরিত্যাগ কর। তোমার ঐ বুদ্ধি শীঘ্র অপনীত হউক। আগে গৃহস্থ হও, পুত্রলাভ কর, যাগযজ্ঞাদিদ্বারা দেবতাদিগকে প্রসন্ন কর, পশ্চাৎ তুমি যতি হইও। বৎস! তাহাই সজ্জনদিগের চিরসেবিত ধর্ম্ম। বৎস! তুমি ব্যতীত আমার আর দ্বিতীয় অবলম্বন নাই। এ অবস্থায় তুমি যদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাও, তাহা হইলে নিশ্চিত আমি জীবিত থাকিব না। তোমার প্রস্থানের পর আমার মৃত্যু হইলে, কে আমার অন্ত্যেষ্টি কার্য্য করিবে, তাহাও ভাবিয়া দেখ। সতী শঙ্কর-মাতা শঙ্করসকাশে রোদন

সহকারে ঐরূপ ঐরূপ কথা বলিতে লাগিলেন, শোকনাশন শঙ্করও অনুরূপ প্রবোধ-প্রদান-দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। শঙ্কর এদিনও সন্ন্যাসানুমতি পাইলেন না। পরদিন প্রভাতাগমে তাঁহার বৈরাগ্য দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল, তিনি মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, এখন আমার কর্ত্তব্য কি? কোন্ বিপ্রের উপদেশ অনুসারে ইনি আমাকে সন্ন্যাসানুমতি প্রদান করিবেন, তাহা বোধ হয় না; অথচ আমার সন্ন্যাস ইহাঁর অনুমতি-সাপেক্ষ। এই স্থলে শঙ্করবিজয়-প্রভৃতি গ্রন্থের লিখিত কথা এই যে, শঙ্কর ঐরূপ চিন্তার পর এক অদ্ভুত কৌশল উদ্ভাবন করিয়া জননীর নিকট হইতে সন্ন্যাসানুমতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৌশলটী এইরূপ—

শঙ্কর সেই দিন মধ্যাহ্ন সময়ে স্নানার্থ নিকটস্থ নদীজলে অবতরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ও জননীকে ডাকিতে লাগিলেন। "মা, শীঘ্র আইস, এক বলিষ্ঠ কুম্ভীর আমার পদদ্বয় ধরিয়াছে।" শঙ্কর-জননী ভর্ত্তা গৃহ হইতে পুত্রের বৈদিনধ্বনি শুনিতে পাইলেন, এবং ব্যাকুলিতা হইয়া নদীতীরে গিয়া দেখিলেন, পুত্র জলমগ্ন ও কুম্ভীর-গ্রস্ত। তিনি তখন নিরুপায় জ্ঞানে পুত্রের জীবনের প্রতি হতাশ হইয়া পাগলিনীর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন, জলমগ্ন শঙ্করও জলে থাকিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শঙ্কর বলিলেন, মা! কে যেন আমায় বলিতেছে, তোমার জননী যদি তোমাকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দেন, তাহা হইলে এই কুম্ভীর তোমাকে এখনই ছাড়িয়া দেয়।

সতী শঙ্কর-মাতা তখন জ্ঞানশূন্যা, পুত্রের জীবন রক্ষাই তৎকালের প্রার্থনীয়, সুতরাং তিনি উক্ত দুঃসহ বাক্যকেও মৃত-সঞ্জীবন-মন্ত্র অপেক্ষা অধিক হিতকর বিবেচনা করিলেন এবং ভাল মন্দ চিন্তা না করিয়াই সন্ন্যাস-গ্রহণের অনুমতি দিলেন। এদিকে কুম্ভীরও শঙ্করকে ছাড়িয়া দিল, শঙ্করও সবেগে তীরোপরি উঠিয়া শিশুসুলভ ভয়-কম্পাদির অভিনয় করিতে লাগিলেন। পরে জননী-সহ গৃহে প্রত্যাগত হইয়া নানা কথায় জননীর মনস্তুষ্টি করিতে লাগিলেন এবং সন্ন্যাসোপযোগী প্রসঙ্গের অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। অবসর প্রাপ্তে বলিলেন, মা! আপনার অনুমতিক্রমে যেই আমি মনে মনে সন্ন্যাস সংকল্প করিলাম, অমনি দুরন্ত কুম্ভীর আমাকে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু মা, আমি বিধিপূর্ব্বক সন্ন্যাস সংকল্প করিয়াছি, সেজন্য এখন আমি গৃহী নহি। তাই বলিতেছি, এখন যাহা কর্ত্তব্য তাহা আমাকে উপদেশ করুন। শুনিয়া শঙ্কর মাতার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি কিয়ৎক্ষণ চিত্রলিখিতের ন্যায় থাকিয়া অতি কষ্টে এইমাত্র বলিলেন, আমি আর কি বলিব, তুমি আপনিই আপনার কর্ত্তব্য বিচার কর। শঙ্করও হৃষ্টচিত্ত হইয়া বলিলেন, আমি তাহাই করিব, কিন্তু মা! আমার আর এক অনুরোধ আছে। আমি আপনাকে ত্যাগ করিয়া গেলে আপনার অন্নাচ্ছাদনের কষ্ট হইবে, সে আশঙ্কা করিবেন না। যাহারা আমার ত্যাজ্য সম্পত্তি গ্রহণ করিবে, তাহারা অন্ততঃ লোকাপবাদ ভয়েও আপনার রক্ষণাবেক্ষণাদি

নবাগত শঙ্কর ইহাঁকে গুরুত্বে বরণ করিলে, যোগীন্দ্র গোবিন্দনাথ শঙ্করকে "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যচতুষ্টয় উপদেশ করিলেন এবং শঙ্করও উক্ত মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গুরুসকাশে বাস করিতে লাগিলেন। শঙ্কর ইহাঁরই নিকট ব্যাসকৃত শাস্ত্রের নিগূঢ়ভাব ও অদ্বৈতমতের পূর্ণ ব্যাখ্যা বিদিত হন। যদিও ইনি নিজ মহত্তাত প্রজ্ঞার সাহায্যে সমস্তই বিদিত ছিলেন, তথাপি, শাস্ত্রমর্য্যাদা-সংরক্ষণার্থ বিদিত বিষয় পুনর্বিদিত হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, শঙ্কর গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই ঋতুদ্বয় ব্যতীত আর অধিক কাল গোবিন্দনাথাশ্রমে বাস করিতে পারেন নাই। বর্ষার অবসানেই তাঁহাকে গুরুকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া কাশীক্ষেত্রে গমন করিতে হইয়াছিল। শঙ্কর বর্ষাঋতুর অবসানে গুরুপদাম্বুজ ধ্যান করিয়া কাশীক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং কিয়দ্দিবস পরেই শিবনগরী কাশী তাঁহার নয়নগোচর হইল।

সে সময়ে কাশীর নগরসন্নিবেশ এখনকার মত ছিল না; অন্যরূপ ছিল। কাশীর যে অংশ এখন জনতায় পরিপূর্ণ, সে অংশ তখন অরণ্যময় ছিল। কাশীর যে অংশে এখন শত শত অট্টালিকা, সেই অংশে তখন বন্যীয় বৃথ, তাপসগণের আশ্রম, কদম্বের বন ও পিপ্পল বৃক্ষের শ্রেণী শোভা বিস্তার করিত। যে অংশে এখন সারনাথ নামক বিজ্ঞান ও ইতরলোকের বাসস্থান, শঙ্করের সময়ে সেই অংশে প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইত। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বৌদ্ধগণ ঐ অংশে নগর স্থাপন করিয়াছিল। আচার্য্য শঙ্করও এবার ঐ অংশে থাকিয়া বহির্ধর্ম্মের বিষয় জ্যোতিঃ বিস্তার করিবার কামনা করিলেন; বাসের জন্য এক বটবৃক্ষের তলদেশ মনোনীত করিলেন। চোলদেশের সনন্দননামা জনৈক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ এই শঙ্করদাস বটমূলে আসিয়া শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। হিংসুখ ও আনন্দগিরি প্রভৃতি কয়েকজন দিগ্বিজয়ী এই স্থানে বাস করিতেন, তাঁহারাও আজ প্রোক্ত বটমূলে আসিয়া শঙ্করের শিষ্য হইলেন। যিনি শঙ্করের প্রথম শিষ্য, যাঁহার নাম সনন্দন, তিনিই কিছুকাল পরে পদ্মপাদাচার্য্য নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

কিছুকাল ঐরূপ কাশীবাসের পর শঙ্করের গুরুর আদেশ মনে পড়িল, তদনুসারে তিনি সূত্রভাষ্য প্রণয়নের জন্য ব্যগ্রচিত্ত হইলেন। ভাবিলেন, ব্যাসের প্রিয়তম স্থান বদরিকাশ্রম, সেই স্থানে থাকিয়া সূত্রভাষ্য প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। ঐরূপ স্থির করিয়া তিনি অনতিবিলম্বে শিষ্যসহ বদরিকাশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দিবস পরেই বদরিকাশ্রম তাঁহাদের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল। এই স্থানের রমণীয়তা প্রভৃতি বর্ণনা করা এ প্রবন্ধের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক; সেই জন্য তাহা উপেক্ষিত হইল।

শঙ্কর শিষ্যসহ উক্তস্থানে বাস করিয়া প্রথমতঃ তত্রত্য যোগীদিগের ও বিবেকীদিগের সহিত বেদান্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও শব্দ-তাৎপর্য্যাদি আলোচনা করিলেন। পরে ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের উপর উৎকৃষ্ট ভাষ্য রচনা করিলেন। শঙ্কর যখন সূত্রভাষ্য রচনা করেন, তখন তাঁহার বয়স দ্বাদশ বৎসর। সূত্রভাষ্য সমাপ্ত হইলে ঐ স্থানে থাকিয়াই

তিনি ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদক ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক, এই দশ উপনিষদের প্রসন্নগম্ভীর ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট ভাষ্য প্রণয়ন করিলেন। তৎপরে মহাভারতের সারস্বরূপ ভগবদ্গীতার, সনৎসুজাতীয় অধ্যায়ের ও বিষ্ণু সহস্রনামের ভাষ্য রচনা করিলেন। তদ্ভিন্ন নৃসিংহতাপনী ব্যাখ্যা ও মুমুক্ষুদিগের পাঠোপযোগী উপদেশগ্রন্থাবলী, আত্মানাত্মবিবেক, মহাবাক্যার্থাদর্শ, দক্ষিণামূর্ত্তি স্তোত্র, প্রকরণপঞ্চিকা বিবেক, কৃতকৃত্যতাষ্টক প্রভৃতি প্রকরণ গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ঐ সকল পুস্তক অদ্যাপি পঠিত হইতেছে। তদ্ভিন্ন কৃত শিব, বিষ্ণু, গণেশ ও দুর্গা প্রভৃতি দেবদেবীর স্তোত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সেই স্তোত্র দৃষ্টে কেহ কেহ তাঁহাকে শাক্ত, কেহ শৈব, কেহ বৈষ্ণব, কেহ গাণপত্য এবং কেহ বা সাকারোপাসক বলিয়া পরিচয় দেন।

উপরে যে বিষ্ণু-সহস্রনাম ভাষ্যের কথা বলা হইল, দণ্ডী-সন্ন্যাসীরা প্রথমে তাহা গৌড়পাদ মুনির অনুমতিক্রমে প্রচার করেন। গৌড়পাদ তখন হিমগিরির নিকটে বসিয়া বিরক্তভাবে কালযাপন করিতেছিলেন। শঙ্কর মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভাষ্যপরিশেষে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলে গৌড়পাদ তাঁহার বুদ্ধি ও জ্ঞান পরীক্ষার পর স্থির করিলেন তিনি উপযুক্ত অধিকারী কি না। বুদ্ধিমান শঙ্কর, একখণ্ড পুস্তক তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন তুমি যদি এই পুস্তকের ভাষ্য প্রস্তুত করিয়া আমায় দেখাইতে পার, তাহা হইলে তোমাকে মাণ্ডুক্যোপনিষদের তাৎপর্য্য বলিতে পারি। আচার্য্য শঙ্কর দেখিলেন পুস্তক খানি বিষ্ণুসহস্রনামের পুস্তক। তিনি কতিপয় দিবসের মধ্যে অতি সারবদ্ভাষ্য রচনা করিয়া পরমগুরু গৌড়পাদের করে অর্পণ করিলে, তিনি বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়া শঙ্করকে নিম্নলিখিত মাণ্ডুক্যকারিকা পুস্তক প্রদান করিলেন, এবং বলিলেন, তুমি এখানা ভাষ্য তোমার মাণ্ডুক্যার্থ নিরূপণে স্ফূর্ত্তি পাইবে। ইহারই পরে শঙ্কর মাণ্ডুক্য উপনিষদের ও গৌড়পাদ-প্রদত্ত সেই মাণ্ডুক্য-কারিকার উৎকৃষ্ট ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন।

পুস্তক-প্রণয়ন কার্য্য শেষ হইলে, অমন যে রমণীয় বদরীবিল্ব, তাহাও তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে পারিল না। তিনি ভারতের সর্ব্বত্র অদ্বৈতবিদ্যার প্রচার ও তাৎকালিক দুষ্ট মতসমূহ নিরাকরণ করিবার জন্য ব্যগ্রচিত্ত হইলেন। অনন্তর অনতিবিলম্বে দিগ্বিজয়ার্থ প্রস্থানোদ্যোগী হইলেন। প্রথমে কাশী, পরে বিন্ধ্যাচল, তৎপরে প্রয়াগে কুমারিল ভট্টের শিষ্য মণ্ডন মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ভট্টপাদ অর্থাৎ ভট্টকুমারিল যে সময়ে প্রয়াগ তীর্থে তুষানলে জীবন বিসর্জ্জন দিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার সহিত শঙ্করের সাক্ষাৎকার হয়। সেইজন্য তাঁহার সহিত কোনরূপ বিদ্যা-বিবাদ ঘটনা হয় নাই। বিশেষতঃ ভট্টপাদ সেই মরণ সময়ে গুরুর মত শুনিয়া ও তাঁহার কৃত সূত্রভাষ্য যথাযথ দৃষ্টি করিয়া, [illegible] প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং কুমারিলের দীক্ষিত হইয়া আপনি [illegible]

করিয়াছিলেন। ভট্টপাদ তুষানলে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছিলেন কেন? সে প্রস্তাব স্বতন্ত্র। প্রবন্ধ বিস্তৃতিভয়ে সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল। ভট্টপাদের মৃত্যু হইলে শঙ্কর তাঁহারই নির্দ্দেশক্রমে বিশ্বরূপের অথবা মণ্ডন মিশ্রের বসতিস্থান মাহিষ্মতীনগর গমন করিয়াছিলেন। এশিষ্য শঙ্কর কিয়দ্দিবস গমনের পর নর্ম্মদাতীরস্থিত মাহিষ্মতী পুরী প্রাপ্ত হইলেন। সে দিন তাঁহারা নগরপ্রান্তস্থ কোন এক আম্র কাননে থাকিলেন, পরদিন প্রাতে মণ্ডনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। এই মণ্ডনের সহিত শঙ্করের বহুদিন-ব্যাপী বিদ্যাবিবাদ চলিয়াছিল। অবশেষে মণ্ডন পরাভূত হইয়া পূর্ব্বকৃত পণ বা প্রতিজ্ঞা অনুসারে গার্হস্থ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়া শঙ্করের অনুগামী হন। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর মণ্ডন সুরেশ্বর নামে বিখ্যাত হন এবং শঙ্করকৃত সূত্রভাষ্যের উপর যুক্তিপূর্ণ বার্ত্তিক রচনা করেন। শ্রোতৃবর্গ স্মরণ করুন, ইনিই সেই প্রণবিপ্রণেতা বার্ত্তিককার।

শাঙ্করী ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায়, মণ্ডনপত্নী সরস্বতীর সহিতও শঙ্করের বিদ্যাবিবাদ হইয়াছিল। মণ্ডন ও সরস্বতী পরাজয়ের পর তাঁহার তীর্থপর্য্যটনেচ্ছা বলবতী হয়। তাহাতে তিনি পর [illegible] র-গোকর্ণ, হরিহরক্ষেত্র, কৃষ্ণবিষ্ণুভবন ও [illegible] প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। [illegible] বলীক্ষেত্রে ভাস্কর নামে এক পণ্ডিত বাস করিতেন। তাঁহার [illegible] নী ও বাণভট্ট একটী পুত্র ছিল। শঙ্করসমাগমে তাহার ব্রহ্মবিদ্ [illegible] হওয়ায় ভাস্কর অগত্যা তাঁহাকে শঙ্কর-সকাশে প্রেরিত করিয়া [illegible] ভাস্কর-পুত্রই শঙ্করের হস্তামলকনামা শিষ্য। মহাপুরুষ শঙ্কর এই [illegible] পুণ্যাত্মন সনন্দন প্রভৃতির সহিত শ্রীবলীক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণ-[illegible] ধানে এক উৎকৃষ্ট পরিব্রাজকাবাস প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই [illegible] গেরি মঠ নামে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই সময়েই তাঁহার [illegible] জননীর মৃত্যু হয়। জননীর মৃত্যুকালীন পরিচর্য্যা পূর্ব্বাশীকার করা হওয়ায় শঙ্কর [illegible] বিলম্বে আসিয়া মৃত্যু জননীর নিকটস্থ হন এবং তাঁহার দেহান্ত হইলে তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিক [illegible] ক্রিয়াদিও পূর্ব্ব-প্রতি [illegible] অনুসারে নির্ব্বাহ করেন। ইহারই পরে তিনি সুধন্বা নামক [illegible] রবল অবলম্বন করিয়া নানাদেশীয় বৈতণ্ডবাদী ও অদ্বয়বাদী বৌদ্ধ-[illegible] পণ্ডিতদিগকে পরাজয় করিতে প্রবৃত্ত হন। প্রথমে রামেশ্বর ও রাজনাথ প্রদেশ, পরে [illegible] চোল, দ্রাবিড়, কা [illegible], কর্ণাট এবং পুনর্ব্বার গৌকর্ণ প্রদেশে গমন করিলেন। এবার এই স্থানে তাঁহার শৈব নীলকণ্ঠের সহিত ঘোরতর বিদ্যাবিবাদ, অবশেষে নীলকণ্ঠের পরাভব-ঘটনা হয়। নীলকণ্ঠ-পরাভবের পর তিনি সৌরাষ্ট্রাদি দেশস্থ বিদ্যাভিমানীদিগকে পরাভূত করিয়া কৃষ্ণ [illegible] রী দ্বারকায় গমন করেন। তৎস্থানীয় পণ্ডিতাভিমানী পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবদিগকে পরাভূত করিয়া তত্রস্থ অধিবাসীদিগের প্রতি বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি কিরূপ, তাহা উপদেশ করিয়াছিলেন। শঙ্করের কৃত একখানি ভক্তিবাদের গ্রন্থও আছে। মধুসূদন সরস্বতী তদবলম্বনে ভক্তিরসায়ন নামে এক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। শঙ্করের ভক্তিগ্রন্থ

আবির্ভাবে সে ভাবের অপগম অর্থাৎ ঈশ্বরাস্তিকতা পুনঃ সংস্থাপিত হইয়াছিল। বৌদ্ধেরা উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্রকে অধঃপাতিত ও বিপ্লবপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিল, শঙ্করের আবির্ভাবে তাহার পুনরুজ্জীবন হইয়াছিল। বৌদ্ধেরা সংস্কৃতভাষাকে নষ্টকল্প করিবার চেষ্টা করিতেছিল, পানি প্রভৃতি অপভাষাদ্বারা তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিতেছিল, ভট্টকুমারিল ও শঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়া তাহারও প্রতীকার করিয়াছিলেন। কুমারিল, শঙ্কর ও বাৎস্যায়ন প্রভৃতি কয়েকজন মহাপুরুষের পূর্ব্বে অধ্যাত্মবিজ্ঞান বিচারের উপযুক্ত ভাষা অতি সংকীর্ণ অবস্থায় ছিল, পরন্তু ইহাঁদেরই আবির্ভাবে তাহার অঙ্গপুষ্টি ও বিশেষ বিস্তৃতি হইয়াছে। অবিশ্রান্ত কর্ম্ম, নিরন্তর সংসারাসক্তি, এবং চিরকালের মত কর্ম্মত্যাগ, এ সকলের সমাবেশ প্রণালী শঙ্কর মহামতির দ্বারাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এ সকল যদি উপকার বলিয়া গণ্য হয় ত উপকার হইয়াছে এবং অপকার বলিয়া গণ্য হইলে অপকারই হইয়াছে।

ঈদৃশ প্রসঙ্গে এক দিন মৃত রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সহিত আমার এইরূপ কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, মহাশয়, শঙ্কর বেদান্ত-প্রচারের জন্য এত ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন কেন? বেদান্তে এমন কি উপকার আছে? আপনি মুক্তির কথা বা পরলোকের কথা বলিবেন; কিন্তু তাহা আমার জিজ্ঞাস্য নহে। আমার জিজ্ঞাস্য—কোনরূপ দৃষ্ট উপকার আছে কি না। তদুত্তরে আমি "কৌতুকপ্রবৃত্তস্য ফলাদর্শনাৎ" ইত্যাদি বাক্য অনুবাদ করিয়া বলিলাম,—যাহারা কৌতুক নিবৃত্তির জন্য বেদান্ত পড়ে, অথবা যাহারা বিদ্যাখ্যাতি বিস্তারের জন্য বেদান্ত পড়ে, তাহারা কোনরূপ দৃষ্ট উপকার পায় বলিয়া আমার বোধ হয় না। কিন্তু যাহারা তদুপদিষ্ট পথে চলিবার জন্য পড়ে, তাহারা অল্পাধিক দৃষ্ট উপকার পায় বলিয়া আমার বিশ্বাস। শোক, সন্তাপ, লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা, পৈশুন্য, আত্মম্ভরিতা, স্বার্থপরতা ও অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি রিপুবর্গ তাহাদিগকে দুর্দ্দমাক্রান্ত আক্রমণ করিতে পারে না। আমার বিবেচনায় তাহাই তাহাদের দৃষ্ট উপকার।

তুলিয়া তিনি বলিলেন, জ্ঞানের বিস্তৃতি যে শোক-সন্তাপাদির ও হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতির অল্পভাব কারণ, তাহা আমি আমাদের স্ত্রীলোকদিগের দৃষ্টান্তে বিশ্বাস করি। পুত্র-কন্যাদির বিনাশ ও ধনের অপহার হইলে স্ত্রীলোকেরা যত অভিভূত হয়, আমরা তত অভিভূত হই না। হিংসা, দ্বেষ, পৈশুন্য, স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতা প্রভৃতি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যত প্রবল, আমাদের মধ্যে তত প্রবল নহে।

আমি বলিলাম, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমি অবশ্যই বলিতে পারি, বেদান্তদ্বারাও দৃষ্ট উপকার পাওয়া যায়। কেন না ঐ সকল উপকার বেদান্তোক্ত জ্ঞানের অর্জ্জন ব্যতীত অন্যান্য অর্জ্জনদ্বারা পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। কাহার কাহার ধনের তৃপ্তিতে শোকের সঙ্কোচ হইতে দেখা যায় বটে; কিন্তু হিংসা দ্বেষ প্রভৃতির সঙ্কোচ

অপব্যবহারের সঙ্কেত দৃষ্ট হয়। বজ্রসূচীর অষ্টাবক্রীয় উপাখ্যানে দেখা যায়, জিষ্ণু অষ্টাবক্র জনক রাজার যজ্ঞসভায় "সোঽহং শ্রদ্ধা ব্রাহ্মণানাং সকাশে ব্রহ্মাদ্বৈতং কথয়িষ্যে ভাগতোঽস্মি" এইরূপ বিস্পষ্ট কথায় ব্রহ্মাদ্বৈত প্রতিপন্ন করিবার জন্য গিয়াছিলেন। অতএব, শঙ্করের ধর্ম্মমতই বলুন, আর দার্শনিক মতই বলুন, কিছুই নূতন নহে, সমস্তই পুরাতন। তাঁহার সন্ন্যাস "ন ধনেন ন প্রজয়া, ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" ইত্যাদি শ্রুতিমূলক, তাঁহার জ্ঞানসাধনা "দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা" "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদি উপনিষদ্‌মূলক, তাঁহার নির্ব্বিশেষবাদও বাদ "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং" ইত্যাদি শ্রুতিমূলক, তাঁহার নিরাকার বাদ "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বং" "অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা" ইত্যাদি উপনিষদ্‌মূলক, তাঁহার জীবব্রহ্মসিদ্ধান্ত "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইত্যাদি শ্রুতিমূলক। তাঁহার একজীববাদ "স ঐক্ষত বহুস্যাং" ইত্যাদি বেদমূলক, তাঁহার মায়াবাদ "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব" "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি" "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" ইত্যাদি বেদমূলক, তাঁহার অভিব্যক্তিনিমিত্তোপাদান বাদ "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ" ইত্যাদি শ্রুতিমূলক, এবং তাঁহার পরিণামবাদ "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং" ইত্যাদি উপনিষদ্‌মূলক। অধিক কি বলিব, শঙ্করের এমন একটিও কথা নাই যাহা অবৈদিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তাই আমার বিশ্বাস—শঙ্করের ধর্ম্মমত ও দর্শন প্রাচীন ধর্ম্মমতের ও দর্শনসিদ্ধান্তের বিস্তৃতিমাত্র।

৩। তৃতীয় কথা—শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা কেন? "মায়াবাদমসৎ শাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব তৎ। ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা॥" শ্লোকটীর মূল্য কি? প্রামাণ্য কিরূপ? তাহাও জানি না। আমি মাত্র এই বুঝি যে, ব্যাসের পুরাণে বুদ্ধের ও শঙ্করের মতোন্মেষ যত অসম্ভব নহে, নামোন্মেষ তত অসম্ভব। যাহাই হউক, অবশ্য কোনও কোন কারণ আছে, না থাকিলে ঐ কথা উঠিবে কেন। কিন্তু সে কারণ আমার অবিদিত। আমি দেখিতেছি শঙ্কর বৌদ্ধের প্রতেদ ব্রাহ্মণ হওয়া প্রতেদের অনুরূপ। বৌদ্ধেরা বর্ণাশ্রমবিধানের বিরোধী, কিন্তু শঙ্কর তাহার অনুরোধী; বৌদ্ধেরা দেবদেবী পূজার নিষেধক, কিন্তু শঙ্কর তাহার বিধায়ক; বৌদ্ধেরা জাতিভেদ ব্যবস্থার বিপক্ষ, শঙ্কর তাহার সপক্ষ; বৌদ্ধদিগের নীতি ও আচার অবৈদিক, শঙ্করানুমোদিত নীতি ও আচার বৈদিক। এইরূপ দর্শনাংশেও প্রভেদ দৃষ্ট হয়। যথা—শঙ্কর প্রমাণ দুই, কিন্তু বৌদ্ধ বলেন "আবরণাভাবোহি আকাশঃ" আর সার্ব্বভৌমের আমরা আকাশ শব্দে ব্যবহার করি সত্য, পরন্তু আকাশ কোন রাখিলেন, শঙ্কর পদার্থ নহে, পরন্তু শঙ্কর দর্শনে উহা এইরূপ বলা যে, দ্বিপ্রমাণবাদী, প্রত্যক্ষ ও অনুমান। কিন্তু শঙ্কর ষট্‌প্রমাণবাদী প্রত্যক্ষ কারণ এই যে, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি। শঙ্কর বলেন জগৎপ্রপঞ্চ পা হে। যখন বেদের

ন জানি

শঙ্ক

ক্ষণ। "একরূপা ঈশ্বরানুভূতিরই ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে উপাসনাপর্য্যা। ... ইত্যাদি ভাষ্যে কথিত হইয়াছে। এইরূপ বহুস্থানে দর্শনকারগণ বিশেষ জ্ঞানপ্রাধান্যবাদী হইয়াছিলেন। ইহাঁদের মতে ভক্তি কর্ম্মবিশেষ; মুখে কখন ভক্তি থাকিলেও কর্ম্মবিশেষ, সেজন্য তাহার মোক্ষজনকতা। প্রাকৃতি অহেতুকী ভক্তি বলে, তাহা নিষ্কাম কর্ম্মের সহিত এবং যাহাকে সাহচর্য্যে সকাম কর্ম্মের সহিত সমান। সকাম ভক্তি সকাম কর্ম্মের ন্যায় মুক্তির বাধক। ভক্তি নিষ্কাম কর্ম্মের ন্যায় মুক্তির জনক। নিষ্কামকর্ম্ম আগে চিত্তশুদ্ধি উৎপাদন করে, বৈরাগ্য জন্মায়, তৎপরে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় করায়। এইরূপ, নিষ্কাম ভক্তিও আগে ভজনীয় পদার্থে নিলয় অর্থাৎ একতান করায়, পরে তাহাকে তন্ময়ী ভাবে পরিণত করিয়া মুক্তিকারী হয়। তন্ময়তা ও তত্ত্বজ্ঞান প্রায় একই কথা। চিত্তকে নিলয় বা একতান করিতে পারিলে, তাদৃশ চিত্তে যে চিন্তনীয় পদার্থবিষয়ক সম্যক্ জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, আমরা গণিত প্রভৃতি লৌকিক বিষয়েও অনুভব করিয়া থাকি। তেমনি ভক্তি বিষয় সম্বন্ধেও আমরা একতান হওয়ার পর বুঝিয়া থাকি। অতএব, মুক্তি কর্ম্মের ফল নহে, পরন্তু জ্ঞানেরই দাসী। যাহাদের ভক্তি জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হয় না, তাহারা মুখ্যমুক্তি নির্ব্বাণ না হইলেও ভাবনার বলে সাক্ষপ্য সালোক্যাদি গৌণমুক্তি ভাবীর প্রভাবে সাক্ষপ্য মুক্তি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠাদিতে বাস করিতে পারে। মুক্তিবিষয়ে দর্শনকারদিগের মত এই যে, যাহা মুখ্য মুক্তি তাহা অপুনরাবৃত্তি সাক্ষপ্য সালোক্যাদি অপুনরাবৃত্তিযুক্ত নহে বলিয়া তাহা গৌণ। অর্থাৎ যুগ ভগবৎপার্ষদ জয়বিজয় প্রভৃতির পতন বৃত্তান্ত মনে করিলে, তাহারা বৈকুণ্ঠে, সালোক্যাদি মুক্তি কি স্বর্গবিশেষ। ভক্তিসম্বন্ধে অপর কথা এই যে, ভক্তি জ্ঞানের নহে, পরন্তু অনুভবের জিনিষ, সুতরাং এক প্রকার মনোবৃত্তির প্রবাহ, সেজন্য তাহা অন্য জাতীয়। প্রভেদ এই যে, ভক্তির বিষয় বা আলম্বন এ ভক্তি উৎকর্ষাপকর্ষ প্রভৃতি জ্ঞানপদবাচ্য মনোবৃত্তির বিষয়াদি হইতে ভিন্ন। সে সকল মনোবৃত্তি সাধারণ সে সকল বৃত্তি বিচারপরিশোধিত প্রমাণমূলক। যাহা ভক্তি নামে পরিচিত, তাহা উত্তমতাবোধমূলক। উত্তমতাবোধ শ্রেণীদ্বয়ে বিভক্ত। এক ভজনীয় পদার্থের লীলা মাধুরী প্রভৃতি সাক্ষাৎ অনুভবের পর ... অন্যে সকল ভক্তি অপরোক্ষ ভাবে জন্মিয়া থাকে। প্রথম প্রকারের ভক্তি জ্ঞানমুক্তি ... একান্তের ভক্তি কেবলা নামে প্রসিদ্ধ। কেবলা ভক্তির ভক্তিত্ব ... ও অন্ধবিশ্বাস; অপ্রত্যক্ষ বিষয় ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে ... থাকে, পরে প্রত্যক্ষে তাহা জ্ঞানমুক্তিতা হইয়া দাঁড়ায়। যাহাদের ভক্তি কেবলা ... তাহারাই সোপানারোহণের ন্যায় ভক্তিপথে গমন করিয়া মোক্ষধামে গমন করে। যাহাদের ভক্তি চিরকালই কেবলা থাকিয়া যায়, তাহারা মোক্ষধামে গমন

র্থাৎ তাহাদের নির্ব্বাণমুক্তি হয় না। হয়ও না, তাহারা তাহা চাহেও না। এ বিষয়ে
র অনেকশত যুক্তিবাক্য থাকিলেও প্রবন্ধবিস্তারের ভয়ে পরিত্যক্ত হইল। কথা এই
র্শনকারগণ, বিশেষতঃ শঙ্কর প্রকৃত মুমুক্ষু বৈরাগ্যবান্ অধিকারীদিগের জন্য জ্ঞান-
স্পৃশক পথ পরিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। সেজন্য তাঁহাদের দর্শনে ভক্তিপ্রাধান্য
পায় নাই। মধুসূদন সরস্বতীও জ্ঞানযোগের ও ভক্তি-যোগের বিভিন্ন অধিকারী নির্দ্দেশ
ি বলিয়াছেন, "যাহাদের চিত্ত অত্যন্ত কোমল, সহজে গলিয়া পড়ে, যাহাদের বিশ্বাস
র ও প্রমাণ চাহে না, যাহাদের মতি বৈরাগ্যের দিকে আদৌ যায় না, তাহারাই
ি পথের পথিক হৌক; আর যাহারা বুদ্ধিপরীত, তাহারা জ্ঞানপথে গমন করুক।"
শঙ্করের গুপ্তবৌদ্ধত্বের অনুমাপক চতুর্থ কারণ অনুশীলিত হইল। এক্ষণে দেখা
ক পঞ্চম কারণ অনুশীলনে কি পাওয়া যায়।

পঞ্চম কারণ এই যে, শঙ্কর প্রত্যক্ষ জগৎকে মিথ্যা বলেন।

বোধ হয় শঙ্কর বুদ্ধিসাহিত্যের, জগৎ দেখিতে যে প্রকার ইহার তত্ত্ব বা রহস্য সে প্রকার
হ। তত্ত্ব বা রহস্য অন্য প্রকার। কেননা যখনই চিন্তা ও অনুসন্ধান করা যায়,
তখনই দেখিতে পাওয়া যায় প্রত্যেক দৃশ্য আপাত দৃষ্টিতে একপ্রকার, পরন্তু বিচার-
ষ্টিতে অন্যপ্রকার। সুতরাং মনে হয়, দৃশ্যপ্রপঞ্চের ঠিক স্বরূপ কি? চক্ষু ত্বক্ রসনা
ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা নির্ব্বাচিত বা নির্ণীত হইবার নহে। ইন্দ্রিয়গণ ব্যবহারিক প্রমাণ
হইলেও পারমার্থিক প্রমাণ নহে। কারণ এই যে, ইন্দ্রিয়গণ ব্যবহার চলিবার উপ-
যোগী প্রত্যেকটী সামান্যাকারের জ্ঞান জন্মাইয়া ব্যবহার নির্ব্বাহ করিয়া দেয়; অবশ্য
তাহাদের শক্তি বা স্বভাব; পরন্তু সে সকলের যাহা ঠিক্ স্বরূপ, তত্ত্ব বা রহস্য, তাহার
নি জন্মায় না। এই মর্ম্মে শ্রুতি—

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাক্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।"

মনে করুন আমরা চক্ষুঃ ক বিতস্তিপ্রমাণ দেখি, তাই বলিয়া কি তাহা বিতস্তি-
ণ? তাহা নহে। তাহা অনেক শত যোজন বিস্তৃত। চক্ষু আকাশকে কটাহতলবৎ
ল ও নীলবর্ণ দেখে, অথচ আকাশের স্বরূপ বা তত্ত্ব তাহা নহে। চক্ষু মরুস্থলে
প্রপঞ্চ দেখে; অথচ তাহা জল নহে, তাহা সৌর কিরণ। চক্ষু স্বপ্নদর্শির
লকালক দেখে না, তাই বলিয়া তাহার নাস্তিতা হয় না। এইরূপ বিষয়ে
ালোচিন্তকগণের কথা এই যে, অতিদূর, অতিসামীপ্য, ইন্দ্রিয়বৈধ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের
পূর্ণতা, বিকলতা ও শক্তিপ্রতিরোধ, মনের অনবস্থিতি, দৃশ্যের সূক্ষ্মতা ও স্থিতিবৈপরী-
াদি দোষে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সর্ব্বদাই বিপর্য্যস্ত। এমন কি যাহা আছে, তাহাকে নাই
লয়া এবং যাহা নাই তাহাকে আছে বলিয়া প্রতীতি জন্মায়। ইন্দ্রিয়গণের আর
ক দোষ এই যে, তাহারা পশুপক্ষ্যাদিগণের কথা দূরে থাকুক, মনুষ্যগণের
ধ্যেও অসমান, অর্থাৎ সমশক্তিক নহে। সেই কারণে আমি যে প্রকার দেখি, তুমি

...পদে বেদবাক্য বলে। যাঁহারা ভক্তিবাদের বেদমূলকত্ব বুঝিতে পারিবেন না। বেদে কর্ম্ম, উপাসনা ... সেই বিবিধ উপদেশ আছে। ... সংসারোন্মুখ ... মার্জ্জন করা ... অধিকারীর প্রতি ... ভগবদুক্ত মার্জ্জিতবুদ্ধি ও সংযতেন্দ্রিয় ... উৎপন্ন উত্তমাধিকারীর ... উপনিষদই বিহিত ... উপাসনা ... ভক্তির বহিরঙ্গে ... এবং বস্তুতে ... কাব্যের দৌহিত্র ... আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী ... মূর্ত্তি নাই, ... ভক্তিযোগ ... মুক্তি নহে। ... হয়, সমাধিস্থ ... তদ্গতচিত্ত, ... মুক্তিসাধন জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন নাম। ... কথা আলোচিত হইয়াছে। ... স্বাধীন, চুল্লী ও বহ্নি প্রভৃতি ... তেমনি, মুক্তির প্রতি ভক্তি ও তত্ত্বজ্ঞান ... তত্ত্বজ্ঞান তৎপ্রতি অসাধারণ কারণ। ... কার্য্য এবং পত্রপেটকের দ্বারা স্থালীর কার্য্য চলিতে পারে; কিন্তু বহ্নির কার্য্য ... পারে তাহা কিছুই নাই। তাহা নাই বলিয়াই কাষ্ঠ চুল্যাদি রাখিবার ... অসাধারণ কারণ। কাষ্ঠ চুল্যাদি সংযোগের অব্যবহিত পরে ... কিন্তু বহ্নি ... পরে তাহা নয়। ... কারণ বা পরম্পরা কারণ ... এইরূপ ভক্ত্যুদ্রেকের ... হয়, কিন্তু ... তাহা হয়। সেই জন্যই ... জ্ঞান সাক্ষাৎ ...

ভাবে মুক্তিকারণ বলা যায়, সে হিসাবে মুক্তিকারণ আরও অনেক আছে। অধিক কি বলিব, যে সকল মনোবৃত্তি শাস্ত্রান্তরে রিপু বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই সকল মনোবৃত্তিও তন্ময়ীভাব উৎপাদন দ্বারা ভক্তির ন্যায় মোক্ষ কারণ হইতে পারে। ভক্তদিগের উক্তিশাস্ত্রের একটী মাত্র শ্লোক বলিলে বোধ হয় অভিহিত বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ প্রদত্ত হইবে। যথা—

"কামাৎ গোপাঃ ভয়াৎ কংসঃ দ্বেষাৎ চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাৎ বৃষ্ণয়ো স্নেহাৎ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥"

গোপীরা কামের দ্বারা, কংস ভয়ের দ্বারা, শিশুপাল প্রভৃতি বিদ্বেষ দ্বারা, বৃষ্ণিবংশীয়েরা বৃষ্ণিবংশসম্বন্ধের গাঢ়ভাব দ্বারা, স্নেহের দ্বারা তোমরা অর্থাৎ বসুদেব দেবকী ও নন্দ যশোদা প্রভৃতি এবং ভক্তির দ্বারা আমরা অর্থাৎ অক্রূর প্রভৃতি মোক্ষভাজন হইয়াছে ও হইয়াছি। ভয়ের দ্বারাও তন্ময় হওয়ার দৃষ্টান্ত তৈলপায়িকা নামক গ্রন্থে। তৈলপায়িকা, ছাঁচ-পাকার ভয়ে এত অভিভূত হয় যে, তাহার চিত্ত কাচপোকা তন্ময় হইয়া পড়ে, ক্রমে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গও তৎসারূপ্য প্রাপ্ত হয়। শ্রোতৃবর্গ এখন শুনুন, ভক্তি মুক্তির প্রতি কিরূপ কারণ। ভক্তি যেমন ভক্তকে তন্ময় করিয়া তুলে, তেমনি, কামক্রোধাদিও ইষ্টা প্রাপ্ত হইলে কামুক প্রভৃতিকে তন্ময় করিয়া তুলে। ভক্তি যেমন তন্ময়তার দ্বারা পরিশেষে মোক্ষ কারণ হয়; তেমনি, কামক্রোধভয় প্রভৃতি মনোবৃত্তিও উপযুক্ত অবস্থায় তন্ময়তা উৎপাদন দ্বারা মোক্ষ কারণ হইয়া থাকে। তাহা না হইলে কংস প্রভৃতির মুক্তি হইত না এবং ঋষিও ঐরূপ বচন লিখিতেন না। আসল কথা, তন্ময়তা। তন্ময়তা সাধনের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে। নবীনভাবে ভজনও তন্ময়তা সাধনের উপায়বিশেষ। উপনিষৎ শাস্ত্রও ব্রহ্মোপাসককে ব্রহ্মতন্ময় করাইবার জন্য এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন।

"প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ॥"

অর্থাৎ ওঁকার যেন ধনুক, আত্মা অর্থাৎ জীব যেন শর, ব্রহ্ম যেন লক্ষ্য। উপাসক অপ্রমত্তভাবে ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে জীবরূপ শরদ্বারা বিদ্ধ করিবেন। শর যেমন তন্ময় হয়, তাহার ন্যায় তন্ময় হইবেন। শর লক্ষ্যমধ্যে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করিলে তাহাকে আর দেখা যায় না; সুতরাং তন্ময় হইয়াছে বলা যায়।

যোগশাস্ত্রকার পতঞ্জলি মুনিও "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" এই সূত্রের দ্বারা ভক্তি নামক ঈশ্বর প্রণিধানকে তন্ময়তাপত্তি নামক সমাধির বৈকল্পিক কারণ বলিয়াছেন। অর্থাৎ যেমন যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানে তন্ময়তাপত্তিরূপ সমাধি জন্মে, তেমনি, তাহা ভক্তিনামক ঈশ্বর প্রণিধানেরদ্বারাও জন্মে। পতঞ্জলির ঈশ্বরপ্রণিধানই ভক্তিমীমাংসার "ঈশ্বরে পরানুরক্তি-রিতি" এই সূত্রে অভিহিত হইয়াছে এবং উহারই ভক্তি, উপাসনা ও ধ্রুবানুস্মৃতি নামকত্ব রামানুজের "উপাসনং তাৎ ধ্রুবানুস্মৃতিদর্শনাৎ নির্বচনাচ্চ" "সেয়ং স্মৃতির্দর্শনসমান-

চক্ষু সে প্রকার দেখে না। একের দর্শনজ্ঞান অপরের দর্শনজ্ঞানের সহিত কদাচ সমান হয় না, কিছু না কিছু প্রভেদ থাকে,—প্রভেদ থাকে বলিয়াই তুমি যাহাকে সুন্দর সুন্দরী দেখ, আমি তাহাকে অসুন্দর অসুন্দরী দেখি। মনুষ্য, পশু ও পক্ষী প্রভৃতি সকলেরই চক্ষু দেখিবার জন্য বটে, কিন্তু সকলের দেখা সমান নহে। এমন অনেক পদার্থ আছে,—যাহাকে পশুরা একপ্রকার দেখে, আমরা আর একপ্রকার দেখি, আবার পক্ষীরা অন্য প্রকার দেখে। এমন যে আলোকময় সূর্য্যমণ্ডল, উল্লুকেরা তাহাকে অন্ধকারময় দেখে। যে অন্ধকারে আমরা কিছুমাত্র দেখিতে পাই না, তাহা অপেক্ষা অধিক অন্ধকারে বিড়াল প্রভৃতিরা দেখিতে পায়। এরূপ দর্শনবিপর্য্যয় দৃশ্য ও দর্শন-সাধন কারণকূটের ও দর্শন-প্রক্রিয়ার দোষেও ঘটিতে পারে এবং দৃশ্য পদার্থের দোষে ঘটিতে পারে; অর্থাৎ দৃশ্য পদার্থের যদি কোন নিয়মিত রূপ, গুণ, শক্তি, সামর্থ্য, আকার প্রকার না থাকে, সমস্তই যদি অনির্দ্দিষ্টস্বভাব হয়, তাহা হইলে দর্শন বিপর্য্যয়ে প্রভৃতি তাদৃশ অনির্দ্দিষ্টস্বভাবতাকেও কারণান্তর বলিতে পারি।

অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় বা দেখিতে পাওয়া যায়, বস্তু একই নিকট একপ্রকার, অপরের নিকট আর এক প্রকার। মনুষ্যের নি আবার পক্ষীর নিকট অন্যপ্রকার শক্তিসম্পন্ন। যে ভুণ্ডুভ (চোঁড়া নির্ব্বিষ, সেই ভুণ্ডুভ (চোঁড়া) সর্প গোখুরার [illegible] যায়—কোন্ও পদার্থের আকার প্রকার, পরিমাণ, শক্তি, রূপ, গুণ, সত্তা, [illegible] নহে, সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল। আজ এক প্রকার, আবার কাল অন্য প্রকার। [illegible] পরিবর্ত্তিত প্রকারের মধ্যে কোন প্রকারটী যে ঠিক্ তত্ত্ববস্তুর স্বরূপ [illegible], তাহা কি কেহ বলিতে পারেন? যৌবনই শরীরের তত্ত্ব, না বাল্যই তত্ত্ব, না [illegible] পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, প্রত্যেক দশ বৎসর অন্তর অন্তর পূর্ব্ব পূর্ব্ব শরীরের কিছুই থাকে না; অস্থি, মাংস, ত্বক্ ও লোম প্রভৃতি সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। বলা বাহুল্য যে আমরা মুহূর্ত্তেকের মধ্যে এই বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডেরও তিন প্রকার পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই;—জাগ্রতে এক প্রকার, স্বপ্নে এক প্রকার, আবার সুষুপ্তিতে অন্য প্রকার। জাগ্রতে বিস্পষ্ট বা জাজ্বল্যমান, স্বপ্নে অস্পষ্ট, সুষুপ্তিতে অভাব বা অজ্ঞানবৎ। আমরা তাহা বটে,—জগতের পরিবর্ত্তন নহে, আমাদের জ্ঞানেরই পরিবর্ত্তন, কিন্তু [illegible] আমাদের সকলেরই জাগ্রৎ, সকলেরই স্বপ্ন ও সকলেরই সুষুপ্তি হওয়ার নিয়ম থাকি তাহা হইলে বুঝিতে পারিতাম, ঐ পরিবর্ত্তন আমার কি তাহার। কল্পান্তকালেই হউক আর যুগবিপ্লবেই হউক, সমুদয় জীবের সুষুপ্তি হইলে, তখনও যে এই [illegible] স্বরূপে থাকিবে অথবা এখনকার মত থাকিবে কিংবা অপরিবর্ত্তিত থাকিবে, [illegible] সাক্ষী কে? অতএব, যেমন ঐন্দ্রজালিক দৃশ্যকে ও রজ্জুসর্প প্রভৃতি অলীক দৃশ্যকে আমরা আছে বলিতে পারি, নাই বলিতে পারি,—সত্য বলিতে পারি [illegible]

বলিতে পারি; তেমনি এই জগৎকে আছে বলিতে পারি, নাই বলিতে পারি, সত্য বলিতে পারি, মিথ্যা বলিতেও পারি। ইহাই শঙ্করোক্ত অনির্ব্বাচ্যবাদের হৃদয় বা মর্ম্ম। সেই জন্যই শঙ্কর সত্যসামান্যকে প্রাতীতিক, প্রাতিভাসিক, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক,—এই চারি প্রকারে বিভাগ করিয়া বলিয়াছেন, জগতে অন্য প্রকার সত্যতা থাকে থাকুক, পারমার্থিক সত্যতা নাই। যাহা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল কালেই সমান থাকে, যাহার ক্ষয়োদয় বা পরিবর্ত্তন কস্মিন্ কালেও নাই, তাহাই পারমার্থিক সত্য। এরূপ সত্যতা ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুতেই নাই।* শঙ্করের এই উপদেশে বুঝিতে হইবে, শঙ্কর যে, জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন, সে বলা ঐ ভাবের বলা। তিনি পারমার্থিক সত্যতার নিষেধ ব্যতীত ব্যবহারিক প্রভৃতি সত্যতার নিষেধ করেন নাই; যথা,—

"যেনাস্য প্রত্যয়ো যদ্বৎ প্রমাণেন নিরূপিতঃ।
লৌকিকং তদ্বদেবেদং প্রমাণং বাধনিশ্চয়াৎ।"

যে, যাবৎ না তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, তাবৎ এই সকল লৌকিক ব্যবহার ও ব্যবহার দশায় সত্যবৎ হইতে থাকে; পরন্তু তত্ত্বজ্ঞানে ব্যবহারাতীত বস্তুই রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা হইয়া যায়। এ প্রকারের যুক্তিযুক্ত কি না, তাহা আমি জ্ঞাত নহি।

এই দ্বৈতমিথ্যাত্ববাদ সম্বন্ধে আমার মনে অন্য এক প্রকার বিতর্কাদির উদয় হয়। আমার মনে হয়, শঙ্কর দ্বৈতকে মাত্র মিথ্যা ভাবিতে বলিয়াছেন। যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদে উপাসনা প্রসঙ্গে গুণাতীত ব্রহ্মে সত্য সঙ্কল্পত্বাদি গুণ ভাবিবার অর্থাৎ ধ্যান করিবার উপদেশ আছে; যেমন অক্ষরাত্মক ওঁকারে ব্রহ্ম ভাবিবার অর্থাৎ ধ্যান করিবার আদেশ আছে; সেইরূপ, দ্বৈত থাকিলেও তাহাতে দ্বৈত নাই; দৃষ্ট দ্বৈত মিথ্যা, ঐন্দ্রজালিক দৃশ্যের ন্যায় ও দৃষ্ট রজ্জুসর্প প্রভৃতির ন্যায় মিথ্যা, এইরূপ ভাবিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ভাবনার বলে দ্বৈতমিথ্যাত্বে সিদ্ধি লাভ করিলে অর্থাৎ তন্ময়ীকৃত হইলে তখন অবশ্যই নিষ্প্রতিবন্ধকে নির্ব্বাণপ্রদ অদ্বৈতাত্মবিজ্ঞান চিরকালের

* সত্য শব্দ-সৎ শব্দ হইতে উদ্ভূত। "আছে" এইরূপ বোধের বিষয় হইলেই তাহাকে সত্য বলা যাইতে পারে। সুতরাং তাহার বিভাগ বা শ্রেণী স্থির করা আবশ্যক। নচেৎ কার্য্য বা লোকযাত্রা চলিবে না। তাই শঙ্কর বলেন, থাকা অনেক প্রকার। যাবৎ স্বপ্ন তাবৎ তাহার বিষয় 'আছে' বলিয়া বিভাবিত হইয়া থাকে এবং কল্পনার অবলম্বন কল্পনাকাল পর্য্যন্ত আছে বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকে। শুক্তিকায় রৌপ্যাদর্শনবিরোধী না হওয়া পর্য্যন্ত রজত থাকে। আবার এমন বিষয় আছে যে, যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান চিরকাল অক্ষুণ্ণ সত্তায় আছে। অতএব, থাকার বা সত্যতার বিভাগ প্রাতীতিক, প্রাতিভাসিক, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। যাবৎ প্রতীতি, তাবৎ থাকে, পরে থাকে না, এইরূপ হইলে প্রাতীতিক। স্বপ্ন, মনোরাজ্য, ভ্রান্তি, এই তিন স্থলে প্রাতিভাসিক। গিরি, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বতাদি বিষয়ে ও ঘট, পট, গৃহ, বৃক্ষাদি বিষয়ে ব্যবহারিক এবং কেবলমাত্র আত্মায় পারমার্থিক সত্য নিশ্চয়।

...দেব ... করিলেন,—

"...লোকে ... মাতৃকুলে, যুবতী কে ... কুলস্ত্রীতুল্য, আর বয়স্কা বালিকাকে ... ভগিনী জ্ঞান করিবে।

"পরস্ত্রী প্রতি কামাসক্ত নয়নে দৃষ্টিপাত করা অপেক্ষা তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা ... উপাদেয় জ্ঞান।"

... করিতেছ, সে হরন মন্ত্রকলোক হইতে ... কর।— ... পরিত্যাগ করিবে। অমৃতময় হাসি ... তোমাদের পক্ষে— ... ভক্তিপ্রবণ হৃদয় ... হরনের চিত্তবিমোহকারী।

... নয়নে ... পুরুষ ... সমাধিমগ্নের ন্যায় ... থাকিয়া ... প্রথমে ... পরে ...

... ইতিকর্ত্তব্য ... দিবা বৎসর পর হইল, ... দীর্ঘকাল নিদ্রা ... দিবা সমাপ্তে ... আসিয়া ... না। এই সময়ের মধ্যে ... দিবা রাত্রি ... দিবা ... পড়িল না, ... তাহার ... হইতে ... হয় নাই। ... বিচ্ছেদে ... হইবার আধিপত্য ... করিয়াছিল।

... পত্নী ... করিয়া ... যাহাতে ... করিবার ... করিলেন, কিন্তু ... পড়িয়া চূর্ণ হইয়া ... তাহার ... হইলেন।

... করিতে ... থাকে ... করিলেন। ... হইলেন।

অপূর্ব্ব-জ্যোতিঃ বিনির্গত হইত। বিহঙ্গমের কলরবে এবং আকাশ হইতে মধুর-ধ্বনিতে দিগ্বিদিক্ নিনাদিত হইত। তাহার শুভাগমনের নিদর্শন দৃষ্টে গ্রামের স্ত্রীপুরুষ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া পুষ্পমালা ইত্যাদি লইয়া তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিতে বাহির হইত। তাহাদের মধ্যে যখন যাহার গৃহে তিনি যাইতেন সে তাঁহার আতিথ্য করিত। অনুগ্রহ করিয়া আজ আমার গৃহে পদার্পণ করিতে হইবে, আপনার রিক্ত পাত্রখানার অনুরূপ মত্ত আহার প্রস্তুত, এই বলিয়া তাহার কেহ হয়ত ভিক্ষাপাত্র লইয়া উপস্থিত জনের মধ্যে কোন গৃহস্থামী তাঁহাকে অনুরোধপূর্ব্বক গৃহে আনিয়া তাঁহাদের আতিথ্য করিতেন। আহার শেষ হইলে বুদ্ধদেব সমবেত লোকসকলকে উপদেশ দিতেন। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কেহ বা বুদ্ধের মন্ত্র গ্রহণ করিত, কেহ বা তাঁহার তদপেক্ষা উচ্চাভিলাষী তাঁহারা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতেন। পরে উঠিয়া তিনি নিজ বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিতেন; সেখানে তাঁহার শিষ্য প্রবেশ করিয়া অন্যান্য পর্য্যায় দিবসের গতাগত ব্যক্তি-সকল বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিতেন। তৎপরে ধীরে ধীরে প্রস্থানোদ্যম হইয়া এইরূপ উপদেশ দিতেন "সত্যপরায়ণ হও, দৃঢ় অধ্যবসায়ী হও। পৃথিবীতে বুদ্ধদর্শন দুর্লভ। বুদ্ধের উপদেশ লাভের সুযোগ অবহেলা করিও না।" পরে তাঁহার পুষ্পবাসিত কক্ষে নিজে বিশ্রাম করিতেন। সন্ধ্যার সময় ইচ্ছা হইলে স্নান করিতেন। গ্রাম না হইতে আসিয়া তাঁহার বাসস্থানে সম্মিলিত হইলে পর তিনি তাহাদের কি ও ধারণা অনুসারে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন; তাঁহারা তাঁহাকে আপন আপন আধ্যাত্মিক অ জ্ঞাপন করিত; যাহার যাহা জানিবার ইচ্ছা তিনি তাহা পূর্ণ করিতেন; যা যে কোন বিষয় সংশয়, তাহা নিরাকরণ করিয়া দিতেন। এইরূপে এক প্রহর রাত্রি কাটিয়া যাইত; পরে সকলকে মধুর সান্ত্বনাবাক্যে বিদায় দিতেন। অবশিষ্ট রাত্রি কতক ধ্যান, কতক বা নিদ্রায় যাপন করিতেন, এবং প্রত্যূষে উঠিয়া কাহার কি আবশ্যক, কাহাকে কিরূপ উপদেশ দিতে হইবে, কি উপায়ে লোকের দুঃখমোচন ও কুশল বর্দ্ধন করিবেন, এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া দিবসের কার্য্য স্থির করিতেন।

মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রে বুদ্ধের মৃত্যুর পূর্ব্বে শেষ তিন মাসের ঘটনাবলীর সবিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ইহা হইতে এবং অন্যান্য প্রাচীনতর গ্রন্থ হইতে দেখা যায় যে বর্ষার চারি মাস ছাড়িয়া অবশিষ্ট বৎসর আট দশ ক্রোশ পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ইহাই তাঁহার বল, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রবুদ্ধ হইবার পর প্রায় চল্লিশ বৎসর তিনি স্বীয় মতানুযায়ী ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়ান। এইরূপে দক্ষিণ-পূর্ব্ব পাটনা হইতে উত্তর-পশ্চিম সরযূতী পর্য্যন্ত এক দিকে প্রায় বেড়াত ক্রোশ অন্য দিকে পঞ্চাশ ক্রোশ ব্যাপিয়া তিনি তাঁহার

ধর্ম্মার দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ করেন এবং এই বিস্তীর্ণ প্রদেশে রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, বহুবিধ জনগণের সমাগমে তিনি মানবপ্রকৃতি—মনুষ্যের ভাব গতি, রীতি নীতি, সুখ দুঃখ, আশা ভরসা ভালরূপ বুঝিবার বিস্তর সুযোগ পাইয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

বুদ্ধদেবের যখন অশীতি বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তিনি কপিলবাস্তু হইতে পূর্ব্বদিকে বিশ ক্রোশ দূরে কুশীনগর রাজ্যকালে 'পাবা' গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী আম্রবনে কিয়ৎকাল বাস করেন। এই ভূমি চুন্দ নামক জনৈক স্বর্ণকার বৌদ্ধসঙ্ঘে দান করিয়াছিলেন। ভিক্ষুকদের জন্য তণ্ডুল ও বরাহমাংস প্রস্তুত করিল। প্রসাদ এই যে সেই মাংস ভক্ষণ করিয়াই বুদ্ধদেব পীড়িত হন এবং এই পীড়াতেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। পরাস্তে কুশীনগরের পথে কিয়দ্দূর চলিয়া শ্রান্তিবোধ হওয়াতে তিনি বসিয়া পড়িলেন এবং আনন্দকে বলিলেন—"আমার বড় তৃষ্ণা লাগিয়াছে, জল আনিয়া দেও।" আনন্দ জল আনিয়া দিলেন। অল্প দূরে কুকুট্ট নদী বহিতেছিল—তীরে পৌঁছিয়া নদীতে শেষ বারের মত স্নান করিয়া লইলেন। মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া এবং লোকে পাছে চুন্দের প্রতি দোষারোপ ও কটুবাক্য প্রয়োগ করে এই আশঙ্কায় আনন্দকে বলিলেন "আমার মৃত্যুর পর চুন্দকে বলিও সে বড়ই পুণ্যফল উপার্জ্জন করিয়াছে; কারণ তাহার প্রদত্ত আহার করিয়া আমি মৃত্যুরূপ আরোগ্য লাভ করিলাম, নির্ব্বাণপুরে উপনীত হইলাম। আমার বুদ্ধত্বের পূর্ব্বে সুজাতার [illegible] এইক্ষণে এই চুন্দের পক্কান্ন উপহার এই দুইই আমার প্রধান পুণ্যফল। এ বিষয়ে [illegible] সন্দেহ প্রকাশ করে, কহিও যে এ কথা আমার নিজের মুখ হইতে শুনিয়াছ।" অনেক কষ্টে আস্তে আস্তে কুশীনগরসমীপস্থ হিরণ্যবতী নদীতীরে গেলেন তথায় কিয়দ্দণ্ড বিশ্রাম করিয়া [illegible] এক শালবনে গিয়া দুইখানি জোড়া খাটে শয়ান থাকিয়া মৃত্যুর পর আপনার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে আনন্দের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। এমন সময় আনন্দের বিলাপধ্বনি শুনিয়া বলিলেন "ভাই আনন্দ, আমার জন্য শোক করিও না। আমি ত তোমাদের পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যার জন্ম তারই মৃত্যু—যার বৃদ্ধি তারই ক্ষয়—এমন কি কোন জিনিস আছে যাহার বিনাশ নাই? শীঘ্রই হউক বিলম্বেই হউক, এক সময়ে প্রিয়জনদের ছাড়িয়া যাইতেই হইবে। কিন্তু আমার মৃত্যু হইল ভাবিও না। আমার প্রচারিত সত্য সকল, আমার উপদেশ ও অনুশাসন আমার পশ্চাতে রাখিয়া যাইতেছি—সেই সকল আমার প্রতিনিধি—সেই তোমাদের পথপ্রদর্শক। আনন্দ, তুমি অতি যত্নে আমার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছ—আশীর্ব্বাদ করি তোমার কল্যাণ হউক। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ধর্ম্মপথে চল, বিনয়শক্তি, অহমিকা, অবিদ্যা হইতে পরিত্রাণ পাইবে। যতদিন আমার শিষ্যেরা শুদ্ধচারী হইয়া সত্যপথে চলিবে, ততদিন আমার ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রচলিত থাকিবে। পাঁচ শত বৎসর পরে

আদেষ্টোবাঢ়বাদো বৌদ্ধানাং বদ্ধবালকান্।
ন হন্তি যঃ স হন্তব্যো দৃষ্ট্যাদিত্যস্মদাদৃশঃ॥

তাহা স্বীয় কার্য্যকর্ত্তাদিগকে আদেশ করিলেন, একদিকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, অন্যদিকে হিমালয় পর্ব্বত, ইহার মধ্যে আবালবৃদ্ধ যত বৌদ্ধ আছে সকলকে সংহার কর [illegible] তাহারা বধ্য।

শঙ্করাচার্য্য কুমারিলের উত্তরকালীন লোক তিনিও বৌদ্ধদিগকে দুষ্ট বলিয়া, [illegible] যেরূপে তিনি হিন্দুসমাজে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত করেন তাহা প্রসিদ্ধই আছে। শ্রীযুক্ত [illegible] কুমার দত্ত তাঁহার প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় নামক গবেষণা ও পাণ্ডিত্য পূর্ণ গ্রন্থে শঙ্করের কালনির্ণয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যুক্তি সঙ্গত বোধ হয়। তিনি [illegible] চীনদেশীয় তীর্থযাত্রী হিউএন্ সাং খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে উপস্থিত [illegible] অনেক বর্ষ অবস্থিতি করিয়া সকলস্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় [illegible] অন্য নানাবিষয়ে যেরূপ সবিশেষ বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে ঐ সময়ে বা তাহার [illegible] হিন্দুসমাজে তাদৃশ ধর্ম্মবিপ্লব সঙ্ঘটিত বা আন্দোলিত হইত, তাহা হইতে [illegible] এরূপ বিষয়ের সে বিষয়ের প্রসঙ্গ না থাকা কোন ক্রমেই সঙ্গত নয়। যখন [illegible] বিবরণে সেরূপ ধর্ম্মালোলনের কিছুমাত্র নিদর্শন নাই, তখন ঐ সময়ের উত্তরকালে [illegible] সময়ে শঙ্করাচার্য্যের প্রাদুর্ভাব সর্ব্বতোভাবে সম্ভব। যতদূর জানা গিয়াছে [illegible] [illegible] কাল খৃষ্টাব্দ ৮০৪।

উপরে বুদ্ধের জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে এখন বৌদ্ধধর্ম্ম [illegible] আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। [illegible] হইয়া যে কার্য্যকারণ [illegible] [illegible] প্রতীত্যসমুৎপাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহার অর্থ কি? এই দ্বাদশ নিদানের [illegible] [illegible] ধ্যানযোগে [illegible] এক যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা আপনারা [illegible] করুন। মোটামুটি এই দেখা যাইতেছে যে অবিদ্যা শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত—অবিদ্যাই [illegible] পঙ্ক্তির মূল কারণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। বেদান্তদর্শনের অধিকাংশ বিষয়ে যে [illegible] শাস্ত্রের ঐক্য [illegible] বেদান্ত মতেও অবিদ্যা হইতে ভাবৎ দুঃখ যন্ত্রণার উৎপত্তি। এই মহাবিপদ্ দান করাই উভয় শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। তবে বেদান্তের অবিদ্যা [illegible] অবিদ্যা এক নহে। বৈদান্তিকেরা বলেন, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে এই অবিদ্যা [illegible] এই ব্যবধান দূর হইলে "সোঽহম্" বলিয়া যে অভেদ জ্ঞান জন্মে, তাহা হইতে [illegible] ব্রহ্মে মিলন সংঘটিত হয়। সেই মিলনেই মুক্তি। বুদ্ধের অবিদ্যা স্বতন্ত্র, ব্রহ্মবিদ্যার [illegible] তাহার কোন সম্পর্ক নাই। অবিদ্যা সেই, যাহা জীবনের প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞানের নিরোধ [illegible] আচ্ছন্ন করিয়া রাখে—সেই মত অনর্থের মূল। যদি কোন ব্যক্তির রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, [illegible] হইলে সে ভ্রম যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সে অকারণ সর্পভয়ে ভীত, সেই ভ্রম সংশোধিত [illegible] সর্পভয়ও দূর হয়—সে রোগও। এই অবিদ্যার অপগমে দুঃখোৎপত্তির কারণের [illegible]

আমাদের জ্ঞাননেত্রে প্রতিভাত হয়। সেই কারণ কি—না বিষয়তৃষ্ণা—তৃষ্ণা হইতে আসক্তি—আসক্তি হইতে জন্ম,—তাহার সঙ্গেই রোগ-শোক দুঃখ ইত্যাদি। এই জন্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়াই মুক্তি। অবিদ্যা দূর হইলে তাহার [illegible] একে একে টুটিয়া যায়; এক কথায়, আমার আমিত্ব [illegible], এবং নির্ব্বাণপথ উন্মুক্ত হয়।

বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার পর বুদ্ধদেব যে চতুর্মহাসত্যের [illegible] দিয়াছেন, তাহাই বা কি? ইহাতে নূতন কথা কিছুই নাই। (১) [illegible] দুঃখের কারণ (৩) দুঃখের মূলোচ্ছেদ (৪) তাহার উপায়নির্দ্ধারণ এই [illegible]। উপায় নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া অষ্টমহামার্গ কিংবা নৈতিশাস্ত্র রচিত হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাংখ্য মতের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিয়া অনেকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সাংখ্য মত হইতে উৎপন্ন বিবেচনা করেন। আবার কেহ কেহ বলেন [illegible] সাংখ্য দর্শন এই বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুদর্শন। কপিল ও বুদ্ধ [illegible]। বৌদ্ধ ও সাংখ্য উভয় মতেই সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়; সেই [illegible] হইতে জীবের পরিত্রাণ সাধন চেষ্টা ঐ উভয় মত প্রবর্ত্তনেরই মূলসূত্র। বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলবাস্তু, বুদ্ধের মাতার নাম মায়া (প্রকৃতি)। এ দুইটিও সাংখ্য মতের পরিচায়ক। বৌদ্ধদের এইরূপ এক উপাখ্যান আছে যে বুদ্ধ পূর্ব্ব জন্মে কপিল ছিলেন। শাক্যসিংহ যখন তাঁহারা আপনাদের নগর নির্ম্মাণের স্থাননির্দ্দেশ করিতে গিয়া কপিল ঋষির কুটীর দেখিতে পান ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে পর, তিনি তাঁহাদিগকে একটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, সেই স্থানে নগর নির্ম্মিত হইলে, কপিলের নামানুসারে তাহার নাম কপিলবাস্তু হইল। সে যাহা হউক এই উভয়মতের যেমন সৌসাদৃশ্য আছে, তেমনি অনেকাংশে বিসদৃশ ও দৃষ্ট হয়। উভয়েই একস্থান হইতে যাত্রারম্ভ করিয়াছেন, উভয়ের ছাড়িবার স্থান এক—মনুষ্যের দুঃখমোচন; কিন্তু গম্য স্থান স্বতন্ত্র এবং গন্তব্যপথও অনেক ভিন্ন। ঐকান্তিক দুঃখ নিবৃত্তি উভয়েরই লক্ষ্য কিন্তু সে লক্ষ্য কিসে সিদ্ধ হয়? কপিল মুনি দুইটি তত্ত্বের মানিয়া লয়েন প্রকৃতি আর পুরুষ। সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক প্রকৃতি নর্ত্তকীর ন্যায় পুরুষের সম্মুখে [illegible] খেলা দেখিতেছেন, পুরুষ নির্লিপ্তভাবে তাহা দর্শন করিতেছেন। [illegible] প্রতিবৃত্তি অপসারিত করিয়া, প্রকৃতির অজ্ঞানরচিত আবরণ [illegible] ফেলিয়া দিয়া পুরুষ যখন প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র রূপে আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন, তখন সেই মায়ার খেলা থামিয়া যায়; তখনি তিনি দুঃখক্লেশ জন্মমৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ করেন; বুদ্ধ এ সকল তত্ত্বের উল্লেখ করেন নাই। বুদ্ধের রাজ্যে পুরুষের অস্তিত্ব নাই। তিনিও বলেন সকলি অনিত্য—সকলি ক্ষয়শীল—সকলি দুঃখময়; কিন্তু এই পরিবর্ত্তনশীল নামরূপের মূলে সত্যবস্তু কিছুই নাই। বুদ্ধের গম্যস্থান নির্ব্বাণ—বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞানও নহে—সাংখ্যের আত্মতত্ত্বও নহে—কিন্তু নির্ব্বাণ, যার অর্থ নিবিয়া যাওয়া—অন্যকথায়, জীবাত্মার অস্তিত্ব লোপ।

তাহার মতানুযায়ী এই নির্ব্বাণ মুক্তি কি, তাহা পরে সবিশেষ আলোচিত হইবে। কিন্তু নির্ব্বাণ যাহাই বলুন, তাঁহার অনুচরেরা তাঁহার নামে যে দর্শন তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহা নিরীশ্বর বই আর কিছুই নহে। আমিও মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা, জগতের মূলকারণ ঈশ্বরও মিথ্যা।

কতকগুলি দার্শনিক তত্ত্ব ও বিশেষ বিধান ছাড়িয়া দিলে দেখা যায় যে হিন্দুর মন্বাদি প্রবর্ত্তিমূলক সমস্ত ধর্ম্মনীতি হিন্দু আর কিছুই নহে। বুদ্ধদেব তাহা, যমা অহিংসাদি নীতির প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়া ও সেই সমুদায়ই মানবকুলের সাধারণ বলিয়া তদীয় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দেন। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ন্যায় বৌদ্ধ ধর্ম্মেও [illegible] প্রচলিত, তন্মধ্যে গৃহস্থ সাধারণের জন্য এই পাঁচটি নির্দ্দেশিত আছে—

বধ করিও না।
অপহরণ করিও না।
ব্যভিচার দোষ করিও না।
মিথ্যা কহিও না।
সুরাপান করিও না।

ভিক্ষুকের জন্য তদতিরিক্ত অপর পাঁচটি বাঁধিয়া আছে; যথা, বিকালভোজন, মাল্যাদি ধারণ, উচ্চ পরিচ্ছদ, প্রশস্ত শয্যা, স্বর্ণ রৌপ্যাদি দান গ্রহণ, এই পঞ্চ বাসনা হইতে বিরতি। ভিক্ষুশ্রেণী ভিক্ষুদের জীবনব্রত যাগযজ্ঞ নাই কঠোর। শ্মশানে যে সকল ছিন্ন বস্ত্র কুড়াইয়া পাওয়া যায়, তাহা আপন হস্তে সেলাই করিয়া পরিতে হইত; তাহার উপর [illegible] দেওয়া যাইত। আহারও যাচিয়া মাগিয়া লইতে পারে, আর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া [illegible] তাহাদের ভিক্ষাপাত্রে যাহা কিছু [illegible] তাহাই [illegible] পাঁচজন নিষিদ্ধ। দিনের মধ্যে একবার, মধ্যাহ্নের পর আহার নিষেধ। বনে [illegible] আশ্রয় বৃক্ষতল তাহাদের আশ্রয় স্থান। সেখানে বড় জোর আসন বিছাইয়া বসিতে পারে, কিন্তু কদাপি শয়ন করিবে না—নিদ্রার সময়েও শয়ন নিষেধ। নিদ্রা যাইবে [illegible] করিয়া বসিয়া। যদি কখন গ্রাম কিম্বা নগরে যাইতে হয় সে বেলা ভিক্ষুকে সন্ধ্যা [illegible] আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসিতে হইবে—তখন কখন শ্মশানে নিশা যাপন করিবে—এই প্রকার কত কঠোর [illegible] করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষু শ্রেষ্ঠ পদবী লাভের অধিকারী হইতেন।

উপরিউক্ত শাসনে যে সকল পাপকার্য্য নিষিদ্ধ, তদ্ব্যতীত আর [illegible] অহঙ্কার, পরনিন্দা, পরপীড়া প্রভৃতি মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার দুষ্প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে নানা [illegible] উপদেশ ও বিধান আছে। যে সমস্ত ধর্ম্মনীতি পালনীয়, তাহা পিতৃভক্তি, গুরুভক্তি, মৈত্রী, অহিংসা চিত্তের স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, ক্ষমা। বুদ্ধের উপদেশ এই, সত্য ও প্রিয়বাক্য কহিবে, কাহারো হিংসা করিবে না। সাধুতার দ্বারা অসাধুকে পরাজয় করিবে, সত্যদ্বারা অসত্যকে

পরাজয় করিবে, মৈত্রী শত্রুতা পরাভব করিবে। হিন্দুশাস্ত্রের মতে প্রায়শ্চিত্ত ও যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা পাপের বিমোচন হয়; কিন্তু বুদ্ধ তাহা অস্বীকার করিয়া উপদেশ দেন, কায়মনোবাক্যে সর্ব্বজীবে দয়া প্রকাশ ও তদীয় হিতানুষ্ঠান ব্যতিরেকে সদ্গতি লাভের অন্য উপায় নাই। হিন্দুধর্ম্ম জাতিভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে প্রচারিত ধর্ম্ম দেশগত, জাতিগত নহে; ইহা মনুষ্য মাত্রের স্বভাবসিদ্ধ সাধারণ ধর্ম্ম, যে হিন্দু, যে মুসলমান, সেই এধর্ম্মের বিরোধী নহে। দুঃখ ক্লেশ ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেরই ভাগধেয়। গৌতম প্রদর্শিত নির্ব্বাণপথের যাত্রীদিগের মধ্যে কোনরূপ ব্যবধান নাই। বৌদ্ধধর্ম্মে জাতির মহত্ত্ব নাই। জাতিভেদে মনুষ্যে মনুষ্যে যে পার্থক্য সে কল্পিত, গুণানুসারেই যথার্থ পার্থক্য। ব্রাহ্মণ শূদ্র অগ্নিরাই [illegible], শুদ্ধাচারী, তিনিই ব্রাহ্মণ। অজ্ঞানান্ধ পাপকারীই [illegible], হিংসারত, দয়ামায়া শূন্য, সেই চণ্ডাল। মাল্য চন্দন উপঢৌকন প্রভৃতি কতক গুলা বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না। যিনি সংযম [illegible] প্রবৃত্তি-রিপুদল স্ববশে আনিয়াছেন, সংসারানল [illegible], তিনিই ব্রাহ্মণ। ইতিপূর্ব্বে চতুর্য্যসত্যরূপ [illegible] তাহাই বৌদ্ধ ধর্ম্মনীতির প্রধান অঙ্গ। বারাণসীর [illegible] ঐই তাঁহার প্রথম উপদেশ। যে নির্ব্বাণমুক্তির আদর্শ [illegible], সেই নির্ব্বাণ পথের চারিটি বিভাগ বা ধাপ আছে এবং [illegible] প্রভৃতি দশরিপু সে পথের বিঘ্নকারী; সেই রিপুদল দমন করিতে করিতে পথিক এক এক ধাপে উপনীত হন ও সমস্ত রিপুর উপর জয়লাভ না করিলে গন্তব্যস্থানে পৌঁছান যায় না। তন্মধ্যে দুটি ভয়ঙ্কর শত্রু, 'ভবতৃষ্ণা' এবং 'অকুশলমূল'। এই বিশ্ব-লীলা, ও পর স্বর্গ-কামনা,—এ দুইই অনর্থের মূল। শেষভাগে পৌঁছিয়া মৈত্রীর সহিত মিত্রতাবন্ধন হয়। সকল ধর্ম্মের শিরোদেশে—সর্ব্বোচ্চ শিখরে প্রেম ও মৈত্রী ভাব। মৈত্রী ভাবের দৃষ্টান্ত মাতৃস্নেহ। মাতা যেমন সন্তানকে প্রাণ দিয়াও পোষণ করেন; সেই উদার গম্ভীর মাতৃপ্রেম—যে প্রেম শত্রু-মিত্র আত্ম পরে সমান—যে প্রেমের ভেরীনিনাদ দিগ্বিদিক্ পরিব্যাপ্ত হইয়া পৃথিবীকে স্বর্গতুল্য করে, সেই প্রেম বিতরণের জন্য মর্ত্ত্যলোকে বুদ্ধদেবের আগমন। তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে এই সার্ব্বভৌম মৈত্রীভাব জগতে বিস্তার উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতে মৈত্রেয় নামক অন্যতর বুদ্ধের উদয় হইবে।

বৌদ্ধধর্ম্মের অভিধর্ম্ম ভাগ (দর্শন) যতই ভ্রান্তিসঙ্কুল ও জটিল হউক না কেন, বুদ্ধের নীতি শিক্ষার উপর কেহই দোষারোপ করিতে পারিবেনা। ঐহিক পারত্রিক অভ্যুদয় কামনা করিয়া যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তিসাধন করা যে নিতান্তই ঘৃণা কার্য্য, আর, আত্মপ্রভাবে ইন্দ্রিয় মন দমন করিয়া এবং চরিত্র সংশোধন করিয়া দয়া ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা যে শ্রেয়ঃ পথের একমাত্র দ্বার—এই কথাটির প্রতি বুদ্ধদেব জনসাধারণের

[illegible] দিলেন। শুধু উপদেশ নহে, বুদ্ধের মহৎ জীবন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার [illegible] করিয়াছে। তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ যেরূপ মহান্, তাঁহার সাধু দৃষ্টান্ত তদপেক্ষা ন্যূন নহে। [illegible] দয়া, ক্ষমা, মমতা, প্রশান্ত গম্ভীর ভাব, যেমন ধ্যানস্থ বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তিতে [illegible] প্রতিমার মানসপটে মুদ্রিত রহিয়াছে। বুদ্ধদেব পৃথিবীর মধ্যে একজন সর্ব্বোচ্চ [illegible] বীর ছিলেন সন্দেহ নাই। আমরা দেখিতেছি, তিনি ঘোর বিলাসিতার [illegible] হইয়া পিতৃ-গৃহের অতুল রূপ সম্পত্তি কেমন অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া [illegible] সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন, পরে দ্বাদশ বৎসর কি সুকঠোর তপস্যা করিয়া [illegible] ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া প্রবুদ্ধ হইলেন এবং প্রায় অর্দ্ধশতাব্দ ধরিয়া উপদেশ [illegible] দ্বারা মুক্তিনির্ব্বিশেষে জ্ঞান ধর্ম্মে সাধারণ মনুষ্য জাতির সমান অধিকার [illegible] করিয়া ভারতের প্রায় সমুদয় বিদেশে ধর্ম্ম প্রচারে জীবন শেষ করিলেন। তিনি যে কার্য্যের [illegible] করিয়াছিলেন, তাহা তিনি একাকী নির্ভীক চিত্তে, উদ্যমশীল [illegible] চিত্তে, আর [illegible] তাঁহার শিষ্যবর্গের নিকট হইতে বিদায় লইয়া যখন [illegible] যাত্রা করিলেন—হায় বুদ্ধের [illegible] যা আনি [illegible] বুদ্ধজীবনের ছবি আমাদের সকলেরই [illegible]

প্রকাশক

[illegible] সাহায্য-নিরপেক্ষ [illegible] তাহার [illegible] কোন বাধা নাই। [illegible] ব্যবস্থা করিতে কোন [illegible] পুরোহিত [illegible] প্রার্থী হইবার পাত্র নাই। [illegible] তীর্থ পণ্ডিত [illegible] অনাবশ্যক [illegible] সাধন ধন ধর্ম্ম, [illegible]

[illegible] এই যে আত্মপ্রত্যয়

[illegible] হিংসা [illegible] লোভ মদ মাৎসর্য্য [illegible] সেই সিদ্ধি [illegible] নিহত্য মুক্ত [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

অবিনাশী। সেই ধর্ম্ম তোমরা প্রাণপণে পালন কর। সংসারের দুঃখ কষ্ট হইতে পরিত্রাণের জন্য আমি সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় তোমাদের জন্য ঔষধ আনিয়াছি—সেই ঔষধ সেবন কর। আমার উপদেশ মনে রেখো, যাহার জন্ম তাহার মৃত্যু যার বৃদ্ধি তারই ক্ষয়; সংসারের সকলি ক্ষয়শীল, সকলি অনিত্য। ইহা জানিয়া যত্নপূর্ব্বক তোমরা নিজ নিজ মুক্তিসাধন কর। এইরূপে আত্মবলে আমার প্রদর্শিত পুণ্যপথে চল—নিশ্চয় তোমাদের কল্যাণ হইবে; তোমরা দুঃখ শোক অতিক্রম করিয়া অপার শান্তি ও নির্ব্বাণরূপ অমূল্য নিধি লাভ করিবে।"

মানব প্রকৃতির উচ্ছেদকারী—মনুষ্য সমাজের উন্নতির প্রতিরোধী কোন এক অভিনব ধর্ম্মপ্রণালী কালে নিশ্চয়ই অবসাদ প্রাপ্ত হয়। বাসনাবিরহিত মনুষ্যে মিলিয়া মনুষ্য সমাজ গঠিত হয় না। ঈশ্বরবিহীন ধর্ম্ম অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারে না। মনুষ্য আপনা অপেক্ষা উচ্চতর দৈবশক্তির উপর নির্ভর না করিয়া ধর্ম্মপথে চলিতে অক্ষম। আমরা এমন একজন জ্ঞানময় মঙ্গলময় পুরুষ চাই, যিনি আমাদের পূজার্চ্চনা গ্রহণ করিতে তৎপর —এমন বান্ধব চাই, যিনি আমাদিগকে সংসারের সমুদয় বিঘ্ন বিপত্তি হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ—এমন সখা, যাঁহার নিকটে আমাদের সুখ দুঃখ নিবেদন করিয়া আমরা ইহলোকে তি—পরলোকে সুগতি লাভে সম হই। আধ্যাত্মিক [illegible] অভীব প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু দেবপ্রসাদ [illegible] ধর্ম্মের মূল শুষ্ক হইয়া যায়। এই কারণে কালসহকারে নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম্মের যে অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, তাহা আপনারা অবগত আছেন; তাহার জন্মভূমি এই ভারতভূমি হইতে তাহার বহিষ্কৃত হইবার কারণও এই। বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া নীতি প্রণালী [illegible] করুন, কিন্তু দেখা যায় অনেকানেক বৌদ্ধক্ষেত্রে ঘোর পৌত্তলিকতা [illegible] ঈশ্বরের প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত মুখে আনিতে কুণ্ঠিত হইতেন, সেই বুদ্ধদেবের পথাবলম্বী সাধকেরা তাঁহাতেই ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। "প্রতিমা পূজা, বুদ্ধ প্রভৃতির অস্থি দন্তাদির অর্চ্চনা এবং নানাবিধ যাত্রা মহোৎসব অবাধে চলিয়া আসিতেছে। ফাহিয়ান খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমে অনেকানেক বুদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া যান। কেবল শাক্য বুদ্ধ নয়, এক এক দেবালয়ে অন্ত অন্ত বৌদ্ধদেবতার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ও অর্চ্চিত হইয়া থাকে।" এদিকে আমরা দেখিতে পাই যে বৌদ্ধেরা নিরীশ্বর এবং দেবপ্রসাদ হইতে পরাঙ্মুখ—ওদিকে দেখিতেছি যে, বৌদ্ধেরা মনুষ্যপূজা এবং মূর্ত্তিপূজার আদি গুরু। বুদ্ধদেব যেমনি পৃথিবী হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন, তাহার কিয়ৎপরে ভারতবর্ষের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত শত স্থান শত দেবদেবীর প্রস্তর মূর্ত্তিতে পরিকীর্ণ হইয়া উঠিল; তার সাক্ষী ইলোরা, অজণ্টা, খণ্ডগিরি, শ্রীক্ষেত্র।"—বুদ্ধ গয়ায় তারাদেবী ও বাগীশ্বরী দেবী, বৈশালীতে ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভ ও বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর নালন্দ বিহারে অবলোকিতেশ্বর, তারা, ত্রিশিরা বজ্রবরাহী, বাগীশ্বরী ইত্যাদি

[illegible] স্থানে অনেকানেক বৌদ্ধ দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ও মন্দির অদ্যাপি দেখিতে পা[illegible] যায়। সেই প্রসাদ হইতে বিচ্ছিন্ন আত্মপ্রভাবের নিরতিশয় কাঠোর সাধনার [illegible] নিদর্শন পরিণাম, তাহা আর এক দিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। আমরা দেখিতে পাই যে বর্ম্মসাধন ক্রমে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যথেচ্ছাচারিতায় পরিণত হইল। যথেচ্ছাচারিতার বলে [illegible] দি উপার্জ্জনের প্রণালী হইতেছে তন্ত্রশাস্ত্র—কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের গম্ভীর ভিতরে বি[illegible] তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডও প্রবেশ লাভ করিল। "হিন্দু মতানুসারী সিদ্ধ যোগীরা যেমন অণিমা লঘিমা, প্রাপ্তি প্রভৃতি আট প্রকার ঐশ্বর্য্য লাভ করেন শিখিত আছে, সেইরূপ বৌদ্ধদিগেরও বিশ্বাস এই যে ঐ সম্প্রদায়ী সিদ্ধব্যক্তিরা অলৌকিক শক্তি [illegible] হইয়া অতীব অদ্ভুত কার্য্য সমূদয় সম্পাদন করিতে সমর্থ হন, যেমন বায়ু মধ্যে [illegible] [illegible] করা, বলিত পর্ব্বত ও সমুদ্র প্রকম্পন, পর্ব্বত ও পৃথিবীর [illegible] [illegible] অগ্নি দ্বারা অনাহত, নষ্ট বা গুপ্ত বিষয় [illegible] [illegible] [illegible]

কর্ম্ম এ পৃথিবীতে নষ্ট হয়না। আমি সত্য বলিতেছি, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যেখানে যাও, সমুদ্রে প্রবেশ কর অথবা গিরিগুহায় লুকায়িত থাক, তোমার কর্ম্মফল তোমার পশ্চাৎ ধাবিত হইবে—কিছুতেই তাহা হইতে নিস্তার নাই। তোমার পাপের ফল যেমন দুঃখ ভোগ, সেইরূপ তোমার পুণ্যের সুফলভাগীও তুমি। বিদেশ হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিলে তোমার আত্মীয় স্বজনবন্ধু যেমন তোমাকে আনন্দে অভ্যর্থনা করে, সেইরূপ তোমার পুণ্যফল লোক হইতে লোকান্তরে তোমাকে অনুসরণ করিবে।

এইস্থলে বৌদ্ধধর্ম্মের পারলৌকিক মত ও বিশ্বাস একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। মৃত্যু ও পরকাল সম্বন্ধীয় যে সকল প্রহেলিকা মানব হৃদয়ে স্বভাবতঃ উদয় হয়, বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহার সমর্থক উত্তর সর্ব্বাংশে উপলব্ধি হয় না। বুদ্ধদেব স্বয়ং তাহা কতক ব্যক্ত, কতক অব্যক্ত রাখিয়াছেন। জীবাত্মার শেষ গতি কি? বুদ্ধদেব মৃত্যুর পর জীবিত থাকিবেন কিনা? এই সকল প্রশ্ন সম্বন্ধে তিনি অনেক সময় মৌনভাব অবলম্বন করিতেন। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁর কাছে এই সমস্ত গূঢ় প্রশ্ন উত্থাপন করিতে বিরত হইত না; বুদ্ধদেব সে সকলের যথাসাধ্য উত্তর প্রদান করিয়াছেন—যাহার উত্তর নাই, তাহাও বলিয়া দিয়াছেন।

মালুক্যপুত্র যখন এইসকল তত্ত্বের জ্ঞানলাভ মানসে বুদ্ধের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করেন তখন বুদ্ধদেব কহিলেন:—

হে মালুক্যপুত্র—আমি কি কখন তোমাকে বলিয়াছি—"এস, আমার শিষ্য হও—আমি তোমাকে বলিয়া দিব, জগৎ সৃষ্ট কি অনাদি, দেহ আত্মা পরস্পর ভিন্ন কি অভিন্ন—বুদ্ধ মরণোত্তর নবজীবন ধারণ করিবেন কিনা? এই সকল সন্দেহ-ভঞ্জন করিয়া উপদেশ দিব, আমি কি এমন কোন বচন দিয়াছি?

মালুক্য—না, গুরুদেব, তা দেন নাই।

বুদ্ধ—এই সকল তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশে কি তুমি আমাকে গুরু বলিয়া মানিয়াছ?

মালুক্য—না, তাহা নহে।

বুদ্ধদেব কহিলেন—

এক ব্যক্তি বিষাক্ত বাণে আহত হইয়াছিল। তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণ একজন সুনিপুণ চিকিৎসক ডাকিয়া আনিল। যদি সেই আহত ব্যক্তি বলিত—আগে আমাকে বল কার কার বাণে আমি আহত হইয়াছি, যে বাণ মারিয়াছে সে লোকটা কে? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কি শূদ্র? তাহার নাম কি? নিবাস কোথায়? সে বাণই বা কি রকমের বাণ? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে কি কোন লাভ আছে? ফলে এই দাঁড়াইত যে কথা শেষ হইতে না হইতেই সে বাণাহত ক্ষত ব্যক্তি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে দেখিতে পাইতে।

হে মালুক্যপুত্র, তুমি আহত হইয়া আমার নিকট চিকিৎসার জন্য আসিয়াছ। তোমার আরোগ্যের উপযোগী যে ঔষধ তাহা আমি বলিয়া দিয়াছি। আমি যাহা

অধিকারী কিনা; তাহাও প্রকাশিত হয় নাই। কোশলরাজ ও সন্ন্যাসিনী ক্ষেমার মধ্যে যে-কথোপকথন তাহাতে ক্ষেমা স্পষ্টই বলিতেছেন—"স্বয়ং বুদ্ধ যাহা প্রকাশ করেন নাই, আমরা তাহা কি বলিব? বুদ্ধের প্রকৃতি সমুদ্রের ন্যায় অতলস্পর্শ গভীর। যদি বল বুদ্ধ অমর, তাহা ভুল—যদি বল তিনি মরণশীল, তাহাও ঠিক নহে।" এই উত্তরে রাজা সন্তুষ্ট হইলেন কি না জানি না, কিন্তু ইহার উপর কাহারো কিছু বলিবার নাই। যে সকল বিষয় মানববুদ্ধির অগোচর সে বিষয়ে মৌন থাকা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই।

বৌদ্ধেরা যদি এইখানে থামিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আর কোন কথা বলিবার থাকিত না। কিন্তু এদিকে আবার দেখা যায়, তাঁহারাও হিন্দুদের ন্যায় মৃত্যুর পর নানাযোনি ভ্রমণ স্বীকার করেন। ইহকালে যিনি যেরূপ শুভাশুভ কর্ম্ম করেন পরকালে তিনি তদনুরূপ যোনি প্রাপ্ত হন। কেবল পশু পক্ষী কীটাদি নিকৃষ্ট জন্তু নয়, পাতকের পরিমাণানুসারে মৃৎপিণ্ডাদি জড় বস্তু হইয়াও জন্মগ্রহণ করিতে হয়। বৌদ্ধেরা বলেন, শাক্যমুনি নিজে অগ্রে জন্মচক্রে ঘূর্ণিত হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। পূর্ব্ব জন্মের কথা তোমার আমার মত যে-সে লোকের মনে থাকেনা, বুদ্ধের ন্যায় সিদ্ধ পুরুষেরাই তাঁহাদের বিগত-জীবন কাহিনী স্মরণ করিয়া বলিতে পারেন। বুদ্ধদেব পশু পক্ষ্যাদি কোন্ যোনিতে কিরূপে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জাতকমালার সন্নিবেশিত আছে। বুদ্ধ জাতকে আত্মার নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধমুখী অভিব্যক্তি নাই—জীবনের ক্রমোন্নতির ভাব লক্ষিত হয় না। কি কারণে কি নিয়মে জীবের অবস্থান্তর ঘটিতেছে—তাহা বুঝা যায় না। আমরা দেখিতে পাই চাতিনার তিনি মহর্দ্ধিক, বিশ বার ইন্দ্র—তিরশীবার সন্ন্যাসী—অষ্টাশীবার রাজা—চব্বিশবার ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন বানর, হস্তী, সিংহ, বরাহ, মৎস্য বৃক্ষ চোর, বাজীকর, ভূতের ওঝা—এইরূপ কত কত জন্ম ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বুদ্ধ কখন নারী জন্ম গ্রহণ করেন নাই—ভূত প্রেত রূপেও জন্মান নাই। সকল জন্মেই তিনি বোধিসত্ত্ব ছিলেন ও জগতের মঙ্গল সাধন উদ্দেশে অশেষ দুঃখ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন।

পরলোক ও মুক্তি বিষয়ে বৌদ্ধমত জানিতে হইলে বৌদ্ধধর্ম্মে আত্ম-তত্ত্বের শিক্ষা ও উপদেশের প্রতি মনোনিবেশ করা আবশ্যক। আত্মার পারলৌকিক গতি ও মুক্তির কল্পনা আত্ম-স্বরূপ লক্ষণের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। আত্মাকে যদি দেহের সহিত অভিন্ন—মস্তিষ্কের প্রক্রিয়া মাত্র মনে করা যায়, তাহা হইলে দেহ নাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও বিনাশ সহজে নিষ্পন্ন হয়। এই আত্ম-তত্ত্ব বিষয়ে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে ও বৌদ্ধ-শাস্ত্রে আকাশ পাতাল প্রভেদ। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, উপনিষদে আত্মা বলিয়া যাহা নিরূপিত, তাহা শরীর হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। আত্মা যে আমি, আমি শরীর হইতে ভিন্ন—আমি চক্ষু নহি, কর্ণ নহি, বাগিন্দ্রিয় নহি—চক্ষু কর্ণ মনোবৃত্তি আমার। ছান্দোগ্য উপনিষদে

শতপথ ব্রাহ্মণের একটি আখ্যায়িকা আছে, তাহাতে প্রজাপতির যে উপদেশ, তাহা এখন বলি—

"এই দেহ নশ্বর—মৃত্যুর অধীন। আত্মা অজর অমর অশরীরী, এই দেহ তাহার বাসস্থান। অন্ধ যেরূপ বর্ণে যুক্ত, এই আত্মাও সেইরূপ শরীরের সহিত সংযুক্ত। যখন আলোক চক্ষুর তারকে প্রবেশ করে, তখন আত্মাই দর্শক, চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়; যিনি আঘ্রাণ করেন তিনি আত্মা, নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয়। যিনি ভাবেন আমি বাক্য উচ্চারণ করিতেছি, তিনি আত্মা রসনা বাগিন্দ্রিয়। যিনি শ্রবণ করেন তিনি আত্মা, কর্ণ শ্রবণেন্দ্রিয়। যিনি মন দ্বারা মনন করেন, তিনি আত্মা, মন দিব্যচক্ষুস্বরূপ; আত্মাই এই মনোরূপ দিব্যচক্ষে কাম্য বিষয় সকল দর্শন করত রমণ করেন। আত্মা যতদিন এই শরীরে অবস্থিতি করেন, ততদিন তিনি মোহপাশে বদ্ধ থাকিয়া বিষয় বাসনায় বশবর্ত্তী হইয়া সুখ দুঃখে বিচলিত হয়েন; কিন্তু যখন তিনি দেহ বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন, তখন সুখ দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

যেমন ঘনীভূত বায়ু মেঘ বিদ্যুৎ আকাশ হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিতে গিয়া নিজ নিজ রূপ ধারণ করে সেইরূপ আত্মাও এই শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই পরম জ্যোতিকে পাইয়া নিজরূপে প্রকাশিত হয়েন—তখনই তিনি উত্তম পুরুষ—তখন সুখ দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেনা। দিব্য জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া বিষয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তখন তিনি পরম শান্তি পরমানন্দ উপভোগ করেন।

উপনিষদের এই উপদেশ—বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশ স্বতন্ত্র। যে ধর্ম্ম হিন্দুসমাজ হইতেই বিনিঃসৃত হইয়াছে, তাহার উপর বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনের প্রতিবিম্ব পড়িবে, তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু বুদ্ধদেব আত্মতত্ত্ব বিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের সহিত সম্পূর্ণ পার্থক্য ঘটিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম দেহ মনের আড়ালে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। জীবাত্মার পৃথক সত্তা অস্বীকার হিন্দুমতের সম্পূর্ণ বিরোধী। যে কোন বৌদ্ধগ্রন্থে বলে দেহ আত্মা এক। স্বতন্ত্র পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করিলে বলিয়া বুদ্ধদেব তাহার উত্তর দানে বিরত ছিলেন। অপরাপর গ্রন্থে ইহা অপেক্ষাও স্পষ্ট তর অবিশ্বাসের কথা আছে অর্থাৎ দেহ হইতে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্পষ্টই অস্বীকার করা হইয়াছে দৃষ্ট হয়। অতএব আত্মা ছাড়িয়া অতবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক সুখ দুঃখভোগী জীবের জীবন সমস্যার পূরণ, বুদ্ধদেব এই অসাধ্য সাধনে প্রভী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই সমস্যা পূরণের প্রণালী এই :—বৌদ্ধমতে যে সমস্ত উপকরণে জীবের সৃষ্টি সঙ্ঘটিত; তাহাদের নাম "স্কন্ধ"। এই স্কন্ধ পঞ্চসংখ্যক, এই পঞ্চ স্কন্ধসমষ্টির নাম জীবে বর্ত্তমান। সেই পাঁচটী এই—

বিষয় প্রপঞ্চ—রূপ;
বিজ্ঞানপ্রপঞ্চ—বেদনা;
সংজ্ঞা প্রপঞ্চ—নাম;

সংস্কার প্রপঞ্চ—বাসনা ;
বিজ্ঞান প্রপঞ্চ (consciousness)

প্রত্যেক স্কন্ধের আবার অসংখ্য নানাপ্রকার বিভাগ। এই পঞ্চ স্কন্ধের সংযোগে জীবের জন্ম—তাহাদের বিয়োগে জীবের মৃত্যু। এই সকল স্কন্ধ ছাড়িয়া জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই।

এই পঞ্চ স্কন্ধ কখন কখন 'নাম ও রূপ' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত দেখা যায়, মোটামুটি বলিতে গেলে জীব নামরূপের সমষ্টিমাত্র। মানসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপার নামের অন্তর্গত—দৈহিক ও বাহ্য বিষয় রূপের অন্তর্ভূত।

মৃত্যুকালে দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে স্কন্ধপুঞ্জের বিয়োগ হইবামাত্র, অন্যত্র তাহাদের সংযোজন ঘটে, হয় ইহলোকে অথবা অন্যলোকে এইরূপে নূতন নূতন জীব সৃষ্টি হয়। এই কয়েকটি স্কন্ধের যোগাযোগেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব—মনুষ্যের চরিত্র—মনুষ্যের আত্মা। এই সমস্ত স্কন্ধের মূলে আত্মা যে আমি, আমি কতক গুলি [illegible] সংযোগের ফলমাত্র। এই যে আমি, আমার নিয়তই পরিবর্ত্তন হইতেছে, আমি একরূপ, তখন অন্যরূপ। শিশু যে, সে বালক নহে ; বালক যে, সে যুবা নহে ; যুবা যে, সে বৃদ্ধ নহে। এই পরিবর্ত্তন অনুসারে নামের ভিন্নতা, যেমন একই ব্যক্তির [illegible] শৈশব, বৃদ্ধি, যৌবন প্রভৃতি নাম ভেদ হয়। ইহাতে একটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে,—যদি আত্মা বলিয়া স্বতন্ত্র পদার্থ না থাকে, তাহা হইলে তত্ত্বাশ্রিত [illegible] ভাল মন্দ যোনি-ভ্রমণ কিরূপে সম্ভবে? আত্মা নাই ত যোনি-ভ্রমণ [illegible] কথায় বলে, "মাথা নাই তার মাথা-ব্যথা।"—ইহার উত্তরে বৌদ্ধ [illegible] অন্য সমস্ত উপাদান (স্কন্ধ) ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়, তখনও [illegible] কর্ম্মফল—অক্ষত থাকে। জীব নিজ নিজ কর্ম্মবলে নূতন জন্ম ধারণ করে। [illegible] সংস্কার এই ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে কার্য্য করিতেছে, মৃত্যু তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করে, কিন্তু কর্ম্ম-বলের উপর মৃত্যুর কোন অধিকার নাই। মৃত্যু ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে জীব দেহ হইতে বিশ্লেষিত আত্মার অবয়বগুলি নূতন যোনিতে সংযোজিত হয়—নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরিত হয়। এইরূপে জীবন স্রোত অব্যাহত থাকে। পূর্ব্বজন্ম ও নবজন্মের মধ্যে কর্ম্মসূত্রই একমাত্র বন্ধন। মনে করুন, তাড়িত শক্তির ন্যায় কর্ম্মবল নামক একটী শক্তি আছে, তাহার গতিবিধিতেই জীবন গঠিত হইতেছে—সংসার চলিতেছে। যেমন রথচক্র উঁচু নীচু নানা স্থান, নানা দৃশ্যের মধ্যে দিয়া গমন করে, অথবা দীপশিখা কিয়ৎকাল জ্বলিয়া আবার নিবিয়া যায়—পুনর্ব্বার জ্বলিয়া উঠে—তাহাকে পূর্ব্বাপর একই শিখা বলা যায় না অথচ ভিন্নও নহে। এইরূপে কর্ম্মবলে জীবনচক্র নিয়তই ঘূর্ণমান—অথচ বৌদ্ধধর্ম্ম আত্মার অনুবর্ত্তিত্ব—আমার আমিত্ব অস্বীকার করেন না। আমার কর্ম্মের স্রোত জীবনে প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু কর্ম্ম-কর্ত্তা কোন পুরুষ নাই। মোটামুটী, বৌদ্ধধর্ম্মের দার্শনিক

[illegible] এই—আত্মার পৃথক্ সত্তা নাই। দেহ এবং আত্মা ও আত্মার উপকরণ [illegible] ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; কর্ম্মবলে সেই সকল ছিন্ন অবয়ব খণ্ড সংসারের [illegible] নূতন নূতন অঙ্গভঙ্গি ও দীর্ঘাকারে পরিণত হইতেছে—বিশ্বসংসার এই [illegible] চলিয়া আসিতেছে। কোন সম্প্রদায়ী লোকেরা (ইংরাজীতে [illegible]), তাহার মতও কতকটা এইরূপ, তাঁহারা ব্যক্তিকে—পুরুষকে নিঃসার-[illegible] স্থানে মনুষ্য জাতিকে সংস্থাপিত করেন। মনুষ্যের বিনাশ—[illegible] জাতির [illegible] কালে মনুষ্যের দেহ মন বিযুক্ত হইয়া আদি হইতে মিলিয়া [illegible], যাহা অ[illegible]ই থাকে, তাহা তাঁহার সুকৃতি এবং সাধুদৃষ্টান্ত;—অন্য কথায়,—কর্ম্মবন্ধ [illegible] [illegible] [illegible] জ্ঞান সন্ততি ও অন্যান্য লোকের মধ্যে প্রচারিত [illegible] [illegible] এবং [illegible] উন্নতি-সাধনে সহায়ীভূত হয়।

[illegible] উৎপন্ন হইতেছে, এই কর্ম্মবন্ধ কাহার? আমার, তাহার, কি অন[illegible] [illegible]ই হইলে, কর্ম্মফল কিসের উপর স্বীয় শক্তি সঞ্চার করিবে? [illegible] [illegible] কিরূপে দেহের বাহিরে ও অভ্যন্তরে [illegible] করিবে? [illegible] [illegible] এই সকল প্রশ্নের সমর্থক উত্তর পাওয়া যায় না। কর্ত্তা ছাড়া [illegible] [illegible] মিলিয়া যায়। স্বাধীন পুরুষ [illegible] [illegible] [illegible] পুরুষকারে বিশ্বাসও এই [illegible] [illegible] [illegible] আমি আছি আমি পরে থাকিব, আমার [illegible] [illegible] [illegible] এই বিশ্বাস পরলোক-বিশ্বাসের মূল। আত্মায় আস্থা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিশ্বাসও হীনবল হয়।

তবে [illegible] [illegible] [illegible] চক্র হইতে জীবের কিছুতেই পরিত্রাণ নাই; আছে [illegible] [illegible] সে উপায় নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তিনি সেই পথ প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়াই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

যন্ত্রণা হইতে কি উপায়ে নিষ্কৃতিলাভ করা যায়। এই অশান্তির মধ্যে শান্তি কো[illegible] যায়? যদি এমন অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, সেখানে জন্ম ভয় নাই, মৃত্যু ভয় নাই, বাসনার দংশন নাই; আসক্তি-বিহীন হইয়া শান্তি, আরাম, নির্ব্বাণ উপভোগ করা যায়, তাহা হইলেই আমার সকল কামনা পূর্ণ হয়। সাধনাদ্বারা তাঁহার সেই অবস্থা লাভ হয়, যেখানে জন্ম-ভয়, শোক-তাপ অতিক্রম করিয়া, তিনি শান্তিলাভ করেন। তখন তিনি পুলকে উৎফুল্ল হইয়া মনে করেন, এতক্ষণে আমি আশ্রয়স্থান লাভ করিলাম। সেই মোক্ষধাম অর্জ্জন ও রক্ষণ করিতে তিনি কায়মনে সচেষ্ট হন; সংযমী, জিতেন্দ্রিয় ও অহিংসাপরায়ণ হয়েন, সর্ব্বভূতে দয়া ও প্রেমে তাঁহার হৃদয় অভিষিক্ত হয়। এইরূপ সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া, এই পরিবর্ত্তনশীল সংসারের অতীত, যাহা স্থায়ী, যাহা সত্য, যাহা অর্হৎ মণ্ডলীর চিরকাঙ্ক্ষিত ফল, তাহা তাঁহার হস্তগত হয়। তখনই তিনি নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করেন।"

এই নির্ব্বাণ মুক্তি স্থানবিশেষেরও নহে। ধর্ম্মই তাহার আশ্রয় স্থান। চীন তাতার কাশ্মীর, গান্ধার, স্বর্গ মর্ত্ত্য যেখানেই থাকুন, প্রত্যেক সাধু পুরুষ বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম পথে চলিয়া নির্ব্বাণ মুক্তি লাভের অধিকারী। যাঁহার চরিত্র পবিত্র, তিনি ধ্যান ও বিবেক অর্জ্জন করিয়াছেন; যিনি আসক্তি-বিহীন মুক্তহৃদয়, তিনি জন্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্ব্বাণরূপ অমৃত লাভ করেন।"

নাগসেন আবার কহিলেন, নির্ব্বাণের যেমন স্থান নির্দ্দেশ করা যায় না, তেমনি তাহার কারণও নির্দ্দেশ করা যায় না। যে পথ নির্ব্বাণে লইয়া যায়, সে পথ প্রদর্শন করা যাইতে পারে; কিন্তু নির্ব্বাণের উৎপত্তি কোথা হইতে, তাহা বলা যায় না আর জিনিসটা যে কি তাও স্পষ্ট বলা যায় না।

রাজা। তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাতে দাঁড়াল এই 'নির্ব্বাণ' কি না 'নির্ব্বাণ' অর্থাৎ তাহা কিছুই নয়।

নাগসেন কহিলেন—"মহারাজ তা নয়—নির্ব্বাণ আছে ইহা সত্য।"

ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধেও উপনিষদের এই উপদেশ "অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে," "আছেন" এ বলা ভিন্ন আর কিসে তিনি উপলব্ধ হন?

নাগসেনের এই সমস্ত উপদেশেও নির্ব্বাণের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হওয়া গেল না। যে অবস্থায় আসক্তি নাই, জন্মভয় নাই, মৃত্যুভয় নাই, রাগ, দ্বেষ, দ্বেষ, মমতা-প্রভৃতি সকলই নষ্ট, মনোবৃত্তি সমুদায় তিরোহিত, সে যে কি অবস্থা কে বলিতে পারে? কাহার সাধ্য তাহা বলিয়া উঠে? কথিত আছে, বুদ্ধদেব স্বয়ং এই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাঁহার শিষ্যেরা সে অবস্থা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন; দেখা যাক্ এই বর্ণনা হইতে বেশী কিছু জ্ঞান-লাভ হয় কি না?

বুদ্ধদেব তাঁহার আসন্ন মৃত্যু কালে শিষ্যদিগকে ডাকিয়া উপদেশ করিলেন, পৃথিবীর

প্রাণশক্তি দেখিতে পাই, তার সাক্ষী এই বৌদ্ধধর্ম্ম দেখুন। বুদ্ধদেবই কি এ ধর্ম্মের প্রাণ নহেন? আবার দেখুন, ঈশার পুরুষকার খৃষ্টধর্ম্মের সর্ব্বস্ব—ঈশাকে ছাড়িয়া দিলে খ্রীষ্টধর্ম্মের আর কি অবশিষ্ট থাকে? মহম্মদ বিহনে মুসলমান ধর্ম্ম কোথায় থাকে? চৈতন্য প্রভুর প্রভুত্ব ছাড়িয়া দিলে বৈষ্ণব ধর্ম্মই বা কোথায় গিয়া দাঁড়ায়? এই সকল ধর্ম্মবীরেরাই মহাপুরুষ। এই সকল মহাপুরুষ সময়ে সময়ে অভ্যুত্থিত হইয়া মনুষ্যের অচেতন আত্মাকে সচেতন করিয়া তোলেন—দুর্গতি-প্রাপ্ত মনুষ্য সমাজকে উদ্ধার করেন। পুরুষ শব্দ পূর্ণতা-ব্যঞ্জক। ভক্তের উপাস্য দেবতা যে পুরুষাত্মা—তিনিও পুরুষ—তিনি পূর্ণ পুরুষ।—"জ্ঞানে পরিপূর্ণ—প্রেমে পরিপূর্ণ আর অটল প্রশান্ত মঙ্গল এবং মহোদ্যমে পরিপূর্ণ।" আমি যে কথাগুলি বলিলাম (বৌদ্ধধর্ম্ম স্বয়ং তাহার সত্যতা প্রমাণ করিতেছে)। আমরা দেখিতে পাই যে, বৌদ্ধ নির্ব্বাণ নানাস্থানে নানারূপ ধৃষ্টতা করিয়াছে। বুদ্ধ ব্রহ্মকে স্বীয় ধর্ম্ম-মন্দিরে স্থান দান করেন নাই; তথাপি তিনি স্বয়ং যেমন অনেকানেক ভক্ত কর্ত্তৃক দেবতারূপে পূজিত হইয়াছেন, সেইরূপ নির্ব্বাণের শূন্যতাও স্বর্গসুখস্বপ্নময় ক্রমশঃ পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে, শূন্যতা আশ্রয় করিয়া কোন ধর্ম্মই টিকিতে পারে না।

আমার মনে অনেক সময় এই তর্ক উপস্থিত হয়, বৈদান্তিক মুক্তি আর বৌদ্ধ নির্ব্বাণ ইহার মধ্যে প্রভেদ কি? এই দুই শুনিতে যত ভিন্ন, আসলে তত নয়। বেদান্ত দর্শন বলেন, নদী যেমন সমুদ্রে পড়িয়া স্বীয় নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া তাহাতে মিশিয়া মিলিত হইয়া যায়, জীবাত্মাও সেইরূপ মোক্ষাবস্থায় নিজত্ব হারাইয়া পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। "বেদান্ত দর্শনের চৌতালা দেবমন্দিরে বৈশ্বানর, হিরণ্যগর্ভ এবং ঈশান, এই তিন দেবতার তিনটি বিভিন্ন বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; চৌতালায় দেওয়া হইয়াছে তৃতীয় অবস্থাকে; এস্থানটি জীবেশ্বরের ঐক্য স্থান বা সমাধিস্থান। এ অবস্থায় জীব 'সোঽহম্' জ্ঞানে ব্রহ্মত্ব লাভ করে—এখানে রোগ নাই শোক নাই, "তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহা গ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি।" বৌদ্ধ চৌতালামন্দিরে নির্ব্বাণ মুক্তিও ইহার অনিকল প্রতিচ্ছবি। আসল কথা এ অবস্থায় আমার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য—আমার আমিত্ব বজায় থাকিবে কিনা? যদি আমার আমিত্ব বিলুপ্ত হইল, তবে আমি প্রস্তরে পরিণত হই, কিম্বা জড়েতে বিলীন হই, অথবা নির্ব্বাণ-মহাসাগরে মিলিয়া যাই, আমার পক্ষে সে একই কথা। আমি চাহিতে চাই, আমার ব্যক্তিগত জীবন—আমার আমিত্ব বিকাশ প্রাপ্ত হইবে অথবা ক্রমোন্নতি সহকারে উচ্চ হইতে উচ্চতর শিখরে আরূঢ় হইয়া জ্ঞান, ধর্ম্ম, স্বাধীনতায় উন্নত হইবে? যদি জিজ্ঞাসা করেন 'আমি কি'—ইহা যুক্তি ও তর্কের কথা নহে, আমরা প্রত্যেকে আত্মবাক্যে জ্ঞানালোকে তাহা অনুভব করিতেছি। আমি জড় হইতে পৃথক্—অন্য জীব হইতে পৃথক্, এই পার্থক্য হইতেই আমার আমিত্ব ফুটিয়া উঠে। আমার এই আত্মা কর্ম্ম, বাসনা, প্রেম, মমতা ও তদ্রূপ সহস্র আকর্ষণের মধ্য দিয়া, এই

[illegible]স্থায়ী বাসগৃহে থাকিয়া দুঃখ ক্লেশের মধ্য দিয়া, উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। [illegible]মি যে অনন্ত জীবন প্রতীক্ষা করিতেছি, তাহাতে আমার আমিত্ব সুরক্ষিত থাকিবে। [illegible]মার নিজের শুভাশুভের জন্য আমি নিজেই দায়ী; আমার নিজের কর্ম্ম [illegible] নিজেই ভোগ করিব; আমার পুণ্যফল পাপের ভোগ আমারই। বৌদ্ধধর্ম্ম এবং [illegible]নি এ উত্তরের উপদেশ অনুসারে যদি আমার আমিত্ব লোপেই যুক্তি দেন, তবে আমার পক্ষে এ দুইই সমান। ব্রহ্মেতে আত্মার লয় কিম্বা মহানির্ব্বাণে [illegible]মার মধ্যে প্রভেদ কি? বৌদ্ধধর্ম্ম যদি এই অহমিকার উচ্ছেদে, এই আত্মরতির [illegible] অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে বুদ্ধের উপদিষ্ট সার্ব্বভৌম মৈত্রীর আধার কোথায় মিলিবে, অন্যের প্রতি আসক্তি ছাড়িয়া দিলে, কি প্রেমের মূল শুষ্ক হয় না? [illegible] —এ ত আমাদের কল্পনাতীত। মনুষ্য যদি কখন ঈশ্বর লাভে সমর্থ [illegible] মানব স্রোত পৃথক্ ভাবে প্রবাহিত হইয়া প্রয়োজনীয় [illegible] তাহার উচ্ছেদ সাধন করা—কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিয়া স্বাধীন [illegible] প্রবেশ করা—সকল জীবনের মূল যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য, তাহা [illegible] একে কিম্বা মুছে মিশিয়া যাওয়া, ইহার পরিণামে মনুষ্যত্বের আর কি [illegible] আমাদের দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম ও আর্য্যধর্ম্মের তুলনা [illegible] প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "[illegible] তৈতন্য মন্দিরের ভূবীয় অবস্থা এবং [illegible] নির্ব্বাণের নির্ব্বাণমুক্তি এ পিঠ ও পিঠ" বেদান্ত মতে জীবাত্মার [illegible] —বৌদ্ধ মতে নির্ব্বাণ প্রদীপ নিবিয়া যাওয়া—ইহার উহা আর [illegible] অন্ধকার, নিস্তব্ধতা, শূন্যতা, বিনাশ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণ।

মহাপরিনিব্বান সুত্ত নামক পালিগ্রন্থে বুদ্ধদেবের জীবনের শেষ অংশ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে মহা-পরিনির্ব্বাণ সূত্র নামক এক-খানি মহাযান (সংস্কৃত) গ্রন্থ ও মহাপরিনিব্বান সুত্ত নামক এক খানি হীনযান (পালি) গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল। উভয় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রায় একরূপ। প্রাচীনকালে উহার গ্রন্থই চীন ও তিব্বত দেশে প্রচারিত হইয়াছিল; এবং চাইনীজ্ ও তিব্বতীয় ভাষায় উভয় গ্রন্থের অনুবাদ বিদ্যমান আছে। Bunyiu Nanjio তাঁহার Complete Catalogue of the Chinese Tripitaka নামক গ্রন্থের ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১২০ ও ১২৩ সংখ্যায় ৫ খানি অনুবাদ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই পাঁচখানি পুস্তক মহাপরিনির্ব্বাণসূত্র নামক সংস্কৃত গ্রন্থের চাইনীজ্ অনুবাদ মাত্র। উল্লিখিত Catalogueএ ১১৮, ১১৯ ও ৫৫২ সংখ্যায় আর তিনখানি অনুবাদ-গ্রন্থের উল্লেখ আছে। ঐ তিনখানি পুস্তক মহাপরিনিব্বানসুত্ত নামক পালি গ্রন্থের অনুবাদ। ভারত ও চীনের পণ্ডিতগণ বিভিন্নসময়ে এই আটখানি অনুবাদ গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

মহাপরিনিব্বানসুত্ত।

চীনদেশে Northern Siang বংশের রাজত্বকালে ৪২৩ খৃঃ অব্দে ধর্ম্মক্ষেম নামক পণ্ডিত চীন ভাষায় যে অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ করেন উহাই ১১৩ সংখ্যায় উল্লিখিত হইয়াছে। তিব্বতীয় ভাষায় এই গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ বিদ্যমান আছে। Earlier Sung বংশের রাজত্বকালে খৃঃ ৪২৪-৪৫৩ অব্দে Hwui-yen ও Hwui-kwan নামক দুইজন চীনদেশীয় শ্রমণ চীনভাষায় যে অনুবাদ-গ্রন্থ প্রচার করেন উহা ১১৪ সংখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। চীন-দেশীয় Thang বংশের রাজত্বকালে ৬১৮—৯০৭ খৃঃ অব্দে জ্ঞানভদ্র নামক ভারতীয় পণ্ডিত ও Hwui-ning প্রভৃতি চীনদেশীয় পণ্ডিত মিলিত হইয়া যে অনুবাদ-গ্রন্থ প্রচার করেন উহা ১১৫ সংখ্যায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের কিয়দংশ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। Eastern Tsing বংশের রাজত্বকালে ৩১৭-৪২০ খৃঃ—অব্দে Fa-hian নামক চাইনীজ্ পরিব্রাজক ও বুদ্ধভদ্র নামক ভারতীয় পণ্ডিত মিলিত হইয়া মহাপরিনির্ব্বাণসূত্রের যে চাইনীজ্ অনুবাদ প্রকাশ করেন উহা Bunyiu Nanjio স্বীয় Catalogueএ ১২০ সংখ্যায় উল্লিখিত করিয়াছেন। HiouenThsang নামক চাইনীজ্ পরিব্রাজক Thang বংশের রাজত্বকালে ৬১৮-৯০৭ খৃঃ অব্দ মধ্যে যে চাইনীজ্ অনুবাদ প্রচার করেন তাহা ১২৩ সংখ্যায় উল্লিখিত হইয়াছে। Eastern Tsing বংশের রাজত্বকালে ৩১৭—৪২০ খৃঃ অব্দে পালি

নিবারিত প্রথার সমুচ্ছেদ সাধন না করিবে, (৪) যত দিন উহারা বৃদ্ধলোকদিগকে সম্মান ও ভক্তি করিবে, (৫) যত দিন উহাদের মধ্যে কুলস্ত্রী ও কুলকুমারীগণ পূজিত হইবেন, (৬) যত দিন উহারা চৈত্যসমূহের বন্দনা ও পূজা করিবে, এবং (৭) যতদিন উহারা অর্হদ্‌গণের রক্ষা ও পালন করিবে; ততদিন বৃজিজাতির অধঃপতন হইবে না, প্রত্যুত উহারা ক্রমেই বৃদ্ধি লাভ করিবে"। বুদ্ধদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বর্ষকার বলিলেন "হে গৌতম! আপনি যে সাতটী অপরিহাণীয় ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিলেন উহার মধ্যে একটীমাত্র প্রতিপালন করিলেও বৃজিগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে না, সমগ্র ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে উহাদের সৌভাগ্য নিশ্চয়ই অচল থাকিবে; হে গৌতম! আমি দেখিতেছি বৃজিজাতির মধ্যে পরস্পর ভেদ সংঘটন করিতে না পারিলে অজাতশত্রুর প্রযাস সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইবে, আমি এক্ষণে প্রস্থান করিলাম, আমার অনেক কার্য্য করিতে হইবে"।

অনন্তর বুদ্ধদেবের আদেশ অনুসারে আনন্দ অসংখ্য ভিক্ষুকে রাজগৃহ নগরে উপস্থান-শালায় আহ্বান করিলেন। বুদ্ধদেব উপস্থান-শালায় উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন;—"হে ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদিগকে সাতটী অপরিহাণীয় ধর্ম্মের উপদেশ দিতেছি, উহা শ্রবণ কর।

যত দিন তোমরা কর্ম্ম, ভস্ম, নিদ্রা ও আমোদ এই সকলে রত না হইবে, যত দিন তোমাদের পাপেচ্ছা প্রবল না হইবে, যতদিন তোমরা পাপমিত্রের আশ্রয় না লইবে ও সতত নির্ব্বাণলাভের উপায় চিন্তা করিবে, ততদিন তোমাদের অধঃপতন হইবে না"।

"হে ভিক্ষুগণ! অপর সাতটী অপরিহাণীয় ধর্ম্ম শ্রবণ কর। যতদিন তোমরা শ্রদ্ধাবান্, হ্রীমান্, বিনয়ী, শাস্ত্রজ্ঞ, বীর্য্যশালী, স্মৃতিমান্ ও প্রজ্ঞাবান্ থাকিবে; ততদিন তোমাদের ক্ষয় হইবে না"।

"অপর সাতটী অপরিহানীয় ধর্ম্ম এই;—যতদিন তোমরা স্মৃতি, পুণ্য, বীর্য্য, প্রীতি, প্রশ্রব্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা এই সাত প্রকার জ্ঞানাঙ্গ ভাবনা করিবে; ততদিন তোমাদের অধঃপতন হইবে না"।

"অন্য সাতটী অপরিহাণীয় ধর্ম্মের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। যতদিন তোমরা অনিত্য, অনাত্ম, অশুভ, আদীনব, প্রহাণ, বিরাগ ও নিরোধ এই সাত প্রকার সংজ্ঞার ভাবনা করিবে; ততদিন তোমাদের পতন হইবে না। অর্থাৎ তোমরা ভাবিবে সংসারের সকল বস্তুই অনিত্য, সকলই অলীক, সকলেরই পরিণাম অশুভ, এবং সকলই পাপময়। এইরূপ ভাবনা করিয়া অর্জ্জিত পুণ্যের সংরক্ষণ, অলব্ধ পুণ্যের লাভ, উৎপন্ন পাপের পরিত্যাগ ও পাপান্তরের অনুৎপত্তি এই চারিটী বিষয়ে সম্যক্ চেষ্টাবান্ হইবে। অনন্তর সংসারাসক্তি ত্যাগ করিয়া বাসনা সমূহের ক্ষয় করিবে"।

"অপর ছয়টী অপরিহাণীয় ধর্ম্ম এই:—

যতদিন ভিক্ষুগণ কায়, মন ও বাক্যে ব্রহ্মচারিগণের প্রতি মিত্রব্যবহার করিবেন, যতদিন ভিক্ষুগণ ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যসমূহ কেবল নিজে ভোগ না করিয়া শীলবান্ ব্রহ্মচারিগণকেও

[illegible] করিয়া দিবেন, যতদিন ভিক্ষুগণ স্বীয় সদাচার রক্ষা করিবেন ও সদ্ধর্ম্মে তাঁহাদের দৃষ্টি থাকিবে ততদিন তাঁহাদিগের ক্ষয় হইবে না"।

অম্বলষ্ঠিকা ও নালন্দা।

কিয়দ্দূর বুদ্ধদেব রাজগৃহ ত্যাগ করিয়া আনন্দের সমভিব্যাহারে অম্বলষ্ঠিকা নামক স্থানে গমন করেন। সেখানে বহু ভিক্ষু সমবেত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব ঐ স্থানে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা বিষয়ে নানা ধর্ম্মালাপ করেন, ও বলেন শীলপরিশুদ্ধ সমাধি, সমাধিপরিশুদ্ধ প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞাপরিশুদ্ধ চিত্ত মহাফল প্রসব করে।

কিয়ৎকালপরে তিনি আনন্দের সমভিব্যাহারে নালন্দায় গমন করেন। সেখানে সারিপুত্র-নামক শিষ্যের সহ তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বুদ্ধদেব নালন্দার প্রাবারিকাম্রবনে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে সারিপুত্র তথায় উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন "হে ভগবন্! আপনার প্রতি আমার এরূপ ভক্তি যে আমার মনে হয় এই পৃথিবীতে অতীতকালে এমন কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন নাই এবং ভবিষ্যৎকালেও এমন কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিবেন না, যিনি আপনার অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী"। তখন বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন "হে সারিপুত্র! অতীতকালে যে সকল জ্ঞানী লোক [illegible] করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের চিত্তের সহ তোমার চিত্তের বিনিময় করিয়া কি জানিতে পারিয়াছ, তাঁহারা কিরূপ শীলসম্পন্ন, ধর্ম্মপরায়ণ ও প্রজ্ঞাবান্ ছিলেন, এবং ভবিষ্যৎকালে যে সকল জ্ঞানী লোক আবির্ভূত হইবেন, তাঁহাদের চিত্তের সহিত কি তোমার চিত্তের বিনিময় করিয়া জানিয়াছ তাঁহাদের শীল, ধর্ম্ম ও প্রজ্ঞা কিরূপ হইবে? হে সারিপুত্র তুমি কি আমার চিত্তের সহ তোমার চিত্তের বিনিময় করিয়া জানিয়াছ, আমার শীল, ধর্ম্ম ও প্রজ্ঞা কিরূপ?

সারিপুত্র উত্তর করিলেন "হে ভগবন্! অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জ্ঞানিগণের চিত্তের সহ আমার চিত্তের বিনিময় করিতে আমি সমর্থ নহি, আমি কেবল তাঁহাদিগের [illegible] প্রণালী অবগত হইয়াছি। নৃপতিগণ সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া উহা উচ্চ প্রাচীরদ্বারা পরিবেষ্টিত করেন। উহার একটীমাত্র বহির্দ্বার বিদ্যমান থাকে, এবং দ্বারী সশস্ত্র দণ্ডায়মান থাকিয়া সতত ঐ বহির্দ্বারে রক্ষা করিয়া থাকে। দ্বারবান্ পরিচিত লোকদিগকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেয় এবং অপরিচিত লোকদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেয়। ঐ বহির্দ্বার ব্যতীত অন্যত্র প্রবেশ করিবার অন্য কোন পথ বিদ্যমান থাকে না। প্রাচীরের কোন স্থানে [illegible] একটী ছিদ্রও থাকে না, যদ্দ্বারা একটী ক্ষুদ্র বিড়ালও ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে। অথচ ঐ বহির্দ্বার দ্বারা সুবৃহৎ প্রাণী ও বস্তুসমূহের প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ অনায়াসে নিষ্পন্ন হয়। হে ভগবন্! অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বুদ্ধের জ্ঞানিগণ [illegible] একটী দ্বার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা উপদেশ করিয়াছেন যে [illegible] না, [illegible] না, বিচিকিৎসা [illegible] পাঁচ প্রকারের প্রতিবন্ধক নিবারণ করা উচিত

অনন্তর ক্রোধ, উপনাহ, মক্ষ, প্রদাশ, ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য্য, শাঠ্য, মায়া, মদ, বিহিংসা, অহ্রী অনপত্রপা, স্ত্যান, ঔদ্ধত্য, অশ্রাদ্ধা, কৌসীদ্য, প্রমাদ, মুষিতস্মৃতিতা, বিক্ষেপ, অসংপ্রজন্য, কৌকৃত্য, মিদ্ধ, বিতর্ক ও বিচার এই চতুর্বিংশতি প্রকার উপক্লেশ অর্থাৎ চিত্তের দূষিত ভাব পরিবর্জন করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর চতুর্বিধ স্মৃত্যুপস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ কায় অপবিত্র, বেদনা দুঃখময়ী, চিত্ত চঞ্চল, ও পদার্থসমূহ অলীক এই চারি প্রকার চিন্তায় সতত অনুস্মরণ করা কর্ত্তব্য। অনন্তর স্মৃতি, পুণ্য, বীর্য্য, প্রীতি, প্রশ্রব্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা এই সাত প্রকার সম্বোধ্যঙ্গ অর্থাৎ পরম জ্ঞানের পথ ভাবনা করা বিধেয়। এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে সম্বোধি বা পরম জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। অতীত কালের জ্ঞানিগণ এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া সম্বুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, ভবিষ্যৎকালের জ্ঞানিগণও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া সম্বুদ্ধি লাভ করিবেন। ভগবান্‌ও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া সম্বুদ্ধি লাভ করিয়াছেন।"

পাটলীগ্রাম।

অনন্তর বুদ্ধদেব পাটলীগ্রামে উপস্থিত হন। পাটলীগ্রামীয় উপাসকগণ সমবেত হইয়া বুদ্ধদেবের পরিচর্য্যা করেন। তিনি আবসথাগারে আসীন হইয়া উপাসকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন "হে উপাসকগণ! অধার্ম্মিক ও দুঃশীল গৃহস্থগণের পঞ্চপ্রকার ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। (১) দুঃশীল গৃহস্থগণ ঘোর দরিদ্রতায় নিপতিত হয়; (২) তাহাদিগের দুর্নাম চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হয়; (৩) তাহারা মনুষ্যসমাজে সশঙ্ক অন্তঃকরণে বিচরণ করে; (৪) দেহত্যাগের সময়েও তাহাদের চিত্তের উদ্বেগ নিবৃত্ত হয় না; এবং (৫) মরণানন্তর তাহারা নিরয়গামী হয়। পক্ষান্তরে সুশীল গৃহস্থগণের পাঁচ প্রকার লাভ দৃষ্ট হয়। (১) সুশীল গৃহস্থগণ মহাসুখ ভোগ করেন; (২) তাঁহাদের সুনাম চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হয়; (৩) তাঁহারা প্রসন্ন অন্তঃকরণে মনুষ্য সমাজে বিচরণ করেন; (৪) দেহ ত্যাগ করিবার সময়ে তাঁহাদিগের চিত্তে কোন প্রকার উদ্বেগ থাকে না; এবং (৫) মরণান্তর তাঁহারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন।

এই সময়ে অজাতশত্রুর সুনীধ ও বর্ষকার নামক দুই ব্রাহ্মণ অমাত্য বৃজিজাতির উচ্ছেদ সাধনের নিমিত্ত পাটলীগ্রামে এক সুবৃহৎ দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। বুদ্ধদেব দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন, পাটলীগ্রাম একসময়ে পাটলীপুত্র নামে খ্যাতি লাভ করিবে। সমৃদ্ধি, সভ্যতা ও বাণিজ্য বিষয়ে উহা শ্রেষ্ঠ নগর হইবে। কিন্তু পরিশেষে অগ্নি, জল ও গৃহবিচ্ছেদ এই ত্রিবিধ কারণে পাটলীপুত্র নগরের ধ্বংস হইবে। অনন্তর তিনি সুনীধ ও বর্ষকারের গৃহে ভোজন করিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি দেখিতে পাইলেন, কোন কোন বলবান্ পুরুষ বাহু সঞ্চালন করিয়া গঙ্গাপার হইবার চেষ্টা করিতেছেন, কেহ কেহ নৌকার অন্বেষণ করিতেছেন, কেহ বা ভেলক প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বুদ্ধদেব সন্তরণ দ্বারা গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইলেন এবং গড়পারে গমন করিয়া হৃষ্ট অন্তঃকরণে নিম্নলিখিত উদান গান করি

নির্ব্বাণ লাভ করুন, আপনার পরিনির্ব্বাণকাল উপস্থিত হইয়াছে"। বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন "হে মার! যতদিন ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকা সমূহ বিনীত, বিশারদ, ধর্ম্মধর ও ধর্ম্মানুধর্ম্মচারী না হইবেন, ততদিন আমি পরিনির্ব্বাণ-গত হইব না; হে মার! যতদিন লোকসমাজে ব্রহ্মচর্য্য সুপ্রচারিত না হইবে, ততদিন আমি পরিনির্বৃত্ত হইব না; হে মার! ব্যস্ত হইও না, অদ্যাবধি তিন মাসের পর আমি পরিনির্ব্বাণ লাভ করিব"।

অনন্তর বুদ্ধদেব আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলেন "হে আনন্দ! বিমোক্ষের আটটী সোপান বিদ্যমান আছে। (১) যাহাদের মনোমধ্যে রূপের ভাব বিদ্যমান আছে তাহারা বাহ্য জগতে রূপ দেখিতে পায়; ইহাই বিমোক্ষের প্রথম সোপান। (২) মনোমধ্যে রূপের ভাব বিদ্যমান নাই অথচ বহির্জ্জগতে রূপ দেখিতে পায়; ইহাই বিমোক্ষের দ্বিতীয় সোপান। (৩) মনোমধ্যে রূপের ভাব বিদ্যমান আছে অথচ বহির্জ্জগতে রূপ দৃষ্ট হয়না; ইহা তৃতীয় সোপান। (৪) রূপ জগৎ অতিক্রম করিয়া "আকাশ অনন্ত" এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে আকাশানন্ত্যায়তনে বিহার করে; ইহাই বিমোক্ষের চতুর্থ সোপান। (৫) আকাশানন্ত্যায়তন অতিক্রম করিয়া "জ্ঞান অনন্ত" এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে বিজ্ঞানানন্ত্যায়তনে বিহার করে; ইহা বিমোক্ষের পঞ্চম সোপান। (৬) বিজ্ঞানানন্ত্যায়তন অতিক্রম করিয়া "কিছুই নাই" এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে আকিঞ্চন্যায়তনে বিহার করে; ইহা বিমোক্ষের ষষ্ঠ উপায়। (৭) আকিঞ্চন্যায়তন অতিক্রম করিয়া "জ্ঞানও নাই, অজ্ঞানও নাই।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তনে বিহার করে; ইহা বিমোক্ষের সপ্তম সোপান। (৮) নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন অতিক্রম করিয়া জ্ঞান ও জ্ঞাতা উভয়ের নিরোধ সাধন পূর্ব্বক সংজ্ঞাবেদয়িতনিরোধ উপলব্ধি করিয়া বিহার করে; ইহা বিমোক্ষের অষ্টম সোপান।

অনন্তর বুদ্ধদেব বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় গমন করেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে আনন্দ বৈশালীর সমগ্র ভিক্ষুকে কূটাগারশালায় আহ্বান করেন। বুদ্ধদেব তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হে ভিক্ষুগণ! আমি যে ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছি; তোমরা সুন্দর রূপে উহার পর্য্যালোচনা কর। লোকের হিত ও সুখের নিমিত্ত জগতে ব্রহ্মচর্য্য সুপ্রতিষ্ঠ কর। হে ভিক্ষুগণ আমি তোমাদিগকে যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছি, তাহার মধ্যে বক্ষ্যমাণ সপ্তত্রিংশৎ বিষয় তোমরা সম্যক্ রূপে ধারণ করিবে। সেই সপ্তত্রিংশৎ বিষয় এই:—চারিটী স্মৃত্যুপস্থান, চারিটী সম্যক্‌প্রহাণ, চারিটী ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ ও অষ্টমার্গ।

কায় অপবিত্র, বেদনা দুঃখময়ী, চিত্ত চঞ্চল, ও পদার্থ সমূহ অলীক; এই প্রকার ভাবনার নাম চতুঃস্মৃত্যুপস্থান। অর্জ্জিত পুণ্যের সংরক্ষণ, অলব্ধ পুণ্যের উপার্জ্জন, পূর্ব্ব সঞ্চিত পাপের পরিত্যাগ ও নূতন পাপের অনুৎপত্তি; এই চারি প্রকার চেষ্টার নাম চতুঃ সম্যক্‌প্রহাণ। অসাধ্য কর্ম্মও লাভের নিমিত্ত অভিলাষ, চিন্তা, উৎসাহ ও

অন্বেষণকে চারিটী ঋদ্ধিপাদ বলে। শ্রদ্ধা, সমাধি, বীর্য্য, স্মৃতি ও প্রজ্ঞা এই পাঁচটীর নাম পঞ্চ ইন্দ্রিয়। এই পাঁচ পদার্থ আবার পঞ্চ বল নামে ও অভিহিত হয়। স্মৃতি, ধর্ম্মপ্রবিচয়, বীর্য্য, প্রীতি, প্রশ্রব্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা এই সাতটীর নাম সপ্ত বোধ্যঙ্গ। সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যগ্বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যগ্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি, ও সম্যক্ সমাধি এই আটটীর নাম অষ্ট আর্য্যমার্গ।

এই সপ্তত্রিংশৎ পদার্থ লইয়া আমি ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছি। তোমরা এই ধর্ম্ম সম্যক্ রূপে আলোচনা কর ও লোক সমাজে প্রচার কর। হে ভিক্ষুগণ! আমি তিন মাসের পর পরিনির্ব্বাণ লাভ করিব। তোমরা সাবধান হইয়া কার্য্য কর। অনন্তর তিনি বক্ষ্যমাণ গাথা গান করিলেন;—

পরিপক্কো বযো মহ্যং পরিত্তং মম জীবিতং।
পহায় বো গমিস্সামি কতং মে সরণমত্তনো॥
অপ্পমত্তা সতিমন্তো সুসীলা হোথ ভিক্খবো।
সুসমাহিতসঙ্কপ্পা সচিত্তম্ অনুরক্খথ॥
যো ইমস্মিং ধম্মবিনয়ে অপ্পমত্তো বিহেস্সতি।
পহায় জাতিসংসারং দুক্খস্সন্তং করিস্সতি॥

আমার বয়স পরিপক্ক হইয়াছে, জীবনের অল্প অবশেষ আছে, সমস্ত ত্যাগ করিয়া আমি চলিয়া যাইব, আমার নিজের আশ্রয় আমি স্থির করিয়াছি। হে ভিক্ষুগণ! তোমরা অপ্রমত্ত সমাহিত ও সুশীল হও, দৃঢ়সংকল্প হইয়া স্বীয় চিত্ত রক্ষণ কর। যিনি এই ধর্ম্মে বিহার করিবেন, তিনি জন্ম ও সংসারের উচ্ছেদ [illegible] করিতে পারিবেন।

অনন্তর বুদ্ধদেব ভিক্ষুগণ সমভিব্যাহারে ভণ্ডগ্রামে উপস্থিত হন। সেখানে [illegible] সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন,—হে ভিক্ষুগণ! শীল, সমাধি প্রজ্ঞা ও বিমুক্তি এই চারিপদার্থের অননুশীলন-বশতঃ লোক সকল সংসারে [illegible]

ভণ্ডগ্রাম, হস্তিগ্রাম, আম্রগ্রাম, জম্বুগ্রাম, ভোগনগর।

অনন্তর বুদ্ধদেব হস্তিগ্রাম, [illegible] করেন। তিনি ভোগনগরে [illegible] বলিলেন। যদি কোন ভিক্ষু আসিয়া [illegible] তিনি অনু[illegible] বলিয়াছেন, বা ভিক্ষুসংঘের নিকট [illegible] হইয়াছেন, [illegible] কয়েক জন স্থবির-ভিক্ষু মিলিত হ[illegible] বলিয়াছেন, অথবা কোন [illegible] বিদ্বান্ ভিক্ষুর মুখ হইতে ঐ ব[illegible] তোমরা তাঁহার [illegible] মতঃ আস্থা বা অনাস্থা [illegible] বাক্যটী সূত্রে [illegible] বিনয়ে [illegible] অনুরূপ বাক্য [illegible]

মান থাকে, তাহা হইলে জানিবে, উক্ত ভিক্ষু ঐ বাক্যটী সুন্দররূপে গ্রহণ করিয়াছেন; এবং তাহা হইলে তাঁহার বাক্যে অভিনন্দন প্রকাশ করিও। আর যদি সূত্রে বা বিনয়ে বাক্যটী দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে জানিবে উক্ত ভিক্ষু ঐ বাক্যটী দূষিতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহা হইলে, তাঁহার কথায় তোমরা আস্থা স্থাপন করিও না"।

পাবা ও কুশীনগর।

অনন্তর বুদ্ধদেব পাবা নামক স্থানে গমন করিয়া চুন্দ নামক শিষ্যের আম্রবনে বিহার করেন। চুন্দ বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক নিবেদন করিল "হে ভগবন্! ভিক্ষুসংঘের সহ সমবেত হইয়া আপনি কল্য আমার গৃহে ভোজন করিবেন"। বুদ্ধ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া চুন্দের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। চুন্দ গৃহে গমন করিয়া বিবিধপ্রকার খাদ্য ও প্রভূত শূকরমাংস প্রস্তুত করিল। পরদিন বুদ্ধ চুন্দের আলয়ে গমন করিয়া তাহাকে বলিলেন "হে চুন্দ! তুমি শূকরমাংস আমাকে পরিবেশন কর, এই ভিক্ষুসংঘকে উহা প্রদান করিও না; মনুষ্যলোক, দেবলোক ও ব্রহ্মলোকে বুদ্ধ ভিন্ন এমন কেহ নাই, যিনি শূকরমাংস ভক্ষণ করিয়া জীর্ণ করিতে পারেন। হে চুন্দ! আমাকে পরিবেশন করিবার পর যে শূকরমাংস অবশিষ্ট থাকিবে, উহা গর্ত্তমধ্যে নিক্ষিপ্ত কর"। তাঁহার বাক্যানুসারে চুন্দ অবশিষ্ট মাংস গর্ত্তে নিক্ষেপ করিল।

চুন্দের গৃহে ভোজনের অব্যবহিত পরেই বুদ্ধের লোহিতপ্রবাহিকা ব্যাধি অর্থাৎ রক্তাতিসার জন্মে। তিনি সেই অবস্থায়ই কুশীনগরাভিমুখে গমন করেন। পথমধ্যে তিনি আনন্দকে বলেন "হে আনন্দ! আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি, তুমি একখানি বস্ত্র চতুর্ব্বিধ করিয়া এই বৃক্ষমূলে বিস্তারিত কর। আমার পিপাসা উপস্থিত হইয়াছে, কিঞ্চিৎ পানীয় আনয়ন কর"। অনন্তর বুদ্ধদেব জলপান করিয়া কথঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভ করিলেন।

সেই সময়ে পুক্কুস নামক আলাড় কালামের কোন শিষ্য কুশীনগর হইতে পাবাভিমুখে আগমন করিতেছিলেন। বুদ্ধকে দেখিয়া তিনি বলিলেন "অহো! প্রব্রজ্যার কি অসীম প্রভাব। এক সময়ে আলাড় কালাম কোন বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া তপস্যা করিতেছিলেন, তখন পাঁচ শত শকট তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তিনি উহা দেখিতে পাইলেন না বা উহার শব্দ শুনিতে পাইলেন না"। পুক্কুসের কথা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধ বলিলেন "হে পুক্কুস! আমি এক সময়ে আত্মা নামক স্থানে ভূধরাগারে তপস্যা করিতেছিলাম, তখন অবিরত মেঘগর্জ্জন, বৃষ্টিপাত ও বিদ্যুৎ বিস্ফুরণ হইতেছিল। সেই দুর্ঘটনায় তু[illegible] পারের দুইজন কৃষক ও চারিটী ব[illegible]। যেখানে সেই কৃষকদ্বয় ও ব[illegible] বর্ষচতুষ্টয় বিনষ্ট হয়, সেই স্থানে [illegible] য়াছিল। তাহাদের মধ্য হইতে একজন আসিয়া আমাকে [illegible] কি হইয়াছে?" আমি বলিলাম "আমি কিছুই জানি না [illegible] মহাশয়! দেববর্ষণ, মেঘগর্জ্জন, বিদ্যুৎ-স্ফুরণ, [illegible] আমার কর্ণে কোন শব্দ

"প্রবেশ করে নাই?" অনন্তর সেই ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়! আপনি কি নিদ্রিত ছিলেন?" আমি বলিলাম "না! আমি জাগ্রত ছিলাম"। তখন সেই লোক বলিল "মহাশয়! বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আপনি জাগ্রত ছিলেন অথচ কিছুই দেখিতে পাইলেন না।" বুদ্ধের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুক্কুস অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন ও সেইদিন তিনি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘের আশ্রয় লইলেন।

কিয়ৎকাল পরে পুক্কুস বুদ্ধকে একখানি সুবর্ণবর্ণ বস্ত্র প্রদান করেন। আনন্দ ঐ বস্ত্রে বুদ্ধের দেহ আবৃত করেন। অনন্তর বুদ্ধ মহাভিক্ষুসংঘসমভিব্যাহারে কুকুত্থা নদীর উপস্থিত হন। তিনি ঐ নদীতে স্নান ও উহার জল পান করিয়া চুন্দের আম্রবনে গমন করেন। চুন্দ একখানি বস্ত্র চতুর্দ্বারবৃত্ত করিয়া বুদ্ধের শয্যা প্রস্তুত করে। তিনি শয়ন করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করেন। অনন্তর তিনি আনন্দকে ডাকিয়া বলিলেন "হে আনন্দ! চুন্দের মনে যদি কোন প্রকার পরিতাপ উপস্থিত হইলে তুমি উহার বিনোদন করিও, তাহার গৃহে ভোজন করিয়া আসিয়াছ, ইহা ভাবিয়া সে যেন চঞ্চলিত না হয়। তুমি তাহাকে [illegible] বুঝাইয়া যে সদ্ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছ, তদ্দ্বারা তাহার [illegible] গৌতম বুদ্ধ তাহার গৃহে শেষ আহার গ্রহণ করিলেন। [illegible] করিয়াছিলেন ও যে খাদ্য খাইয়া তিনি পরিনির্ব্বাণ [illegible] ফলদায়ক"।

অনন্তর বুদ্ধ উদান গান করিলেন:—

"পুঞ্ঞং পবড্ঢতি সংযমতো বেরং ন চীয়তি।
কুসলো চ জহাতি পাপকং রাগদোসমোহক্খয়া স নিব্বুতো তি॥

দানশীল ব্যক্তির পুণ্য প্রবর্দ্ধিত হয়, সংযত ব্যক্তির বৈর উৎপন্ন হয় না, ধার্ম্মিক ব্যক্তি অমঙ্গল বর্জ্জন করিতে পারেন, এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহের ক্ষয়ে নির্ব্বাণ লাভ হয়।

অনন্তর বুদ্ধ হিরণ্যবতী নদী পার হইয়া কুশীনগরের উপবর্ত্তনে শালবনে উপস্থিত হন। সেখানে উত্তরশীর্ষ হইয়া একটী মঞ্চের উপর শয়ন করেন। অনন্তর আনন্দকে ডাকিয়া বলিলেন "হে আনন্দ। চারিটী স্থান সকলেরই শ্রদ্ধার সহিত অবলোকন করা উচিত; যেখানে বুদ্ধের জন্ম হইয়াছে, যেখানে তিনি সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিয়াছেন, যেখানে তিনি ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন ও যেখানে তাঁহার পরিনির্ব্বাণ লাভ হইয়াছে। এই চারিটী স্থান সকলেরই শ্রদ্ধার সহিত দর্শন করা উচিত"।

এই সময়ে আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগবন্! স্ত্রীজাতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে?" বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন "অদর্শন, অর্থাৎ তাহাদিগের সহ সাক্ষাৎ করিবে না"। "হে ভগবন্ যদি সাক্ষাৎ হয় তাহা হইলে কি করিতে হইবে?"

"হে আনন্দ অনালাপ, অর্থাৎ তাহাদিগের সহ আলাপ করিবে না"।

ভগবন্! যদি তাহারা আলাপ করে, তাহা হইলে কি করিতে হইবে?"
আনন্দ উপস্থাপন, অর্থাৎ তাহাদিগকে দেবতার ন্যায় পূজা ও উপাসনা করিবে।
সুখ আনন্দ বুদ্ধকে বলিলেন "হে ভগবন্! কুশীনগর একটী অজপূর্ণ ক্ষুদ্র নগর,
আপনি এখানে পরিনির্বৃত হইবেন না। চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী,
বারাণসী প্রভৃতি অনেক মহানগর আছে, সেখানকার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ আপনার
প্রতি ভক্তিমান, তাঁহারা ভগবানের সবীর পূজা করিবেন। হে ভগবন্! আপনি
এ পরিনির্ব্বাণগত হইবেন না।" বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন "হে আনন্দ, তুমি
এরূপ কথা বলিও না। পুরাকালে মহাসুদর্শন নামে এক ধার্ম্মিক ও চক্রবর্ত্তী
বিজয়ী রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এই কুশীনগর বা কুশাবতীতে রাজত্ব
করিতেন। এই রাজধানী মহাঋদ্ধিশালী ও বহুজনাকীর্ণ ছিল ইহা পূর্ব্ব পশ্চিম
দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ ও উত্তর দক্ষিণ সপ্তযোজন বিস্তৃত। হে আনন্দ তুমি
মল্লগণকে বল, আজ রাত্রির শেষ যামে বুদ্ধ এই স্থানে পরিনির্ব্বাণলাভ করিবেন।
কুশীনগরের মল্লগণ তথায় আগমন করিয়া বুদ্ধের বন্দনা ও পূজা করিল।

এই সময়ে সুভদ্র নামক পরিব্রাজক কুশীনগরে আগমন করেন। সুভদ্র শুনিলেন যে আজ রাত্রির শেষ যামে গৌতম বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণলাভ করিবেন। তখন সুভদ্র বলিলেন—"আমি প্রাচীনগণের মুখে শ্রবণ করিয়াছি সময়ান্তরে কদাচিৎ কোন বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়া থাকে। গৌতম বুদ্ধ আজ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন। আমার ধর্ম্ম বিষয়ে একটী সন্দেহ আছে। বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমি সন্দেহ ভঞ্জন করিব।" সুভদ্র বুদ্ধের সমীপে গমন করিতে উদ্যত হইলে আনন্দ বলিলেন "মহাশয় ভগবান্ ক্লান্ত হইয়াছেন, আপনি তাঁহাকে বিরক্ত করিবেন না।" বুদ্ধদেব ঐ কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দকে বলিলেন,—"হে আনন্দ সুভদ্রকে বারণ করিওনা, তাহাকে আমার সমীপে আসিতে দেও।" তখন সুভদ্র বুদ্ধের সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে গৌতম! পূরণ কাশ্যপ, মক্করী গোশাল, অজিত কেশকম্বলী, প্রকুধ কাত্যায়ন, সঞ্জয় বেলাষ্ঠপুত্র ও নিগ্রন্থ নাথপুত্র প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্মোপদেষ্টা পৃথিবীতে বিদ্যমান আছেন তাঁহাদের উপদেশ সকল শ্রেয়স্কর কি না এবং তাঁহারা সকলে অভিজ্ঞ কিনা?" বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন,—"হে সুভদ্র, ঐ সকল তীর্থঙ্কর অভিজ্ঞ কিরূপ তাহা বিচার করিয়া কোন ফল নাই; আমি তোমাকে যে ধর্ম্মের উপদেশ দিতেছি তাহা মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর। হে সুভদ্র, যে ধর্ম্মে সম্যগ্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যগ্ বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যগ্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি এই অষ্ট আর্য্যমার্গের উপদেশ নাই ঐ ধর্ম্মের অবলম্বিগণের মধ্যে কোন শ্রমণ জন্মিতে পারেন না; যে ধর্ম্মে অষ্ট আর্য্যমার্গের উপদেশ আছে সেই ধর্ম্মে শ্রমণও বিদ্যমান আছেন। শ্রমণ ভিন্ন অপর ব্যক্তিগণের বাক্য শূন্য গর্ভ

ও মল্লগৃহস্থগণ কেশ বিকিরণ করিয়া ও বাহু বিতাড়ন পূর্ব্বক ভূমি [illegible] তিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অনন্তর উহারা কুশীনগরের উপকণ্ঠে শা[illegible]ন করিয়া নৃত্য, গীত, বাদ্য, পুষ্পমালা, গন্ধ প্রভৃতি দ্বারা ক্রমান্বয়ে সাত দিন বু[illegible]ব পূজা করিল। সপ্তম দিবসে উহারা বুদ্ধের দেহ মুকুটবন্ধন নামক চৈত্যে স্থানান্তরিত করিয়া শুদ্ধ বস্ত্রদ্বারা পরিবেষ্টিত করিল ও অনন্তর উহা শুদ্ধ কার্পাস দ্বারা আবৃত করিল। এইরূপে পঞ্চশতে পাঁচশত বার বস্ত্র ও কার্পাস দ্বারা দেহ আচ্ছাদিত করা হইল। অনন্তর তৈলপূর্ণ সৌবর্ণপাত্রে ঐ দেহ নিক্ষিপ্ত হইল। [illegible]নন্তর উহারা সর্ব্বগন্ধময় চিতা প্রস্তুত করিয়া ঐ দেহের [illegible] করিল। [illegible] এক বৃহৎ [illegible] করিয়া বলিল [illegible] কেন গৃহস্থ এইস্থানে [illegible] বা পদ [illegible] করিবেন, অথবা এখানে আগমন [illegible] চিত্ত প্রসন্ন করিবেন, তাহাদিগের জীবন সুদীর্ঘ হইবে ও তাহারা সুখ [illegible]

এই সময়ে মহারাজগণ পাঁচশত ভিন্ন ভিন্ন যানে আরো[illegible] [illegible] করেন। তিনি মুকুটবন্ধন চৈত্যে উপস্থিত হইয়া তিনবার [illegible] ও অবনত মস্তকে বুদ্ধের পাদ বন্দনা করিলেন। অনন্ত[illegible] ক্রমে বুদ্ধের চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু প্রভৃতি সমস্তই দগ্ধ হইল, কে[illegible] থাকিল।

এই সময়ে মগধ রাজ অজাতশত্রু শুনিলেন, বুদ্ধদেব [illegible] তিনি কুশীনগরে দূত প্রেরণ করিয়া বলিলেন [illegible] আমিও ভগবানের পরীনির্ব্বাণ [illegible] আমি ভগবানের [illegible] উপর মহাস্তূপ নির্ম্মাণ [illegible] দেহ ভাগ করিয়া বলিল, "ভগবান্ [illegible] আমরাও ভগবানের দেহের অংশ পাইতে পারি, আমরাও দেহাবশেষের উপর মহাস্তূপ নির্ম্মাণ করিব।" এইরূপে কপিলবস্তুর শাক্যগণ, অল্লকল্পের বুলয়গণ, রামগ্রামের [illegible] ও বেদদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ সকলেই বুদ্ধের শরীরাংশ প্রার্থনা করিলেন। বেঠদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ ও বুদ্ধের দেহের অংশ প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। এই সময়ে কুশীনগরের মল্লগণ বলিল "ভগবান্ আমাদিগের গ্রামক্ষেত্রে পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরা কাহাকেও উহার দেহের অংশ প্রদান করিব না।" তখন দ্রোণ-নামক ব্রাহ্মণ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—

"সুণন্তু ভোন্তো মম একবাক্যম্
অম্হাকং বুদ্ধো অহু খন্তিবাদো।
ন চ যুজ্জতে অয়ম্ উত্তমপুগ্গলস্স
সরীরভঙ্গে সিয়া সম্পহারো॥
সব্বেব ভোন্তো সহিতা সমগ্গা
সম্মোদমানা করোম অট্ঠ ভাগে॥

মহাকাশ্যপের সভাপতিত্বে ও পাঁচ শত ভিক্ষুর সমাগমে প্রথম বৌদ্ধসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজগৃহ নগরে বৈভার পর্ব্বতের পার্শ্বে ও সপ্তপর্ণী গুহার সমীপে সভা সংস্থাপনের নিমিত্ত অজাতশত্রু এক গৃহ নির্ম্মাণ করেন। সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইয়া মহাকাশ্যপ বিনয় ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। উপালি ও আনন্দ যথাক্রমে ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর করেন।

২য় বৌদ্ধসংঘ

মহাবংশের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ও চুল্লবগ্গের দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে বৈশালীর কতিপয় ভিক্ষু কয়েকটী ধর্ম্মনিয়ম ভঙ্গ করায় খৃঃ পূঃ ৪৪০ অব্দে বৈশালী নগরীর বালুকারাম বিহারে কালাশোকের রাজত্বকালে দ্বিতীয় বৌদ্ধসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। সভায় সাত শত ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন এবং স্থবির রেবত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এবারেও প্রশ্ন ও উত্তর দ্বারা ধর্ম্মের তত্ত্ব নিরূপিত হয়।

৩য় বৌদ্ধসংঘ

মহাবংশের পঞ্চম পরিচ্ছেদে লিখিত আছে, তীর্থিকগণ কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া স্বীয় ধর্ম্মমত সমূহ বুদ্ধের প্রচারিত মত বলিয়া খ্যাপন করিত। উহারা বৌদ্ধ ভিক্ষু সাজিয়া লোকদিগকে প্রতারিত করিত ও যথার্থ ভিক্ষুগণের সহ উপোষথ ক্রিয়া সম্পন্ন করিত। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ধর্ম্মাশোকের নিকট নিবেদন করেন "মহারাজ! আমরা তীর্থিকগণের সহ একত্র উপোষথ করিব না"।

তদনুসারে ধর্ম্মাশোক তীর্থিকগণকে অশোকারাম বিহার হইতে পৃথক করিয়া দেন। তদনন্তর পাটলীপুত্র নগরে খৃঃ পূঃ ৩২১ অব্দে ধর্ম্মাশোকের রাজত্বকালে তৃতীয় বৌদ্ধসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময়ে তথায় সহস্র ভিক্ষু সমবেত হন এবং মৌদ্গলীপুত্র তিষ্য সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি কথাবৎথুপ্রকরণ নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া ধর্ম্মবিষয়ক সন্দেহ সমূহ নিবারণ করেন।

৪র্থ বৌদ্ধসংঘ

সুম্‌পোই ছোই জুঙ্ নামক তিব্বতীয় গ্রন্থের মতে খৃঃ পূঃ ৩৩ অব্দে কনিষ্কের রাজত্বকালে কাশ্মীরের কুণ্ডান নামক স্থানে একটী বৌদ্ধসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। কনিষ্ক, পঞ্জাব, দিল্লী অঞ্চল ও কাশ্মীরের রাজা ছিলেন। এই সময়ে অশ্বঘোষ বৌদ্ধসঙ্ঘ কনিষ্ককে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত জানবশঃ নামক ভিক্ষুকে কাশ্মীরে প্রেরণ করেন। জানবশঃ চতুর্থ বৌদ্ধসংঘ সভায় উপস্থিত ছিলেন। বসুমিত্র ও পার্শ্বকের তত্ত্বাবধানে এই সভা পরিচালিত হয়। এই সভায় ৫০০০ ভিক্ষু ও ৫০০ অর্হৎ আগমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে বৌদ্ধগণ অষ্টাদশ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রত্যেকেরই বিভিন্ন ধর্ম্ম মত ছিল। ঐ সকল ধর্ম্ম মত হইতে প্রকৃত তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার জন্য কনিষ্ক ৪র্থ বৌদ্ধসংঘের প্রতিষ্ঠা করেন।